সীরাতুল মুস্তফা সা.
২য় খন্ড
আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.)

সীরাতুল মুস্তফা (সা)

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী (র)

কালাম আযাদ অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

সীরাতুল মুস্তাফা (সা) দ্বিতীয় খণ্ড
মূল: হযরত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র)
কালাম আযাদ অনূদিত
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪০৪
ইফা প্রকাশনা : ২২৮৮/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0950 5

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০৪

তৃতীয় প্রকাশ (উন্নয়ন)
আগস্ট ২০১৩
ভাদ্র ১৪২০
শাওয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হারুনুর রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ১৮০.০০ (একশত আশি) টাকা।

SEERATUL MUSTAFA (SM) : written by Hazrat Allama Idris Kandlavi in Urdu, translated by Kalam Azad in Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone: 8181535, August 2013.

E-mail : Directorpubif@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 180.00 ; US Dollar : 7.00

সূচিপত্র

মহাপরিচালকের কথা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন-এর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ·

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

আর মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন :

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"

তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের নিশ্চয়তা।

মহানবী (সা)-এর জীবন এক মহাসমুদ্রের মত। তিনি যদিও পৃথিবীতে মাত্র ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্মের আলোচনা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। মানুষের জন্যে খোদায়ী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি একমাত্র তাঁরই মাধ্যমে ঘটাতে তাঁর সীরাত বা জীবনী চর্চার প্রয়োজন বর্তমানে আরো অধিক হওয়ার দাবিদার।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব ভাষায়ই মহানবী (সা)-এর সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষের তথ্য অনুযায়ী শুধু বাংলা ভাষায়ই বিগত কয়েক শ' বছরে পাঁচ শ'-এর অধিক সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

'সীরাতুল মুস্তফা (সা)' নামের এই প্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থটি রচনা করেছেন বিখ্যাত আলিমে দীন আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র)। তিন খণ্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক জনাব কালাম আযাদ। প্রথম সংস্করণে কিছু ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণে এটি পূনঃসম্পাদনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যাবতীয় প্রকাশনাকে কবুল করুন। আমিন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন

প্রকাশকের কথা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বজগতের জন্য মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক অনন্য আশিস্–রাহ্মাতুললিল আলামীন। তাওহীদের আলোকময় বাণীর অবিনাশী ঝাণ্ডা নিয়ে তিনি অজ্ঞানান্ধ ও সত্যভ্রষ্ট মানুষকে আহ্বান করেন সত্যের পথে, কল্যাণের পথে; শান্তি, সাম্য, মানবতা ও সৌভ্রাতৃত্বের পথে। আল্লাহ্র প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাঁর অসাধারণ চরিত্র-মাধুর্য, সততা-নিষ্ঠা, আমানতদারি, সর্বোপরি পরিপূর্ণ তাকওয়াসমৃদ্ধ কল্যাণকর এক আদর্শ মানব সমাজ গঠনে তাঁর অসাধারণ সাফল্য বিশ্ব-ইতিহাসের শীর্ষতম স্থানে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। প্রখ্যাত মনীষী এডওয়ার্ড গীবন তাঁর 'দি ডিক্লাইন এন্ড দি ফল্ অব দি রোমান এম্পায়ার' গ্রন্থে নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 'আরবীয় পয়গাম্বরের মেধা, তাঁর জাতির আচার-আচরণ এবং তাঁর ধর্মের প্রাণশক্তি প্রাচ্য সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ; এবং আমাদের দৃষ্টি অন্যতম প্রধান স্মরণীয় একটি বিপ্লবের দিকে অভিনিবিষ্ট, যা বিশ্বের জাতিসমূহের ওপর এক নতুন ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে।' মহানবী (সা) বিশ্বমানবের, বিশ্বসমাজের ওপর 'সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী' এক মহান মানুষ, মহান পয়গাম্বর।

মানবমুক্তির মহান দিশারী সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আলোকোজ্জ্বল জীবনাদর্শ বিশ্বমানবের সামনে অনির্বাণ প্রদীপ-শিখার মতো–যুগ যুগ ধরে যা পথনির্দেশনা দিয়ে চলেছে কোটি কোটি মানুষকে। সেই আদর্শ আজও যেমন আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়, ভবিষ্যতেও তেমনি নিজের অনন্য অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অম্লান জীবনাদর্শ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে অগণিত সীরাত গ্রন্থ। আরবী, উর্দু, ফারসি, ইংরেজিসহ পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় রচিত এ সকল সীরাত গ্রন্থ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বৈচিত্র্যধর্মী উপস্থাপনা-নৈপুণ্যে ভাস্বর এবং স্ব-বৈশিষ্ট্য ও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এ কারণে মহানবী (সা)-এর মহাসমুদ্রতুল্য জীবন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে হলে বিভিন্ন ভাষায় রচিত সীরাত গ্রন্থসমূহ পাঠ করা অত্যন্ত জরুরী।

এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় রচিত বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে আসছে। এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র) কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত মূল্যবান সীরাত গ্রন্থ 'সীরাতুল মুস্তাফা (সা)' অনুবাদ ও প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। বইটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। বিশিষ্ট আলিম ও লেখক জনাব কালাম আযাদ কর্তৃক অনূদিত দ্বিতীয় খণ্ডটি ২০০৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'সীরাতুল মুস্তাফা (সা)' বইটি যেমন তথ্যবহুল ও তেমনি সুলিখিত তেমনি অনুবাদটিও হয়েছে মূলানুগ। এ কারণে প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই এর দ্বিতীয় সংস্করণের সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে বইটির পুনঃসম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি, বইটি আগের মতোই সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সমাদর লাভ করবে। আল্লাহ্ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

নবী (আ)-গণের আগমন আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট নিয়ামত। এ নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনে মানব দেহের প্রতিটি পশম প্রশংসামুখর জিহ্বায় পরিণত হলেও তা শেষ করা যেত না। তাঁদের শুভাগমন পৃথিবীতে না ঘটলে মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে পথহারা মানুষদের কে পথনির্দেশনা দিত? প্রকৃত প্রভুর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি সম্পর্কে কে আমাদের অবহিত করত? ঐ প্রকৃত মা'বূদের ইবাদত-বন্দেগীর পদ্ধতি কে আমাদেরকে শেখাত? কে বুঝাত হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের পার্থক্য? উপার্জন ও পরিশ্রম, দীন ও দুনিয়া, আত্মার পরিশুদ্ধিতার অনুশীলন, শাসন ও সুবিচার করার পথ কে আমাদের দেখাত? মসজিদের চটে বসে কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায়, মহা ন্যায়বিচারক মহানস্রষ্টা আল্লাহর অবাধ্য জনগণের শোষক তৎকালীন রোম ও পারস্য সম্রাট তাদের সিংহাসন কিভাবে ন্যায় ও সত্যের কাছে ধসে পড়ে, কিভাবে মসজিদের ইমাম হয়ে যুগপৎ রাষ্ট্রপতি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক হওয়া যায় এবং মসজিদের মেঝেতে বসে তৎকালীন বৃহৎ শক্তিসমূহের অন্যায় দখলমুক্ত করা যায়, সম্পদ মযলূম মানুষদের মাঝে বন্টন করা যায়—এ বিরাট কাজসমূহ একমাত্র নবী (আ)-গণ ছাড়া কেউই আমাদের শেখাতে পারতেন না। আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান, অমসৃণ কর্মকুশলতার নূর, পথ প্রদর্শন ও হিদায়াত ছাড়া সম্পূর্ণই অকার্যকর, অর্থহীন।

চোখ যতই জ্যোতির্ময় ও দৃষ্টিপ্রখর হোক না কেন, যদি সূর্য ও চন্দ্রের আলোর সাহায্য না পায়, তখন তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে জ্ঞানের জ্যোতি এবং চোখের জ্যোতির দ্বারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য তখনই ধরা পড়ে, যখন নবূওয়াতের নূর এবং হিদায়ত প্রদীপের আলো তার পরামর্শদানকারী ও পথপ্রদর্শক হয়। যেমন রাতে এবং অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি কোনো কাজে আসে না, তেমনি পথহারাদের রাতের গভীরতা তুল্য অন্ধকারে জ্ঞানের আলোও ফলপ্রসু হয় না।

জ্ঞানও একটি দলীল কিন্তু ওহী ও নবূওয়াতী জ্ঞান ছাড়া তা অসম্পূর্ণ, পরিপূর্ণতার স্তর পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে না। পরিপূর্ণ দলীল তো নবী (আ)-গণের আবির্ভাব, যার ওপর পরকালের স্থায়ী আযাব ও সওয়াব এবং পুরস্কার ও শাস্তি নির্ভরশীল। মানুষের এ অন্ধ, পঙ্গু ও খোঁড়া জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহ, তাঁর উচ্চমার্গের গুণাবলী, তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি, আম্বিয়ায়ে কিরাম (তাঁদের প্রতি হাজার সালাম)-এর শিক্ষা ব্যতীত কি করে শিখবে?

মোটকথা নবী-রাসূল (আ)-গণের আবির্ভাব হচ্ছে রহমত এবং বাস্তব নিয়ামতের মূর্তপ্রতীক। তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শের ওপর দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য ও সাফল্য নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর মাধ্যমে এর সূত্রপাত ঘটান আর বান্দার হিদায়াতের জন্য একের পর এক পয়গাম্বর প্রেরণ করেন, যাতে তাঁরা মানুষকে প্রকৃত ইলাহ-এর আনুগত্যের আহ্বান জানাতে পারেন এবং তাদেরকে নাফরমানী থেকে বাঁচাতে পারেন, অনুগত ও আজ্ঞাবহদের জান্নাতের সুসংবাদ শোনাতে পারেন এবং নাফরমান ও অবাধ্যদেরকে আযাবের ভয় দেখাতে পারেন।

যাঁরা সৌভাগ্যবান, তাঁরা এ মহা নিয়ামতের প্রতি সম্মান দেখান ও আল্লাহর শোকর আদায় করেন এবং নিছক পার্থিব বিষয়াদিতে নিমজ্জিত না থেকে আল্লাহর নবী (আ)-গণের পথনির্দেশনা গ্রহণ করেন। আর নিজের ইচ্ছা, কামনা-বাসনা ও সন্তুষ্টিকে ঝেড়ে ফেলে প্রতিটি কাজকর্ম নবী-রাসূলগণের আদর্শ ও নির্দেশনা অনুসারে করে থাকেন। এ শ্রদ্ধাভাজনদের হাতে নিজেদেরকে এমনভাবে সমর্পন করেন, যেমনিভাবে মৃত ব্যক্তি জীবিতদের হাতে সমর্পিত হয়ে থাকে। আর যারা নির্বোধ ও ভাগ্যাহত, তারা এ মহা নিয়ামতের মর্যাদা অনুধাবনে ব্যর্থ। তাদের কাছে শরীআতের অনুসরণ ও আল্লাহর নির্দেশ মানা কঠিন মনে হবে। তারা অন্য প্রাণীর ন্যায় চলা নিজেদের জন্য পসন্দ করবে। তারা ঐ সম্মান ও মর্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না, যা আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা পালনের আহ্বানের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন। আর নিজেদের কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় এবং অভিশপ্ত শয়তানের উস্কানী ও ফুসলানোর ফলে ওরা আল্লাহর নবী (আ)-গণকে অস্বীকার ও তাঁদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাঁদের সাথে শত্রুতা ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আনুগত্যকে তারা দূষণীয় ও অপমানজনক মনে করে এং প্রবৃত্তি ও শয়তানের আনুগত্যকে নিজেদের জন্য সম্মানজনক মনে করে। হযরত আম্বিয়া (আ) সুন্দর ও নম্রভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে থাকেন। যেমনিভাবে মহানুভব ও দয়ার্দ্র পিতা তার অপদার্থ সন্তানকে সংশোধন ও সুশিক্ষাদানের জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেন না, তেমনি নবী (আ)-গণ নিঃস্বার্থ উপদেশ ও স্নেহপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা উম্মতের অযোগ্য ও দুর্ভাগা সদস্যদের বুঝানোর ও সংশোধনের কোন চেষ্টাই বাদ রাখেননি।

তাঁরা সুদীর্ঘকালব্যাপী সুন্দর ও নম্রভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে থাকেন, কিন্তু হতভাগার দল দিনকে দিন আল্লাহ্ থেকে দূরে পলায়ন করতে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قَالَ رَبِّ انِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلاً وَّنَهَاراً - فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِىْ الاَّ فِرَاراً وَانِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْاْ اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْاْ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً ٠

"সে [নূহ (আ)] বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্র আহ্বান করেছি, কিন্তু আমার আহ্বান ওদের পলায়ন-প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।

আমি যখনই ওদের আহ্বান করি, যাতে তুমি ওদের ক্ষমা কর, ওরা কানে আঙুল দেয়, নিজেদেরকে কাপড়ে ঢেকে রাখে ও হঠকারিতর ওপর অটল থাকে এবং খুবই ঔদ্ধত্য সহকারে দাম্ভিকতা প্রকাশ করে।" (সূরা নূহ : ৫-৭)

যখন নবী (আ)-গণ নসীহত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, ওদের ওপর এর কোনোই প্রভাব পড়ে না; বরং ওদের ঔদ্ধত্য ও পাপ-প্রবণতা আরো বাড়তে থাকে, তাদের বিরোধিতায় অনুগতদের পক্ষে আল্লাহর নাম নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। আল্লাহর নবী এবং তাঁদের সঙ্গী অনুসারীদের ওপর যখন ওদের যুলুম-নিপীড়ন, ঠাট্টা-বিদ্রুপ বৃদ্ধি পায়, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি আযাব নাযিল করেন। মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের রক্ষা করেন এবং অস্বীকারকারী ও মিথ্যাবাদীদের ধ্বংস করে দেন। কাউকে পানিতে ডুবিয়ে আবার কাউকে যমীনে ধসিয়ে মারেন, কারো প্রতি আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করেন আর কারো জন্য পাঠান ভূমিকম্প। কারো প্রতি প্রবল ঝড়ো হাওয়া প্রেরণ করেন, আবার কাউকে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেন। (হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে এসব শাস্তি থেকে রক্ষা কর)। মোটকথা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে অস্বীকারকারী ও তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হওয়াটা ঐতিহাসিক সত্য, এতে কারো দ্বিমত নেই।

একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত আযাব দানকারী এবং চরম প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সব সময় তিনি আড়ালে থেকে এর প্রকাশ ঘটান। তিনি স্বীয় দুশমনকে ধ্বংস করার নির্দেশ যাকেই প্রদান করেন, সে কোনরূপ ইতস্তত না করেই তা পালন করে থাকে।

তিনি কখনো সমুদ্রকে স্বীয় দুশমনদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য, কখনো যমীনকে ওদের ধসিয়ে দেয়ার জন্য, কখনো বা বাতাসকে ওদের ছিন্নভিন্ন করতে, আবার কখনো ফেরেশতাকে ওদের ধ্বংস করতে নির্দেশ দেন।

সারকথা

সারকথা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর প্রতিনিধি নবী (আ)-গণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও শত্রুতার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অবাধ্য অকৃতজ্ঞদের প্রতি তাঁর গযব এবং অপদস্থতার ধারাবাহিকতাও চলতে থাকে। ন্যায়বিচারের স্বাভাবিক দাবিও এটাই। সুতরাং তেমনি নবী (আ)-গণকে অস্বীকারকারী এবং তাঁদের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের ফেরেশতা কর্তৃক আযাব দান ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারেরই দাবি।

অনুরূপভাবে সত্য অস্বীকারকারী ও মিথ্যা আরোপকারীদেরকে খোদ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, তাঁদের সঙ্গী ও অনুসারীদের মাধ্যমে শাস্তি দান ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারেরই দাবি। যেমন আল্লাহর নির্দেশ :

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ ۔

"তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করো; তোমাদের হাতদ্বারা আল্লাহ্ ওদেরকে শাস্তি দিবেন।" (সূরা তাওবা : ১৪)

এ আয়াত দ্বারা এটা পরিষ্কার হলো যে, বান্দার হাত দিয়ে যে আযাব প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহরই কাজ। বান্দার হাত তা প্রকাশ ও বাস্তবায়নের মাধ্যম মাত্র। যেমন আঘাতকারী দ্বারা হত্যা ও আঘাত কোন মাধ্যম ছাড়াই কোন সময় সংঘটিত হয়, আর কোন সময় তীর-তরবারির মাধ্যমে। একইভাবে আল্লাহর আযাবের প্রকাশ অনেক সময় কোন মাধ্যম ছাড়াই ঘটে, আবার কোন কোন সময় তার প্রকাশ ঘটে মানুষ অথবা ফেরেশতার হাত দিয়ে।

وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ اَوْ بِاَيْدِيْنَا

“এবং আমরা প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ। তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন, সরাসরি নিজ পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দিয়ে। (সূরা তাওবা : ৫২)

এ আযাবে ইলাহী কখনো বা শুধু ফেরেশতার হাত দিয়ে প্রকাশ পায়, আর কখনো কেবল মানুষের হাত দিয়ে যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের আকারে প্রকাশ পায়। মানুষ ও ফেরেশতার হাত দিয়ে কেবল আল্লাহর আযাবই প্রকাশ পায়। যেমন বদর যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের হত্যা সাহাবায়ে কিরামের হাত এবং সম্মানিত ফেরেশতাদের হাত উভয় দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। সৎকর্মশীল মু'মিন এবং সম্মানিত ফেরেশতা, উভয় দল মিলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অস্বীকার-কারী ও তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের বিরুদ্ধে যেভাবে মুকাবিলা করেছিলেন, ইনশা আল্লাহ্ শীঘ্রই তা বদর যুদ্ধের বর্ণনায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। যেহেতু নিয়ম এই যে, অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দানকে শাসক ও বিচারকের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়, জাল্লাদ, তীর বা তরবারি চালনাকারীর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয় না, এ জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ - وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

“তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং যখন তুমি তীর নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করো নি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।” (সূরা আনফাল : ১৭)

অর্থাৎ ঐ বিদ্রোহীদের হত্যাকারী প্রকৃতপক্ষে আমি। আর তোমরা কেবল হাতিয়ার অথবা মাধ্যম মাত্র। যেমন তীর ও তরবারি তোমাদের কাজের হাতিয়ার ও মাধ্যম, একইভাবে আমার কাজের জন্য তোমরা তীর ও বন্দুক সাবরূপ মাত্র। আবূ তায়্যিব বলেন :

فانت حسام الملك وَاللّٰهُ ضارب * وانت لواء الدين والله عاقد

“অতএব তুমি রাষ্ট্রের তরবারি আর আল্লাহ্ হলেন অপরাধীকে আঘাতকারী। তুমি দীনের পতাকা আর আল্লাহ্ তা বন্ধনকারী।”

বরং আল্লাহর অবাধ্যদেরকে ফেরেশতা দিয়ে শাস্তি না দিয়ে মানুষের হাত দিয়ে যুদ্ধ ও হতাহতের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব প্রকাশ পাওয়া, এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটা বিশেষ রহমত। কারণ ফেরেশতাদের মাধ্যমে যেসব উম্মতকে ধ্বংস করা হয়েছে, তাদের সংশোধনের অবকাশও দেয়া হয়নি। আর যে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে

নবী রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীগণের যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়েছে, তারা বুঝার, শোনার ও চিন্তা-ভাবনা করার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছে। কাজেই মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার উৎসাহ ও আসমানী সাহায্য আল্লাহ্-প্রেমীদের সহায়ক, আর আল্লাহর ফেরেশতাদের অগণিত সৈন্যের শত্রুদের দিকে সক্রোধে দৃষ্টিপাত দেখে অনেকেই সত্যের সামনে মাথা নত করে দেয়। তারা বুঝতে পারে যে, এঁরা আল্লাহরই প্রেরিত, আসমান-যমীন, জল-স্থল, বৃক্ষ-পাথর সব কিছুই এঁদের সাহায্যে নিয়োজিত। কাজেই এ মহাত্মাগণের সামনে গর্দান ঝুঁকিয়ে দেয়াতেই নিরাপত্তা। যারা আদি পাপাচারী ও দুর্ভাগা ছিল, তারা এর পরেও নির্লজ্জ এবং বেপরোয়াভাবে মুকাবিলা করতে থাকে। যার ফল হলো, দুনিয়াতেও তারা অপদস্থ হলো, আর আখিরাতে অপদস্থ হওয়ার ব্যাপারে তো কোন প্রশ্নই আসে না। দুনিয়াতে দেখুন যে, রাষ্ট্রীয় অপরাধে বড় থেকে বড় অপরাধও ক্ষমা করা হয়, কিন্তু বিদ্রোহের শাস্তি হত্যা অথবা যাবজ্জীবন কারাবাস ছাড়া আর কিছুই নেই। অথচ ওরাও মানুষ আর এরাও মানুষ।

সীমিত কয়েকদিনের রাষ্ট্রশক্তিও বিদ্রোহের অপরাধকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করে এবং সমস্ত বিজ্ঞজন একে যথার্থ, উপযুক্ত ও সঠিক বিবেচনা করে। অথচ বিদ্রোহী ব্যক্তি না বাদশাহর সৃষ্ট, না সমজাত; তাছাড়া সামান্য কোন জিনিসের ব্যাপারেও বাদশাহর মুখাপেক্ষী নয়।

অথচ সেই আহকামুল হাকিমীন, রাব্বুল আলামীন চরম ও পরম ক্ষমতাবান আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রতিনিধি নবী-রাসূল (আ)-গণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের তোমরা কেন তুচ্ছ মনে কর ? মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীকে বিধি মুতাবিক শাস্তিদান এবং আল্লাহর বিধান থেকে ঘাড় ফিরানোদের ঘাড় ভেঙ্গে দেয়াকে কেন অত্যাচার ও সীমালংঘন মনে কর?

পৃথিবীর শাসক কর্তৃক তাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালিয়ে কাউকে হত্যা করা, কাউকে বন্দী করা, তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং সেই সম্পদ রাষ্ট্রের শুভাকাঙ্ক্ষী ও দেশের প্রতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মাঝে উপঢৌকন হিসেবে বন্টন করাকে তোমরা শান-শওকতের ব্যাপার এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে মনে কর, অথচ তোমরাই আবার সেই আহকামুল হাকিমীন, আসমান এবং যমীনসমূহের বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের সাথে যুদ্ধ করা ও তাদের হত্যা করা, বন্দী করা, তাদের দাস বানানো এবং তাদের ধন-সম্পদ জব্দ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর।

কাজেই যুদ্ধে শত্রুর জীবনের ক্ষতি সাধন রাজনৈতিক নিয়ম এবং সামরিক কর্মকাণ্ডের পূর্ণতা, অনুরূপভাবে শত্রুর সামরিক এবং আর্থিক শক্তিকে দখল করে নেয়াও সামরিক কৌশলের পূর্ণতা। আশ্চর্যের বিষয় যে, ইউরোপ যখন শত্রুর আর্থিক সামর্থ্য কব্জা করে, তখন তাকে সামরিক-রাজনৈতিক কৌশল বলা হয়, আর যখন ইসলাম আল্লাহদ্রোহীদের আর্থিক সামর্থকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখন এর নাম লুটপাট ও ছিনতাই হয়ে যায়। আবার যুদ্ধে যখন শত্রুর জীবন সংহার করাও

বৈধ, তখন তাদের সম্পদ গ্রহণে কেন এত হৈচৈ ও প্রতিবাদ করা হয় ? অবশেষে ইসলাম যখন রকান বাণিজ্য কাফেলার প্রতি আক্রমণ পরিচালনা করেছে, তখন কি সে সব দুশমনদের বাণিজ্য কাফেলা ছিল না, যারা ইসলামের জানমালের দুশমন ? এ ধরনের মানুষের জানমালের প্রতি আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ কোন্ বিচার বা নীতির কাছে দূষণীয় ? বিশেষ করে এ আক্রমণ যদি কেবল তাদের সম্পদ দখলের উদ্দেশ্যে না হয়, বরং এ উদ্দেশ্যে হয় যে, এর সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রকারী ? অধিকন্তু সাধারণ রাষ্ট্রগুলোর সেনা অভিযান তো কেবল রাজ্যসীমা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, জাতিসংঘ সনদ থাকা সত্ত্বেও এখনো যা অনেকের কাছে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জিহাদ এবং সাহাবায়ে কিরামের পদক্ষেপ শুধু আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা এবং আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল, যাতে আল্লাহর বিধান ভূলুণ্ঠিত না হয়; আল আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীআত খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত না হয় এবং আল্লাহর স্মরণকারীগণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিতে পারে নিজেদের প্রকৃত প্রভুর নাম। তেমনি কাফির ও ফাজিরগণ ঈমান আনুক বা না আনুক, তারা যেন আহকামুল হাকিমীন, আসমান ও যমীনসমূহের অধিপতি মহান আল্লাহর বিধানাবলী প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বাধাদান করতে না পারে।

হযরত ইউশা ইবন নূন, হযরত সুলায়মান, হযরত দাঊদ ও অপরাপর নবী (আ)-গণের জিহাদ এ উদ্দেশ্যেই ছিল। আর হযরত ঈসা ইবন মরিয়ম (আ) কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে অবতরণ করার পর এ উদ্দেশ্যেই দাজ্জাল ও তার সেনাবাহিনীর সাথে জিহাদ করবেন, যেমনটি 'মুকাশিফাতে ইউহান্না' এবং তাহলিকীদের নামে পলের দ্বিতীয় পত্রে বলা হয়েছে। পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিগুলো যদি চায় যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা, হুকুমত, রাষ্ট্রীয় ভাব-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়া তাদের অধিকার, ইযযত ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে, তবে তা হবে অসম্ভব। অথবা কোন রাষ্ট্র যদি চায় যে, তাদের উপদেশ বাণী দ্বারা খারাপ রীতিনীতি, বাতিল রেওয়াজ, ভ্রষ্ট চিন্তাধারা ও অবাস্তব কল্পনা রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াই মিটিয়ে দেবে, তবে তা হবে দুঃসাধ্য।

নিঃসন্দেহে উপদেশ ও নসীহতের প্রভাব আছে, তবে তা সাদাসিধে মানুষদের জন্য। ঠাণ্ডা মাথার অপরাধীদের আপনি যতই নিষ্ঠা ও সহানুভূতির সাথে উত্তম থেকে উত্তম উপদেশ দিন না কেন, এরদ্বারা কিন্তু হঠকারী ও ধর্মবিমুখ ব্যক্তি খুব কমই প্রভাবিত হয়।

মানুষের মধ্যে সবার প্রবৃত্তি একই রকম নয়। এমন অনেক আছে যে, তাদের কারো জন্য আল্লাহ্ কিতাব নাযিল করেছেন, আর কারো জন্য লৌহ অবতরণ করেছেন। আজ যদি সহস্র ওয়ায়েয মিলে চান যে, তাদের ওয়ায-নসীহত দ্বারা ঐ সব লোককে হিদায়াত করবেন ও খারাপ প্রথাকে বিলোপ করবেন, তা হলে স্বাভাবিক

অবস্থায় তা পারবেন না। কিন্তু একটি শাহী ফরমান একই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উল্লিখিত হঠকারী ও ধর্মবিমুখ লোকের উক্ত খারাপ প্রথার বিলোপ সাধন করতে সক্ষম।

আদম সন্তানদের মাঝে শ্রেষ্ঠ সন্তান, আমাদের নেতা, খাতিমুল আম্বিয়া ও সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে যখন মহা বিচারক, আসমান-যমীন তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে বিশ্ববাসীর হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন, সে সময় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একাকী; না ছিল তাঁর কেউ সাহায্যকারী, না ছিল কোন উপদেষ্টা, এমনকি কোন সহকারীও ছিল না।

তিনি নবূওয়াত ও রিসালাতের ঘোষণা দিলেন। এই বলে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে এক মানো, এক উপলব্ধি করো এবং এক উপাস্য মানো, তাঁরই কাছে চাও এবং তাঁরই সামনে মাথা নত কর। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং সমস্ত গর্হিত কাজ থেকে তিনি সবাইকে নিষেধ করলেন; তাদেরকে সুন্দর চরিত্র গঠন ও সম্মানজনক কাজে উৎসাহ দিলেন। মোটকথা, তিনি পার্থিব ও পারলৌকিক এমন কোন কল্যাণ ও মঙ্গলজনক কাজ বাদ দেননি যার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং যার নির্দেশ প্রদান করেননি। তেমনি ইহ-পারলৌকিক এমন কোন গর্হিত কাজ ছিল না, যা থেকে তিনি নিষেধ করেননি।

সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষগুলো তাঁর সরাসরি বাণী, নির্দেশ ও উপদেশগুলো কান লাগিয়ে শুনল এবং গ্রহণ করল। আর যারা হঠকারী, ধর্মবিমুখ, একগুঁয়ে ও ধন-সম্পদের নেশায় উগুত্ত ছিল, তারা কেবল তাঁকে অস্বীকার ও মিথ্যারোপ করেই ক্ষান্ত থাকল না, বরং তাঁকে নানা ধরনের কষ্ট ও যন্ত্রণা দিল এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপে জর্জরিত করল। তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীগণকে কষ্ট দিতে তারা কোনই ত্রুটি করল না (বিস্তারিত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। কিন্তু তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতেন আর এ পথভ্রষ্টদের জন্য দু'আ করতেন : اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ "হে আল্লাহ্! আমার কওমকে হিদায়াত দান কর, কেননা তারা জানে না।"

মক্কার মুশরিকদেরকে হাত দিয়ে কিংবা মুখ দিয়ে কোনরূপ প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে হযরত (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনুমতি ছিল না; বরং নির্দেশ ছিল :

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যতক্ষণ না ঐ ব্যাপারে আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা বাকারা : ১০৯)

পরিশেষে যখন তিনি ও তাঁর সাহাবা কিরাম হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হন, তখন জিহাদের অনুমতি সম্বলিত কুরআনের আয়াত নাযিল হয়।

জিহাদের নির্দেশ

হযরত ইবন আব্বাস[১], হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), যুহরী, সাঈদ ইবন যুবায়র, মুজাহিদ, উরওয়া ইবন যুবায়র, যায়দ ইবন আসলাম, কাতাদা, মুকাতিল ইবন হায়্যান (র) এবং অপরাপর মহান আলিমগণের বর্ণনানুযায়ী জিহাদের অনুমতি যে আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম নাযিল হয়, তা হলো এই :

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ - اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ - اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ٠

“যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম; তাদেরকে শুধু এ কারণে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।’ আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তা হলে (খৃস্টান সংসার বিরাগীদের) আশ্রয়স্থল, গির্জা, (ইয়াহূদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত–যাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী সত্তা। আমি এদেরকে (মুসলমানদেরকে) যদি প্রতিষ্ঠা দান করি, তা হলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে। আর সকল কাজের শুভ অশুভ পরিণাম আল্লাহরই এখতিয়ারে।” (সূরা হজ্জ : ৩৯-৪১)[২]

---

১. হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর এ রিওয়ায়াত মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুস্তাদরাক প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী একে হাসান বলেছেন। হাকিম বলেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। যারকানী ও যাদুল মাআদ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে, আবদুর রাযযাক ও ইবন মিসতাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন (দুররে মনসূর, ৪খ. পৃ. ৩৬৪)। আর হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা নাসাঈ সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন। যারকানী (১খ. পৃ.৩৭৮) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে এবং যুহরী হযরত সাঈদ ইবন যুবায়র (রা) থেকে ও আল্লামা আবূ বকর রাযী আল-জাসসাস তাঁর আহকামুল কুরআনে (১খ. পৃ. ১৭৫) বর্ণনা করেছেন। আর এ সনদেই মুকাতিল তাফসীরে ইবন কাছীরে বর্ণিত হয়েছে।

২ আল্লামা যারকানী (১খ, পৃ. ২৮৭) বলেন, এ আয়াত তৃতীয় হিজরীর সফর মাসের এগার তারিখে অবতীর্ণ হয়। আর কারো কারো বক্তব্য থেকে জানা যায়, যুদ্ধের বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিলের সময়কাল ছিল প্রথম হিজরী।

আর কিছু সংখ্যক আলিমের বক্তব্য হলো, যুদ্ধের ব্যাপারে প্রথম যে আয়াত নাযিল হয়, তা হচ্ছে :

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ ·

"এবং তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।" (সূরা বাকারা : ১৯০)

এ উদ্ধৃতি আবুল আলিয়া সূত্রে ইবন জারীর তাবারীর। আর হাকিম তাঁর 'ইকলীল' গ্রন্থে বলেছেন, যুদ্ধ বিষয়ে সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এ আয়াত :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ·

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।" (সূরা তাওবা : ১১১) (যারকানী, ১খ. পৃ. ২৮৭)।

যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা সামষ্টিকভাবে যুদ্ধের প্রয়োজন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এবং ইঙ্গিতে ঐ সমস্ত লোকের এ সন্দেহেরও জবাব দিয়েছেন, যারা বলে যে, যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে ইসলাম রক্তপাতের দ্বার উণ্মুক্ত করে দিয়েছে। মোটামুটি জবাব এই যে, প্রয়োজনে যুদ্ধের নির্দেশ কেবল ইসলামের সর্বশেষ নবীর সাথেই নির্দিষ্ট নয়, বরং পূর্ববর্তী নবী-রাসূল (আ)-গণকেও জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি জিহাদের অনুমতি না দেয়া হতো, তা হলে আল্লাহর নাম নেয়াটাও কঠিন হয়ে দাঁড়াতো এবং সমস্ত উপাসনালয় ধ্বংস করে দেয়া হতো। আর আল্লাহ্ তা'আলার এটাও চিরন্তন বিধান যে, তিনি সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে জিহাদের আদেশ করে থাকেন যাতে ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টিকারী, বিবাদকারী, ফিতনাবাজ অনিষ্টকারীদের হাত থেকে আল্লাহর অন্য বান্দাদের রক্ষা করা যায়। আল্লাহ্ বলেন :

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَي الْعٰلَمِيْنَ ·

"আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তা হলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু আল্লাহ্ গোটা বিশ্বজাহানের প্রতি অনুগ্রহশীল।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

এ সকল আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদের সাধারণ প্রয়োজন এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড়াও এর কারণও বর্ণনা করেছেন—সাহাবায়ে কিরামকে কেন যুদ্ধ ও জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ? তা এ জন্য যে, তাঁদের প্রতি নানা ধরনের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল এবং বিনা অপরাধে ও অকারণে তাঁদেরকে আপন ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে 'আমাদের রব আল্লাহ্' শুধু এ কথা বলার কারণে। আর জিহাদের অনুমতি কেবল মক্কার মুশরিকদের কালো হাত গুড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই নয়, বরং

এর উদ্দেশ্য আল্লাহর দীনকে সাহায্য সহযোগিতা করা। وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ "আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।"

আর সর্বশক্তিমানের এ শক্তি রয়েছে যে, তিনি পৃথিবীতে তাঁর অনুসারী বান্দাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে তাঁর দীন এবং বিধি-বিধান প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের শক্তি ও সামর্থ্য দান করেন, যাতে তারা পৃথিবীর কর্তৃত্ব পেয়ে নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করে। নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং অন্যকেও সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে।

অর্থাৎ যে সমস্ত লোককে আমি জিহাদের অনুমতি দিয়েছি এবং যাদেরক সাহায্য সহযোগিতা করার ওয়াদা করেছি, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, শাসন কর্তৃত্ব পাওয়ার পর তারা পৃথিবীর অপরাপর শাসকদের ন্যায় আরাম-আয়েশে নিমজ্জিত হবে না; বরং জীবন ও সম্পদের সদ্ব্যবহার দ্বারা তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগত ও আজ্ঞাবহ হবে এবং অপরকেও সঠিক পথে পরিচালিত করবে। মোটকথা নিজেও পরিপূর্ণ হবে এবং অপরকেও পরিপূর্ণ করবে, নিজেও হিদায়াতের ওপর থাকবে এবং অপরকেও সুপথে আনয়ন করবে। কাজেই এ পরিপূর্ণ গুণাবলী খুলাফায়ে রাশেদীনের মাঝে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। আর তা কেন হবে না, যাঁদেরকে আল্লাহ্ আসমানী নিরপেক্ষ বিধি-বিধান সমৃদ্ধ শাসন কর্তৃত্ব খিলাফতের জন্য মনোনীত করেছেন, তাঁদের তো এমন গুণাবলীই থাকা প্রয়োজন।

সুতরাং হযরত উসমান গনী (রা) বলতেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা খিলাফত রাজত্বদানের পূর্বেই তাঁদের প্রশংসা ও গুণগান করেছেন যে, তাঁরা খিলাফত ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পেলে এমনটিই হবেন।

জিহাদের তাৎপর্য

জিহাদ শব্দটি 'জুহদ' শব্দ থেকে উদ্ভূত, এর অর্থ শক্তি। যার তাৎপর্য হলো, স্বীয় শক্তিকে শুধু ধন-সম্পদ অর্জন, গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব, জাতীয়তা, স্বদেশ প্রীতি, বাহাদুরী ও বীরত্ব প্রদর্শন, রাজ্যসীমা বৃদ্ধি বা শাসন করার জন্যই নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ও তাঁর প্রদত্ত বিধানের শ্রেষ্ঠত্বকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে নিজের শক্তিকে পানির মত বইয়ে দেয়াকে শরীআতের পরিভাষায় জিহাদ বলে।

যদি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা উদ্দেশ্য না হয়, বরং কেবল সম্পদ-কাঞ্চন উদ্দেশ্য হয় অথবা হক-বাতিলের বাছ-বিচার না করে দেশ এবং সম্প্রদায়কে সাহায্য করা অথবা নিজের বীরত্ব ও শক্তিমত্তা প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সেটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে জিহাদ নয়। জিহাদ তো কেবল তা-ই, যা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করা হয়, পার্থিব ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ কালিমা থেকে তা সম্পূর্ণ পবিত্র হবে।

সার সংক্ষেপ

আল্লাহর বিদ্রোহীদের সাথে তাঁর বিরোধী হওয়ার কারণে বিশ্বস্ত বান্দাদের লড়াই করার নাম জিহাদ। তবে শর্ত হলো, তা হবে একমাত্র আল্লাহর বাণী ও তাঁর

বিধি-বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। পার্থিব কোন প্রকার লাভের উদ্দেশ্য তাতে থাকবে না। এমন বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মোৎসর্গকারীকে শরীআতে শহীদ বলা হয়।

نشود نصیب دشمن که شود هلاك تغیت

سردو ستاں سلامت که توخنجر از مای

যদি সম্পদ উদ্দেশ্য হয় কিংবা সুখ্যাতি লাভের বাসনা, অথবা ইসলাম ছাড়া কেবল দেশ জয় বা জাতির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা, তা হলে শরীআতে তা জিহাদ নয়, বরং এক ধরনের যুদ্ধ। সুতরাং হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মানুষ কখনো বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, কখনো নিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও অহমিকার ভিত্তিতে, আর কখনো যশ ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। এর মধ্যে কোন্‌টি আল্লাহর পথে জিহাদ হিসেবে বিবেচ্য হবে? জবাবে তিনি বললেন :

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ·

"যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে, শুধু সেটাই 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন যার নাম হলো لا يقال فلان شهيد অর্থাৎ কারো সম্পর্কে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলা যাবে না যে, সে ব্যক্তি শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করেছে। তা এ জন্যে যে, তার উদ্দেশ্য ও জীবনকালের সমাপ্তির অবস্থা কারো জানা নেই। তিনি ঐ অধ্যায়ে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, কোন এক যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের সাথে নবী করীম (সা)-এর মুকাবিলা হলো। ঐ যুদ্ধে সাহবায়ে কিরামের বাহিনীর সাথে কোযমান নামে এক ব্যক্তি ছিল– যে ছিল গোপনে মুনাফিক। এ যুদ্ধে সে মুশরিকদের বিরুদ্ধে খুবই বীরত্ব দেখায় ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। সাহাবী হযরত সাহল ইবন সা'দ সাইদী (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ما اجزا منا اليوم احدكما اجزا فلان "আজ আমাদের মধ্যে কেউ ততটা কাজ করেনি, যতটা অমুক ব্যক্তি করেছে।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : اما انه من اهل النار "জেনে রাখ, সে জাহান্নামী।"

শেষ পর্যন্ত কাফিরের সাথে যুদ্ধ করতে করতে সে ব্যক্তি গুরুতর আহত হলো এবং আঘাতের যন্ত্রণা সইতে না পেরে সে আত্মহত্যা করল। হাফিয আসকালানী[১] এ হাদীসের ভাষ্যে বলেন, অধ্যায় শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক এই যে, ঐ ব্যক্তি

১. হাফিয আসকালানীর মূল ইবারত এই : ووجه اخذ الترجمة مسئلة انهم شهيد وابرحجائه فى امر الجاد فلو كان كان قتل لم يمتنع ان يشهدوا له بالشهادة وقد ظهر منه انه لم يقاتل لله وانما قاتل غضبا لقومه فلا يطلق على كل مقتول فى الجهاد انه شهيد لاحتمال ان يكون مثل هذا ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৬৬, কিতাবুল জিহাদ, باب لايقال فلان شهيد অধ্যায়।

আল্লাহর ওয়াস্তে যুদ্ধ করেনি, বরং জাতির শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় উদ্দীপ্ত হয়ে যুদ্ধ করেছিল। ফলে এরূপ ব্যক্তিকে শহীদ বলা যায় না। বর্ণনার উপসংহারে জানা গেল, যে ব্যক্তি নবী (সা)-এর সাহায্যার্থে কাফিরের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে নয়, বরং দেশ ও জাতির জন্য যুদ্ধ করে, তা হলে এরূপ ব্যক্তিকেও মুজাহিদ বা শহীদ বলা যাবে না। এ যেন স্বজাতি ও স্বদেশী ভাইদের সাথে মিলিত হয়ে ইসলামী ভাইদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রস্তুত হয়েছে। হাফিয বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন, যুদ্ধের ময়দানে এ ব্যক্তি (কোযমান) সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। সে কাফিরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে এবং চিৎকার দিয়ে বলে, ওহে আওস সম্প্রদায়! নিজেদের মান-মর্যাদা ও দেশ-জাতির নিরাপত্তার জন্য লড়াই কর। হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা) নামক জনৈক সাহাবী তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তার গুরুতর অবস্থা দেখে বলেন, هنيا لك الشهادة "ওহে কোযমান, তোমার শাহাদত কল্যাণময় হোক।" কোযমান এ কথা শুনে উত্তর দিল :

انى والله ما قاتلت على دين ما قاتلت الاعلى الحفاظ

"আল্লাহর শপথ, আমি ইসলাম ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিনি, আমি তো কেবল গোত্র ও সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানের জন্য যুদ্ধ করেছি।"

পরিষ্কার অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সমাজে তাঁর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার নিয়্যত ছাড়া নিছক জাতি ও দেশের জন্য যুদ্ধ করা এবং এতে নিহত হওয়ায় মানুষ মুজাহিদ বা শহীদ হয় না। নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে যে যুদ্ধ আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে করা হয়, তাতে নিহত হলে সে শহীদ হয়।

এর পরে ঐ ব্যক্তি যখন আত্মহত্যা করল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো ফাজির ও কাফির ব্যক্তি দ্বারাও ইলামকে শক্তিশালী করে থাকেন।" এ বর্ণনা উমদাতুল কারী গ্রন্থে (৬খ. পৃ. ৬৩১) باب لا يقال فلان شهيد শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ - وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِادْفَعُوْا ۔

"যেদিন দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল, সেদিন তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল, এটা মু'মিন এবং মুনাফিকদের প্রকাশ্যে জানার জন্য আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, এসো, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬৬-১৬৭)

কেননা শত্রু যদি জয়যুক্ত হয়, তবে প্রতিশোধ গ্রহণে মু'মিন এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করবে না। সাধারণ মুসলমানদের ন্যায়ই তোমাদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এ আয়াত মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলূল প্রসঙ্গে নাযিল

হয়েছিল। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করেছিলেন আর আবদুল্লাহ ইবন উবাই ও অপরাপর মুনাফিকগণ কেবল সম্প্রদায় ও দেশকে সাহায্য করার লক্ষ্যে শত্রু প্রতিহত করছিল। এর দ্বারা পরিষ্কার জানা গেল, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতিতে সম্প্রদায় এবং দেশের জন্য শত্রু প্রতিহত করার নাম জিহাদ নয়। উপরোক্ত আয়াতের قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه অংশে যে শর্ত চিহ্নিত করা হয়েছে, তার অর্থ এটাই।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, (বদর যুদ্ধে) কিছু সংখ্যক মুসলমান নিজ জন্মভূমি রক্ষার্থে মুশরিকদের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মক্কাবাসীর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুকাবিলায় বের হয়। আর বদরের যুদ্ধে কাফির সেনাদলের সাথে অংশগ্রহণকারী এ মুসলমানদের মধ্যে যারা সাহাবায়ে কিরামের হাতে নিহত হয়, তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয় :

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۔

"নিশ্চয়ই যখন ফেরেশতাগণ এরূপ লোকদের রূহ কবয করেন, যারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করে নিজেদের পাপী করে রেখেছিল, তোমরা কোন্ কর্মে ছিলে? তারা বলবে, আমরা যমীনে অসহায় ছিলাম। তখন ফেরেশতারা বলবেন, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না? তোমাদের উচিত ছিল হিজরত করে সেখানে যাওয়া। এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস।" (সূরা নিসা : ৯৭)

এ আয়াত ঐসব ব্যক্তি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়, যারা ইসলামকে সহায়তা না করে বরং নিজ সম্প্রদায় এবং নিছক দেশের খাতিরে কাফির সেনাদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিল।

জিহাদের আদব

১. জিহাদের উদ্দেশ্যে যখন ঘর থেকে বের হবে, তখন আল্লাহর নাম স্মরণ করে বের হবে।

২. অহংকার কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা ভুলে জৌলুসের সাথে বের হবে না।

৩. পরস্পর পরস্পরের সাথে ঝগড়া বিবাদ করবে না, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে সবসময় সামনে রাখবে।

৪. সংঘর্ষের সময় দৃঢ়পদ থাকবে, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে মুকাবিলা করবে।

৫. তুমুল লড়াই চলাকালেও আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্যমনস্ক হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَاتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ

الصّٰبِرِيْنَ - وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ٠

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন (১) অবিচল থাকবে এবং (২) আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৩) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং (৪) নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে সাহাস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা অটল অবিচল থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। (৫) তোমরা তাদের মত হবে না, যারা দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজ গৃহ থেকে রণাঙ্গণে বের হয়। তারা যা করে, আল্লাহ্ তা বেষ্টন করে আছেন।" (সূরা আনফাল : ৪৫-৪৭)

৬. নিজেদের সংখ্যাধিক্যে ও অস্ত্র-রসদের প্রাচুর্যে কখনো গর্বিত হবে না এবং সংখ্যাস্বল্পতায় কখনো হতাশ হবে না; বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার ওপর নির্ভর করবে। বিজয়দাতা ও সাহায্যকারী হিসেবে কেবল আল্লাহর ওপরেই নির্ভর করবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ - ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ ٠

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে তো বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি, বরং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল ও পরে তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের ওপর তাঁর নিকট থেকে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতরণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। এটাই হলো কাফিরদের কর্মফল।" (সূরা তাওবা : ২৫-২৬)

৭. যখন বাহনে আরোহণ করবে, তখন প্রথমে আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করবে যে, তিনি তোমার আরামের জন্য এ বাহন তৈরি করেছেন। আর এ আয়াত পাঠ করবে :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ - وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ٠

"পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি এটিতে আমার বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও এটিকে বশীভূত করতে আমরা সমর্থ ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই ফিরে যাব।" (সূরা যুখরুফ : ১৩-১৪)

৮. যখন কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করবে, তখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্মরণ করে তাকবীর ধ্বনি দেবে। আর যখন কোন নিম্নভূমিতে অবতরণ করবে, তখন সুবহানাল্লাহ বলবে। এ জন্যে যে, তিনি সর্বপ্রকার নীচুতা থেকে পাক ও পবিত্র।

৯. যদি আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে বিজয় ও সাফল্য দান করেন, তখন মুজাহিদ বাহিনীর সিপাহসালারের কর্তব্য হলো, মুজাহিদদেরকে কাতারবন্দী করে নিম্নের বাক্যসমূহ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার শোকর করা, তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করা; আর মুজাহিদরা তখন 'আমিন' বলবে।

اللهم لك الحمد كله لاقابس لما ببضطت ولاباسط لما قبضت ولا هادى لمن اضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطى لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورفقك .

"হে আল্লাহ্! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, যা তুমি প্রশস্ত কর, তা কেউ সংকুচিত করতে পারে না, আর তুমি যা সংকুচিত করবে, কেউ তা প্রশস্ত করতে পারে না। তুমি যাকে গুমরাহ কর, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না, আর তুমি যাকে পথ দেখাও, কেউ তাকে গুমরাহ করতে পারে না। তুমি যাকে বঞ্চিত কর, কেউ তাকে সেটা দিতে পারে না, আর তুমি যাকে দাও, কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। আর তুমি যাকে কাছে টানো, কেউ তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য তোমার বরকত, তোমার অনুগ্রহ, তোমার মর্যাদা এবং তোমার বন্ধুত্বকে প্রশস্ত করে দাও।" (নাসাঈ ও ইবন হিব্বান)

১০. বিজয়ের সৌভাগ্য অর্জনের পর বলো না যে, আমরা জয় করেছি। বরং আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করে বল যে, কেবল তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়ায় আমরা জয়লাভ করেছি। যেমন এমর্মে হাদীস শরীফে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তাঁর মুখে তাওহীদের এ বাণী উচ্চারিত হতো :

لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيْـكَ لَـهُ لَـهُ الْمُـلْكُ وَلَـهُ الْـحَمْدُ وَهُـوَ عَـلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ - صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ .

"আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, মালিকানা তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই, আর তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী, গুনাহ্ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুদলকে একাই পর্যুদস্ত করেছেন।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ)

১১. কুকুর, ঘন্টা ও বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে নিও না। যে কাফেলার সাথে এসব থাকে, (রহমতের) ফেরেশতা তাদের সাথে থাকেন না। (হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে মুসলিমে বর্ণিত)। অর্থাৎ আরাম-আয়েশ এবং আনন্দ-স্ফূর্তির কোন বস্তুই সঙ্গে রাখবে না।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ভেবে দেখুন, ইসলামী জিহাদের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা ইসলামের একদল সৈন্য কিন্তু অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে তারা পৃথিবীব্যাপী আসমান যমীনের স্রষ্টার ভালবাসায় সিক্ত একটি দল।

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ বিভিন্ন প্রকার। জিহাদের একটি প্রকার হলো প্রতিরোধ। একে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধও বলা হয়। অর্থাৎ কাফিরদের কোন সম্প্রদায় প্রথমে তোমাদের ওপর হামলা চালালে এর প্রতিরোধে তোমরা ওদের মুকাবিলা করবে। এ প্রকারের জিহাদকে আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন :

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَتَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ·

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।" (সূরা বাকারা : ১৯০)

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُنِ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ·

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক'।" (সূরা হাজ্জ : ৩৯-৪০)

জিহাদের দ্বিতীয় প্রকার হলো অগ্রগামী হয়ে আক্রমণ করা। অর্থাৎ কাফিরের শক্তি ও দাপট ইসলাম ও তার লালনক্ষেত্র মুসলিম ভূ-খন্ডের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি ও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে, এক্ষেত্রে ইসলাম স্বীয় অনুসারীদের এ নির্দেশ দেয় যে, বিপদ নিশ্চিত জানলে আক্রমণাত্মক হামলা কর এবং প্রতিরোধে অগ্রসর হও। কেননা যখন দুশমনদের থেকে ভয়ের কারণ থাকে, তখন সাবধানতা এবং এরূপ পন্থা অবলম্বন সময়ের দাবি হয়ে পড়ে—যাতে ইসলাম ও মুসলমানগণ কাফির ও মুশরিকের আগ্রাসন থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। আর নির্ভয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর বিধান পালন করতে সক্ষম হয় এবং যে কোন অপশক্তি ও বিক্রম তাদেরকে নিজেদের দীন থেকে সরাতে বা বিরত রাখতে না পারে। তেমনি কোন শক্তি আল্লাহর আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে না পারে। এমতাবস্থায় জ্ঞান ও দূরদর্শিতা, বিচার-বিবেচনা ও রাজনীতির

এটাই দাবি যে, বিপদ সামনে আসার পূর্বেই তা নির্মূলের ব্যবস্থা করা। বিপদ সামনে এসে পড়লে তা প্রতিহত করা হবে—এ লক্ষ্যে অপেক্ষা করা উচ্চ পর্যায়ের বোকামী ও মূর্খতা বৈ কিছু নয়। সিংহ ও ব্যাঘ্র হামলা করার পূর্বেই যেমন এগুলো হত্যা করা, দংশন করার পূর্বেই যেমন সাপ ও বিচ্ছুকে মেরে ফেলা যুলুম নয়, বরং উন্নত পর্যায়ের বিচক্ষণতা এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা, অনুরূপ ক্ষেত্রেও কাফির ও মুশরিকদের কোথাও ইসলাম ও মুসলমানদের বড় রকমের ক্ষতির জন্য সম্ভাব্য মাথাচাড়া দেয়ার পূর্বেই তা প্রতিহত করা উচ্চ পর্যায়ের দূরদর্শিতা। চোর, লুটেরা কিংবা হিংস্র পশু যদি কোন জঙ্গল অথবা বিরানভূমিতে একত্রিত হয়, তা হলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবি হলো, আবাসিক এলাকায় আক্রমণের পূর্বেই তাদের শেষ করে দেয়া। হিংস্র পশুকে আক্রমণের পূর্বেই হত্যা করা জ্ঞান এবং বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ "(তোমাদের হত্যার জন্য উদ্যত বা তাতে লিপ্ত) মুশরিকদের হত্যা কর, যেখানে তাদের পাও।" এবং اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا "ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই পাকড়াও করা হবে এবং যথাযথভাবে হত্যা করা হবে।" প্রভৃতি আয়াতে যুদ্ধরতদের ব্যাপারে এ ধরনের নির্দেশ এসেছে। হিংস্র পশুকে হত্যা করা, আক্রমণাত্মক মনে করা এবং এ ধারণা করা যে, ঐ পশুগুলো একত্রিত হয়ে যখন আমাদের ওপর হামলা করবে, তখন তা প্রতিহত করা হবে, এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের খোলাখুলি বোকামী ও মূর্খতা। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন : وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ "আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দীন (প্রতিবন্ধকতামুক্ত হয়ে) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায় (কোন প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট না থাকে)।" এসব পরিস্থিতিতে এ ধরনের জিহাদই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও লড়াই কর যেন কুফরের ফিতনা অবশিষ্ট না থাকে এবং আল্লাহর দীনের পূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়। এ আয়াতে ফিতনা বলতে কাফিরের শক্তি ও দাপট বুঝানো হয়েছে। আর আয়াতের দ্বার দীনের প্রকাশ ও প্রাধান্যই উদ্দেশ্য। যেমন অপর আয়াতে আছে, দীনের প্রভাব ও প্রাধান্য যেন এতটাই অর্জিত হয় যে, কাফিরের শক্তি দ্বারা যাতে এর পরাজিত হওয়ার কোন অবকাশই অবশিষ্ট না থাকে এবং কুফর ও শিরকের ফিতনা থেকে দীন ইসলাম সম্পূর্ণ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হয়।

বাকী থাকলো কুফরের ফিতনা থেকে দীন ইসলাম কিভাবে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। এ নিরাপত্তার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি পদ্ধতি হলো কাফিররা মুসলমানদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করবে এবং মুসলমানদের প্রজা হয়ে জিযয়া দিয়ে ইসলামী হুকুমতের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। যখন বিশ্ব সমাজে দাসপ্রথা চালু ছিল, তখনকার নিয়মানুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের প্রতিপক্ষ ক্ষতিপূরণ দিয়ে ফেরত না নিলে বা বন্দী বিনিময় না করলে তখন তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী ওরা মুসলমানদের দাস হিসেবে থাকতো।

নিরাপত্তার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, কাফিররা মুসলমানদের সাথে নিরাপত্তমূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। আর তৃতীয় পদ্ধতি হলো, কাফিররা মুসলমানদের নিরাপত্তায়

এসে পড়বে। এ পদ্ধতিসমূহে এ ধরনের কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। ইসলামী সমাজে জিহাদের হুকুম কেবল যুদ্ধবাজ কাফিরের জন্য নির্দিষ্ট; যিম্মী এবং চুক্তিবদ্ধ শান্তিপ্রিয় কাফিরদের ব্যাপারে হুকুম আলাদা (তখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অনুসরণীয়)।

যে সমস্ত কাফির ইসলামী হুকুমতে বসবাস করে, তারা ইসলামী শরীআতের বিচার ব্যবস্থা এবং সামাজিক জীবনের হুকুম-আহকামে নাগরিক অধিকারের দিক থেকে মুসলমানদের সমান। তাদের জীবন-সম্পদ ও ইযযত-সম্ভ্রমের হিফাযত করা মুসলমান এবং ইসলামী হুকুমতের জন্য ফরয বা আবশ্যিক। তবে শর্ত এই যে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা বা শত্রুপক্ষের সঙ্গে কোন গোপন ষড়যন্ত্র করবে না। বলা বাহুল্য, শত্রু ও মিত্র, যুদ্ধবাজ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকের ব্যাপারে নির্দেশের তারতম্য সকল বিজ্ঞজনের কাছেই সমর্থিত।

জিহাদের উদাহরণ : জিহাদের উপমা এভাবে বুঝে নিন যে, যখন কোন ব্যক্তির হাতে একটি ফুস্কুড়ি কিংবা ফোঁড়া উঠে, তা হলে এর প্রথম চিকিৎসা পট্টি বাঁধা, এটা লাগালে দূষিত রক্ত বেরিয়ে যাবে কিংবা ভাল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পর্যায় হলো অস্ত্রোপচার আর তৃতীয় পর্যায় হলো পূরো দেহসত্তার সুস্থ রাখার বৃহত্তর স্বার্থে চিকিৎসকের দ্বারা ঐ আক্রান্ত অঙ্গ কেটে ফেলা, যাতে শরীরের অন্য সুস্থ অঙ্গ এর দ্বারা আক্রান্ত হতে না পারে।

এ অবস্থায় যদি চিকিৎসক কারো হাত কিংবা পা কেটে দেয়, তা হলে সবাই ঐ চিকিৎসকের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাকে উচ্চ মূল্যের ফী, হাদিয়া ও উপঢৌকন দিয়ে থাকে। আর জীবনভর তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে এজন্যে যে, তিনি একটি অঙ্গ কেটে অপরাপর অঙ্গসমূহকে পচে যাওয়া, গলে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং গোটা দেহসত্তার নিরাপত্তা বিধান করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির জীবনকে সুখী করেছেন। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিই চিকিৎসকের এ কাজকে পাশবিক কিংবা নির্যাতনমূলক বলে মনে করে না। অনুরূপভাবে রূহানী চিকিৎসক (নবী-রাসূল)-গণ আল্লাহর নির্দেশে প্রথমে কুফরীরূপ ফোঁড়ায় ওয়ায-নসীহতের পট্টি বেঁধে দেন। যদি এ দ্বারা উপকার না হয় এবং ঐ অঙ্গ সুস্থ হওয়ার আশা তিরোহিত হয়, বরং আশঙ্কা দেখা দেয় যে, এ অঙ্গ সংক্রমিত হয়ে নষ্ট করে ফেলবে, তখন ঐ অঙ্গ কেটে ফেলে দেন যাতে অন্য অঙ্গ এর ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় এবং দূষিত রক্ত বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ না পায়। ঈমানদারদের ঈমানকে উল্লিখিত পন্থায়ও রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ : চোর এবং ডাকাতের শাস্তি বিধান রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্যাদির অন্তর্ভুক্ত। যদি তা না হয়, তা হলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যারা মানুষের ঈমানরূপ সম্পদ ছিনতাই করে, আর এটা চায় যে, আমাদের থেকে ঈমান ও সত্যকে লুট করে নেবে, আর তারা ইচ্ছা করে যে, (আল্লাহ্ মাফ করুন) সত্যপন্থীদেরকেও তাদের মত ডাকাত এবং লুটেরা অর্থাৎ কাফির বানিয়ে ফেলবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিশ্বাসী বান্দাদের দফতর থেকে তাদের নাম কাটিয়ে

আল্লাহদ্রোহীদের দলে শামিল করে নেবে, তা হলে এরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও জিহাদ ও লড়াই করা ন্যায়সঙ্গত এবং সুবিবেচনা প্রসূত কাজই হবে। বরং তা হবে ওয়াজিব। শরীআতের অপরাপর ফরয কাজের মতই মানব সমাজের দুশমন ঐ অপরাধপ্রবণ লুটেরাদের মূলোৎপাটন করাও অবশ্য কর্তব্য। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে উল্লিখিত যালিম ও শোষকদের নিপীড়নে মানবতা আর্তনাদ করতে থাকলে, ইসলাম তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলে ঐ জনগণ তখন ইসলাম ও মুসলমানদের স্বাগত জানায়।

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : জিহাদের নির্দেশদানের মাধ্যমে সমস্ত কাফিরকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়া আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য এটাই যে, গোটা মানবতার কল্যাণে আল্লাহর দীন পৃথিবীতে শাসক হয়ে থাকবে এবং মানুষ সম্মানের সাথে জীবন যাপন করবে ও নিরাপদে নিশ্চিন্তে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারবে। এ ভীতি থাকবে না যে, কাফিররা তাদের দীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

ইসলাম তার শত্রুদের জীবন ও অস্তিত্বের শত্রু নয়, বরং তাদের এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি, মানসিকতা, কার্যক্রম ও আড়ম্বরের শত্রু, যা ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের জন্য ভীতির কারণ। পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক জাতি-গোষ্ঠীগুলো এ কথা সমর্থন করে যে, নিজেদের জান-মাল, ইযযত-আব্রুর নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার এবং এটা ঐতিহ্যবাহী বীরত্বব্যঞ্জক ধারণা। তবে জানি না, মুসলমানদের জন্য এ অধিকারকে সমর্থন করতে কেন কৃপণতা করা হয়। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক দল, সর্বপ্রকারের বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা-চালাকী-চাতুরী, যেভাবেই সম্ভব নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব-আধিপত্য ও নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী এবং নিজেদের বিরোধীদের পরাভূত করার জন্য যে অস্ত্রই ব্যবহার করা সম্ভব, তার নাম তারা রাজনীতি ও দূরদর্শিতা রেখে থাকে। কিন্তু যদি কোন জনগোষ্ঠী সত্য ও সততার সাথে, বৈধ পন্থায়, সুবিচার ও পরম ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে অসত্যের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা হলে স্বার্থান্ধ ঐ সকল শক্তি ও ব্যক্তিগণ এর নাম দেয় গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদিতা ইত্যাদি।

সুবহানাল্লাহ্! যে সত্য দীনে নিজেদের দুশমনের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা, তাদেরকে অপবাদ দেয়া এবং তাদের ওপর যুলুম-নির্যতন করা হারাম, তাদের জানমাল, ইযযত-আব্রুর হিফাযত করা তাদের প্রথম পর্যায়ের ফরয ও উদ্দেশ্য, সে দীন ইসলমের উচ্চ মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিজ্ঞোচিত কার্যক্রম সম্পর্কে ঐ মতলববাজ, স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক অসাধু ও লুটেরাদের এ সমালোচনা করার কী অধিকার আছে?

ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য এই যে, সত্য এবং প্রকৃত ন্যায় ও সুবিচারকামীরাই পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করবে, যাতে স্বার্থপর ব্যক্তি কিংবা পার্টি বা কোন অন্যায়কারী আধিপত্যবাদী শক্তি পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করতে না পারে এবং কোন জনপদের মানুষের ওপর অত্যাচার, শোষণ, যুলুম-নিপীড়ন চালাতে না পারে।

যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য শুধু সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা, নিরাপত্তা ও সত্য সুরক্ষিত হোক, আর ঘুষখোর, চোর, পাপিষ্ঠ, ব্যভিচারী, অসৎ চরিত্র, বেহায়াপনা এবং সমস্ত

গর্হিত কাজ ও স্বার্থপরতার মূলোচ্ছেদ হোক, এ ধরনের যুদ্ধ বর্বরতা নয়; বরং উন্নত পর্যায়ের ইবাদত ও আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অশেষ কল্যাণ ও অনুগ্রহ।

আর কুরআন মজীদে যে জিযয়ার নির্দেশের উল্লেখ রয়েছে, এর উদ্দেশ্য এই যে, কাফির ও বাতিল যাতে সত্য ও ন্যায়ের সামনে মাথানত করে। জিযয়ার আয়াত : حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ এ صغار (সিগার) শব্দদ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। আর এ জিযয়াদাতাকে শরীআতের পরিভাষায় যিম্মী ও মু'আহিদ এজন্যে বলে যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ঐ শ্রেণীর লোকের জীবন ও সম্পদের হিফাযতের যিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন।

ইসলাম এবং জবরদস্তি

মানুষকে জোরজবরদস্তি করে মুসলমান বানানোর জন্য জিহাদ নয়, বরং ইসলামের ইযযত ও সম্মানের হিফাযত ও মযলূমের মুক্তির জন্য। আর পৃথিবীর কোন সম্প্রদায়, বিশ্বের কোন ধর্ম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া মানবতার কল্যাণে এ কাজ করতে পারে না। ইসলাম ও মানবতার দুশমনেরা আকাশ মাথায় তুলে নিয়েছে এবং মুখে ও কলমের দ্বারা (ও মিডিয়ার জোরে) এ ঢাক বাজিয়ে বেড়াচ্ছে যে, তরবারির দ্বারাই ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং ইসলাম সন্ত্রাসী। অথচ তারাই মুসলমানদের ভূখণ্ড রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দ্বারা দখল করে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের উল্টো সন্ত্রাসী বলছে! ওদের এটা জানা নেই যে, ইসলামী শরীআত অনুযায়ী মুসলমান ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ইসলামের সত্যকে মুখে স্বীকার এবং অন্তর দিয়ে তা সত্যায়ন করে। আর যে ব্যক্তি কোন প্রকার লোভ-লালসায় কিংবা কোন ভয়-ভীতির কারণে কেবল মুখে ইসলামের উচ্চারণ করে এবং অন্তর দ্বারা এর সত্যায়ন কিংবা বিশ্বাস পোষণ না করে, এ ব্যক্তি ইসলামী শরীআত অনুযায়ী মুসলমান নয়; বরং তাকে মুনাফিক বলা হয়। প্রকাশ থাকে যে, এ বিশ্বাস আবশ্যিক। আর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন (যা ইসলামের অংশবিশেষ নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস) না কোন জোরজবরদস্তির দ্বারা আদায় করা যায়, আর না কোন উৎসাহ্ দান বা ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা। আর যদি কোন লোভ কিংবা ভয় দেখিয়ে জোর করে মুখে কোন বিষয়ে শপথ উচ্চারণও করানো হয়, কিন্তু অন্তর তখনই তা সত্যায়ন করে, যখন তার সামনে দলীল-প্রমাণ দ্বারা এর সত্যতা উদ্ভাসিত হয়ে যায়। পৃথিবীর সমস্ত শক্তিও যদি চায় যে, জোরজবরদস্তি করে কারো অন্তরে শান্তি দেবে, তবে তা হবে অবাস্তব ও অসম্ভব। খঞ্জর, তীর ও তরবারি দিয়ে কোন বিশ্বাসকে অন্তরে গেঁথে দেয়া যায় না। আর এ প্রকৃত কারণকে সম্ভবত কোন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও অস্বীকার করতে পারবে না। সুতরাং ইসলাম তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে—এ কথা কেবল নেহায়েত ভুলই নয়, বরং নিজেদের জঘন্য অপরাধকে ঢাকা দেয়ার বা তা থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে নেয়াই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

২. সাহাবায়ে কিরাম (রা) একাদিক্রমে তের বছর পর্যন্ত মক্কার কাফিরদের হাতে নানা ধরনের বিপদ ও নির্যাতন ভোগ করেছেন; ইসলামের কারণে পিতামাতা, আত্মীয় ও আপনজনদের পরিত্যাগ করা এ কাজের প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল প্রমাণ যে, তাঁরা

ইসলামকে সানন্দে ও সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলামের মাধুর্য ও মিষ্টতা তাঁদের অন্তরে এভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, তা পৃথিবীর তিক্ত থেকে তিক্ত বিপদগুলোকে তাঁদের কাছে সুমিষ্ট ও উপাদেয় বস্তুতে পরিণত করেছিল। নিজেদের জীবন ও সম্পদ সবকিছুই তাঁরা এর প্রতি কুরবানী করেছিলেন। বিরোধিতাকারী ও প্রতিবাদীগণ বলুন তো, যে বিষয় জবরদস্তি করে গর্দানে তরবারি ঠেকিয়ে স্বীকার করানো হয়, তার বৈশিষ্ট্য কি এরূপ হতে পারে ?

৩. অধিকন্তু ইসলামী শরীআতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে এর নির্দেশগুলো গ্রহণ করবে, যাতে করে সওয়াব ও পরকালীন মুক্তি তার জন্য প্রযোজ্য হয় যে, বান্দা ঈমান আনয়ন করেছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট সেই ঈমান ও ইসলাম গ্রহণযোগ্য যা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হয়। জোর-জবরদস্তি সহকারে কাউকে মুসলিম বানানো ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হয়েছে :

وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ٠

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে অবস্থানকারী সবাই ঈমান আনতো, তুমি কি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে ?" (সূরা ইউনুস : ৯৯)

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ٠

"সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে সত্য প্রত্যখ্যান করুক।" (সূরা কাহফ : ৪৯)

৪. হযরত নবী করীম (সা) যে সময় নবূওয়াতের ঘোষণা দিয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, ঐ সময় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একাকী। কোন রাজত্ব ও বাদশাহী তাঁর ছিল না। ছিল না তাঁর হাতে কোন তরবারি, যা দিয়ে ঈমান অস্বীকারকারীদের তিনি ভয় দেখাতেন। অন্যদের কথা আর কী উল্লেখ করা যায়, গোত্র এবং স্ববংশীয়, যারা মানুষের সাহায্যকারী ও মদদগার হয়ে থাকে, তারাই তাঁর প্রাণের শত্রু এবং রক্ত পিপাসুতে পরিণত হয়েছে। অত্যাচার-নির্যাতনের এমন কোন প্রকার বা পর্যায় অবশিষ্ট ছিল না, যা তাঁর প্রতি এবং তাঁর সাথীদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়নি। আর যদি আল্লাহ্ তাঁকে সান্ত্বনা ও সমবেদনা না জানাতেন, তা হলে ঐ অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। জোরজবরদস্তি দ্বারা এ অবস্থা কি করে সম্ভব ?

৫. নবূওয়াতপ্রাপ্তির পর মক্কায় তাঁর অবস্থানকাল ছিল তের বছর। ঐ সময়ে এবং ঐ অবস্থাতেই শত শত গোত্র ইসলামে দাখিল হয়েছে। হযরত আবূ যর গিফারী (রা) সূচনাপর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন। আর তিনি যখন ফিরে যান, তখন তাঁর আহ্বানে গিফার গোত্রের অর্ধেক মানুষ মুসলমান হয়ে যায়। হিজরতের পূর্বেই তিরাশিজন পুরুষ এবং আঠারজন স্ত্রীলোক (যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) মক্কার কাফিরদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করেন। আবিসিনিয়ার খৃস্টান শাসক নাজ্জাশী হযরত জাফর তাইয়্যার (রা)-এর ওয়ায শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরতের পূর্বে মদীনার সত্তরজন মানুষ মিনায় নবী (সা)-এর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

হযরত মুসআব ইবন উমায়র (রা)-এর ওয়াযে একদিনেই বনী আবদে আশহাল গোত্রের সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর অবশিষ্টরাও মুসলমান হয়ে আনসারের মর্যাদায় ভূষিত হন।

এ সমস্ত সম্প্রদায় জিহাদের নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বেই মুসলমান হন। আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ফারুকে আযম (রা), হযরত উসমান গনী (রা) এবং হযরত আলী (রা), যাঁরা দুনিয়ার চতুর্দিকে ইসলামের ডঙ্কা বাজিয়েছেন, ইসলামের এ বীর সিপাহসালারগণও জিহাদ ও লড়াইয়ের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইসলামের গণ্ডিভুক্ত হয়েছেন।

৬. নাজরান ও সিরিয়ার খৃস্টানদের কে বাধ্য করেছিল যে, তারা প্রতিনিধি দল হিসেবে নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন? প্রত্যেক এলাকা থেকেই এভাবে প্রতিনিধি দল আগমনের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, দলগুলো তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতেন এবং ইসলাম গ্রহণ করতেন। জবরদস্তি তো দূরের কথা, তিনি তাদেরকে ডাকার জন্য কোন দূতও প্রেরণ করেননি। যেমনটি সামনে অগ্রসর হয়ে 'প্রতিনিধি দল' শীর্ষক বর্ণনায় জানা যাবে।

৭. জিহাদের প্রসঙ্গ ইসলামের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং পূর্ববর্তী নবী (আ)-গণের শরীআতেও এ বিধান বিদ্যমান ছিল। কাজেই যদি ইসলামের উন্নতি এবং প্রসারের কারণ কেবল জিহাদই হয়, তা হলে অপর নবী (আ)-গণের যাঁদের মধ্যে এ বিধান বিদ্যমান ছিল, তাঁরা কেন এরদ্বারা বিকাশলাভ করতে পারলেন না? বিশেষত যখন ইতিহাসে অধিক সংখ্যায় এ ধরনের উদাহরণই বিদ্যমান যে, সব সময় প্রতাপশালী শাসকবর্গ এবং ইয়াহূদী-নাসারাগণ নিজ নিজ বিরোধীদের পাইকারীভাবে হত্যা করেছে।

৮. ইসলামী হুকুমত যদি লোকজনকে জবরদস্তি করে মুসলমান বানাতো কিংবা এ ধরনের কোন প্রচেষ্টা চালাতো, যা খৃস্টধর্মের জন্য করা হয়েছে এবং করা হচ্ছে, তা হলে তো মুসলিম দেশে কোন ভিনধর্মী লোকের অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকতো না। কারণ সত্য ও ন্যায়ের সাথে যখন বস্তুগত সাহায্য-সহযোগিতাও শামিল হয়ে যায়, তখন সত্য গ্রহণে আর বাধা থাকে কোথায়? যখন লোভ-লালসার দরুন ত্রিত্ববাদের রাগ-রাগিণী ঝংকৃত হয়, একই মানুষের মধ্যে যখন হাজারো মানবীয় প্রয়োজনের সমাবেশ ঘটে, বৃক্ষ ও পাথরকে খোদা এবং সত্তা ও আত্মাকে আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায় অনাদি, অবিনশ্বর, প্রাচীন ও চিরন্তন মানা হয়, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার অনাবিল একত্ববাদ, নিষ্কলুষতা, তাঁর একত্ব, চিরন্তনতা, তাঁর জ্ঞানশক্তি, শবণ ও দর্শনশক্তিকে লোভ-লালসা দ্বারা মানিয়ে নেয়া কিরূপে অসম্ভব হবে? কিন্তু ইসলামের আল্লাহ্ প্রদত্ত পরম সৌন্দর্য এ থেকে পবিত্র ও অমুখাপেক্ষী যে, দিরহাম ও দীনারের চাকচিক্যকে এ প্রসারের মাধ্যমে পরিণত করবে এবং শয়তানের ধনুকের[1] মাধ্যমে নিজেদের তীর

১. শয়তানের বক্তব্য হচ্ছে, স্ত্রীলোক হলো আমার পুরাতন ধনুক, এর মাধ্যমে আমি যে তীর নিক্ষেপ করি, তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। অতএব (পাঠকবর্গ) এটা বুঝে নিন এবং এর ওপর অবিচল থাকুন।

চালনা করবে। যারা এ পদ্ধতিতে কোন ধর্ম অবলম্বন করে, তারা আল্লাহর বান্দা নয়, বরং দিরহাম ও দীনারের বান্দা। আমরা এর থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

৯. অধিকন্তু ইসলামের আইনসমূহ স্বয়ং এর সাক্ষী–ইসলাম তরবারি দ্বারা বিস্তারলাভ করেনি। কেননা ইসলাম প্রসারের নিয়ম এটাই যে, কোন সপ্রদায়ের ওপর যখন আক্রমণ পরিচালনার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখন তাদের সামনে এই বলে ইসলাম পেশ কর যে, তোমরা ঈমান আনয়ন কর। যদি তারা ঈমান আনে, তা হলে তারা তোমাদের ভাই। তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সবাই এক সমান। আর যদি ইসলাম কবূল না করে এবং নিজধর্মে স্থির থাকতে চায়, তা হলে তাদের বল যে, তোমরা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের অঙ্গীকার কর, জিযয়াদানে সম্মত হও এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করো না। তা হলে তোমাদের জানমাল, ইযযত-আব্রুর হিফাযতের দায়িত্ব আমাদের, তোমাদের জানমাল, ইযযত-আব্রুর হিফাযত মুসলমানদের জানমাল, ইযযত-আব্রুর হিফাযতের অনুরূপ হবে। এ শর্ত অনুযায়ী তোমরা ইসলামী রাষ্ট্র ও ধর্মের ক্ষতি হয়, এমন তৎপরতায় লিপ্ত হতে পারবে না। অধিকন্তু তোমাদের এ স্বাধীনতা থাকবে যে, ইসলাম তোমাদের প্রতি তার নিষেধাজ্ঞাসমূহ প্রয়োগ করবে না। যেমন মদ্যপান ইসলামে নিষিদ্ধ, যা তোমাদের ধর্মে বৈধ। সুতরাং তোমাদের মদ্যপানে এবং এর ক্রয়-বিক্রয়ে বাধা দেবে না। তবে সামাজিক আইন-শৃঙ্খলা ব্যাহত করা চলবে না। বিয়ের ব্যাপারে ইসলামে যে বিশেষ শর্তাবলী রয়েছে, তোমাদেরকে তা পালন করতে ইসলাম বাধ্য করবে না। নিজ ধর্মমতে বিয়ে-শাদী করার ব্যাপারে ইসলম তোমাদেরকে অনুমতি দেবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর যদি তারা ইসলামী রাষ্ট্রীয় বিধান জিযয়াদানেও সম্মত না হয়, তা হলে এরপর তরবারি চালনার নির্দেশ আছে। এতে জানা গেল যে, তরবারি চালনার নির্দেশ মুসলমান বানানোর জন্য নয়, বরং এ ব্যবস্থা সর্বশেষ পর্যায়ে তাদের ঔদ্ধত্যের জবাব স্বরূপ। তাই বলতে হয়, যদি ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রসার লাভ করতো, তা হলে সর্বপ্রথমেই তরবারি চালনার নির্দেশ দিত; এত বিধি-বিধানের অবতারণা করা হতো না।

১০. যদি ইসলাম জোরজবরদস্তির মাধ্যমে প্রসার লাভ করতো, তা হলে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতগণ নিষ্ঠাবান ইসলামপ্রেমী ও এ জন্যে আত্মোৎসর্গকারী হতো না। কেননা জোরজবরদস্তির প্রভাব থাকে উপরি উপরি, এর প্রভাব অন্তর পর্যন্ত যায় না। কাজেই জোর করে কাউকে মুসলমান বানানো হলে তাদের অবস্থা এরূপ হতো যে, বাহ্যিকভাবে তারা মুখে ইসলামের কালেমা পাঠ করলেও অন্তর থেকে এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করতো ও অসন্তুষ্ট থাকতো। অথচ বাস্তবতা হলো, এ সকল ব্যক্তি শরীর-মন দিয়ে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, লোক সমক্ষে-গোপনে সর্বাবস্থায় ইসলামের প্রতি আত্মনিবেদিত ছিলেন, মসজিদ অপেক্ষা গৃহে বেশি (নফল) ইবাদত করতেন, সৌভাগ্য মনে করতেন ইসলামের জন্য জানমাল উৎসর্গ করাকে। এছাড়াও ইসলামী শরীআতের মাসআলা হলো, যে ব্যক্তি মুখে কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, তাকে হত্যা করা অবৈধ। কাজেই যে ধর্ম দুশমনের হাতে এ ব্যবস্থা দিয়ে রেখেছে যে, একবার মুখে

কালেমা পাঠ করামাত্র সে অব্যাহতি পেয়ে যায়, এ ধর্ম সম্পর্কে জোরজবরদস্তির অভিযোগ-অপপ্রচার করা যায় কি ? সমস্ত কাফিরই কালেমা পাঠ করে হত্যা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। বিরোধিতাকারীদের কথামতো যে মানুষগুলো চাপে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা কেন আজীবন এ চাপের অনুসারীই থেকে গেল, সুযোগমত কেন তাদের পূর্বের ধর্মে ফিরে গেল না ?

ইসলাম এবং দাসত্বের মাসআলা

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, তা আর কোন সৃষ্টিকে দেননি। তিনি মানুষকে জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, বাকশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি পরিপূর্ণ গুণাবলীর প্রতিফলনস্থলে পরিণত করেছেন। তাকে স্বীয় খিলাফতদানে ধন্য করেছেন, ফেরেশতাগণের সিজদার পাত্ররূপে সমস্ত সৃষ্টির ওপর মর্যাদা দান করেছেন। এমনকি অভশপ্ত শয়তান অবলীলাক্রমে বলে উঠেছে : هٰـذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ "এতো হচ্ছে মাটির তৈরি সে আদম, যাকে তুমি আমার ওপর মর্যাদা দান করেছ।" সমস্ত সৃষ্টিকেই তার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে এতই আযাদী ও স্বাধীনতা দান করেছেন যে, সমস্ত পৃথিবীই তার মালিকানা ও অধিকারে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : خَلَقَ لَكُمْ مَا فِىْ الاَرْضِ جَمِيْعًا "পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" কিন্তু যখন সেই অথর্ব মানুষ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার আনুগত্য অপরিহার্য হওয়াকে অস্বীকার করে বসে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (কুফরী) করে বসে, আর নবী (আ)-গণের মুকাবিলা ও তাঁদের সাথে যুদ্ধের জন্য ময়দানে বেরিয়ে আসে, তখন তার সমুদয় মর্যাদা ও সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয় এবং সেই প্রদত্ত আযাদী ও স্বাধীনতা তার থেকে কেড়ে নেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বিদ্রোহী ও অবাধ্য ব্যক্তিদেরকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দা, যাঁরা ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটানোর জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের দাস ও আজ্ঞাবহে পরিণত করে দেন। আর তাদের এ অনুমতি দান করেন যে, চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু ও মালিকানাধীন সম্পত্তির মতই ওদেরকে যেভাবে ইচ্ছা, ক্রয়-বিক্রয় কর। ওদেরকে কেনা, বিক্রি করা, দান করা কিংবা বন্ধক রাখার পূর্ণ এখতিয়ার তোমাদেরকে দেয়া হলো। এরা তোমাদের অনুমতি ছাড়া কোনকিছু করতে পারবে না। অপরাধীর শাস্তি অপরাধের ধরন অনুযায়ী হয়ে থাকে। যে ধরনের অপরাধ হবে, শাস্তিও হবে ঠিক সেই ধরনেরই। চুরি এবং ব্যভিচারের অপরাধীকে কয়েকদিন শাস্তিদানের পর অব্যাহতি দেয়া হয়ে থাকে। কেননা এ অপরাধ সমাজ বিরোধী। কিন্তু বিদ্রোহের অপরাধ ক্ষমা করা হয় না। কেননা তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ্রোহ। এ জন্যে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرِكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ٠

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। আর এছাড়া তিনি অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।" (সূরা নিসা : ৪৮)

কেননা সত্য অস্বীকারকারী কাফিররা নীতিগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার অপরিহার্য আনুগত্য এবং তাঁর প্রেরিত বিধানের প্রতি সক্রিয় আনুগত্য স্বীকার করে না। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার অনুগত বলে নিজকে মনে করে না। এ জন্যই আল্লাহর বিদ্রোহী। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বাভাবিক, যৌক্তিক ও নৈতিকভাবে এদের দ্বারা এমন সব কর্ম সাধিত হয়, যা শরীআত সম্মত। এটা তাদের আনুগত্য বা খোদায়ী নীতির অনুসরণ নয়, বরং দৃশ্যত তা কেবল সৎকর্মের অনুরূপ। নীতিগতভাবে তারা বিরোধী ও বিদ্রোহী। আর প্রকাশ থাকে যে, যদি মৌলিক বিরোধিতা, সামগ্রিক অবাধ্যতা ও বিশ্বাসগত দ্বন্দ্ব থাকে, তা হলে আংশিক কিংবা বাহ্যিক সাযুজ্যের কী মূল্যায়ন হতে পারে ? এজন্যেই ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া ক্ষমাপ্রাপ্তি অসম্ভব। আর তার সমুদয় সৎকর্ম এবং চারিত্রিক গুণাবলী একজন ফাসিক মু'মিনের তুলনায় কিছুই নয়। কেননা ফাসিক মু'মিনের এ ফাসিকী আংশিক ক্ষেত্র হিসেবে সীমাবদ্ধ। বুনিয়াদীভাবে সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আবশ্যিক আনুগত্য সমর্থন করে। যদি সে কখনো কোন গুনাহ্ করে বসে, তখন আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করে শত বিনয়-নম্রতা ও অজস্র অনুতাপসহ ক্ষমা প্রার্থনা করে। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ط أُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ

"এবং মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও মু'মিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম। ওরা আগুনের দিকে আহ্বান করে।" (সূরা বাকারা : ২২১)

আত্মোৎসর্গকারী বিশ্বস্ত ব্যক্তি আর আল্লাহর বিদ্রোহী ও প্রতারককে সমমর্যাদা দান করা জ্ঞান, প্রকৃতি ও রাষ্ট্রীয় আইনে স্পষ্ট যুলুম। এটা কোন্ ধরনের সংস্কৃতিবান রাষ্ট্র, যার আইনে অনুগত ও পাপী উভয়ে সমমর্যাদাসম্পন্ন হবে ? আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ "আমি কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের সদৃশ্য গণ্য করব ?" (সূরা কালাম : ৩৫)

সকল আধুনিক রাষ্ট্রেই বিদ্রোহী আর রাজনৈতিক অপরাধীদের শাস্তি সাধারণ অপরাধী। যেমন চোর, বদমায়েশ, প্রতারক ও ধোঁকাবাজদের শাস্তি থেকে বেশিই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অপরাধে অপরাধী, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিংবা দেশ থেকে বহিষ্কার ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না। যদিও মূলত বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র উভয়ই অপরাধ, কিন্তু চুরি কিংবা বদমায়েশীর অপরাধ মাত্র এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, অথচ রাষ্ট্রদ্রোহীতা এবং রাজনৈতিক অপরাধ সমসাময়িক শাসক, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে। এরা চায় যে, এ রাষ্ট্রই ধ্বংস হয়ে যাক। আর সমস্ত সভ্য রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রদ্রোহ অপেক্ষা বড় কোন অপরাধ নেই। চুরি-ডাকাতির অপরাধ রাষ্ট্রদ্রোহের তুলনায় স্বল্প। রাষ্ট্রের সর্বসম্মত আইন হচ্ছে, যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করবে, তার সর্ব প্রকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা শেষ হয়ে যায় এবং তার সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার সাথে হীন আচরণ করা হয়।

রাজনৈতিক এ অপরাধী যতই যোগ্য, জ্ঞানী ও মর্যাদাশীল হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় আইনে এটাই তার পাওনা। এ অপরাধী ব্যক্তি জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং শিক্ষায় প্রজাতন্ত্রের শীর্ষ ব্যক্তি অপেক্ষাও যোগ্যতর হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পার্থিব রাষ্ট্রগুলো যদি তাদের বিদ্রোহীদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করার অধিকারী হতে পারে, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা (যিনি ঐ বিদ্রোহীদেরকে অস্তিত্ব, জীবন, জ্ঞান-বুঝ এবং ধন-সম্পদ দান করেছেন) তাঁর কি ঐ বিদ্রোহী (কাফির) থেকে স্বপ্রদত্ত স্বাধীনতা হরণ করে নেয়ার অধিকার নেই ?

সারকথা : আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব থেকে বিদ্রোহ অর্থাৎ কুফরীর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। তাওরাত ও ইনজীলেও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বরং এমন কোন জাতি বা ধর্ম নেই যাতে দাসত্বের বিষয়টি অনুপস্থিত। বরং এটা অনস্বীকার্য যে, দাসত্ব ও গোলামীর বিষয়টি সমস্ত ধর্ম ও জাতির সমন্বিত ঐকমত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়।

যদি দাসত্ব প্রকৃতিগতভাবেই মন্দ কিছু হতো, তা হলে তা কোন শরীআতেই বৈধ হতো না। তাওরাত ও ইনজীল দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূলই এটাকে বৈধ রেখেছেন। দাসত্ব যদি প্রকৃতিগতভাবেই মন্দ কিংবা কোন বন্য প্রথা হতো অথবা কোন লজ্জাকর বিষয় হতো, তা হলে নবী (আ)-গণ কিভাবে এটাকে বৈধ রেখেছেন ? হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের কি এটা জানা ছিল না যে, দাসত্ব প্রকৃতিগতভাবেই মন্দ এবং প্রকৃতির বিধানের বিপরীত ? হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা) দাসী হিসেবে নবী (সা)-এর শয্যাসঙ্গিণী ছিলেন, যাঁর গর্ভে হযরত ইবরাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। নবী করীম (সা) কি আজীবন প্রকৃতিগতভাবে গর্হিত একটি কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, তিনি কি প্রকৃতির বিধান বিরোধী কাজ করেছিলেন ? অসম্ভব হলেও যদি ধরে নেয়া হয় যে, নবী (আ)-গণ থেকে এ ব্যাপারে কোন ইজতিহাদী ভুল হয়ে গেছে, তা হলে প্রশ্ন হলো, সর্বজ্ঞাতা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কেন ওহীর মাধ্যমে এ ভ্রান্তি থেকে সতর্ক করলেন না ?

ইসলামের পূর্বে এমন কোন সম্প্রদায় ছিল না, যাদের মধ্যে দাসত্বের প্রচলন ছিল না। ইসলাম এসে কেবল এ বিধান বৈধ রেখেছে। কিন্তু দাসদের সাথে যে লজ্জাকর ও মানবতাবিরোধী কাজকর্ম করা হতো, ইসলাম এক মুহূর্তেই তা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের মালিকদের অধিকার চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের মুক্তির পথ বাতলে দিয়েছে, যা হাদীস এবং ফিক্হ গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে।

হ্যাঁ, তবে ইসলাম দাসপ্রথাকে সমূলে শেষ করে দেয়নি। কেননা এটা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিদ্রোহ অর্থাৎ কুফরীর শাস্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে কুফর ও শিরক অবশিষ্ট আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাসত্ব ও দাসপ্রথাও অবশিষ্ট থাকবে এবং থাকা উচিত। অপরাধ যখন বিদ্যমান তখন শাস্তি কেন থাকবে না ? শরীআত প্রকৃত দাসত্ব অবশিষ্ট রেখেছে কিন্তু এর অবৈধ কাজগুলোকে সংশোধন করেছে। এতে সন্দেহ নেই যে, দাসত্ব একটি বড় ধরনের অপমানজনক কাজ, কিন্তু শিরক ও কুফরী এর চেয়ে কি কম অপমানজনক ? সব ধরনের অপরাধের ক্ষতি ও এর অকল্যাণ নির্দিষ্ট, কিন্তু

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিদ্রোহের ক্ষতি ও অকল্যাণের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাই কুফরীর জন্য স্থায়ী শাস্তি এবং ঈমানের জন্য স্থায়ী সওয়াব নির্দিষ্ট। কেননা কুফরীর ক্ষতি ও অকল্যাণের যেমন সীমা নেই, তেমনি ঈমানে সৌন্দর্য ও কল্যাণেরও কোন সীমা-পরিসীমা নেই। ইসলামের উদ্দেশ্যই হলো কুফরীকে অপদস্থ করা। চুরি এবং বদমায়েশীর পেছনে উদ্দেশ্য থাকে লোভ এবং কুপ্রবৃত্তি, আর আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পেছনে উদ্দেশ্য থাকে অস্বীকৃতি ও অহংকার। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : اَبى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ "সে অমান্য করল এবং অহংকার করল, সুতরাং সে কাফিরের অন্তর্ভুক্ত হলো।"

এজন্যে প্রথমোক্ত অপরাধের শাস্তি তাদের উপযোগী নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যে অপরাধের উদ্দেশ্য ছিল অহংকার ও অবাধ্যতা, এর শাস্তি অপদস্থতা অর্থাৎ দাসত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। আর অপরাধের শাস্তি অপরাধের অনুরূপই হয়ে থাকে। যে সমস্ত মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং এ পথে জীবনপাত ও আত্মোৎসর্গ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এভাবে ইযযত ও সম্মান দান করেছেন যে, তাদেরকে ঐ অহংকারী ও বিদ্রোহীদের অধিকারী ও প্রভুতে পরিণত করেছেন। وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ "আর সম্মান আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"

যে ব্যক্তি ভাল ও মন্দ, ঈমান ও কুফর, সৎ ও অসৎ, মু'মিন ও কাফিরের মাঝে বিভাজনের প্রবক্তা, তার জন্যে এ বিষয়টি কোন সমস্যা নয়, আর যে ব্যক্তি সরাসরি ভাল ও মন্দ, সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্যই মানে না, তাদের সাথে আমাদের কোন কথা নেই; তারা মানুষই নয়, বরং পশুতুল্য।

কুরআনুল করীমে مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ বাক্যটি পনেরবার এসেছে এবং গুনাহের কাফফারা স্বরূপ দাসমুক্ত করার কথাও পবিত্র কুরআনে সরাসরি এসেছে। অনুরূপভাবে মুকাতাব[1] দাসের কথাও কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে এসেছে। এ ধরনের সমস্ত আয়াতদ্বারা দাসত্বের প্রমাণ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কোন দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তা অস্বীকার করা অসম্ভব। আর হাদীস শরীফে এসেছে : المكاتب عبد مابقى عليه درهم "মুকাতাব ঐ সময় পর্যন্ত গোলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তির এক দিরহামও অপরিশোধিত থাকে।" হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) যখন বনী কুরায়যার ব্যাপারে এ আদেশ দিলেন, تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم "তাদের মধ্যকার যুদ্ধোক্ষম পুরুষদের হত্যা করা হোক এবং অল্পবয়স্কদের গোলাম বানানো হোক।" তখন নবী (সা) বললেন, قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللّٰهِ "ওহে সা'দ! তুমি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ফয়সালা

১. দাসকে নির্ধারিত অর্থ কিংবা অপর কোন শর্তে মুক্তিদানের ব্যাপারে মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ দাসকে মুকাতাব বলে।

করেছ।" আর আওতাস যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে : وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ "আর নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।" কাজেই কুরআন ও হাদীসের দ্বারা দাসপ্রথার প্রমাণ দিবালোকের মতই উজ্জ্বল।[১]

আরিফ রূমী (কু. সি.) তাঁর মসনবীর চতুর্থ দফতরে (পৃ. ১২১) বলেন :

در تفسير اين حديث نبوى كه

ان اللّه تعالى خلق الملائكة وركب فيهم العقل خلق البهائم وركب فيها الشهرة وخلق بنى آدم وركب فيهم العقل والشهوة فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلى من الملائكة ومن غلبت شهوته على عقله فهو ادنى من البهائم صدق النبى ﷺ .

"নবী করীম (সা)-এর এ হাদীসের তাফসীর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা পয়দা করলেন এবং তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান দিলেন। তিনি জীবজন্তু সৃষ্টি করলেন আর তাদের মধ্যে প্রবৃত্তি সৃষ্টি করলেন। তিনি বনী আদম সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে জ্ঞান এবং প্রবৃত্তি উভয়ই দিয়েছেন। কাজেই যার জ্ঞান প্রবৃত্তির ওপর বিজয়ী হলো, সে ফেরেশতা অপেক্ষাও উচ্চ মর্যাদা লাভ করল। আর যার প্রবৃত্তি তার জ্ঞানের ওপর বিজয়ী হলো, সে পশু থেকেও নিম্নস্তরে পৌঁছে গেল।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

در حديث امدكه يزدان مجيد * خلق عالم راسركونه افريد

হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে তিনভাগে সৃষ্টি করেছেন।

يك كره احمله علم و عقل وجود * ان فرشته است ونداند جزسجود

একভাগকে জ্ঞান ও অফুরন্ত উদারতা দ্বারা ধন্য করেছেন, এরা হলো ফেরেশতার দল; যারা আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হওয়া এবং তাঁর আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই জানে না।

نيست اندر عنصرش حرص رهوا * نور مطلق زنده از عشق خدا

এদের মূলে লোভ এবং আত্মপ্রবৃত্তির কোন নাম-নিশানাও নেই, তারা নূরের তৈরি এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রেম-ভালবাসাই তাদের জীবন।

يك گروهى ديگر از دانش نهى * همچوان ازعلف در فربهى

---

১. এসব ছাড়াও যুদ্ধবন্দীদেরকে যদি তাদের দেশ মুক্তিপণ কিংবা বন্দী বিনিময় না করে, তখন বিজয়ী মুসলিম শক্তি তাদের কিভাবে ছাড়তে পারে ? এ কারণেই যেহেতু যুদ্ধবন্দী যে কোন সময় হতে পারে, এজন্যে এ পদ্ধতি বহাল রাখতে হয়েছে। অন্যথায় বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া কিংবা তাদেরকে আটকে রাখা ছাড়া উপায় কি ? তাই ইসলাম সমস্যাটির সমাধান মানবিকভাবে করেছে।

দ্বিতীয় দলটি, যারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেমন পশু, যাদের কাজ কেবল চরে বেড়ানো ও মোটাতাজা হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

او نه بنيد جز كه اصطبل وعلف * از شقاوت غالف ست دز شرف

এরা আস্তাবল এবং ভূষি ছাড়া আর কিছুই চেনে না। সৌভাগ্য ও সুকীর্তি সম্পর্কে এরা পুরোপুরি অজ্ঞ।

ان سوم هست آدمی زاده بشر * از فرشته نمیی ونیمش زخز

তৃতীয় দল হলো মানুষ, যার অর্ধাংশ ফেরেশতাসুলভ এবং বাকী অর্ধাংশ মূর্খ অর্থাৎ পশুতুল্য। ফেরেশতার গুণ এবং পশুর আচরণ মিলে সে সৃষ্টি হয়েছে।

نیم خر خود مائل شفلی بود * نیم دیگر مائل علوی بود

এ মানুষের অর্ধাংশ মূর্খ পশুর ন্যায় প্রবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট, আর দ্বিতীয় অংশ ফেরেশতাসুলভ গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট এবং উন্নত।

تاكه امين غالب ايد در نبرد * زين دوكانه تاكد امين بردنرد هازى

আর এ দু'অংশে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিদ্যমান। দেখে এ সংঘাতে কে বিজয়ী হয় এবং এ পরীক্ষায় কে উত্তীর্ণ হয়।

عقل گر غالب شود پش شدفزون * از ملائك اين بشر در آزمون

অতএব যদি এ পরীক্ষায় জ্ঞান বিজয়ী এবং পশুত্ব পরাজিত হয়, তা হলে এ ব্যক্তি আল্লাহর ফেরেশতা অপেক্ষাও উত্তম ও মর্যদাবান হয়। এজন্যে যে, সে জ্ঞানকে পশুত্ব ও কুপ্রবৃত্তির ওপর ফেরেশতাদের বিপরীতে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কেননা ফেরেশতাদের নিমগ্নতার মধ্যে কোন বস্তু অন্তরায় হয় না।

شهوت ازغالب شودپس كمتراست * ازبهائم اين بشر زان كمتر است

যদি কুপ্রবৃত্তি বিজয়ী হয়, তা হলে এ ব্যক্তি জানোয়ার ও পশু থেকেও নিকৃষ্ট হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ "ওরা পশুর ন্যায়, বরং তা থেকেও নিকৃষ্ট।"

آن دو قوم اسوده از كنگ وحراب * وين بشر بادو مخالف دو عذاب

ঐ দুই দল ফেরেশতা ও পশু, এরা প্রবৃত্তি ও শয়তানের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত প্রতিহত করা থেকে মুক্ত। কিন্তু তৃতীয় দল অর্থাৎ মানুষ জ্ঞান এবং কুপ্রবৃত্তির বিরোধ ও সংঘাতে এক ধরনের শাস্তি ও সমস্যায় নিমজ্জিত থাকে।

وين بشر هم زامتجان قسمت شدند * آدمی شكل اندوسراست شدند

অতএব, এ মানুষ পরীক্ষা ও নিমগ্নতার প্রেক্ষিতে তিনভাগে বিভক্ত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ - وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ والسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ - أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ .

"ডানদিকের দল, কত ভাগ্যবান ডানদিকের দল! এবং বামদিকের দল, কত হতভাগ্য বামদিকের দল! আর অগ্রবর্তিগণই তো অগ্রবর্তী, তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।" (সূরা ওয়াকিয়াহ : ৮-১১)

یك کروه مستغرق مطلق شده * همچو عیسی باملك ملحق شده

এক দল তারা, যারা আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসায় নিমজ্জিত ও উৎসর্গিত এবং হযরত ঈসা (আ)-এর মত ফেরেশতাদের সাথে মিলে গিয়েছেন।

দ্রষ্টব্য : হযরত ঈসা (আ) যেহেতু জিবরাঈল (আ)-এর ফুঁ-এর মাধ্যমে জন্মলাভ করেছেন, এজন্যে তিনি আকৃতিগতভাবে মানুষ এবং প্রকৃতিগতভাবে ফেরেশতা ছিলেন। অনুসন্ধানের জন্য 'ফুতুহাতে মাক্কিয়্যা' এবং 'ফুসূসুল হিকাম' গ্রন্থ দেখুন।

نقش آدم لیك معنی جبرئیل * رسته از خشم وهواؤ قال وقیل

এর যদিও আকৃতিগতভাবে মানুষ কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে জিবরাঈল (আ), কাম-তাড়না, ক্রোধ এবং সব ধরনের গালমন্দ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

قسم دیگر باخران ملحق شدند * خشم محض وشهوت مطلق شدند

দ্বিতীয় দল তারাই, যারা গর্দভ ও পশুর সাথে মিলে যায় এবং প্রবৃত্তি ও কোধের অনুগত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ "ওরা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ।" আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন " اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ " "ওরা পশুর ন্যায়, বরং তা থেকেও নিকৃষ্ট।"

وصف جبریلی ور ایشان بود رفت * تنگ بود آنخانه وان وصف رفت

জিবরাঈলের গুণপনা তার থেকে দূরীভূত হয়, ধারণ ক্ষমতার সংকীর্ণতার কারণে তার মধ্যে ঐ গুণাবলী অবশিষ্ট থাকে না। দ্বিতীয় দল বামদিকের দল।

مانديك قسم وگراندر جهاد * نيم حيوان نيم حيى بارشاد

তিন দলের মধ্যে আরেক দল অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এরা সাধারণ মু'মিনের দল। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা 'আসহাবুল মায়মানাহ' বা দক্ষিণপন্থী দল বলেছেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন কিন্তু এখনো তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়নি। তাদের ঈমান তাদেরকে আল্লাহর দিকে টানে, আর প্রবৃত্তি তাদেরকে সুস্বাদু সামগ্রী ও কামনা-বাসনার পথে নিয়ে যেতে চায়। তারা আশ্চর্য ধরনের দোটানায় ভোগে। কখনো পশু প্রবৃত্তি বিজয়ী হয়, আর কখনো ঈমান ও হিদায়াত জয়ী হয়।

روزشب در کنگ واندر کشمکش * کرده چالش اولش یاخرش

দিনরাত তারা এই যুদ্ধ ও দোটানার মধ্যে থাকে। তাদের জ্ঞান প্রবৃত্তির সাথে এবং আত্মা শরীরের সাথে সংঘর্ষ চালাতে থাকে।

আরিফ রূমীর এ বর্ণনা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সামান্য ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করলাম। এখন আসল উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হব।

মূল উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন : মানুষের মধ্যে যে স্বাধীনতা ও মুক্তির গুণ বিরাজমান, তা তার প্রকৃতি ও মূলের সাথে সম্পৃক্ত নয় (যে, তার থেকে তা অপসারণ অসম্ভব

হবে), বরং এ গুণ ফেরেশতাসুলভ গুণের সাথে যতক্ষণ সম্পৃক্ত থাকে, ততক্ষণ তার স্বাধীনতা বজায় থাকবে। আর যখন সে পশুসুলভ গুণের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন ঐ মুক্তি ও স্বাধীনতা খতম হয়ে যায়। কুরআনী দলীল দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, কুফর ও শিরক করার কারণে মানুষের প্রতি পশুসুলভ নির্দেশ বর্তায়। কেননা খোদায়ী বিধানের পরিপন্থি কাজের দ্বারা মানব চরিত্রে মনুষত্বের বদলে পশুত্বের বিকাশ ঘটে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اِنْ هُمْ اِلاَّ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلاً ·

"ওরা তো পশুর মতই, বরং ওরা অধিক পথভ্রষ্ট।" (সূরা ফুরকান : ৪৪)

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ·

"আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই, যারা কুফরী করে।" (সূরা আনফাল : ৫৫)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ ·

"যারা কুফরী করে, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদরপূর্তি করে।" (সূরা মুহাম্মদ : ১২)

যেমন আজকাল পশুসুলভ সংস্কৃতি ও সভ্যতার চর্চা হচ্ছে, যার সংবাদ আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন, আজকালকার সাংস্কৃতিক আসরসমূহ এর প্রত্যায়ন নয়, বরং সাক্ষ্য পেশ করছে। পৃতিবীর বিজ্ঞজনেরা কি এ চারিত্রিক অপরাধীদেরকে জন্তু-জানোয়ার থেকে নিকৃষ্ট মনে করেন না ? তা হলে যদি ইসলাম আল্লাহদ্রোহীদের পশু থেকে নিকৃষ্ট বলে, এতে দোষটা কোথায় ?

কাজেই যেমন পশু ধরা হলে বা শিকার করা হলে এর মালিক হওয়া যায়, একইভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিদ্রোহকারীকে বন্দী অথবা গ্রেফতার করলেও এর মালিক হওয়া যায়। আর যেমনভাবে পশুকে বন্দী অথবা শিকার করা এর মালিকানা লাভের কারণ, অনুরূপভাবে কাফিরদের ওপর জয়লাভ করা বা অধিকার লাভ করা তার মালিকানা অর্জন ও দাসত্বে নেয়ার পরিপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ ও পশুতে যে পার্থক্য, তা কেবল জ্ঞান, অনুভূতির দরুনই হয়ে থাকে। আর এ কারণে সমস্ত জ্ঞানী সম্প্রদায়ের নিকটই জ্ঞানসম্পন্ন না হওয়ার দরুন পশু ক্রয়-বিক্রয় কেবল বৈধই নয়, বরং উত্তম। কাজেই মানুষ যখন অজ্ঞতার পর্যায়ে নেমে আসে এবং পশুর ন্যায় কারো অধিকার খর্ব করে, তবে কোন কোন সময় আদালতও তার ক্রয়-বিক্রয়ে নেতিবাচক ঘোষণা প্রদান করে। আর কোন কোন সময় আদালত শক্তি প্রয়োগ করে তার সম্পদ ও মালিকানা খরিদ করে মানুষের অধিকার আদায় করে থাকে। এটা কি স্বাধীনতা ও মুক্তি হরণ নয় ?

একটি সন্দেহ ও তার সমাধান : জানা আবশ্যক, মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে যে স্বাধীন বলা হয়, তার অর্থ কখনই এটা নয় যে, মুক্তি ও স্বাধীনতা মানুষের আত্মপ্রকৃতির সাথে অত্যাবশ্যকীয় ও অবিচ্ছেদ্য। বরং এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে। এ জন্যে সে প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন। আর দাসত্ব

অপরাধের শাস্তিস্বরূপ, যা প্রকৃতি বিরোধী। যদি কিছুক্ষণের জন্য এটা স্বীকারও করে নেয়া হয় যে, স্বাধীনতা মানুষের প্রকৃতিগত অধিকার, তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এটা কি এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন লাগামছাড়া স্থায়ী অধিকার যে, কোন অপরাধ কর, কুফরী কর, শিরক কর, আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর, তাঁর নাযিলকৃত বিধানের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বাধাদান কর, তাঁর প্রেরিত পয়গাম্বরকে মিথ্যা বল, তাঁদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ কর, তাঁদের মুকাবিলা কর, তাঁর অনুসারীদের ওপর নিপীড়ন চালাও, যে অপরাধ ইচ্ছা, তাই কর, তাও তোমার কোন দোষ নেই, তোমার স্বাধীনতা অধিকার কোনক্রমেই বিনষ্ট হবে না।

গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, সমস্ত আসমানী ধর্ম এবং সমস্ত আস্তিক জাতিগোষ্ঠী এ ব্যাপারে একমত যে কুফর ও শিরক অবলম্বনের পর জীবন ও অস্তিত্বের অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। এমন লাগামহীন স্বাধীনতা তো কোন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সংস্কৃতিবান ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও নেই। এমন নয় যে, রাষ্ট্রকেও অস্বীকার কর, মন্ত্রীবর্গ ও শাসনকর্তাকে অমান্য কর, অমান্য কর রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনকেও; এর বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা কর, এর আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বাধাদান কর, এরপরও তুমি স্বাধীন থাকবে। তোমাকে গ্রেফতার করা হবে না, তোমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে না আর তোমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হবে না, তোমার অর্থ-কড়ি যা ব্যাংকে জমা আছে, তাও জব্দ করা হবে না কেন হবে না ? যখন তুমি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তখন রাষ্ট্রও তোমার বিরুদ্ধে ও সবই করবে যা তোমার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মানুষের আয়ুষ্কাল প্রকৃতিগত বিষয়, কিন্তু শরীআতী শাস্তি বিধান ও হত্যার বদলায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন এবং আয়ুষ্কালের সমাপ্তি ঘটানো ওয়াজিব বা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অপররাধ সংঘটনের কারণে প্রকৃতিগত অধিকার শেষ হয়ে যায়। আর কুফর থেকে কোন বড় অপরাধই বড় নয়।

রাজনৈতিক দাসত্ব

ফিরিঙ্গি জাতি ইসলামী দাসত্বের উল্লেখ করে। কিন্তু তাওরাত ও বাইবেলে যে দাসত্বের মাসআলা উল্লেখিত আছে, তার নামটিও নেয় না। আর অন্যদের ওপর রাজনৈতিক দাসত্ব প্রতিষ্ঠা নিজেদের জন্য আবশ্যিক ও প্রয়োজনীয় মনে করে। বর্তমান পাশ্চাত্য রাজনীতি পুরো সম্প্রদায় এবং গোটা দেশকেই দাসত্বে আবদ্ধ করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এ কারণে ব্যক্তি পর্যায়ে দাসত্বের প্রয়োজন নেই। আর তারা গণতন্ত্র ও সমানাধিকারের যুগেও সাদা মানুষদেরকে কালো মানুষের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও লোহিত বর্ণের অধিবাসীর জন্য কৃষ্ণ অধিবাসী থেকে পৃথক আইন প্রণয়ন করে রেখেছে।

যুদ্ধ ও অভিযানের ধারাবাহিকতা

আল্লাহর রাস্তায় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের দমনে আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ ও মস্তকদানকারীদের আত্মোৎসর্গের একটি অধ্যায়

জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হয় এবং রাসূল (সা)-ও যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু করেন এবং আশেপাশে বাহিনী প্রেরণ করেন। যে যুদ্ধে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেন, সীরাত বিশেষজ্ঞ ও আলিমগণের পরিভাষায় তাকে 'গাযওয়া' (غزوة) বলে। আর যাতে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেননি, তাকে 'সারিয়্যা' (سريه) অথবা 'বা'স' (بعث) বলে।

যুদ্ধের সংখ্যা

মূসা ইবন উকবা, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, ওয়াকিদী, ইবন সা'দ, ইবনুল জাওযী এবং দিময়াতী ইরাকী বলেছেন যুদ্ধর সংখ্যা হচ্ছে সাতাশটি। আর হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যাব[১] (রা) থেকে চব্বিশটি, হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্[২] (রা) থেকে একুশটি আর হযরত যায়দ ইবন আরকাম[৩] (রা) থেকে ঊনিশটির কথা বর্ণিত আছে। আল্লামা সুহায়লী বলেন, সংখ্যার ব্যাপারে এ মতপার্থক্যের কারণ হলো, কোন কোন আলিম নিকটতম সময়ে এবং একই অভিযানে সংঘটিত হওয়ার কারণে কয়েকটি যুদ্ধকে একটি বলে গণনা করেছেন। ফলে তাদের নিকট যুদ্ধের সংখ্যা কম হয়েছে। আর এ সম্ভাবনাও থাকতে পারে যে, কেউ কেউ কোন কোন যুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।[৪]

অভিযানের সংখ্যা : অনুরূপভাবে অভিযানের সংখ্যায়ও মতভেদ আছে। ইবন সা'দ থেকে চল্লিশটি, ইবন আবদুল বার থেকে পঁয়ত্রিশটি, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক থেকে আটত্রিশটি, ওয়াকিদী থেকে আটচল্লিশটি এবং ইবনুল জাওযী থেকে এ সংখ্যা ছাপ্পান্নটি বর্ণিত হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৮৮ দেখুন)।

হযরত হামযা (রা)-এর অভিযান

হিজরতের সাত মাস পর রাসূলুল্লাহ (সা) সর্ব প্রথম পহেলা হিজরীর রমযান মাসে অথবা দ্বিতীয় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে হযরত হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে

---

১. সহীহ সনদে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন।

২. সহীহ সনদে আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন।

৩. বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

৪. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১৮; যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৮৮।

ত্রিশজন[১] মুহাজিরের (বর্ণনায় মতপার্থক্য রয়েছে) একটি দলকে সায়ফুল বাহর-এর দিকে প্রেরণ করেন, যাতে তারা আবূ জাহলের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনরত তিনশ' কুরায়শের একটি কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করতে পারেন। হিজরতের পর এটা ছিল প্রথম অভিযান এবং এ বাহিনীতে মুহাজির ছাড়া আনসারদের কেউ ছিলেন না। হযরত হামযা (রা) যখন সায়ফুল বাহর-এ উপস্থিত হলেন এবং উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো ও যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধও হলো, তখন মাজদী ইবন আমর জুহানী উভয় পক্ষের মাঝে দাঁড়িয়ে মিটমাট করে দিল। ফলে আবূ জাহল কাফেলা নিয়ে মক্কায় চলে গেল এবং হযরত হামযা (রা) মদীনায় ফিরে এলেন।[২]

হযরত উবায়দা ইবন হারিস (রা)-এর অভিযান

এটা আবার হিজরতের আট মাস পর প্রথম হিজরী সালের শাওয়াল মাসে নবী করীম (সা) ষাট অথবা আশিজন ঘোড় সওয়ার মুহাজিরের একটি দলকে হযরত উবায়দা ইবন হারিস (রা)-এর নেতৃত্বে রাবিগের দিকে প্রেরণ করেন। এ অভিযানেও কোন আনসার সদস্য ছিলেন না।

সেখানে পৌঁছে কুরায়শের দু'শ অশ্বারোহীর একটি দলের মুখোমুখি হলেন। কিন্তু যুদ্ধের সুযোগ এলো না। শুধু হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা) একটি তীর নিক্ষেপ করেন। এটাই ছিল ইসলামী আমলের প্রথম তীর। আবূ সুফিয়ান[৩] ইবন হারব অথবা ইকরামা ইবন আবূ জাহল অথবা মিকরায ইবন হাফস (বর্ণনায় বিভিন্নতা রয়েছে) এ বাহিনীর প্রধান ছিল। হযরত মিকদাদ ইবন আমর ও হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা) যদিও পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু কাফিরদের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে হিজরত করতে অপারগ ছিলেন। তারা এজন্যে কুরায়শের কাফেলার সাথে ছিলেন এবং সুযোগ পাওয়ামাত্র মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলেন। সুতরাং যখন মুসলমান এবং কাফির উভয়পক্ষ মুখোমুখি হলো, এ দু'ব্যক্তি সেই সুযোগে কাফির দল থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের দলে শামিল হলেন।[৪]

---

১. কেউ কেউ বলেন, এ অভিযানে কিছু আনসারও ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন, বিশুদ্ধ মত এটাই যে, আনসারদের মধ্যে কেউ এতে ছিলেন না। বদর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (সা) যতগুলো অভিযান পরিচালনা করেছেন, তাতে কোন আনসার এ জন্যে ছিলেন না যে, আনসারগণ মদীনায় অবস্থান করে তাঁর হিফাযতের শপথ করেছিলেন, বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার শপথ করেননি। এ কারণে নবী (সা) বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে আনসারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, তোমাদের সিদ্ধান্ত কি? তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২, প্রথম অধ্যায়; যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৮০।

২. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৪৪।

৩. আবূ সুফিয়ান ইবন হারব ও ইকরামা ইবন আবূ জাহল মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন। মিকরায ইবন হাফসকে কেউ সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেননি। কেবল ইবন হিব্বান তাঁর কিতাবুস সিকাত গ্রন্থে এ পর্যন্ত বলেছেন : "বলা হয় তিনি একজন সাহাবী।" যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯১।

৪. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯১।

হযরত হামযা ও হযরত উবায়দা (রা)-এর অভিযান যেহেতু খুবই কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, সেহেতু এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ হযরত হামযার অভিযানকে অগ্রগামী বলেন, আর কেউ হযরত উবায়দার অভিযানকে প্রথম বলেছেন।

কেউ বলেন, এ দু'অভিযান একইসাথে হয়েছিল। এজন্যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। কেউ হযরত হামযার অভিযানকে অগ্রগামী বলেছেন, আর কেউবা হযরত উবায়দার অভিযানকে। ফলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে সঠিক রয়েছেন।

হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর অভিযান

পুনরায় হিজরী প্রথমবর্ষের যিলকাদ মাসে হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা)-এর নেতৃত্বে বিশজন মুহাজিরের একটি পদাতিক বাহিনী খাররার দিকে প্রেরণ করেন।

খাররার ছিল জুহফার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। গাদীরে খুমও এরই সন্নিকটে অবস্থিত। এ দলটি দিনের বেলা লুকিয়ে থাকত এবং রাত্রিবেলা পথ চলত। খাররার পৌঁছে জানা গেল, কুরায়শের কাফেলা চলে গেছে। ফলে তারা মদীনায় ফিরে এলেন।[১]

জানা দরকার যে, ওয়াকিদী এবং মুহাম্মদ ইবন সা'দ-এর নিকট এ তিনটি অভিযানই প্রথম হিজরী সনে প্রেরিত হয়েছিল। আর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, এ অভিযান তিনটি দ্বিতীয় হিজরী সনে আবওয়া যুদ্ধের পরে প্রেরিত হয়েছিল।[২] ইবন হিশামও তাঁর সীরাত গ্রন্থে এ মত পোষণ করেছেন যে, প্রথমে আবওয়ার যুদ্ধ, এরপর উবায়দা ইবন হারিসের অভিযান এবং তারপর হযরত হামযার অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। আর এ অধম (লেখক) হাফিয ইবন কায়্যিম, আল্লামা কাসতাল্লানী এবং আল্লামা যারকানীর অনুসরণ করেছেন।

আবওয়ার[৩] যুদ্ধ

এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ, যাতে মহানবী (সা) স্বয়ং সশরীরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর তাবূক ছিল তাঁর অংশগ্রহণকৃত শেষ যুদ্ধ।

দ্বিতীয় হিজরী সনের সফর মাসের প্রারম্ভে নবী সরীম (সা) ষাটজন মুহাজির সঙ্গে নিয়ে, যাদের মধ্যে কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না, কুরায়শ কাফেলা এবং বনী যামরার প্রতি আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আবওয়ার দিকে যাত্রা করেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মদীনায় হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কে নিযুক্ত করেন। এ যুদ্ধের পতাকা ছিল হযরত হামযা (রা)-এর হাতে।

---

১. যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৮৩।

২. ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ৪১।

৩. মদীনা থেকে তেইশ মাইল দূরে জুহফার নিকটে অবস্থিত। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১৭, মাগাযী অধ্যায়।

যখন তিনি আবওয়া পৌঁছেন, ততক্ষণে কুরায়শ কাফেলা চলে গিয়েছিল; কাজেই তিনি বনী যামরার সর্দার মাখশী ইবন আমর-এর সাথে সন্ধি করে ফিরে আসেন। সন্ধির শর্তসমূহ এই ছিল যে, বনী যামরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে না এবং মুসলমানদের কোন শত্রুকেও সাহায্য করবে না। আর মুসলমানদের সাথে প্রতারণাও করবে না; বরং প্রয়োজনে মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।[১]

এ যুদ্ধকে ওয়াদ্দানের যুদ্ধও বলে। আবওয়া এবং ওয়াদ্দান দু'টি সন্নিকটবর্তী স্থান, উভয়ের দূরত্ব মাত্র ছয় মাইল।

মহানবী (সা) পনর দিন পর কোন রক্তপাত ছাড়াই এ যুদ্ধ থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন। এতে লড়াই করার প্রয়োজন হয়নি (উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৩২৫; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১৭)।[২]

বুয়াতের[৩] যুদ্ধ

ওহীর মাধ্যমে নবী (সা) জানতে পান যে, কুরায়শের একটি বাণিজ্য কাফেলা মক্কায় যাচ্ছে। ফলে তিনি দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস সানী মাসে দু'শ' মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে কুরায়শের ঐ কাফেলাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বুয়াতের দিকে যাত্রা করেন। এ সময় তিনি প্রথমদিকের মুসলমান এবং আসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবী হযরত সায়িব ইবন উসমান ইবন মাযঊন (রা)-কে মদীনা হাকিম নিযুক্ত করেন।

কুরায়শের ঐ কাফেলায় আড়াই হাজার উট ছিল। আর উমায়্যা ইবন খালফসহ এতে লোকসংখ্যা ছিল একশত। বুয়াত পৌঁছে জানা গেল যে, কুরায়শের কাফেলা চলে গেছে। নবী (সা) কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।[৪]

উশায়রার যুদ্ধ

দ্বিতীয় হিজরীর ২রা জমাদিউল আউয়াল তারিখে দু'শ' মুহাজির সাহাবীসহ কুরায়শ কাফেলার ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য নবী (সা) উশায়রা অভিযানে বাহন হিসেবে ত্রিশটি উট সঙ্গে নেন, যাতে সাহাবায়ে কিরাম (রা) পালাক্রমে আরোহণ করতেন।

তিনি পৌঁছার কয়েকদিন পূর্বে কাফেলা চলে গিয়েছিল। তিনি জমাদিউল আউয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো এবং জমাদিউস সানী মাসের কয়েক রাত্রি সেখানে অবস্থান করেন এবং বনী মুদলিজের সাথে সন্ধিচুক্তি করে বিনাযুদ্ধে সেখান থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধির বাক্যাবলী ছিল নিম্নরূপ :

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৩।

২. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৩২৬।

৩. বুয়াত মানবার সন্নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম, যা মদীনা থেকে কমবেশি আটচল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। যারকানী

৪. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯২।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ هٰذَا كِتَابُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِبَنِى ضَمْرَة بِاَنَّهُمْ امِنُوْنَ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ لَهُمْ النصر على من رامهم ان لايحاربوا فى دين الله مابل بحر صوفة وان النبى اذ دعاهم لنصره اجابوه - عليهم بذالك ذمة الله وذمة رسوله ولهم النصر من بر واتقى ۔

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এটা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে বনী যামরার জন্য লিখিত চুক্তি যে, তাদের জানমাল সব নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি বনী যামরার সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করবে, তার মুকাবিলায় বনী যামরাকে সাহায্য করা হবে—এ শর্তে যে, বনী যামরা আল্লাহর দীনে কোন প্রকার বাধাদান করবে না। এ চুক্তি সমুদ্র শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ স্থায়ীভাবে থাকবে। নবী করীম (সা) যখন তাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করবেন, তারা উপস্থিত হবে। এটা তাদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা চুক্তি এবং যে ব্যক্তি সৎ ও বিশ্বস্ত থাকবে, তাকে সাহায্য করা হবে।"[১]

সর্বপ্রথম কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও একদল বর্ণনাকারী বলেন, সর্বপ্রথম আবওয়া, তারপর বুয়াত এবং এরপর উশায়রার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর এ ধারাবাহিকতাই ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ্ বুখারীতে অনুসরণ করেছেন এবং হাফিয আসকালানীও তাঁর শারহে বুখারীতে এটাই অনুসরণ করেছেন। আর কোন কোন আলিম এ মত অবলম্বন করেছেন যে, প্রথম যুদ্ধ ছিল উশায়রার যুদ্ধ।[২]

অধিকন্তু সীরাত বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মধ্যেও এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, প্রথমোক্ত তিনটি অভিযান, অর্থাৎ হযরত হামযা (রা), হযরত উবায়দা (রা) এবং হযরত সা'দ (রা)-এর অভিযান প্রথম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, নাকি দ্বিতীয় হিজরীর আবওয়া যুদ্ধের পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অধিকাংশ আলিম এ তিনটি অভিযান প্রথম হিজরী সালে আবওয়া যুদ্ধের পূর্বে বলে উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ হলো, অনুমতি লাভের পর যুদ্ধের সূচনা অভিযানের মাধ্যমে শুরু হয়। আর হাফিয ইবন কায়্যিম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে, আল্লামা কাসতাল্লানী মাওয়াহিব গ্রন্থে এবং আল্লামা যারকানী শারহে মাওয়াহিবে প্রথমোক্ত অভিযানসমূহকে অর্থাৎ হযরত হামযা (রা)-এর অভিযান, হযরত উবায়দা (রা)-এর অভিযান এবং হযরত সা'দ (রা)-এর অভিযান প্রথম হিজরীতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন। আর এ অধম (লেখক) যুদ্ধ এবং অভিযানের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ কাসতাল্লাসী এবং যারকানীর অনুসরণ করেছে। আর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক প্রমুখের সিদ্ধান্ত হলো, যুদ্ধের সূচনা আবওয়ার যুদ্ধ দ্বারা হয়েছে এবং এর পরে হযরত হামযা (রা)-এর অভিযান এবং হযরত উবায়দা (রা)-এর অভিযান চালানো হয়। যেহেতু রাসূল (সা) এ দু'টি

১. রাউযুল উনূফ, ৩খ. পৃ. ৫৮; যারকানী, ১খ. পৃ. ১৯৬।

২. তারিখুল খামীস, ১খ. পৃ. ৪০১।

অভিযানের নির্দেশ একই সাথে দিয়েছেন, এজন্যে বর্ণনাকারীদের সন্দেহ হয়েছে যে, কোন অভিযানটি প্রথমে চালানো হয়েছিল। ইবন হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে এ ধারাবাহিকতার অনুসরণ করেছেন যে, প্রথমে আবওয়ার যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন, এর পরে উবায়দা ইবন হারিসের অভিযান, পরে হযরত হামযার অভিযান এবং এরপর বুয়াত যুদ্ধ অতঃপর উশায়রার যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন। আর তিনি এ সমুদয় যুদ্ধ ও অভিযানকে দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন।

বদরের প্রথম যুদ্ধ (বদরে সুগরা বা গাযওয়ায়ে সাফওয়ান)

উশায়রার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী (সা) সম্ভবত প্রায় দশদিন মদীনায় অবস্থান করেন। ইত্যবসরে কুরয ইবন জাবির ফিহ্‌রী মদীনার চারণভূমিতে নৈশ আক্রমণ চালায় এবং মানুষের উট ও ছাগল নিয়ে পালিয়ে যায়। নবী (সা) এ সংবাদ শুনে তার পশ্চাদ্ধাবন করে সাফওয়ান পর্যন্ত গমন করেন—যা বদরের নিকটবর্তী একটি মৌজা। কিন্তু তিনি এখানে পৌছার পূর্বে কুরয চলে গিয়েছিল। ফলে তিনি মদীনার দিকে ফিরে আসেন।

সাফওয়ান যেহেতু বদরের নিকটবর্তী একটি মৌজা এবং নবী (সা) তার পশ্চাদ্ধাবন করে বদর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছিলেন, এজন্যে একে বদরের প্রথম যুদ্ধ এবং সাফওয়ানের যুদ্ধও বলা হয়। এ যুদ্ধে যাত্রাকালে নবী (সা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।[১]

কুরয ইবন জাবির ছিল নেতৃস্থানীয় কুরায়শদের একজন। পরবর্তীতে ইনি মুসলমান হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উরাইনীদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য বিশজন অশ্বারোহীর এক বাহিনী প্রেরণ করেন, তখন হযরত কুরয ইবন জাবির (রা)-কে এর নেতা নির্বাচন করেন। ইনি মক্কা বিজয়কালে শাহাদতবরণ করেন।[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-এর অভিযান

সাফওয়ান যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল (সা) দ্বিতীয় হিজরীল রজব মাসে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-কে নাখলার[৩] দিকে প্রেরণ করেন এবং এগারজন মুহাজিরকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে প্রেরণ করেন—যাঁদের নাম নিম্নরূপ :

১. হযরত আবূ হুযায়ফা ইবন উতবা (রা),
২. হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা),
৩. হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা),
৪. হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা),

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯৬; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ২২৭।

২ আল-ইসাবা, ৩খ. পৃ. ২৯০।

৩. নাখলা মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তীস্থানের একটি জায়গার নাম, যা মক্কা থেকে একদিন ও এক রাতের দূরত্বে অবস্থিত। আর এটা ঐ স্থান, যেখানে জিন্নদের একটি দল নবী (সা)-এর নিকট এসেছিল। যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯৭।

৫. হযরত আমির ইবন রবীআহ (রা),
৬. হযরত ওয়াকিদ ইবন আবদুল্লাহ (রা),
৭. হযরত খালিদ ইবন বুকায়র (রা),
৮. হযরত সাহল ইবন বায়যা (রা),
৯. হযরত আমির ইবন ইয়াস (রা),
১০. হযরত মিকদাদ ইবন আমর (রা) এবং
১১. হযরত সাফওয়ান ইবন বায়যা (রা)।

এ এগারজন মুজাহিদ তাঁর সঙ্গী ছিলেন এবং দ্বাদশতম ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের নেতা হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণের ইচ্ছা করলেন এবং বললেন, এমন ব্যক্তিকে তোমাদের নেতা বানাব যে ব্যক্তি হবে ক্ষুৎ-পিপাসায় তোমাদের চেয়ে বেশি ধৈর্যধারণকারী। এরপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-কে আমাদের আমীর মনোনীত করেন এবং তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম আমীর।[১]

হযরত জুনদুব বাজালী (রা) থেকে হাসান সনদে মু'জামে তাবারানীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-কে প্রেরণকালে একটি পত্র লিখে দেন এবং নির্দেশ দেন যে, দু'দিনেরপথ অতিক্রম করার পূর্বে এ পত্র খুলে দেখবে না। দু'দিনের পথ অতিক্রমের পর এ পত্র খুলবে এবং সে মর্মে কাজ করবে। তবে তোমার সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে বাধ্য করবে না।

কাজেই দু'দিনের পথ অতিক্রমের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) নবী (সা)-এর নির্দেশনামা খোলেন এবং এতে লিখা দেখতে পান যে, তোমরা সামনে অগ্রসর হও, এমনকি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে গিয়ে অবতরণ করবে এবং সেখানে কুরায়শদের জন্য অপেক্ষা করবে ও তাদের সংবাদাদি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) এ পত্র পাঠ করলেন এবং সঙ্গীরা বললেন, শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। আর তিনি তাঁর সকল সঙ্গীকে এ পত্রের মর্ম অবহিত করলেন এবং এও বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে বাধ্য করব না, শাহাদত যার কাছে প্রিয়, সে আমার সাথে যাবে। সুতরাং সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করলেন এবং অগ্রসর হলেন।

পথিমধ্যে হযরত সা'দ এবং হযরত উতবা (রা)-এর উট হারিয়ে যাওয়ায় উট খুঁজতে গিয়ে তাঁরা পিছনে পড়ে যান এবং হারিয়ে যান। আর অবশিষ্ট সবাই নাখলায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ১৪৩, مايذكر فى المناولة এবং كتاب اهل العلم الى البلدان অধ্যায়; উয়ূনুল আসার এবং যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯৭)।

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯৭।

ইসলামে প্রথম গনীমত

কুরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছিল। ঐদিন ছিল রজব মাসের শেষ তারিখ (এ মাসে যুদ্ধ ও রক্তপাত হারাম[১] ছিল)। শা'বান মাস শুরুর পূর্বরাত্রে তাঁরা ঐ কাফেলার ওপর আক্রমণ করে বসেন।

কাফেলার সর্দার আমর ইবন হাযরামীকে হযরত ওয়াকিদ ইবন আব্দুল্লাহ (রা) একটি তীর নিক্ষেপ করেন, যাতে সে নিহত হয়। সে মৃত্যুবরণ করামাত্রই কাফেলার লোকজন হৈ চৈ শুরু করে এবং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে পলায়ন করতে থাকে। আর মুসলমানগণ কাফেলার সমুদয় মালামাল দখল করে নেন এবং উসমান ইবন আবদুল্লাহ ও হাকাম ইবন কায়সানকে গ্রেফতার করেন। ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধলব্ধ মালামাল বন্টনের ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) নিজের চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী প্রাপ্ত মালামালের পাঁচভাগের চারভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং এক-পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য রেখে দেন। যখন মদীনা পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ ব্যাপারে অবহিত করেন, তখন তিনি বললেন, আমি তো তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দেইনি। আচ্ছা, যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত গনীমতের মাল এবং বন্দীদের হিফাযতে রাখ। এতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ লজ্জিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অপরদিকে মুশরিক ও ইয়াহূদীরা বলতে থাকে যে, মুহাম্মদ (সা) ও তার সাথীরা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধকে বৈধ করে নিয়েছে। ফলে এ আয়াত নাযিল হয় :

---

১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শরীআতে চারটি মাস যুদ্ধ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ (হারাম) ছিল। যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম, এ তিনমাস পর্যায়ক্রমে এবং অপর একমাস রজব। যিলহাজ্জ হজ্জের মাস, এর পূর্বে একমাস এবং এর পরবর্তী একমাস এজন্যে হারাম করা হয় যে, দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজীগণ যাতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে হজ্জ করে ফিরে যেতে পারেন। আর রজব মাসে উমরা করার জন্য ঐ সব লোক আসত, যারা মক্কা থেকে দশ-পনের দিনের দূরত্বে বাস করত। এজন্যে রজব মাসকে হারাম করা হয়, যাতে আসতে চৌদ্দ-পনের দিন এবং যেতে চৌদ্দ-পনের দিন নিরাপদে থাকে। আর এ সময়ে খাদ্যশস্যও আসত, ফলে ঐ মাসসমূহ হারাম করা হয় যাতে মানুষের জানমাল লুটতরাজ হতে নিরাপদ থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেন : جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ "পবিত্র কা'বাগৃহ, পবিত্রও মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন।" (সূরা মায়িদা : ৯৭)। হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে ইসলামের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত এ বিধান বলবৎ থাকে। এমনকি উক্ত আয়াত দ্বারা তা রহিত করা হয় এবং ঐ মাসসমূহে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয় কিন্তু জিহাদ ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধ ছাড়া এ মাসসমূহের নিষিদ্ধতা এখনো অবশিষ্ট আছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন : مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلَا تَظْلِمُوا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ "এ চার মাস হারাম, এ সময়ে নিজেদের ওপর অত্যাচার করো না।" অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানী করবে না। আতা বলেন, ঐ চার মাস যুদ্ধ ও রক্তপাত হারাম হওয়ার বিধান এখনো বলবৎ আছে, রহিত হয়নি। রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১৬০।

يَسْئَلُوْ نَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط وصد عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَ كْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ ان اسْتَطَاعُوْا

"পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে; বল, ওতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধাদান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে (প্রবেশে) বাধা দেয়া এবং সেখানকার বাসিন্দাকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর কাছে এর চেয়ে বেশি অন্যায়; ফিতনা হত্যার চেয়ে গুরুতর অন্যায়। ওরা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে না নেয়, যদি ওরা সক্ষম হয়।" (সূরা বাকারা : ২১৭)

মোটকথা কোন সন্দেহ বা সংশয়ের ভিত্তিতে বা অজ্ঞতার দরুন হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হওয়া দূষণীয় কিছু নয়। অবশ্য কুফর ও শিরকের ফিতনা এবং মুসলমানদেরকে মসজিদুল হারামে যেতে বাধাদান একটা বড় ধরনের ফিতনা, যার চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছু নেই। এ পবিত্র আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী (সা) গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্টাংশ মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের মনে আগ্রহের সঞ্চার হলো। জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা কি এ যুদ্ধের বিনিময়ে কিছু আশা করতে পারি ? ফলে এ আয়াত নাযিল হয় :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহর পথে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ণ, পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা : ২১৮)

এটা ছিল ইসলামে প্রথম গনীমত এবং আমর ইবন হাযরামী ছিল প্রথম ব্যক্তি, যে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। কুরায়শরা উসমান ইবন আবদুল্লাহ এবং হাকাম ইবন কায়সানের জন্য মুক্তিপণ প্রেরণ করে। নবী (সা) বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সঙ্গী সা'দ এবং উতবা ফিরে না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ বন্দীদের ছাড়ছি না। কেননা আমার সন্দেহ হয় যে, তোমরা না জানি তাদের হত্যা করে ফেল। যদি তোমরা আমার সঙ্গীদের হত্যা কর, তা হলে আমিও তোমাদের লোকদের হত্যা করব। এর কয়েকদিন পর সা'দ ও উতবা ফিরে আসেন, তিনিও মুক্তিপণ গ্রহণ করে উসমান ও হাকামকে ছেড়ে দেন। উসমান তো ছাড়া পাওয়ামাত্রই মক্কায় ফিরে যায় এবং মক্কায় গিয়ে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আর হাকাম ইবন কায়সান মুসলমান হয়ে

মদীনায়ই অবস্থান করেন এবং বীরে মা'উনার যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন।[১] আর এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করেন :

تَعُدُّوْنَ قَتْلاً فِى الْحَرَامِ عَظِيْمَةً * وَاعْظَمُ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرَّشَدَ رَاشِدُ

صَدُوْدُكُمْ عَمَّا يَقُول مُحَمَّدُ * وَكُفْرُ بِهِ وَاللّٰهُ رَاءٍ وَشَاهِدُ

وَاِخْرَاجِكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللّٰهِ اَهْلَهُ * لِئَلاَّ يُرى فِى الْبَيْتِ لِلّٰهِ سَاجِدُ

فانا وان عُمَّيْرِ تُمُوْنَا لِقَتْلِهِ * وَاَرْجَفَ بِالْاِسْلَامِ بَاغٍ وحاسد

سَقَيْنَا مِنِ ابْنِ الْحَضرمى رِمَاحَنَا * بِنَخْلَةَ لَمَا اوقد الحرب واقد

دما وابن عبد اللّٰه عثمان بيننا * ينازعة فُدٌ من القبد عَانِدُ

"তোমরা হারাম মাসে অর্থাৎ রজব মাসে যুদ্ধকে বড় মনে কর, অথচ মুহাম্মদ (সা) যা বলেন, তা থামিয়ে দেয়া এবং তাঁকে অস্বীকার করা এর চেয়ে বড় অপরাধ। হায়! যদি কোন বুঝমান ব্যক্তি একটু খেয়াল করত! আর আল্লাহ্ তো সম্যক দ্রষ্টা ও সাক্ষ্যদাতা।

"আর আল্লাহর ঘর থেকে আল্লাহ্ ভক্তদের এজন্যে বের করে দেয়া যে, সেখানে আল্লাহকে সিজদাকারী যেন পরিদৃষ্ট না হয়, এটাও হারাম মাসে যুদ্ধ করা অপেক্ষা বড় অপরাধ।

"তোমরা যদিও এ যুদ্ধের জন্য আমাদেরকে লজ্জা দাও, আর বিতণ্ডাকারী ব্যক্তি তো ইসলামের ব্যাপারে কতই মিথ্যা বলে, তাতে আমাদের কোনই পরোয়া নেই। নিঃসন্দেহে আমরা আমর ইবন হাযরামীর রক্ত দিয়ে নাখলা নামক স্থানে নিজের তীর রঞ্জিত করেছি। যখন ওয়াকিদ ইবন আবদুল্লাহ (রা) যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে আর উসমান ইবন আবদুল্লাহ্ আমাদের কাছে বন্দী ছিল, যার গলার বেড়ি এবং শিকল ধরে নিজের দিকে টানছিল।" (সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৯; হুসনুস সাহাবা, ১খ. পৃ. ৩০৩)।[২]

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৭; যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯৭।

২ সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৯।

বদর[১] যুদ্ধ (বদরে কুবরা)

(রমযানুল মুবারক, দ্বিতীয় হিজরী)

এ যুদ্ধ ছিল ইসলামের যুদ্ধসমূহের মধ্যে সবচে' বড় যুদ্ধ। এজন্যে যে, ইসলামের সম্মান ও শৌর্যের সূচনা এবং এইসঙ্গে কাফির ও মুশরিকদের বে-ইযযতী ও লাঞ্ছনার সূচনা উভয়ই এ যুদ্ধের মাধ্যমেই ঘটে। আর আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে প্রকাশ্য ও বস্তুগত প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ছাড়াই একমাত্র গায়েবী শক্তিবলে মুসলমানদের বিজয় ঘটে। ইসলাম কুফর ও শিরকের মাথায় এমন আঘাত হানে যে, বস্তুত তার হাড়-অস্থি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এর নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসেবে বদরের ময়দান আজো বিদ্যমান। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ দিনকে يَوْمُ الْفُرْقَانْ তথা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যের দিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বরং এ পুরো মাসটিই ছিল পার্থক্যকরণের মাস, রমযানুল মুবারকের মাস, যে মাসে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন নাযিল করে হক ও বাতিল, হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছেন। আবার এ মাসেই রোযা ফরয করেছেন—যাতে নিষ্ঠাবান আল্লাহপ্রেমিক নিবেদিতপ্রাণ বান্দা আর অন্যদের মধ্যে পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে তাঁর খাঁটি প্রেমিক। কেননা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁরই প্রেমে মত্ত হয়ে আল্লাহপ্রেমিকগণ প্রচণ্ড গরমের কষ্ট স্বীকার করে, আর কে ভণ্ড প্রেমিক এবং পেট ও প্রবৃত্তির গোলাম, তা ধরা পড়ে। মোটকথা এ মাসটিই ন্যায়-অন্যায় এবং হক-নাহকের পৃথকীকরণের মাস, এ মাসে বিভিন্নভাবে ও নানান পদ্ধতিতে খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

ঘটনার সূত্রপাত

রমযানের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (সা) এ সংবাদ পান যে, আবূ সুফিয়ান কুরায়শদের এমন একটি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছে, তাদের সাথে আছে অর্থ-সম্পদ। তিনি (সা) মুসলমানদের একত্রিত করে এ সংবাদ দিলেন এবং বললেন, এটা কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা। তোমরা সেদিকে বেরিয়ে পড়। এ কাফেলা

---

১. বদর একটি গ্রামের নাম যা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে চার মনযিল ও আট ফারসাখ অর্থাৎ প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত। বদর ইবন ইয়াখলাদ ইবন নাযর ইবন কিনানা কিংবা বদর ইবন হারিসের নামের সাথে সম্পর্কিত, যিনি এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আর কেউ বলেন, বদর একটি কূপের নাম ছিল এবং কূপের নামেই গ্রামটি প্রসিদ্ধিলাভ করে। যারকানী, ১খ., পৃ. ৪০৬।

তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা গনীমত হিসেবে দান করবেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।[১]

যেহেতু যুদ্ধ-বিগ্রহ বা খুনোখুনির কোন ধারণাও ছিল না, কাজেই তাঁরা কোনরূপ রণপ্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াই বেরিয়ে পড়েন। আবূ সুফিয়ান এমন কিছু একটা সন্দেহ করছিলেন। কাজেই হিজায এলাকায় পৌঁছে তিনি প্রতিটি মুসাফির পথচারীকে নবী (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন। এদের মধ্যে জনৈক মুসাফিরের মাধ্যমে খবর পেলেন যে, মুহাম্মদ (সা) তোমার কাফেলা ধরার জন্য তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ সুফিয়ান সাথে সাথে যমযম গিফারীকে মজুরীর বিনিময়ে এ খবর মক্কায় প্রেরণ করেন যে, তুমি গিয়ে কুরায়শদের মাঝে ঘোষণা করে দেবে যে, যত দ্রুত সম্ভব, তোমরা নিজেদের কাফেলার খবর নাও এবং এ বহর রক্ষা করার চেষ্টা কর। কেননা এ কাফেলা আটক করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ তার সাথীদের নিয়ে বের হয়েছেন।[২] হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন :

لم اتخلف من رسول الله ﷺ في غزوة غزاها الا في غزوة تبوك غير انى تخلقت عن غزوة بدر ولم يعاقب احد تخلف عنها انما خرج رسول الله ﷺ يريد غير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ·

“যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) খোদ অংশগ্রহণ করেছেন, একমাত্র তাবূক যুদ্ধ ছাড়া এমন আর কোন যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ থেকে পেছনে থাকিনি। বদর যুদ্ধেও আমি পেছনে থেকে গিয়েছিলাম কিন্তু তাবূক যুদ্ধের মত বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ না করার জন্য কারো প্রতি কোন শাস্তি আরোপিত হয়নি। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল কুরায়শদের কাফেলার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, আর দৈবক্রমে কোন পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী করেন।” (সহীহ্ বুখারী, কিসসাতু বদর যুদ্ধ অধ্যায়)

দ্রষ্টব্য : হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) তাবূক ও বদর যুদ্ধে পেছনে থাকার বিষয় পৃথক পৃথক শব্দদ্বারা উল্লেখ করেছেন, উভয়টি একই শব্দদ্বারা বর্ণনা করেননি। আর তিনি এভাবে বলেননি যে, الا في غزوة تبوك غير انى تخلقت عن غزوة بدر বরং তাবূক যুদ্ধে অশগ্রহণ না করার জন্য ١لا এবং বদর যুদ্ধের ব্যাপারে غير শব্দ ব্যবহার

---

১. শত্রুর অর্থনৈতিক অবরোধ বা রসদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়া যুদ্ধের একটি বড় কৌশল। মহানবী (সা)-এর এ নির্দেশ তাঁর বিরাট রণকৌশল জ্ঞানের পরিচায়ক।

২. এ রিওয়ায়াত সীরাতে ইবন হিশামে এ সনদে বর্ণিত হয়েছে : قال ابن اسحق فحدثنى محمد مسلم الزهرى وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن ابى بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس الخ সনদটি বিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ, বরং বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৫৬।

করেছেন এবং বলেছেন যে, الا فى غزوة تبوك غير انى تخلف من غزوة بدر দু'টিকে একই না বোধক বাক্য দ্বারা বর্ণনা করেননি। কেননা উভয় পেছনে পড়ার কারণ ও বৈশিষ্ট্য একইরূপ ছিল না। তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা ছিল নিন্দনীয়, তাবূক যুদ্ধে পেছনে অবস্থানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অবতীর্ণ হয়েছিল, আর বদর যুদ্ধে পেছনে অবস্থান করা নিন্দনীয় ছিল না। কাজেই যে ব্যক্তি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের জন্য কোন ভৎসনা ছিল না। এজন্যে বদর যুদ্ধে পেছনে থাকার বিষয়ে غير শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা ও তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা বিপরীতার্থক ও পরস্পর বিরোধী বলে জানা যায়। অতএব বুঝে নিন, কেননা এটা অতীব সূক্ষ্ম বিষয়।[১]

ইবন সা'দ বলেন, এটা ছিল ঐ কাফেলা, যাতে তিনি দু'শ' মুহাজিরসহ যুল-উশায়রায় গমন করেছিলেন। এ কাফেলা তখন সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিল। যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল কাফেলাকে ধরা, কাজেই দ্রুততার কারণে স্বল্প সংখ্যক লোকই তাঁর সঙ্গী হতে পেরেছিল। আর এটা যেহেতু যুদ্ধাভিযান ছিল না, সেহেতু এতে না যাওয়ার কারণে কাউকে কোন প্রকার নিন্দা কিংবা ভৎসনা করা হয়নি।

অভিযান : পবিত্র রমযানের বার তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা মুনাওয়ারা থেকে অভিযানে বের হন। তিনশ' তের, চৌদ্দ অথবা পনেরজন[২] তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব এত প্রকট ছিল যে, এত বড় কাফেলায় মাত্র দু'টি ঘোড়া আর সত্তরটি উট ছিল। একটি ঘোড়া ছিল হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)-এর, অপরটি ছিল হযরত মিকদাদ (রা)-এর। আর এক-একটি উট দু' অথবা তিনজনের জন্য বরাদ্দ ছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, বদরে যাত্রাকালে একেকটি উট তিনজনের জন্য বরাদ্দ ছিল। তারা পর্যায়ক্রমে এতে আরোহণ করতেন। হযরত আবূ লুবাবা এবং হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে শরীক ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পদব্রজে চলার পালা আসত, তখন হযরত আবূ লুবাবা অথবা হযরত আলী (রা) আরয করতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আরোহণ করুন, আমরা আপনার বদলায় পদব্রজে যাচ্ছি। জবাবে তিনি বলতেন, "তোমরা পথ চলার ব্যাপারে আমার চেয়ে শক্তিশালী নও, আর আমিও আল্লাহর পুরস্কারের ব্যাপারে তোমাদের তুলনায় অমুখাপেক্ষী নই।"

বীরে আবূ ইনবায় পৌঁছে (যা ছিল মদীনা থেকে এক মাইল দূরে) তিনি দলের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। দলে যারা অল্পবয়স্ক ছিল, তাদেরকে ফেরত

১. ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ২২৩।

২ মুসনাদে আহমদ, বাযযার ও মু'জামে তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে তিনশ' তেরজন বর্ণনা করেছেন। মু'জামে তাবারানীতে হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) তিনশ' চৌদ্দজন এবং বায়হাকীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) সূত্রে হাসান সনদে তিনশ' পনেরজন বর্ণিত আছে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২২৭, 'আদাতু আসহাবে বদর' অধ্যায়।

পাঠিয়ে দিলেন। আর-রাওহায় পৌঁছে হযরত আবূ লুবাবা ইবন আবদুল মুনযির (রা)-কে মদীনার প্রশাসক মনোনীত করে ফেরত পাঠালেন।

এ বাহিনীতে তিনটি পতাকা ছিল। একটি হযরত আলী (রা)-এর হাতে, দ্বিতীয়টি হযরত মুসআব ইবন উমায়র (রা)-এর হাতে এবং তৃতীয়টি জনৈক আনসারী সাহাবীর হাতে।

যখন তাঁরা সাফরার নিকটবর্তী হলেন, তখন হযরত লাব্বাস ইবন আমের জুহানী (রা) এবং আদী ইবন আবূ যুগবা জুহানী (রা)-কে আবূ সুফিয়ানের অনুসন্ধানের জন্য আগাম প্রেরণ করলেন।[১]

অপরদিকে যমযম গিফারী আবূ সুফিয়ানের এ বার্তা নিয়ে মক্কায় পৌঁছল যে, তোমাদের কাফেলা বিপদের সম্মুখীন, সেদিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং যত শীঘ্র সম্ভব এর সংবাদ লও।

এ সংবাদ কেবল পৌঁছার অপেক্ষা, মক্কায় হুলস্থুল পড়ে যায়। এ কারণে যে, কুরায়শের এমন কোন পুরুষ বা মহিলা ছিল না, যার পুরো মূলধন এ বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা হয়নি। সুতরাং এ খবর শোনামাত্র সমগ্র মক্কায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ল এবং এক সহস্র মানুষ[২] অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়ল, যার নেতৃত্বে ছিল আবূ জাহল।

কুরায়শ বাহিনী অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে আরাম-আয়েশের সরঞ্জামাদিসহ গায়িকা স্ত্রীলোক, ঢোল-তবলা ও বাদ্যকার সঙ্গে নিয়ে অহংকার ও অহমিকার সাথে অগ্রসর হলো। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ ·

"তোমরা (হে মুসলমানগণ) তাদের মত হবে না, যারা অহংকারসহ লোক দেখানোর জন্য নিজেদের গৃহ থেকে বের হয়েছিল।" (সূরা আনফাল : ৪৭)

নেতৃস্থানীয় সমস্ত কুরায়শ এ বাহিনীতে শরীক হয়েছিল, কেবল আবূ লাহাব কোন কারণবশত যেতে পারেনি, তবে তার বদলে আবূ জাহলের ভাই আস ইবন হিশামকে প্রেরণ করেছিল।

আস ইবন হিশামের যিম্মায় আবূ লাহাবের চার হাজার দিরহাম ঋণ ছিল, যা অভাবের কারণে তার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব ছিল না। এজন্যে ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে সে আবূ লাহাবের পক্ষে যুদ্ধে যেতে সম্মত হয়েছিল।[৩]

---

১. ইবন সা'দকৃত তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৬।

২ মুসলিম, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী হযরত ইবন আব্বাস (রা) হযরত উমর (রা) সূত্রে ও ইবন সা'দ হযরত ইবন মাসঊদ (রা) সূত্রে এ সংখ্যা বর্ণনা করেছেন। আর মূসা ইবন উকবা এবং ইবন আয়িয-এর মাগাযীর মতে এ সংখ্যা সাড়ে নয়শত ছিল। তবে এতে কোন মতপার্থক্য নেই। প্রকৃত যোদ্ধার সংখ্যা ছিল সাড়ে নয়শত এবং অবশিষ্ট পঞ্চাশজন ছিল খাদিম বা অনুরূপ কিছু। যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১০।

৩. তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৭।

অনুরূপভাবে উমায়্যা ইবন খালফও প্রথমে বদরে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কিন্তু আবূ জাহলের চাপের ফলে সে দলে যোগ দেয়।

উমায়্যার অস্বীকৃতির কারণ ছিল এই যে, হযরত সা'দ ইবন মু'আয আনসারী (রা) জাহিলী যুগ থেকেই উমায়্যার বন্ধু ছিলেন। উমায়্যা যখন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া যেত, তখন পথিমধ্যে মদীনায় হযরত সা'দ ইবন মু'আযের নিকট যাত্রা বিরতি করত এবং সা'দ ইবন মু'আয মক্কায় এলে উমায়্যার আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। মহানবী (সা) মদীনায় হিজরত করার পর সা'দ ইবন মু'আয উমরা করার উদ্দেশ্যে একবার মক্কায় আগমন করেন এবং নিয়মানুযায়ী উমায়্যার ঘরে উঠেন। আর উমায়্যাকে বলেন, তাওয়াফের জন্য আমাকে এমন সময় নিয়ে যাবে যখন হরম লোকজন থেকে খালি থাকবে। অর্থাৎ যাতে মানুষের ভিড় না থাকে। উমায়্যা দুপুরবেলা হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-কে নিয়ে বের হলো। তিনি তাওয়াফ করছিলেন, এমন সময় আবূ জাহল সামনে এলো এবং বলতে লাগল, ওহে আবূ সাফওয়ান! (উমায়্যার ডাকনাম) তোমার সাথে এ ব্যক্তিটি কে ? উমায়্যা বলল, ইনি সা'দ। আবূ জাহল বলল, আমি দেখছি যে, এ ব্যক্তি নিশ্চিন্তে তাওয়াফ করছে। তুমি এ ধরনের বেদীনদের আশ্রয় দাও আর তার সাহায্য-সহযোগিতা কর ? ওহে সা'দ! আল্লাহর কসম, যদি তোমার সাথে আবূ সাফওয়ান (উমায়্যা) না থাকত, তা হলে তুমি এখান থেকে সুস্থ দেহে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না। সা'দ উচ্চ কণ্ঠে বললেন, যদি তুমি আমাকে তাওয়াফ করতে না দাও, তবে আল্লাহর কসম, আমি মদীনার পথে তোমার সিরিয়া যাওয়া বন্ধ করে দেব। উমায়্যা সা'দকে বলল, তুমি আবুল হাকামের (আবূ জাহলের) সামনে তোমার কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না, কেননা তিনি এ উপত্যকার সর্দার। সা'দ সাথে সাথে বলে উঠলেন, হে উমায়্যা, বাদ দাও, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি, তুমি নবী (সা)-এর সঙ্গী-সাথীদের হাতে নিহত হবে। উমায়্যা বলল, আমি কি মক্কায় মারা যাব? সা'দ বললেন, এটা আমার জানা নেই যে, তুমি কখন বা কোন্ স্থানে মারা যাবে। এ কথা শুনে উমায়্য খুব ঘাবড়ে গেল ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। আর ফিরে গিয়ে সে তার স্ত্রী উম্মে সাফওয়ানকে এ কথা খুলে বলল।

অপর এক বর্ণনায় আছে, উমায়্যা বলল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ কখনো মিথ্যা বলেন না। সম্ভবত মৃত্যুভয়ে ঐ সময় উমায়্যার প্রস্রাব-পায়খানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২২০)। আর উমায়্যার ভয়-ভীতি এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, সে সংকল্প করেছিল, কখনো মক্কার বাইরে যাবে না। কাজেই আবূ জাহল যখন লোকজনকে বদরের উদ্দেশ্যে বের হতে বলছিল, তখন উমায়্যাকে মক্কা থেকে বের করা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। তার ছিল প্রাণের ভয়। আবূ জাহল উমায়্যার কাছে এলো এবং তাকে যাওয়ার জন্য তাকিদ দিল। আবূ জাহল যখন দেখল, উমায়্যা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়, তখন বলল, আপনি নেতা, আপনি যদি বের না হন তা হলে আপনার দেখাদেখি অনেক লোকই যাত্রা থেকে বিরত থাকবে। মোট কথা, আবূ জাহল সব সময় উমায়্যাকে খোঁচাতে ও উৎসাহিত করতে থাকল। পরিশেষে বলল, ওহে আবূ সাফওয়ান, আমি আপনার জন্য একটি উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়া কিনে দেব

(যেখানেই বিপদ অনুভব করবেন, ওতে আরোহণ করে যাতে ফিরে আসতে পারেন)। উমায়্যা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো এবং ঘরে গিয়ে আপন স্ত্রীকে বলল, আমার সফরের মাল-সামান প্রস্তুত করে দাও। স্ত্রী বলল, ওহে আবূ সাফওয়ান, তোমার ইয়াসরিবী ভাইয়ের কথা কি তোমার স্মরণ নেই ? উমায়্যা বলল, আমার ইচ্ছা কিছু দূর পর্যন্ত যাওয়া, এরপর ফিরে আসব। অতএব উমায়্যা এ উদ্দেশ্য নিয়েই যাত্রা করল এবং যে মনযিলেই অবতরণ করতো, উটটি নাগালের মধ্যেই রাখত। কিন্তু ভাগ্যের লিখন তাকে পলায়নের সুযোগ দেয় নাই। সে বদরে উপস্থিত হয় এবং যুদ্ধের ময়দানে সাহাবায়ে কিরামের হাতে নিহত হয় (বুখারী শরীফ, বদর যুদ্ধ অধ্যায়)। মোটকথা এই যে, নিজের নিহত হওয়ার ব্যাপারে উমায়্যার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আবূ জাহলের জবরদস্তির জন্য সে অংশগ্রহণ করেছিল। ফলে আবূ জাহল নিজেও ধ্বংস হয় এবং অপরকেও ধ্বংস করে।

احلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار

কুরায়শের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ অবহিত হওয়া, নবী (সা) কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ এবং আত্মোৎসর্গমূলক ভাষণ

রাওহা থেকে রওয়ানা হয়ে যখন তাঁরা সুফরায় পৌঁছলেন, তখন লাব্বাস এবং আদী (রা) নবী (সা)-কে কুরায়শদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুহাজির এবং আনসার সাহাবীগণকে পরামর্শ করার জন্য একত্র করেন এবং কুরায়শ বাহিনীর জাঁকজমকের সাথে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ দেন। এ খবর শোনামাত্র হযরত আবূ বকর (রা) দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিজকে উৎসর্গ করার ঘোষণা দিলেন ও নবী (সা)-এর ইঙ্গিতকে আপাদমস্তক গ্রহণ করলেন আর জীবন দিয়ে আনুগত্য করার জন্য কোমর বেঁধে নিলেন। এরপর হযরত উমর (রা) দাঁড়ালেন এবং তিনিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে আত্মোৎসর্গের ঘোষণা দিলেন।

হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা)-এর আত্মোৎসর্গমূলক ভাষণ[১]

এরপর হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা) দাঁড়ালেন এবং আরয করলেন :

امض لما امرك الله (تعالى) فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون .

---

১. মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের বর্ণনাদ্বারা মনে হয় যে, হযরত মিকদাদ (রা) এ ভাষণ সুফরায় দিয়েছিলেন। কিন্তু সহীহ্ বুখারী ও সুনানু নাসাঈর বর্ণনাদ্বারা জানা যায়, তিনি বদরের দিন এ ভাষণ দিয়েছিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২২৩)। তবে এ উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। হযরত মিকদাদ (রা) এ ভাষণ নবী (সা)-এর কথার জবাবে সুফরায় দিয়েছিলেন, এরপর বিভিন্ন স্থানে উপভোগের উদ্দেশ্যে এ বাক্যগুলো বার বার পুনরাবৃত্তি করেছেন। মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি সেমতে ব্যবস্থা নিন, আমরা সবাই আপনার সাথে আছি। আল্লাহর শপথ, আমরা বনী ইসরাঈলের মত কখনই এ কথা বলব না যে, ওহে মূসা! তুমি এবং তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা তো এখানেই বসে থাকব। আমরা বণী ইসরাঈলের বিপরীতে বলব, আপনি এবং আপনার পরোয়ারদিগার যে যুদ্ধ ও লড়াই করবেন, আমরাও আপনার সাথে যুদ্ধ ও লড়াইয়ে শরীক হব।"

এটা ইবন ইসহাক বর্ণিত শব্দমালা।[১] বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে :

ولكنا نقائل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك ·

"আমরা আপনার ডাইনে ও বামে, সামনে ও পিছনে থেকে লড়াই করব।"

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি দেখেছি ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র চেহারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল (বুখারী, পৃ. ৫৬৪, বদর যুদ্ধ অধ্যায়)।

উবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সা) হযরত মিকদাদ (রা)-এর কল্যাণ কামনা করে দু'আ করেন।

হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে আবূ সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ দেন এবং বলেন, যদি তোমরা ঐদিকে বের হও, তা হলে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে গনীমত দান করবেন। আমরা আরয করলাম, উত্তম, এরপর রওয়ানা হলাম। যখন এক বা দু'দিনের পথ অতিক্রম করলাম, তখন তিনি আমাদেরকে মক্কা থেকে কুরায়শ বাহিনীর আগমনের সংবাদ দেন এবং যুদ্ধ ও লড়াই করার জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। কিছু লোক কিছুটা ইতস্তত করছিল (কেননা তারা ঘর থেকে এ উদ্দেশ্যে বের হয়নি)। তখন হযরত মিকদাদ (রা) দাঁড়িয়ে আত্মোৎসর্গমূলক যে ভাষণ দিলেন, মনে হচ্ছিল যেন এটা আমাদেরই কথার প্রতিধ্বনি (ইবন হাতিম)। অর্থাৎ যেন আমরা সবাই প্রথমেই এমনটি বলেছি এবং পরেও সবাই তাই বলেছে আর আমাদের সবার অন্তরেও তাই ছিল, যা হযরত মিকদ্দ (রা) বলেছিলেন। কাজেই মুসনাদে আহমদে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে :

قال اصحاب رسول الله ﷺ لا نقول كما قالت بنو اسرائيل ولكن انطلق وربك فقاتلا انا معكم ·

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমস্ত সাহাবীই একমত হয়ে বলেছিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা বনী ইসরাঈলের মত বলব না; আমরা সর্বাবস্থায়ই আপনার সাথে আছি।"

এ প্রেরণাদায়ক ও সন্তোষজনক জবাবে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে রাসূল (সা) বললেন : اشيروا عى ايها الناس "হে লোক সকল! আমাকে পরামর্শ দাও।"

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১২; সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১২।

আনসারদের নেতা হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) আরব ও আজমের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধভাষী নবী করীম (সা)-এর এ পরিষ্কার ইঙ্গিত ও সূক্ষ্ম মন্তব্য বুঝে ফেললেন এবং তৎক্ষণাৎ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সম্ভবত ইঙ্গিতটা আনসারীদের প্রতি ? তিনি (সা) বললেন, হ্যাঁ।[১]

হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর আত্মোৎসর্গমূলক ভাষণ

এর ফলে হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) আরয করলেন :

يا رسول الله قد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق واعطيناك على ذالك عهود او مواثيق على السمع والطاعة ولعلك يا رسول الله خرجت لامر فاحدث الله غيره فامض لما شئت وصد حباك من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعاد من شئت وخذ من اموالنا ما شئت واعطنا ما شئت وما اخذت منا كان احب الينا مما تركت وما امرت به من امرنا فامرنا تبع لامرك لنن سرت حتى تاتى يرك الغماد لنسيرن معك فوالذى بعثك بالحق لراستعرضت بنا هذا البحر اخضناه وما تخلف منا رجل واحد وما نكره ان نلقى عدونا انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقربه عينك فسرينا على بركة الله ·

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনাকে সত্য নবী বলে জেনেছি। আর এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা সবই সত্য এবং আমরা আপনার আনুগত্য করার এবং আপনার জন্য আত্মোৎসর্গ করার দৃঢ় শপথ ও মযবূত প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছি। মদীনা থেকে আপনি ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয়েছিলেন, আর এখন আল্লাহ্ আরেক অবস্থার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যে পথে চলা উত্তম মনে করেন, তা অনুসরণ করুন, যার সাথে ইচ্ছা সম্পর্ক সৃষ্টি করুন এবং যার সাথে ইচ্ছা সম্পর্ক ছিন্ন করুন, আর যার সাথে ইচ্ছা সন্ধি করুন এবং যার সাথে ইচ্ছা দুশমনি করুন। সর্বাবস্থায়ই আমরা আপনার সাথে আছি। আমাদের

১. যেহেতু আনসারিগণ আকাবার বায়আতে নবী (সা)-এর সাথে কেবল এ ওয়াদা করেছিলেন যে, নবী (সা)-এর ওপর কোন শত্রু আক্রমণ করলে তার বিরুদ্ধে তারা তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন, মদীনার বাইরে গিয়ে তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ওয়াদা ছিল না। এজন্যে নবী (সা) বার বার আনসারীগণের প্রতি তাকাচ্ছিলেন। হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তাঁর এ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে উত্তর দিয়েছিলেন এবং খুব সুন্দর জবাবই দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৬৪; দ্র. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ২৪৭।

ধন-সম্পদের মধ্য থেকে যা খুশি নিয়ে নিন এবং যা খুশি আমাদের দিয়ে দিন।[১] আর আমাদের সম্পদের যে অংশ আপনি গ্রহণ করবেন, তা আমাদের জন্য ছেড়ে দেয়া অংশ থেকে আমাদের নিকট বেশি প্রিয় হবে। আপনি যদি আমাদেরকে 'বারকুল গামাদে' যাওয়ারও নির্দেশ দেন, আমরা আপনার সাথে সেখানেই যাব। কসম ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি আমাদেরকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ারও যদি আদেশ করেন, তা হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। আমাদের এক ব্যক্তিও এতে পিছপা হবে না। আমরা শত্রুর মুকাবিলা করাকে অন্যায় মনে করি না, আমরা অবশ্যই লড়াইয়ের ময়দানে ধৈর্যশীল ও সম্মুখ সমরে সত্যবাদী। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে এই কামনা করি যে, তিনি আমাদের দ্বারা আপনাকে এমন দৃশ্য দেখান, যাতে আপনার চোখ জুড়িয়ে যায়। সুতরাং আপনি আল্লাহর নামের বরকতে আমাদের নিয়ে চলুন।" (যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১৩)

সতর্ক বাণী : কোন কোন বর্ণনায় হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর পরিবর্তে হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটা সঠিক নয়, বর্ণনাকারীর ধারণামাত্র। এজন্যে যে, সর্বসম্মতভাবে হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) বদর যুদ্ধে উপস্থিত হননি। বিস্তারিত জানার জন্য যারকানী দেখুন।[২]

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামের এরূপ আত্মোৎসর্গকারী ভাষণ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে অগ্রসর হও, আর তোমাদের জন্য সুসংবাদ, আল্লাহ্ তা'আলা আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, আবূ জাহল এবং আবূ সুফিয়ানের দল দু'টির মধ্যে যে কোন একটি দলের ওপর বিজয়ী হতে তিনি অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আর আমাকে কাফির সম্প্রদায়ের পরাজিত হওয়ার স্থানসমূহ দেখানো হয়েছে যে, অমুককে অমুক স্থানে, তমুককে তমুক স্থানে পরাজিত করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ . لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ .

"স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদের কাছে ওয়াদা করেছেন যে, দু'দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে, অথচ তোমরা চাচ্ছিলে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন, সত্যকে তিনি তাঁর বাণীদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করবেন। এজন্যে যে, তিনি সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে

১. এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমাদের সম্পদ প্রকৃতপক্ষে আপনারই সম্পদ, এর থেকে যদি আপনি আমাদের জন্য কিছু ছেড়ে দেন, তা তো আপনারই দেয়া হলো।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১৪।

অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীগণ এটা পসন্দ করে না।" (সূরা আনফাল : ৭-৮)

আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

এদিকে নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে এ সংবাদ দেন যে, আমাকে দুশমনদের পরাজিত হওয়ার স্থানসমূহ দেখানো হয়েছে, অন্যদিকে মক্কা মুকাররামায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফু আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব যমযম গিফারীর মক্কায় পৌঁছার পূর্বে এ স্বপ্ন দেখেন, জনৈক উষ্ট্রারোহী বাতহায় উট বসিয়ে উচ্চস্বরে এ ঘোষণা দিচ্ছে যে, الا انفقوا يا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث "ওহে আলে গাদার (সন্ত্রাসী, প্রতারক সম্প্রদায়)[১] তোমরা তিনদিনের মধ্যে নিজেদের নিহত এবং পরাজয় ক্ষেত্র অভিমুখে বের হয়ে পড়ো।"

লোকজন তার চারপাশে জমা হয়ে গেল। এরপর ঐ ব্যক্তি নিজের উট নিয়ে মাসজিদুল হারামের দিকে চলে গেল এবং একই ঘোষণা দিল। অতঃপর সে আবূ কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করল এবং সেখান থেকে পাতরের একটি খণ্ড ছুঁড়ে মারল। পাথরের ঐ টুকরাটি যখন পাহাড়ের পাদদেমে পড়ল, তখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মক্কার এমন কোন ঘর অবশিষ্ট রইল না, যেখানে ঐ পাথরের টুকরা পড়েনি।

আতিকা তার ভাই হযরত আব্বাস (রা)-এর কাছে এ স্বপ্নটি বর্ণনা করলেন এবং বললেন, ওহে ভাই! আল্লাহর কসম, আজ আমি এ স্বপ্ন দেখেছি। আর আমি আশঙ্কা করছি যে, আপনার সম্প্রদায়ের ওপর কোন বালা-মুসীবত সমাগত। এ স্বপ্নের কথা আর কাউকে বলবেন না। হযরত আব্বাস গৃহ থেকে বের হলেন এবং তার বন্ধু ওলীদ ইবন উতবাকে স্বপ্নটির কথা বললেন। আর বলে দিলেন, এ স্বপ্নের কথা যেন কাউকে বলা না হয়। কিন্তু ওলীদ তার পিতার কাছে এ স্বপ্নের কথা হুবহু বলে দেয়। এভাবে ঐ স্বপ্নের কথা সমগ্র মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন হযরত আব্বাস মাসজিদুল হারামে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, আবূ জাহল একদল লোকের মধ্যে বসা। হযরত আব্বাসকে দেখামাত্র আবূ জাহল বলল, ওহে আবুল ফযল! তোমাদের পুরুষ তো নবূওয়াতের দাবিদার ছিল, এখন কি তোমাদের স্ত্রীলোকেরাও নবূওয়াতোর দাবি করা শুরু করল? (হযরত আব্বাস বলেন,) আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? আবূ জাহল আতিকার স্বপ্নের কথা উল্লেখ করল। এরই মধ্যে যমযম গিফারী আবূ সুফিয়ানের বার্তা নিয়ে এ অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হলো যে, তার পোশাক ছিন্নভিন্ন, উটের লাগাম কেটে দেয়া এবং সে চেঁচিয়ে বলছে, ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! নিজেদের বাণিজ্য কাফেলার সংবাদ নাও, আবূ সুফিয়ানের কাফেলার সাহায্যার্থে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হও।

---

১. যেহেতু এ সমস্ত লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে গাদ্দারী করেছিল, এজন্যে স্বপ্ন জগতে ওদেরকে 'আলে গাদার' বলা হয়েছে। এটাও আশ্চর্য নয় যে, গাদার দ্বারা শয়তান অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আর যেহেতু মুশরিকরা শয়তানের অনুগত, তাই তাদেরকে আলে গাদার বলা হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সংবাদ শোনামাত্র কুরায়শগণ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং বদর প্রান্তে পৌঁছে স্বপ্নের জীবন্ত ব্যাখ্যা সচক্ষে দেখতে পায়।[১] হায়তামী বলেন, তাবারানী হাদীসটি মুরসাল বর্ণনা করেছেন, তবে এর সনদে ইবন লাহিয়া নামে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। মাজমুয়াউয-যাওয়ায়েদ একে হাসান বলেছেন। মূসা ইবন উকবার বর্ণনায় আছে, যমযম গিফারী যখন মক্কায় উপস্থিত হলো, তখন আতিকার স্বপ্নদ্বারা কুরায়শদের মনে ভীতির সঞ্চার হলো।[২]

মন্তব্য : আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইবন সা'দ বলেন, আতিকা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং মদীনায় হিজরত করেছেন (ইসাবা, আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের জীবনী অধ্যায়)।[৩]

জুহায়ম ইবন সাল্‌ত-এর স্বপ্ন

মোটকথা এই যে, কুরায়শগণ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা বাজিয়ে মক্কা থেকে রওয়ানা দিল। তারা যখন জুহফায় উপস্থিত হলো, তখন জুহায়ম ইবন সাল্‌ত এ স্বপ্ন দেখল যে, এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে আছে এবং তার সাথে একটি উটও আছে। সে এসে দাঁড়ালো এবং বলতে লাগলো, উতবা ইবন রবীআ, শায়বা ইবন রবীআ, আবুল হাকাম ইবন হিশাম অর্থাৎ আবূ জাহল, উমায়্যা ইবন খাল্‌ফ এবং অমুক অমুক নিহত হয়েছে। একটু পরে ঐ ব্যক্তি উটটিকে বর্শাদ্বারা আঘাত করে সেনাদলের মাঝে ছেড়ে দিল। আর সেনাদলে এমন কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকল না, যার গায়ে ঐ উটের রক্তের ছিঁটা পড়েনি। আবূ জাহল যখন এ স্বপ্নের খবর অবগত হলো, তখন ভীষণ রুষ্ট হয়ে বলল, মুত্তালিবের বংশে দ্বিতীয় নবী জন্মগ্রহণ করেছে। কাল যখন মুকাবিলা হবে, তখন বুঝা যাবে আমাদের মধ্যে যুদ্ধে কে নিহত হয়।[৪]

হযরত লাব্বাস ও হযরত আদী (রা), যাঁদেরকে নবী (সা) আবূ সুফিয়ানের কাফেলার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা বদরে পৌঁছে টিলার নিচে একটি ঝর্ণায় নিজেদের উট নিয়ে গেলে সেখানে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখা গেল। ওদের একজন অপরজনকে ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিচ্ছিল। তখন ঋণ গ্রহীতা মহিলা বলল, কাল অথবা পরশু কুরায়শের কাফেলা সিরিয়া থেকে আসছে। সে সময় মজুরী করে যা উপর্জন করব, তা দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করব।

মাজদী ইবন আমর জুহানীও এ সময় ঝর্ণার কাছে উপস্থিত ছিল এবং সমুদয় কথোপকথন শুনছিল। ঋণ গ্রহীতা মহিলা যখন ঋণদাত্রী মহিলার উদ্দেশ্যে বলতে শুনল যে, কাল অথবা পরশু কুরায়শের কাফেলা সিরিয়া থেকে আসছে, সে সময়

১. মুস্তাদরাকে হাকিম, ৩খ. পৃ. ১৯; মাজমুয়াউয যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ. ৭১।

২. আল-হাদিয়াতুত তাহাতিয়া, ৩খ. পৃ. ২৫৮।

৩. আল-ইসাবা, ৪খ. পৃ. ৩৫৭।

৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৬৫; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ২৫।

মজুরী করে যা উপার্জন করব, তা দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করব, তখন ঋণদাত্রী মহিলা বলল, ঠিক আছে। এরপর দু'জনের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়ে সে চলে গেল। হযরত লাব্বাস ও হযরত আদী (রা) এ কথা শোনামাত্র উটে আরোহণ করলেন এবং নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন।

হযরত লাব্বাস ও হযরত আদী (রা) চলে যাওয়ার পর আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গতিবিধির সংবাদ নেয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হন এবং মাজদী ইবন আমরকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি কাউকে এখানে আসা যাওয়া করতে দেখেছ ?

মাজদী বলল, কাউকে দেখিনি, কেবল দু'জন আরোহীকে দেখেছি, যারা এ টিলার নিচে এসে উটকে বসায় ও পানি পান করায় এবং মশকে পানি ভরে নিয়ে চলে যায়। আবূ সুফিয়ান দ্রুত ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং কিছু উটের মল পড়ে থাকতে দেখেন। এক টুকরো মল নিয়ে ভেঙে এর মধ্যে একটা খেজুরের বীচি দেখতে পান।

আবূ সুফিয়ান এ বীচি দেখে বললেন, আল্লাহর কসম, এটা ইয়াসরিবের (মদীনার) খেজুর বীচি। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কাফেলার পথ পরিবর্তন করে দেন। আর আরব উপসাগরের উপকূল পথ দিয়ে কাফেলাকে নিরাপদে নিয়ে যান এবং কুরায়শের নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করেন যে, انكم انما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم واموالكم قد نجاها الله فارجعوا "তোমরা তো এ উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলে যে, নিজেদের কাফেলা, লোকজন ও ধন-সম্পদকে রক্ষা করবে। আল্লাহ্ সব কিছু রক্ষা করেছেন। কাজেই তোমরা সবাই মক্কায় ফিরে যাও।"

আবূ জাহল বলল, আমরা বদরে পৌঁছে যতক্ষণ না তিনদিন পর্যন্ত খানাপিনা, গান-বাজনা করে ফূর্তি করব, তার আগে কিছুতেই মক্কায় প্রত্যাবর্তন করব না।

বনী যাহরার সর্দার আখনাস ইবন শুরায়ক বলল, ওহে বনী যাহরা! তোমরা তো কেবল নিজেদের সম্পদ রক্ষার জন্য বের হয়েছিলে। আর আল্লাহ্ তোমাদের মাল রক্ষা করেছেন। এখন আর আমাদের যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অপ্রয়োজনে ধ্বংসের মুখে পড়ার আমাদের দরকার কি ? যেমন এ ব্যক্তি (আবূ জাহল) বলছে। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। বনী যাহরা গোত্র তাদের সর্দার আখনাস ইবন শুরায়কের পরামর্শে ফিরে গেল এবং বনী যাহরার কোন ব্যক্তিই বদরে অংশগ্রহণ করেনি। আর অপর কেউ কেউ এমনটিও বলেছিল যে, আমাদের কাফেলা যখন নিরাপদে রক্ষা পেয়েছে, তা হলে এখন আর যুদ্ধের প্রয়োজন কি। কিন্তু আবূ জাহল কোন কিছুই শুনল না এবং বদর প্রান্তর অভিমুখে যাত্রা করল।[১]

এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীগণসহ বদরে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু কুরায়শগণ তাঁদের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে পানির ঝর্ণা দখল করে নেয় এবং নিজেদের জন্য উপযুক্ত জায়গা বেছে নেয়। মুসলমানগণের অবস্থা ছিল এর বিপরীত। না পানি পেলেন আর না মনমত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন। ময়দান ছিল

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৪; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৬৬।

বালুকাময়, যেখানে চলাফেরা করাই দুষ্কর। চলতে গেলেই বালুতে পা বসে যেত। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। ফলে সকল বালু জমে গেল। আর মুসলমানগণ ছোট ছোট হাউয বানিয়ে বৃষ্টির পানি ধরে রাখলেন, যাতে তাদ্বারা উযূ-গোসলের কাজ সারতে পারেন। সূরা আনফালে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ অনুগ্রহের উল্লেখ করেছেন :

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۔

"এবং (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের থেকে শয়তানের অপবিত্রতা অপসারণ, তোমাদের অন্তর দৃঢ় ও পাসমূহ স্থির রাখার জন্য আসমান থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করেন।" (সূরা আনফাল : ১১)

এ পানি মুসলমানগণ যদিও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য রেখেছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর জন্য রহমত, দয়ার্দ্রচিত্ত মহানবী (সা) এ পানি স্বীয় রক্তপিপাসু শত্রুদের পান করারও অনুমতি দান করেন।

যখন রাত এল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কুরায়শদের অবস্থা জানার জন্য হযরত আলী, হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম, হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-সহ কতিপয় সাহাবীকে প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে দু'টি গোলাম এসে পড়ে। তাঁরা তাদের বন্দী করে আনেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন নামায পড়ছিলেন। ঐ গোলাম দু'টি বলল, আমরা কুরায়শদের পানির দয়িত্বে নিয়োজিত, পানি সংগ্রহের জন্য বেরিয়েছি। তাঁরা এদের কথা খুব একটা বিশ্বাস করলেন না। কাজেই এদেরকে খানিকটা প্রহার করা হলো, যাতে ভয়ে তারা আবূ সুফিয়ানের সন্ধান দেয়। মার খেয়ে তারা বলল, আমরা আবূ সুফিয়ানের লোক। এ কথা শুনে তাঁরা মার থেকে বিরত হলেন।

নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ গোলাম দু'টি যখন সত্য বলছিল, তখন তোমরা তাদের মারছিলে, আর যখন মিথ্যে বলল, তখন ছেড়ে দিলে! আল্লাহর কসম, এর কুরায়শের লোক (অর্থাৎ আবূ সুফিয়ানের সঙ্গী-সাথী নয়)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুরায়শরা কোথায় ? গোলাম দু'টি বলল, আল্লাহর কসম, ওরা ঐ মুকানকাস টিলার পেছনে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ওদের লোকসংখ্যা কত ? গোলাম দু'টি বলল, ওদের সংখ্যা আমরা জানি না। তিনি বললেন, প্রতিদিন খাওয়ার জন্য ক'টি উট যবেহ করে ? জবাব দিল, একদিন নয়টি, আরেক দিন দশটি। তিনি বললেন, তা হলে ওদের সংখ্যা নয়শত থেকে হাজারের মাঝামাঝি হবে।

এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, কুরায়শ সর্দারদের মধ্যে কে কে আছে ? ওরা বলল, রবীআর দুই পুত্র উতবা এবং শায়বা, আবুল বুখতারী ইবন হিশাম, হাকিম ইবন হিযাম, নাওফেল ইবন খুয়ায়লিদ, হারিস ইবন আমির, তাইমা ইবন আদী, নযর

ইবন হারিস, যামআ ইবন আসওয়াদ, আবূ জাহল ইবন হিশাম, উমায়্যা ইবন খালফ, হাজ্জাজের দু'পুত্র নবীয়া ও মনীয়া, সুহায়ল ইবন আমর এবং আমর ইবন আবদুদ। এ কথা শুনে তিনি সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, মক্কা নিজের কলিজার টুকরোগুলোকে আজ তোমাদের প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছে। মোটকথা, এভাবে তিনি কুরায়শদের অবস্থা জেনে নিলেন।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

প্রভাত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর অবস্থানের জন্য টিলার ওপরে একটি ছাউনী প্রস্তুত করালেন।

ان سعد معاذ رضى الله عنه قال يا نبى الله الانبى لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائيك ثم نلقى عدونا فان اعزنا الله واظهرنا كان ذالك ما احبينا وان كانت الاخرى جلست على ركانبك فلحقت بمن ورائنا من قومنا فقد نخلف عنك اقوام يا نبى الله ما نحن باشد لك حبا منهم ولو ظنوا انك تلقى حرباما تخلفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحون ويجاهدون معك فاعنى عليه رسول ﷺ الله خيرا ودعاله بخير ثم بنى لرسول ﷺ الله عريش فكان فيه ·

"হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য টিলার ওপরে একটি ছাউনী প্রস্তুত করব না ?—যাতে আপনি অবস্থান করবেন এবং সওয়ারীসমূহ আপনার কাছাকাছি প্রস্তুত রাখবেন ? আর আমরা গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করব। এরপর যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে সম্মান দান করেন এবং শত্রুর ওপর বিজয়ী করেন, তা হলে সেটাই হচ্ছে আমাদের সুপ্রিয় প্রত্যাশা। আর আল্লাহ্ না করুন, ফলাফল যদি এর বিপরীত হয়, তা হলে আপনি দ্রুত সওয়ারীতে আরোহণ করে আমাদের অবশিষ্ট লোকজনের সাথে গিয়ে মিলিত হবেন। সম্প্রদায়ের যে সমস্ত লোক পেছনে রয়ে গেছে, হে আল্লাহর নবী! তারা যদি কোন প্রকারে এটা বুঝতে পারত যে, আপনাকে আমরা তাদের চেয়ে বেশি মহব্বত করি না,[১] আপনাকে যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে, তা হলে তারা অবশ্যই পেছনে থাকত না। সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাধ্যমে আপনার হিফাযত করবেন এবং তারা খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার পক্ষে যুদ্ধ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সা'দ ইবন মু'আযের প্রশংসা করলেন এবং তাঁর জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন। এরপর তাঁর জন্য একটি ছাউনী নির্মাণ করা হলো যাতে তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন।"

১. এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের নিষ্ঠা যে, সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভালবাসা এবং নিষ্ঠার দরুন কেবল মুখেই নয়, বরং অন্তর দিয়ে ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ। অপরের ভালবাসাকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া এটা চরমতম ভালবাসারই প্রমাণ।

এ ছাপড়া ঘর এমন উঁচু এক টিলার ওপর নির্মাণ করা হয়েছিল, যেখান থেকে সম্পূর্ণ ময়দান নজরে আসত।

হযরত আনাস[১] (রা) হযরত উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, যেদিন সকালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা, তার পূর্বরাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে গেলেন, যাতে মক্কাবাসীদের নিহত হওয়ার স্থানসমূহ আমরা সচক্ষে দেখতে পারি। সুতরাং তিনি আমাদেরকে পবিত্র হাত দিয়ে ইশারা করছিলেন এবং বলছিলেন, هذا مصرع فلان غدا انشاء الله "এটা ইনশা আল্লাহ আগামীকাল অমুকের নিহত হওয়ার স্থান।" এভাবে তিনি সংশ্লিষ্ট স্থানে হাত রেখে প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে সাহাবীগণকে দেখাচ্ছিলেন। আল্লাহর কসম, যিনি তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এদের কোন একজনও সেই নির্ধারিত স্থানের বাইরে নিহত হয়নি, তিনি যে স্থান স্বহস্তে দেখিয়েছিলেন (মুসলিম, باب ذكر النبى ﷺ من يقتل ببدر অধ্যায়)।[২]

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর গুহার সঙ্গী, নিবেদিতপ্রাণ বন্ধু, মুহাজির শ্রেষ্ঠ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ঐ ছাপড়া ঘরে[৩] প্রবেশ করলেন এবং দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। আর পরম সত্যনিষ্ঠ আনসারী সাহাবী হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তরবারি হাতে ছাপড়া ঘরটির দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন।[৪]

হযরত আলী (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের পূর্বরাত্রে আমাদের কেউই এমন ছিল না-যে ঘুমায়নি। একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-ই সারারাতব্যাপী দু'আ এবং কান্নাকাটিতে অতিবাহিত করেন। এমনকি এভাবে প্রভাত হয়ে যায় (তাবারানী, ইবন জারীর, ইবন খুযায়মা প্রমুখ বর্ণিত)।

প্রভাত হওয়ামাত্রই তিনি ঘোষণা করলেন, "ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! নামাযের সময় সমাগত।" ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সবাই একত্রিত হয়ে গেলেন। নবী (সা) একটি বৃক্ষের গোড়ায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ালেন এবং নামায শেষে আল্লাহর রাস্তায় বীরত্ব প্রদর্শন এবং আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করে উদ্দীপনামূলক ভাষণদান করলেন (ইবন আবূ শায়বা, আহমদ, ইবন জারীর হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং একে সহীহ বলেছেন; মুনতাখাবু কানযুল উম্মাল, ৪খ. পৃ. ৯৮)।

১. বিশুদ্ধ সনদে মুসনাদে আহমদ হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কোন ব্যক্তি হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন ? জবাবে তিনি বললেন, আমি বদর থেকে কোথায় উধাও হয়ে থাকতে পারতাম ? হযরত আনাস (রা) নবী (সা)-এর খিদমত করার জন্য তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন কিন্তু অল্পবয়স্ক হওয়ার দরুন তাঁকে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। এ সময় তাঁর বয়স ছিল দশ অথবা এগার বছর। এর ফলে বদরে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে তাঁকে গণনা করা হয়নি। যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৩৪

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৩১০ ও ৪৩৪।

৩. এ ছাপড়া ছিল খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি। তাবাকাতে ইবন সা'দ

৪. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৯।

এরপর তিনি সাহাবীগণকে সারিবদ্ধ করলেন। অপরদিকে কাফিরদের সারি প্রস্তুত ছিল। পবিত্র রমযান মাসের সতের তারিখ জুমুআর দিন একদিকে সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহী দল, অপরদিকে হচ্ছে বাতিলের ধ্বজাধারী বাহিনী, এ দু'টি দল পৃথকীকরণের ময়দানের[১] দিকে অগ্রসর হলো।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পূর্ণ যুদ্ধ প্রস্তুতিসহ কাফিরদের বিশাল বাহিনীকে যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর হতে দেখলেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে এ বলে প্রার্থনা করছিলেন যে,

اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسول لك اللهم فنصرك الذى وعدتنى اللهم احنهم الغداة ۰

"হে আল্লাহ্! এটা কুরায়শের দল, যারা অহংকার ও দাম্ভিকতা সহকারে মুকাবিলা করতে এসেছে। এরা আপনার বিরোধিতা করে, আপনার রাসূলকে অস্বীকার করে। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করুন, আপনি যার ওয়াদা করেছেন। হে আল্লাহ্! ওদেরকে ধ্বংস করে দিন।" (সীরাতে ইবন হিশাম, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اذ تستغيثون ربكم ... ... شديد العقاب অধ্যায়)

এরপর তিনি মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত ও সারিবদ্ধ করেন। এ সময় তাঁর হাতে একটি তীর ছিল। সারি থেকে হযরত সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যা (রা) সামান্য সামনে ছিলেন। তিনি শেখানোর উদ্দেশ্যে সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যার পেটে তীর দ্বারা হালকাভাবে খোঁচা দিয়ে বললেন, استو باسواد "ওহে সাওয়াদ, সারি বরাবর সোজা হয়ে দাঁড়াও।"

সাওয়াদ (রা) আরয করলেন, يا رسول الله ارجعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقدنى "ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে আঘাত করেছেন, আর অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সত্য ও ন্যায়সহ প্রেরণ করেছেন। কাজেই আমাকে এর বদলা গ্রহণের সুযোগ দিন।"

নবী (সা) স্বীয় পেট থেকে কাপড় উঠিয়ে বললেন, বদলা নাও।

সাওয়াদ (রা) পবিত্র পেটে গলা লাগান ও চুমো দেন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্ভবত এটাই শেষ মুলাকাত। রাসূলুল্লাহ (সা) এতে আনন্দিত হন এবং হযরত সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যা (রা)-এর জন্য কল্যাণের দু'আ করেন। [ইসাবা, হযরত সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যা আনসারী (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যায়]

---

১. আল্লাহ্ তা'আলা বদরের দিনকে 'ইয়াওমুল ফুরকান' (পৃথকীকরণের দিন) বলেছেন। অর্থাৎ দিনটি ছিল হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। এর অনুকরণে অধম (লেখক) এ ময়দানকে ময়দানে ফুরকান বলে আখ্যায়িত করেছে। কেননা এ ময়দানেই সত্যের আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামী বাহিনীকে বিন্যস্ত এবং তাঁদের কাতারকে ফেরেশতাদের কাতারের মত সুশৃংখল করে ছাপড়া ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেন। কেবল আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর সহগামী হন এবং হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তরবারি হাতে ছাপড়ার দরজায় দণ্ডায়মান হন।

হযরত আবূ মিহজান সাকাফী বলেন :

وسميت صديقا وكل مهاجر * سواك يسمى باسمه غير منكر
سبقت الى الاسلام والله شاهد * وكنت جليسا بالعريش المشهر
وبالغار اذ سمعيت بالغار صاحب * وكنت رقيقا للنبى المطهر

"আপনার নাম সিদ্দীক রাখা হয়েছে এবং সমস্ত মুহাজিরকে এ নাম ছাড়া অন্যান্য নামে ডাকা হয়। আপনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী এ মর্মে আল্লাহ্ সাক্ষী, আর আপনিই ছাপড়ায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। অনুরূপভাবে আপনি হেরা গুহায়ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলেন। এজন্যে আপনাকে 'গুহার বন্ধু' বলা হয়।" [ইবন আবদুল বার প্রণীত আল-ইসতিয়াব, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জীবন চরিত]

কুরায়শগণ যখন নিশ্চিন্ত হলো, তখন যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে উমায়র ইবন ওহাব জুমাহীকে মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে ধারণালাভের জন্য প্রেরণ করল। উমায়র ইবন ওহাব ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম বাহিনীর আশেপাশে চক্কর দিয়ে ফিরে এসে বলল, কমবেশি তিনশ' লোক হবে; তবে আমাকে আর একটু সময় দাও, আবার দেখে আসি, মুসলমানদের সাহায্যে আর কোথাও কোন বাহিনী লুকিয়ে আছে কি না। সুতরাং উমায়র পুনরায় ঘোড়ায় সওয়ার হল এবং দূরদরাজ পর্যন্ত চক্কর দিয়ে এসে বলল, কোন ওঁতপাতা গুপ্ত বাহিনী অথবা সাহায্য করার মত কেউ নেই। কিন্তু ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! মদীনার উট নিজেদের নিহত হওয়াকে আবশ্যিক করে নিয়েছে, ওদের নিজেদের তরবারি ছাড়া আর কোন আশ্রয় কিংবা সাহায্যকারীও নেই। আল্লাহর কসম, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ আঘাতকারীকে হত্যা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কখনো মরতে চাইবে না। আমাদের লোকজনও যদি ওদের মতই মারা যায়, তা হলে জীবনের সাধ-আহলাদ কোথায় রইল ? ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও।

হাকিম ইবন হিযাম বলল, একদম সত্যি কথা। আর সে উঠে উতবার কাছে গেল এবং বলল, ওহে আবুল ওয়ালীদ! আপনি কুরায়শদের সর্দার এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আপনি কি এটা পসন্দ করেন না যে, সব সময় আপনার নাম উত্তম ও কল্যাণকর কাজের সাথে উল্লেখ করা হোক ? উতবা বলল, কি ব্যাপার ? হাকিম বলল, লোকজনকে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন এবং আমর ইবন হাযরামীর রক্তপণ নিজ যিম্মায় নিয়ে নিন। উতবা বলল, আমি আমর ইবন হাযরামীর রক্তপণ বা দিয়াত নিজ

যিম্মাদারীতে নিলাম কিন্তু তোমরা আবূ জাহলের সাথেও পরামর্শ কর। এরপর সে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত ভাষণ দিল :

যুদ্ধের ময়দানে উতবার ভাষণ

"ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ ও তার সাথীদের সাথে যুদ্ধ করে তোমাদের কোন লাভ হবে না। এরা সবাই তোমাদের নিকটাত্মীয়। ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, তোমরা নিজেদের পিতা, ভ্রাতা, চাচাত ভাই ও মামাত ভাইদের দেখতে থাকবে। কাজেই মুহাম্মদ এবং আরবদের ছেড়ে দাও। যদি আরববাসী মুহাম্মদকে খতম করে দেয়, তা হলে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। আর আল্লাহ্ যদি তাদের বিজয় দান করেন, তা হলে তা-ও তোমাদের জন্য সুনাম ও মর্যাদার কারণ হবে। কেননা তিনি তো তোমাদেরই সম্প্রদায়ের (তাঁর বিজয় তোমাদেরই বিজয়)। দেখ, আমার উপদেশকে গুরুত্ব দাও এবং আমাকে মূর্খ ও নির্বোধ সাব্যস্ত করো না।"

হাকিম ইবন হিযাম বলেন, আমি আবূ জাহলের কাছে এলাম। আর ঐ সময় সে বর্ম পরিধান করে অস্ত্র সজ্জিত হচ্ছিল। আমি বললাম, উতবা আমাকে এ প্রস্তাব দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

এ কথা শোনামাত্র আবূ জাহল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল এবং বলল, উতবা এজন্যেও যুদ্ধ পরিহার করতে চাচ্ছে যে, তার পুত্র আবূ হুযায়ফা মুসলমানদের সাথে আছে, তার গায়ে যেন আঁচড় না লাগে। আল্লাহর কসম, আমরা কক্ষণই ফিরে যাব না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিচ্ছেন। আর আমর ইবন হাযরামীর ভাই আমির ইবন হাযরামীকে ডেকে বলল, তোমাদের মিত্র উতবা লোকদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, আর তোমার ভাইয়ের রক্ত তো তোমার চোখের সামনেই। আমির এ কথা শোনামাত্রই হায় আমর, হায় আমর বলে চিৎকার করতে শুরু করল। ফলে পুরো বাহিনীতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হল এবং সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।[১]

দ্রষ্টব্য : আমর ইবন হাযরামীর রক্তের বদলার কথা আবূ জাহল কেবল লোকদেরকে উস্কিয়ে দেয়ার জন্যই বলত। প্রকৃত উদ্দেশ্য, যার জন্য কুরায়শ মক্কা থেকে বের হয়েছিল, তা ছিল বাণিজ্য কাফেলার হিফাযত করা। যখন কাফেলা রক্ষা পেল, তখন লোকজন যুদ্ধের প্রতি উৎসাহী ছিল না এবং পদে পদে প্রত্যাবর্তনের বিষয় আলোচনায় আসছিল। কাজেই কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা যে, কুরায়শ শুধু আলা ইবন হাযরামীর রক্তের বদলা নেয়ার জন্যই মদীনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল, এটা নিতান্তই ভুল ধারণা, সমস্ত বর্ণনা এর বিপরীত।

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১৬; সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৬।

যুদ্ধের সূচনা

আবূ জাহলের তিরস্কারমূলক কথাবার্তার প্রভাব এই দাঁড়াল যে, উতবাও অস্ত্র সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। মুশরিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম উতবা ইবন রবীআই তার ভাই শায়বা ইবন রবীআ এবং পুত্র ওলীদকে নিয়ে ময়দানে আসে এবং উচ্চস্বরে যুদ্ধের জন্য প্রতিপক্ষকে আহ্বান করে।

ইসলামী বাহিনী থেকে তিন ব্যক্তি, হারিসের পুত্র আওফ ও মাউয[1] এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) মুকাবিলা করতে বের হন।

উতবা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে ? তাঁরা বললেন, رهط من الانصار অর্থাৎ "আমরা আনসার গোত্রের।" উতবা বলল, مالنا بكم من حاجة "তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, আমরা তো আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে চাই।"

সঙ্গীরা ধ্বনি দিয়ে উঠল, يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قومنا "ওহে মুহাম্মদ! আমাদের সাথে লড়াই করার জন্য আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিপক্ষকে প্রেরণ কর।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের নির্দেশ দিলেন যে, নিজেদের সারিতে প্রত্যাবর্তন কর এবং হযরত আলী, হযরত হামযা এবং হযরত উসমান ইবন হারিস (রা)-কে ওদের এক-একজনের সাথে মুকাবিলা করার জন্য আদেশ করলেন।

আদেশ অনুযায়ী এ তিনজন মুকাবিলার জন্য বের হলেন। মুখের ওপর যেহেতু পর্দা ছিল, সুতরাং উতবা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে ? উবায়দা বললেন, আমি উবায়দা, হামযা বললেন, আমি হামযা এবং আলী বললেন, আমি আলী। উতবা বলল, نعم اكفاء كرام "হ্যাঁ, তোমরা আমাদের সমকক্ষ এবং সম্মানিত ব্যক্তি।"

ইবন সা'দের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

قوموا يا بنى هاشم بحقكم الذى بعث الله به بنبيكم اذجاؤا بباطلهم ليطفؤا نور الله .

---

১. আওফ এবং মাউযের পিতার নাম হারিস এবং মাতার নাম আফরা। আফরাও সাহাবী ছিলেন। হাফিয আসকালানী বলেন, আফরা (রা)-এর মধ্যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যা আর কোন মহিলা সাহাবীর মধ্যে পাওয়া যায় না। তা হলো, আফরা (রা)-এর প্রথম বিবাহ হারিসের সাথে হয়েছিল। হারিসের ঘরে তাঁর তিন পুত্র ছিলেন, আওফ, মাউয এবং মু'আয (রা)। এরপর বুকায়র ইবন ইয়ালীলের সাথে তাঁর পুনর্বিবাহ হয়। সেখানে তাঁর চার পুত্র ইয়াস, আকিল, খালিদ এবং আমির (রা) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সাত পুত্রের, তিনজন প্রথম স্বামীর এবং চারজন দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষের, সবাই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এমন কোনই মহিলা সাহাবী ছিলেন না, যাঁর সাত পুত্রই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কেবল হযরত আফরা (রা) ছাড়া। যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১৬।

"ওহে বনী হাশিম! ঐ সত্যের জন্য দণ্ডায়মান হও যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীকে প্রেরণ করেছেন। এরা অসত্য দ্বারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে এসেছে।"

উতবা, শায়বা এবং ওলীদ হত্যার বর্ণনা

অতঃপর যুদ্ধ শুরু হলো। উবায়দা[১] (রা) উতবার বিরুদ্ধে, হামযা (রা) শায়বার বিরুদ্ধে এবং আলী (রা) ওলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন।

হযরত আলী ও হযরত হামযা তো প্রথম আক্রমণেই নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করে ফেললেন কিন্তু উবায়দা (রা) নিজেও আহত হলেন এবং প্রতিপক্ষকেও আহত করলেন। শেষ পর্যন্ত উতবা হযরত উবায়দাকে তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করল যে, হযরত উবায়দা (রা)-এর পা কেটে গেল। হযরত আলী এবং হযরত হামযা (রা) নিজ নিজ প্রতিপক্ষকে খতম করে হযরত উবায়দার সাহায্যার্থে উপস্থিত হলেন এবং উতবাকে হত্যা করলেন। তারা উবায়দা (রা)-কে উঠিয়ে নবী (সা)-এর সামনে নিয়ে এলেন। হযরত উবায়দার পায়ের গোছার হাড় থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি শহীদ ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উবায়দা (রা) বললেন, আজ যদি আবূ তালিব জীবিত থাকতেন, তা হলে বুঝতেন যে, এ কবিতার আমরাই অধিক হকদার :

ونسلم حتى تصرع حوله * ونذهل عن ابنائنا والحلائل

"আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে তখনই শত্রুর হওলা করে দিতে পারি যখন আমাদের সবাইকে তাঁর পূর্বেই হত্যা করা হবে। আর যখন আমরা নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে বেখবর হয়ে পড়ি।"[২]

---

১. এটা মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের বর্ণনা যে, উবায়দা উতবার বিরুদ্ধে এবং হামযা শায়বার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। কিন্তু মূসা ইবন উকবার বর্ণনা এর বিপরীত যে, উবায়দার সঙ্গে শায়বার এবং হামযার সঙ্গে উতবার মুকাবিলা হয়েছিল। সমস্ত সীরাত গ্রন্থের বর্ণনায় এ ব্যাপারে ঐকমত্য পাওয়া যায় যে, হযরত আলী ওলীদের মুকাবিলা করেছেন। কিন্তু আবূ দাউদের এক সহীহ সনদযুক্ত বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত আলী শায়বার প্রতিপক্ষ ছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ফাতহুল বারী (৭খ. পৃ. ২২৬) গ্রন্থের 'নবী (সা)-এর দু'আ এবং কাতলে আবূ জাহল' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১৭।

২ এক বর্ণনায় আছে, যখন সাহাবায়ে কিরাম হযরত উবায়দার এ অবস্থা দেখলেন, তখন তাঁকে নবী (সা) সমীপে উপস্থিত করলেন। উবায়দা (রা) আপন গণ্ডদেশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পায়ে রেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ তালিব যদি জীবিত থাকতেন এবং আমাদেরকে দেখতেন, তা হলে জানতে পারতেন যে, তাঁর চেয়ে আমরাই এ কবিতার অধিক হকদার। এরপর তিনি ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : اشهد انك شهيد। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তুমি শহীদ।" আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৭৪, ইমাম শাফিঈ (র) কর্তৃক বর্ণিত।

এরপর তিনি এ কবিতা পাঠ করেন :

فان يقطعوا رجلى فانى مسلم * ارجى عيشا من الله عاليا

"যদিও কাফিরগণ আমার পা কেটে নিয়েছে, কিন্তু এতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ আমি মুসলিম, এর বিনিময়ে আমি আল্লাহ' তা'আলার কাছে উচ্চতর জীবনের আশা রাখি।" অর্থাৎ পা কেটে যাওয়ায় এ নশ্বর দুনিয়া কেটে গেছে, কিন্তু এর বিনিময়ে এমন অবিনশ্বর জীবন পাওয়া যাবে যা কখনো কর্তিত হবে না।

واليسنى الرحمن من فشل منه * لباسا من الاسلام غطى المساويا

"আর কেনই বা আশা করব না, পরম দয়ালু আল্লাহই তো শুধু তাঁর অনুগ্রহে আমাকে ইসলামের পোশাক পরিয়েছেন, যা সমস্ত কদর্যকে ঢেকে দিয়েছে।"

মনে হয়, যে শরীরে ইসলাম এবং আল্লাহ্-ভীতির পোশাক নেই, তা উলঙ্গ ও বিবস্ত্র। দৃশ্যমান জগদ্বাসী যদিও এ উলঙ্গপনাকে অনুভব করতে না পারে, অদৃশ্য জগতের অধিবাসিগণ এ উলঙ্গপনাকে অবশ্যই অনুভব করতে সক্ষম হবেন। হাফিয ইবন আবদুল বার বলেন, হযরত লবীদ (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন এ কবিতা বললেন :

الحمد لله اذلم ياتنى اجلى * حتى اكتسيْتُ من الاسلام سربالا

এ কবিতাও এরই সমার্থক, যদি দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকা না থাকত, তা হলে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আরো কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতাম। বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সামান্য মনোযোগেই অনুভব করতে পারবেন।

দ্রষ্টব্য : উতবা এবং শায়বা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ থেকে এজন্যে বেঁচে থাকতে চাচ্ছিল যে, প্রথমত তারা আতিকা এবং পরে জুহায়ম ইবন সালতের স্বপ্নের কারণে উদ্বিগ্ন ছিল। এছাড়াও যখন তারা মক্কা থেকে রওয়ানা হচ্ছিল, তখন এ সমস্যার হয়েছিল যে, হযরত আদ্দাস (রা) (যিনি উতবা ও শায়বার গোলাম ছিলেন এবং তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে খৃস্টধর্ম থেকে তওবা করে মুসলমান হয়েছিলেন), যখন উতবা ও শায়বা বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিল, তাদের পা ধরে বলেছিলেন : بابى وامى انتما والله انه الرسول الله وما تساقان الا الى مصار عكما "আমার পিতামাতা আপনাদের প্রতি উৎসর্গ হোক, আল্লাহর কসম, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। আর আপনারা কেবল নিজেদের নিহত হওয়ার স্থানের দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন।"

এরপর তিনি কেঁদে ফেললেন। আস ইবন শায়বা হযরত আদ্দাস (রা)-কে কাঁদতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে আদ্দাস (রা) বললেন, আমি আমার মুনিবদের কারণে কাঁদছি যে, তারা উভয়ে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। আস প্রশ্ন করল, সত্যিই কি তিনি আল্লাহর রাসূল ? আদ্দাস কেঁপে উঠলেন এবং বললেন : اى والله انه لرسول الله الى الناس كافة "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল যিনি সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।"

আদ্দাস (রা)-এর এ বক্তব্য উতবা ও শায়বার মনে গেঁথে গিয়েছিল যে, এরা সবাই এখানে নিহত হবে। এজন্যে উতবা এবং শায়বা যুদ্ধ থেকে বেঁচে থাকতে চাচ্ছিল। শুধু আবূ জাহলের ভর্ৎসনার কারণে উতবা ও শায়বা সর্বাগ্রে অগ্রসর হয়েছিল। আবূ জাহল বার বার উতবা ও শায়বাকে কাপুরুষতা ও ভীরুতার অপবাদ দিচ্ছিল, ফলে এরা দু'জন সর্বপ্রথম যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়, যাতে কাপুরুষতা ও ভীরুতার অপবাদ দূরীভূত হয়। হযরত আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য নিজেদের তীর বাঁচিয়ে রাখবে। যখন কাফির তোমাদের ওপর চড়াও হবে এবং নিকটে পৌঁছে যাবে, তখন তীর নিক্ষেপ করবে। (বুখারী শরীফ, বদর যুদ্ধ অধ্যায়)

মহানবী (সা) কর্তৃক বিজয়লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা

উতবা ও শায়বা নিহত হওয়ার পর যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ (সা) ছাপড়া ঘর থেকে বের হলেন এবং সারিগুলোকে সুবিন্যস্ত ও বিস্তৃত করলেন এবং এরপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সাথে নিয়ে ছাপড়ায় ফিরে গেলেন। আর হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তরবারি নিয়ে ছাপড়ার দরজায় দণ্ডায়মান হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নিজ সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যাল্পতা ও যুদ্ধ-উপকরণ ঘাটতি এবং শত্রুর শক্তি ও সংখ্যাধিক্য দেখলেন, তখন নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দু'রাকাআত নামায আদায় করে তিনি প্রার্থনায় নিমগ্ন হলেন। তখন তিনি এ দু'আ করছিলেন : اللهم انى انشرك عهدك ووعدك اللهم ان شئت لم تعبد "হে আল্লাহ্! আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা পূর্ণ করার আবেদন করছি। আয় আল্লাহ্ আপনি কি চান যে, আপনার উপাসনা না করা হোক ?"

নবী করীম (সা)-এর মধ্যে বিনয়নম্রতা ও শিষ্টাচারের এক বিশেষ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। কখনো সিজদায় পড়ে আকুল কণ্ঠে ফরিয়াদ করছিলেন, কখনো বা দু'হাত তুলে সাহায্যপ্রার্থী ও ভিক্ষুকের ন্যায় বিজয় ও সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছিলেন। তখন তিনি এতই আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর কাঁধ থেকে চাদর বার বার পড়ে যাচ্ছিল।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করলাম এবং পরে নবী (সা)-এর নিকট এলাম। দেখলাম, তিনি সিজদারত অবস্থায় 'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম' বলছেন। এ অবস্থা দেখে আমি ফিরে এলাম এবং পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হলাম। কিছুক্ষণ পর আবার তাঁর কাছে এসে একই অবস্থা দেখতে পেলাম। তিনবার তাঁকে একই অবস্থায় পেলাম। চতুর্থবার আল্লাহ্ তাঁকে বিজয় দান করেন। (নাসাঈ ও হাকিম বর্ণিত, ফাতহুল বারী, اذ تستغيثون ربكم ... ... شديد العقاب অধ্যায়)

সহীহ মুসলিমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, যখন বদরের দিন এলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা) দেখলেন, মক্কার মুশরিকের সংখ্যা এক হাজার এবং তাঁর সাহাবীর

সংখ্যা তিনশ' থেকে কিছু বেশি, তখন তিনি ছাপড়ায় ফিরে এলেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন :

اللّٰهم انجزلى ما وعدتنى اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لاتعبد فى الارض -

"আয় আল্লাহ্! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করুন। আয় আল্লাহ্! যদি মুসলমানদের এ দল ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে পৃথিবীতে আর আপনার উপাসনা হবে না।"

যেহেতু তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াত ধারার পরিসমাপ্তি এবং এ উম্মত সর্বশেষ উম্মত, আল্লাহ্ না করুন, যদি তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ ধ্বংস হয়ে যান, তা হলে এ পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য অবশিষ্ট কেউ থাকবে না। অধিকন্তু এ দু'আ থেকে এটাও জানা যায় যে, বিজয় ও সাফল্য অর্জনের জন্য এ দু'আ কেবল মুসলমানদের প্রাণ রক্ষার জন্যই ছিল না, বরং তা ছিল এজন্যে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার উপাসনার ধারা অব্যাহত থাকুক। এমটি যেন না হয় যে, পৃথিবী আল্লাহর উপাসনা থেকে শূন্য হয়ে যায়।

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হাত তুলে তিনি এ প্রার্থনা করতে থাকেন যে, আয় আল্লাহ! যদি এ দল ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত হবে না। এ অবস্থায় চাদর তাঁর ঘাড় থেকে পড়ে যায়।

হযরত আবূ বকর (রা) চাদরটি তাঁর ঘাড়ে উঠিয়ে দেন এবং পেছন থেকে এসে তাঁর কোমর ঝাঁপটে ধরেন। এটা সহীহ মুসলিমের বর্ণনা। বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে যে, আবূ বকর (রা) তাঁর হাত ধরে ফেললেন এবং আরয করলেন, "ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে, আপনি আল্লাহর দরবারে খুবই অনুনয় বিনয় করেছেন (দু'আ কবূল হয়েছে)।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টি মহান আল্লাহর বিশাল ক্ষমতা, শক্তি, মর্যাদা, ধনাঢ্যতা ও অমুখাপেক্ষিতার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : اِنَّ اللّٰه لغنىٌّ عن الْعَالَمِيْنَ। "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টি জগতের অমুখাপেক্ষী।" আল্লাহ্ আরো বলেছেন : وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ "আর আল্লাহ্ই ধনাঢ্য ও প্রশংসিত, তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের ধ্বংস করতে পারেন।" এর ফলে রাসূল (সা)-এর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর এ ব্যাকুলতা ও বিহ্বলতাপূর্ণ বিনয়-নম্রতা দেখে হযরত আবূ বকর (রা)-এর এ বিশ্বাস হয়েছিল যে, তাঁর দু'আ কবূল হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ٠

"বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে আর বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব (খিলাফত) প্রদান করেন।" (সূরা নামল : ৬২)

---

১. দু'আর ফলে রণাঙ্গণের অবস্থা অনুকূলে দেখে হযরত আবূ বকর (রা) এ কথা বলেন।

মোটকথা এই যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ছিলেন আশার পর্যায়ে আর রসূল (সা) ছিলেন ভীতির স্তরে।

একটি সন্দেহ ও তার সমাধান : সন্দেহ এই যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলারর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদাই ছিল, সেক্ষেত্রে মহানবী (সা) কেন এত উদ্বিগ্ন ছিলেন ?

উত্তর : এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যকে সাহায্য করা ও সত্যের বিজয়ের ব্যাপারে সামষ্টিক এক ওয়াদা ছিল। বিশেষ কোন স্থান-কাল কিংবা কোন ঘটনা বা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার মহান মর্যাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রতি ছিল। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যা ইচ্ছা তিনি তাই করতে সক্ষম। আল্লাহর দরবারের আদব এটাই যে, তাঁর স্বীরিকৃত ওয়াদার ক্ষেত্রেও বান্দা তাঁকে ভয় করবে এবং এটা মনে করবে যে, কোন অবস্থায়ই কোন বিষয় তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক নয়; বান্দার কাজ হলো তাঁর কাছে চাওয়া, তিনি যা কিছু দেবেন তা তাঁর অনুগ্রহ ও পুরস্কার স্বরূপ। আর যদি সাহায্যের ওয়াদা কোন সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তা হলে তাতেও এ সম্ভাবনা থাকে যে, এ ওয়াদা বাস্তবায়ন এমন একটি গুপ্ত বিষয় ও শর্তের সাথে সম্পর্কিত, যা আল্লাহ্ তা'আলা কোন কৌশল ও বিচক্ষণতার দরুন স্বীয় নবীদেরকেও অবহিত করেননি। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ "আর আল্লাহ্ তা'আলার ওপর এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, কোন ঘটনা কিংবা ওয়াদা কার্যকর করার কারণ ও শর্ত সম্পর্কে নবী (আ)-গণকে অবহিত করবেন।" কোন কোন সময় পরিপূর্ণ কৌশল ও চাহিদা এরূপ হয়ে থাকে যে, প্রকৃত তাৎপর্য গোপন থাকে, যাতে বান্দার দৃষ্টিতে আল্লাহর ভীতি এবং মর্যাদার গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত না হয়ে যায়।

নবী (আ)-গণের এরূপ কাকুতি মিনতি সহকারে দু'আ করা এজন্যে নয় যে, আল্লাহর ওয়াদার প্রতি তাঁরা সংশয় পোষণ করেন, বরং এতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্বের ভীতি তাঁদের ওপর প্রবল হয় (মাদারিজুন নুবূওয়াত থেকে গৃহীত)।

আর সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) আরয করলেন : كفاك مناشدتك ربك فانه سينجزلك ما وعدك "ব্যাস, আল্লাহর নিকট আপনার এ প্রার্থনা যথেষ্ট হয়েছে, অবশ্যই তিনি তাঁর ওয়াদা পূরা করবেন।"

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিয়েছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক

সহস্র ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে। আল্লাহ্ এটা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে, যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো কেবল আল্লাহর নিকট থেকেই আসে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আনফাল : ৯-১০)

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, এ সময় তিনি ছাপড়া থেকে বের হন এবং তাঁর কণ্ঠে এ আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ "এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।" (সূরা কামার : ৪৫)

ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, দু'আ করতে করতে তাঁর চোখে তন্দ্রা নেমে আসে। একটু পরেই জেগে ওঠেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন :

ابشر يا ابا بكر اتاك نصر اللّٰهُ هذا جبرئيل اخذ يعنان فرسه يقوده على شناياه الغبار -

"ওহে আবূবকর! তোমার জন্য সুসংবাদ, তোমার নিকট আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। এই তো জিবরাঈল আমীন ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, যার দাঁতে ধুলিবালি লেগে আছে।[১]

ইসলামপন্থীদের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফেরেশতাগণের অবতরণ

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য প্রথমে এক হাজার, পরে তিন হাজার এবং এরপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা অবতরণ করান।

দ্রষ্টব্য : এ যুদ্ধে যেহেতু কাফির ও মুশরিকদের সাহায্য করার জন্য অভিশপ্ত শয়তান তার বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়, সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য হযরত জিবরাঈল. হযরত মিকাঈল এবং হযরত ইসরাফীল (আ)-এর নেতৃত্বে আসমান থেকে তাঁর ফেরেশতা বাহিনী নাযিল করেন। আর যেহেতু শয়তান স্বয়ং সুরাকা ইবন মালিকের আকৃতিতে এবং তার বাহিনী বনী মুদলিজের পুরুষের বেশ ধারণ করে আগমন করেছিল [যেমনটি দালাইলে বায়হাকী এবং দালাইলে আবূ নু'আইমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে][২] সেজন্য ফেরেশতাগণও পুরুষের বেশে অবতরণ করেন (যেমনটি আল্লামা সুহায়লী এবং ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেছেন)।[৩]

আর যে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাহায্য ও সহায়তার জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা অবতরণ করেন, তাঁরা যদিও আকৃতিতে মানুষ ছিলেন কিন্তু প্রকৃতিতে তাঁরা ফেরেশতাই ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁরা নিম্নোক্ত শ্লোকের প্রতিচ্ছবি ছিলেন :

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৪২; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৩৫৫।
২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২০৪।
৩. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ৪২৪।

نقش آدم ليك معنى جبرئيل * رسته از جمله هواو قال وقيل

"আকৃতিতে আদম কিন্তু প্রকৃতিতে জিবরাঈল, যাবতীয় কামনা-বাসনা এবং অনর্থক বাক্যালাপ থেকে তিনি মুক্ত।"

হযরত আবূ উসায়দ সাঈদী (রা) (যিনি বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন) বলেন, বদরের দিন ফেরেশতাগণ হলুদ রঙের পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় অবতরণ করেন, আর এর প্রান্তদেশ মাথার পেছনে দু'কাঁধের মধ্যভাবে ঝুলানো ছিল [ইবন জারীর হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন; আর ইবন আবূ হাতিম হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)-ও বদরের দিন হলুদ বর্ণের পাগড়ি পরিধান করেছিলেন]। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, ফেরেশতাগণের পাগড়ির রং ছিল কালো আর কারো কারো বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, এ রং ছিল সাদা।

হাফিয সুয়ূতী বলেন, বিশদ্ধ বর্ণনামতে এটাই অনুমিত হয় যে, পাগড়ির রং হলুদই ছিল, কালো এবং সাদা রং সম্বন্ধে যত বর্ণনাই থাকুক, এর সবই দুর্বল (যঈফ)।[১]

দ্রষ্টব্য : আশ্চর্য নয় যে, মুসলমানদের আনন্দ ও খুশির জন্য ফেরেশতাগণের পাগড়ির রং হলুদ রাখা হয়েছিল। এজন্যে যে, হলুদ রং দেখলে আনন্দবোধ হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ "উহা হলুদ বর্ণের গাভী, এর রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়।" (সূরা বাকারা : ৬৯)

মূল কথা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা বাহিনী নাযিল করেন। প্রথমত তো ফেরেশতাদের শুধু অবতরণই কল্যাণ ও বরকতময় ছিল। যেমন হুনায়নের যুদ্ধে কেবল ফেরেশতাদের অবতরণই জয়লাভের কারণে পরিণত হয়েছিল। যেনটি এর বর্ণনা ইনশা আল্লাহ্ সামনে আসছে।

দ্বিতীয় পুরস্কার আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তিনি ফেরেশতাদের নিকট এ নির্দেশ দেন, তারা যেন আত্মিকভাবে মুসলমানদের অন্তরে শক্তিদান করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ٠

"স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ।" (সূরা আনফাল : ১২)

আল্লাহ্ তা'আলা যেমন শয়তানকে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়ার শক্তি দিয়েছেন, অনুরূপভাবে সম্মানিত ফেরেশতাগণকে মানুষের অন্তরে ভাল কথা ঢেলে দেয়ার ক্ষমতা দান করেছেন। যাকে লুম্মা ও ইলহাম বলে। সুতরাং ফেরেশতাগণ মুসলমানদের অন্তরে আল্লাহর অবাধ্যদের বিরুদ্ধে এ মর্মে বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দেন যে, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মুকাবিলায়

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪২৪।

দৃঢ়পদে অবিচল থাক। উত্তম প্রভু ও উত্তম সাহায্যকারী তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আর তাঁর ফেরেশতাদের বাহিনী তোমাদের পৃষ্ঠপোষকরূপে উপস্থিত আছে। কাজেই কিসের চিন্তা, কিসের ভাবনা ? জয়-পরাজয় তো অংশগ্রহণকারীর অন্তরের শক্তি বা দুর্বলতার উপর নির্ভরশীল। এভাবে তাঁরা মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি ও তাঁদের অন্তরকে অবিচল করে তোলেন।

তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তিনি মুসলমানদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিয়েছেন।

চতুর্থ পুরস্কার হিসেবে তিনি বলেছেন যে, প্রকৃত জিহাদকারী সাহাবাকে ফেরেশতাগণ সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, ফেরেশতাগণ ছিলেন তাঁদের অধীন। যেমন ممدكم শব্দটি সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়।

পঞ্চম পুরস্কার, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি কাফিরদের অন্তরে মুসলমান-ভীতির উদ্রেক করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন : سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ "আমি শীঘ্রই কাফিরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেব।"

ফেরেশতাগণকে জিহাদ ও লড়াইয়ের নিয়ম শিক্ষাদান

ফেরেশতাগণের যেহেতু মানুষের যুদ্ধ করার নিয়ম জানা ছিল না, এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যুদ্ধের নিয়মাবলী শিক্ষা দেন : فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ "সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাদের ঘাড়ে এবং আঘাত কর তাদের আঙ্গুলের অগ্রভাগে। (সূরা আনফাল : ১২)

রবী ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতাদের হাতে নিহত ও মানুষের হাতে নিহতদের পৃথকভাবে চেনা যাচ্ছিল। ফেরেশতা কর্তৃক নিহতদের ঘাড়ে এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগ আগুনে পোড়া কালো চিহ্নযুক্ত ছিল। (ফাতহুল বারী شهود الملائكة بدر অধ্যায়)

সহীহ মুসলিমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন মুসলিম পুরুষ জনৈক মুশরিককে তাড়া করছিল। তখন উপর থেকে চাবুকের শব্দ ও অশ্বারোহীর আওয়ায শোনা গেল : ওহে হায়যুম![1] সামনে অগ্রসর হও। অতঃপর তিনি ঐ মুশরিকের প্রতি লক্ষ্য করে দেখেন যে, সে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। চাবুকের আঘাতে তার নাক-মুখ ফেটে নীল হয়ে গেছে।

এ সমুদয় ঘটনা এক আনসারী সাহাবী এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শোনান। তিনি এ কথা শুনে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, এটা ছিল তৃতীয় আসমানের সাহায্য।[2]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : هذا جبرئيل اخذ برأس فرسه عليه اداة الحرب

১. হায়যুম হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ঘোড়ার নাম। –যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১৬।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৪৪২।

"ইনি হলেন জিবরাঈল, যিনি যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন।" (বুখারী শরীফ شهود الملائكة بدر অধ্যায়)

হযরত সাহল ইবন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বদরের দিন আমরা দেখেছি, আমাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যখন কোন মুশরিকের দিকে ইশারা করত, তখন তরবারির নাগালে আসার পূর্বেই তার মাথা ধড় থেকে পৃথক হয়ে যমীনে পড়ত। হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর ছাত্র বায়হাকী, এমনকি আবূ নুয়ায়মও এ হাদীসটি সহীহ বলেছেন।[১]

সাহল ইবন সা'দ বলেন, আমাকে আবূ উসায়দ বলেছেন, ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি তুমি ও আমি বদরে থাকতাম, তা হলে তোমাকে ঐ ঘাঁটি দেখাতাম, যেখান থেকে ফেরেশতাগণ আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছিলেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর সনদে সালামা ইবন রাওহ নামে একজন (হাদীসের বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে) সন্দিগ্ধ বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইবন হিব্বান তাঁকে বিশ্বস্ত এবং অন্যরা যঈফ বলেছেন।

মোট কথা, বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যার্থে আসমান থেকে ফেরেশতাগণের অবতীর্ণ হওয়া এবং মুসলমানদের সাথে মিলে তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, পবিত্র কুরআনের আয়াত ও রাসূল (সা)-এর হাদীসসমূহ দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত, যা সন্দেহ কিংবা অস্বীকার করার কোনই অবকাশ নেই।

ফেরেশতাগণের ঘোড়ায় সওয়ার হওয়াও অগণিত বর্ণনাদ্বারা প্রমাণিত। কতিপয় বর্ণনামতে তাঁরা সাদা-কালোয় মিশ্রিত রংয়ের ঘোড়ায় আরোহী ছিলেন।[২]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কেবল বদর যুদ্ধ ছাড়া আর কোন স্থানে ফেরেশতাগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি। হ্যাঁ, মুসলমানদের কেবল উৎসাহ ও প্রেরণা দান, সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, চিত্তের প্রশান্তি ও স্বস্তিদানের জন্য ফেরেশতাগণ অন্যান্য স্থানেও অবতরণ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হুনায়নের যুদ্ধে ফেরেশতাগণের অবতরণের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا "আর তিনি এমন বাহিনী অবতরণ করেছেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি।" (সূরা তাওবা : ১)

অবশ্য বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে উহুদ যুদ্ধেও হযরত জিবরাঈল ও হযরত মিকাঈল (আ)-এর অংশগ্রহণের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানের জন্য ছিল না, বরং বরকতময় সত্তা (তাঁর প্রতি সর্বোত্তম শান্তি ও প্রশংসা)-এর সাহায্য ও নিরাপত্তার জন্য ছিল।[৩]

দ্রষ্টব্য : যেহেতু এটা পৃথিবী এবং এখানে কার্যকারণ ছাড়া কোনো কাজ সম্পাদিত হয় না; কাজেই আল্লাহ্ তা'আলাও পার্থিব নিয়মই অনুসরণ করেছেন, ফেরেশতাগণকে

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৪২৭।
২. যারকানী, ২খ. পৃ. ৪২৭।
৩. যারকানী, ২খ. পৃ. ৪২৫।

সৈন্যের আকৃতিতে মুসলমানদের সাহায্যার্থে নাযিল করেছেন। অন্যথায় মাত্র একজন ফেরেশতাই সবার জন্য যথেষ্ট ছিলেন। প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী তো আল্লাহ্ই। কিন্তু এ পৃথিবীতে কার্য-কারণের মাধ্যমে তাঁর ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে থাকে। এ জন্যে পার্থিব নিয়মানুসারে ফেরেশতাগণকে সেনাবাহিনীর আকারে মুসলমানদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছেন।[১]

বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) টিলার উপরস্থ ছাপড়া থেকে বাইরে বের হলেন এবং যুদ্ধে উৎসাহ দান করে বললেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আজ যে ব্যক্তি অটল অবিচল থেকে নিঃস্বার্থভাবে এবং বিশুদ্ধ নিয়্যতে আল্লাহর দুশমনদের সাথে সামনাসামনি মুকাবিলা করবে এবং আল্লাহর পথে নিহত হবে, অবশ্যই তাকে আল্লাহ্ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

হযরত উমায়র ইবন হুমাম (রা)-এর হাতে ঐ সময় কিছু খেজুর ছিল, যা তিনি খাচ্ছিলেন। যখন এ কথাগুলো একাধিক্রমে তাঁর কানে পৌঁছল, তখন তা শোনামাত্র তিনি বলে উঠলেন :

بخ بخ افما بينى وبين ان ادخل الجنة الا ان يقتلنى هؤلاء -

"বাহ বাহ! আমার আর জান্নাতের মধ্যে আর কতটুকুই বা দূরত্ব রয়েছে, শুধু ওরা আমাকে হত্যা করবে এতটুকুই।"

এরপর তিনি হাত থেকে খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তরবারি নিয়ে ছুটে গিয়ে রণাঙ্গণে জিহাদ শুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন।[২] আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন।

হযরত আউফ[৩] ইবন হারিস (রা) আরয করলেন : يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده "ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দার কোন কাজটি আল্লাহ্কে হাসায়?"[৪] নবী (সা)

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৪৩।

২ ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৮; তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৬।

৩. তাঁর পিতার নাম হারিস এবং মাতার নাম আফরা। অর্থাৎ মু'আয এবং মু'আউয়ায (রা)-এর ভ্রাতা।

৪. অর্থাৎ যে কাজের জন্য বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করে, যে পর্যায়ের সন্তুষ্টির সাথে সুসংবাদ, আনন্দ ও ভালবাসার প্রকাশই উদ্দেশ্য হয়, এক্ষেত্রে 'রিযা' (সন্তুষ্টি) শব্দের পরিবর্তে 'দিহাক' (হাস্য) শব্দ ব্যবহৃত হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের আনন্দ, সর্বোচ্চ পর্যায়ের সন্তুষ্টি ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের ওপর নির্ভরশীল, এজন্যে যে, প্রভু কোন কোন সময় স্বীয় দাসের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু তা প্রকাশ করে না। 'দিহাক' শব্দটি সন্তুষ্টি ও এর প্রকাশ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত তালহা ইবন বারা (রা) প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে : اللهم الق طلحة يضحك اليك وتضحك اليه "হে আল্লাহ্! তালহার সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাত করুন, যেন সে আপনাকে দেখে হাসে এবং আপনিও তাকে দেখে হাসেন।" অর্থাৎ এমনভাবে সাক্ষাত হবে, যাতে অগণিত সন্তুষ্টি এবং অসংখ্য ভালবাসার প্রকাশ ঘটবে। আল্লাহর হাসির অর্থ ভাল করে বুঝে নিন। রাউযুল উনুফ, ২খ. পৃ. ৬৯।

ইরশাদ করলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বর্মমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর দুশমনের রক্তে যখন বান্দা তার হাত রঞ্জিত করে, এ কাজটি আল্লাহ্কে হাসায়।

আউফ (রা) এ কথা শোনামাত্র বর্ম খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তরবারি হাতে যুদ্ধ শুরু করলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন।

আবূ জাহলের প্রার্থনা এবং লোকজনকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ দান

উতবা, শায়বা এবং ওলীদ নিহত হওয়ার পর আবূ জাহল লোকজনের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য বলল :

ওহে লোক সকল! উতবা, শায়বা এবং ওলীদ নিহত হওয়ায় হতোদ্যম হয়ো না, ওরা তাড়াহুড়া করে ফেলেছিল। লাত ও উযযার কসম, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কখনই ফিরে যাব না, যতক্ষণ না ঐ তিন হত্যাকারীকে বেঁধে নিতে সক্ষম হব।

এরপর আবূ জাহল আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করল : আয় আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যে রক্তসম্পর্ক ছিন্নকারী এবং অজ্ঞাত বিষয়ের প্রবক্তা, তাকে ধ্বংস করুন। আর আমাদের মধ্যে যে আপনার কাছে বেশি প্রিয় ও পসন্দনীয়, তাকে আজ সাহায্য করুন ও বিজয় প্রদান করুন।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

"তোমরা মীমাংসা চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের কাছে এসেছে, তোমরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তোমরা যদি পুনরায় যুদ্ধ কর, তবে আমিও তোমাদেরকে আবার শাস্তি দেব এবং সংখ্যায় তোমরা অধিক হলেও তা তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মু'মিনদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা আনফাল : ১৯)

ইবন ইসহাক এবং হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করে একে সহীহ বলেছেন। বায়হাকী আবদুল্লাহ ইবন সালাবা ইবন সাঈর সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২০৬; যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৬৯)। ইবন কাসীর বলেন, ইমাম আহমদ ও নাসাঈ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিমও এটি বর্ণনা করে বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ, যদিও তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৪৮২)।

'দালাইলে বায়হাকী' এবং 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ জাহলের দু'আ করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করার জন্য হাত উঠালেন এবং আরয করলেন : "আয় পরওয়ারদিগার! (আল্লাহ্ না করুন)

যদি এ দল ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে এরপর এ পৃথিবীতে আপনার উপাসনা আর কখনই হবে না।"

একদিকে আবূ জাহল দু'আ করছিল, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আয় মশগুল ছিলেন। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) এ সময় ছাপড়া থেকে বের হন এবং সাহাবায়ে কিরামকে জিহাদ ও লড়াইয়ে উৎসাহ দান করে বলেন : আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যক্তি নিহত হবে, তাকে আল্লাহ্ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১]

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ইঙ্গিতে একমুষ্ঠি[২] মাটি নিয়ে মুশরিকদের মুখপানে ছুঁড়ে মারলেন এবং সাহাবাদেরকে কাফিরদের ওপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দিলেন। মুশরিকদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যার চোখ, নাক ও মুখমণ্ডলে এ মাটি লাগেনি।

আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, এই একমুষ্ঠি মাটির মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য ছিল, যদ্বারা তা ছুঁড়ে মারামাত্রই শত্রুরা পলায়ন করতে শুরু করল! এ প্রসঙ্গেই সামনের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى -

"আর তুমি তা নিক্ষেপ করোনি, যখন তা নিক্ষেপ করছিলে, বরং আল্লাহ্ই তা নিক্ষেপ করেছেন।" (সূরা আনফাল : ১৭)

অর্থাৎ দৃশ্যত যদিও তুমি একমুষ্ঠি মাটি নিক্ষেপ করেছ, কিন্তু এক হাজার যোদ্ধার প্রত্যেক ব্যক্তির চোখে ও নাকে ঐ মাটি পৌঁছে দেয়া তোমার কাজ ছিল না, বরং এটা ছিল আল্লাহর কাজ এবং তাঁরই কুদরতের কারিশমা।

যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) একমুষ্ঠি কঙ্কর নিয়ে 'শাহাতিল উজূহ' পাঠ করে কুরায়শদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং সাহাবীগণকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। এক মুহূর্তও বিলম্ব ঘটেনি, নিক্ষিপ্ত কঙ্করে সত্যি সত্যি আল্লাহর দুশমনদের চেহারায় অপদস্থতার ছোঁয়া লাগল। তারা চোখ ডলতে শুরু করল। এদিকে মুসলমানগণ বীর বিক্রমে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুহরী এবং উরওয়া ইবন যুবায়র বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ একমুষ্ঠি মাটিতে আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদান করলেন। দুশমনরা প্রত্যেকেই অবনত মস্তক ও দিশেহারা হয়ে পড়ল যে, এখন তারা কোথায় এবং কোনদিকে যাবে। কঙ্করযুক্ত একমুষ্ঠি মাটি কেবল নিক্ষেপের

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪২৭; তারীখে ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ৪৭।

২ একমুষ্ঠি মাটি নিক্ষেপের ঘটনা হযরত হাকিম ইবন হিযাম এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে মু'জামে তাবারানী বর্ণনা করেছেন। হাফিয হায়সামী বলেন, হযরত হাকিম ইবন হিযাম (রা)-এর বর্ণনার সনদ হাসান পর্যায়ের। আর হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারীগণের মতই (মাজমু'আউয যাওয়াইদ, ৬খ. পৃ. ৮৪)।

অপেক্ষা ছিল, তার সাথে সাথে গোটা কাফির বাহিনী বিচলিত হয়ে পড়ল এবং দুঃসাহসী বড় যোদ্ধারা নিহত ও বন্দী হতে শুরু করল। মুসলমানগণ আল্লাহর দুশমনদের হত্যা ও বন্দী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ছাপড়ায় অবস্থান করছিলেন। হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তরবারি সজ্জিত হয়ে রাসূল (সা)-এর হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) দেখলেন সাহাবীগণ কুরায়শদের গ্রেফতারে ব্যস্ত রয়েছেন, এদিকে হযরত সা'দ ইবন মু'আযের চেহারা বিমর্ষ ও মলিন মনে হচ্ছিল। তাঁর চেহারায় অনভিপ্রেত কিছুর আভাস দেখা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, ওহে সা'দ! সম্ভবত কুরায়শদের গ্রেফতার তোমার কাছে অনভিপ্রেত মনে হচ্ছে? সা'দ (রা) আরয করলেন :

اجل والله يا رسول الله كانت اول وقعة اوقعها الله تعالى باهل الشرك فكان الا ثخان فى القتل احب الى من استبقاء الرجال -

"হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা প্রথম বিপর্যয়, যা আল্লাহ্ মুশরিকদের প্রতি নাযিল করেছেন। আমার কাছে আল্লাহর সাথে শরীককারীদের জীবিত ছেড়ে দেয়া অপেক্ষা হত্যা করাই বেশি প্রিয়।" (সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৮)

যাদের অন্তর আল্লাহর একত্ববাদের প্রেরণায় পরিপূর্ণ, তাদের অন্তরে আল্লাহর সাথে শিরককারীদের জন্য কী সহানুভূতি থাকতে পারে?

অধিকন্তু যারা আল্লাহর চরিত্রে নিজেকে চরিত্রায়িত করেছেন, তাদের দাবিও এটা, যেন শিরককে ক্ষমা করা না হয়।

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ·

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধে যাকে ইচ্ছা, তিনি ক্ষমা করেন। যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে মহাপাপ করে।" (সূরা নিসা : ৪৮)

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইতোপূর্বে বলে রেখেছিলেন, বনী হাশিম ও অন্যান্য গোত্রের কিছু লোক ইচ্ছা ও আগ্রহে নয়, বরং কুরায়শদের জবরদস্তিতে বাধ্য হয়েই যুদ্ধে এসেছে, তাদের যেন হত্যা করা না হয়। তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন নেই। কাজেই তোমাদের মধ্যে কেউ আবুল বুখতারী ইবন হিশাম এবং আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবকে পেলে তাদের যেন হত্যা না করে। সাহাবীগণ এজন্যে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করার চেষ্টা করতে থাকেন।

কাজেই হযরত মুজযির ইবন যিয়াদ আনসারী (রা) যখন আবুল বুখতারীকে দেখলেন, তখন বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে হত্যা করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

আবুল বুখতারীর[১] এক বন্ধু ছিল, যে মক্কা থেকেই তার সাথে এসেছিল, তার নাম ছিল জুনাদা ইবন মুলায়হা। আবুল বুখতারী বলল, আমার বন্ধুকেও ? মুজযির বললেন, অবশ্যই না; তোমার বন্ধুকে আমরা এ নিষেধের আওতায় আনতে পারি না। রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল তোমার ব্যাপারেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আবুল বুখতারী বলল, আল্লাহর কসম, আমার সাথীকে পরিত্যাগ করা আমার দ্বারা কখনই সম্ভব হবে না। কাল মক্কার স্ত্রীলোকেরা আমাকে অভিসম্পাত দেবে যে, সে কেবল নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যই আপন বন্ধুকে পরিত্যাগ করেছে। এই বলে সে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে আক্রমণ করতে অগ্রসর হলো :

لَنْ يُسْلِمُ ابْنُ حَرَّةٍ زَمِيْلَهُ * حَتّٰى يَمُوْتَ اَوْ يَرٰى سَبِيْلَهُ ·

"একজন সম্ভ্রান্ত সন্তান কখনো বিপদে তার বন্ধুকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে সঙ্কুচিত হয় না; এজন্যে সে হয় মৃত্যুবরণ করে অথবা ভিন্ন পথ দেখে।"

আবুল বুখতারী কেবল আক্রমণ করতে উদ্যত হচ্ছিল, ইতোমধ্যে হযরত মুজযির (রা)-এর তরবারি তার জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন :

والذى بعثك بالحق لقد جهدت ان يتاسر فآتيك به فابى الا ان يقاتلنى فاتلته فقتلته -

"সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, যাতে আবুল বুখতারীকে গ্রেফতার করে আপনার খিদমতে উপস্থিত করতে পারি। কিন্তু সে তা মেনে নেয়নি; বরং লড়াই ও আক্রমণ করার চেষ্টা করে। ফলে আমি তার সাথে লড়াই করে তাকে হত্যা করেছি।"

উমায়্যা ইবন খালফ ও তার পুত্রকে হত্যা

উমায়্যা ইবন খালফ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরম শত্রুদের একজন। যে সময় বদর যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা কিংবা ধারণাও ছিল না, তখনই সে মক্কায় হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর মুখে তার নিহত হওয়ার আগাম বার্তা শুনেছিল। এ জন্যে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল। আবূ জাহল (আরবী) "নিজেদের কাফেলার খবর

১. আবুল বুখতারী মুসলমান না হলেও মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারী ছিল। আবুল বুখতারীর পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূলের প্রতি কখনো কোন অনভিপ্রেত কাজ করা হয়নি এবং সে নির্যাতনমূলক সম্পর্কচ্ছেদের চুক্তি বাতিলে ভূমিকা রেখেছিল। (সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৫; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৮৫)

লও” এ কথা বলে মানুষকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছিল। উমায়্যা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। আবূ জাহল বলেছিল, ওহে আবূ সাফওয়ান! আপনি এ উপত্যকার সর্দার, আপনার পাশ কাটানো দেখে অন্যরাও পাশ কাটিয়ে যাবে। আবূ জাহল বার বার তাগিদ দিচ্ছিল। উমায়্যা যখন বাধ্য হয়ে পড়ল, তখন বলল, আল্লাহর কসম, আমি একটি উত্তম জাতের দ্রুতগামী উট ক্রয় করব। যখন সুযোগ পাব, রাস্তা থেকেই প্রত্যাবর্তন করব। অতঃপর নিজ স্ত্রী উম্মে সাফওয়ানকে গিয়ে বলল, আমার জন্য সফরের মাল-সামান প্রস্তুত করে দাও। উম্মে সাফওয়ান বলল, তোমার ইয়াসরিবী ভাইয়ের কথা, ‘তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গীদের হাতে নিহত হবে’ কি তোমার মনে নেই? উমায়্যা বলল, কেন নয়, খুবই মনে আছে। আমার যাওয়ার ইচ্ছা নেই, কিছু দূর তাদের সাথে যাব, তারপর সুযোগ বুঝে ফিরে আসব। এভাবেই উমায়্যা সমস্ত মনযিল অতিক্রম করে বদরে এসে উপস্থিত হয়। (বুখারী من يقتل ببدر অধ্যায়)[1]

যখন সে বদরে আসে, তখন হযরত বিলাল (রা)-এর নজরে পড়ে। তাঁকে সে উত্তপ্ত পাথরের উপর শুইয়ে শাস্তি দিত। কাজেই বিলাল (রা) উমায়্যাকে দেখেই আনসারদের লেলিয়ে দেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) জাহিলী যুগ থেকেই উমায়্যার বন্ধু ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন যে, উমায়্যা নিহত না হোক, বরং গ্রেফতার হয়ে বন্দী হোক (সম্ভবত আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে এ উসীলায় হিদায়াত নসীব করবেন এবং পরকালের স্থায়ী আযাব থেকে মুক্তি দেবেন)।

হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর হাতে কিছু সোনা-দানা ছিল, যা তিনি কাফিরদের থেকে নিয়েছিলেন। তিনি সেসব মাটিতে ফেলে দেন এবং উমায়্যা ও তার পুত্রের হাত ধরেন। তা দেখে হযরত বিলাল (রা) উচ্চস্বরে আওয়াজ দিলেন, কাফিরদের সর্দার উমায়্যাকে ধর, যদি ও বেঁচে যায় তা হলে আমি বাঁচব না। এ আওয়াজ শোনামাত্র আনসার সাহাবীগণ সেদিকে ধাবিত হন। হযরত আবদুর রহমান উমায়্যার পুত্রকে আগে বাড়িয়ে দেন। আনসারগণ তাকে হত্যা করেন এবং উমায়্যার দিকে অগ্রসর হন। আবদুর রহমান (রা) উমায়্যার ওপর শুয়ে পড়েন কিন্তু আনসারগণ এ অবস্থায়ই তাঁর দু‘পায়ের ফাঁক দিয়ে তরবারি চালিয়ে তাকে হত্যা করেন। ফলে আবদুর রহমান (রা)-এর পা যখম হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন এর চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।[2]

আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) বলতেন, আল্লাহ্ তা‘আলা বিলালের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমার সোনা-দানাও গেছে আর আমার বন্দীও হাতছাড়া হয়ে গেছে। (সহীহ্ বুখারী, উকালা অধ্যায়)

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩২১।

২ এ বর্ণনা সহীহ বুখারীর। দু‘পায়ের ফাঁকের বাক্যাবলী মুতওয়াযী ইবন আয়িযের মূল বাক্যের অনুবাদ, যদ্বারা বুখারীর হাদীসের ব্যাখ্যা হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী, ৩খ. পৃ. ২৩৯)।

আল্লাহর দুশমন, মুসলিম উম্মাহর ফিরআওন আবূ জাহল নিহত

হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি সেনা সারিতে দাঁড়ানো, হঠাৎ আমি দেখলাম আমার ডানে ও বামে দুই আনসার যুবক দাঁড়িয়ে। আমার সন্দেহ হলো (যে, দু'টি বালকের মাঝে আমাকে দাঁড়ানো দেখে লোকজন পাছে আমাকে বিদ্রুপ না করে)।

আমি এ চিন্তায় ছিলাম, এমন সময় ওদের একজন আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, চাচা, আবূ জাহল কোনটি, আমাকে দেখান তো। আমি বললাম, বৎস, আবূ জাহলকে তুমি কি করবে ? যুবকটি বলল, আমি আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছি, যদি আমি আবূ জাহলকে দেখতে পাই, তাকে হত্যা করব অথবা আমি নিজে শহীদ হব। কারণ আমি জেনেছি, আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গালি-গালাজ করে। মহান পবিত্র ঐ আল্লাহর কসম, যাঁর কুদরতি হাতে আমার জীবন, আমি যদি তাকে দেখতে পাই, আমার ছায়া তার ছায়া থেকে পৃথক হবে না, যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে নির্ধারিত, তার মৃত্যু ঘটে।

তার এ কথাবার্তা শুনে আমি দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মাঝে না থেকে দু'টি বালকের মাঝখানে থাকায় যে সংকোচবোধ করছিলাম, তা দূর হয়ে গেল। ইঙ্গিতে আমি আবূ জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। শোনামাত্র তারা শিকারী বাজপাখির ন্যায় আবূ জাহলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে খতম করে দিল। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল জিহাদ, من لم يخمس الاسلاب অধ্যায় এবং বুখারী শরীফ, ২খ. বদর যুদ্ধ অধ্যায়)। এ দু' যুবক ছিল হযরত ছিল হযরত আফরা (রা)-এর দু'পুত্র মু'আয এবং মু'আউয়ায (রা)।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর ইবন হাযম, হযরত মু'আয ইবন আমর আল-জুমূহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবূ জাহলের খোঁজে ছিলাম, যখন সুযোগ পেলাম, এমন জোরে আঘাত করলাম যে, আবূ জাহলের পা কেটে গেল।

আবূ জাহলের পুত্র ইকরামা, (যিনি মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন) তার পিতাকে রক্ষায় মু'আযের বাহুতে এত জোরে তরবারির আঘাত হানলো যে, সঙ্গে

---

১. সহীহ বুখারীর রিওয়ায়াত, যা বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, হযরত আফরা (রা)-এর দু'পুত্র মু'আয ও মু'আউয়ায আবূ জাহলের হত্যাকারী ছিলেন। কিন্তু কিতাবুল জিহাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তারা ছিলেন মু'আয ইবন আফরা এবং মু'আয ইবন আমর আল-জুমূহ। হাফিয আসকালানী বলেছেন, আফরার দু'পুত্রের সাথে মু'আয ইবন আমর আল-জুমূহও হত্যায় শরীক ছিলেন, বরং মু'আয ইবন আমর আল-জুমূহই এ হত্যায় বেশি অংশগ্রহণকারী ছিলেন। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) মু'আয ইবন আমর আল-জুমূহকেই পুরস্কার দেয়ান। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩০; বদর যুদ্ধ অধ্যায় এবং ফাতহুল বারী, ৬খ. من لم يخمس الاسلاب অধ্যায় এবং যারকানী,১খ. পৃ. ৪৩০)।

সঙ্গে তাঁর হাত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। শুধু চামড়াটুকু বাকী থাকায় তা ঝুলে থাকে। কিন্তু আল্লাহরই মরযী, মু'আয (রা) এ অবস্থা নিয়েও সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই করতে থাকেন। হাত লটকে থাকায় অধিক কষ্ট হওয়ায় হাতটি পায়ের নিচে চেপে ধরে তিনি এমন জোরে টান দিলেন যে, চামড়া ছিঁড়ে তা পৃথক হয়ে গেল। এক হাত নিয়েই মু'আয (রা) হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তবে মু'আউয়ায ইবন আফরা (রা) আবূ জাহলকে হত্যার পর যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। শেষ পর্যন্ত তিনি শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

বিজয় লাভের পর আবূ জাহলের লাশের অনুসন্ধান

আবূ জাহল গুরুতর আহত হলেও জীবনের কিছুটা তখনো অবশিষ্ট ছিল। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কেউ গিয়ে আবূ জাহলের সংবাদ নিয়ে আসতে পার কি ? হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) গিয়ে লাশের মধ্যে সন্ধান করলেন এবং আবূ জাহলের লাশ দেখতে পেলেন। তখনো তার জীবনের কিছুটা অবশিষ্ট রয়েছে।

এটা বুখারীর বর্ণনা। ইবন ইসহাক এবং হাকিমের বর্ণনায় আছে যে, ইবন মাসউদ (রা) আবূ জাহলের ঘাড়ে পা রেখে বললেন : اخزاك الله يا عدو الله "ওহে আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ্ তোকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেছেন।" এরপর তার শিরোশ্ছেদ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে পেশ করে বললেন : هَذَا رَأسُ عَدُوِّ اللهِ اَبِىْ جَهْلٍ "এটা আল্লাহর দুশমন আবূ জাহলের মাথা।"[১] রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : اَللهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ "ঐ আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এটা আবূ জাহলেরই মাথা।" আমি বললাম : نعمْ ,الله الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ "হ্যাঁ, ঐ আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন প্রভু নেই, এটা আবূ জাহলেরই মাথা।" হযরত (সা) আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং নিজ পবিত্র মুখে তিনবার বললেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعَزَّ الْاِسْلاَمَ وَاَهْلَهُ "প্রশংসা ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদেরকে সম্মান দান করেছেন।"[২]

কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি সিজদায়ে শুকরিয়া আদায় করেছেন (উমদাতুল কারী, আবূ জাহল হত্যা অধ্যায়)। আর ইবন মাজাহর বর্ণনায় আছে, (এর শোকরে) তিনি দু'রাকা'আত নামাযও আদায় করেছেন [ইবন মাজাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন]।[৩]

---

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আবূ জাহলকে হত্যা করা হয়, তার মাথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে নীত হয়। ইবন মাজাহ উত্তম সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। যারকানী, ২খ. পৃ. ১।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩০।

৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৮৯।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে, আমি আবূ জাহলের বুকের ওপর চড়ে বসলাম। আবূ জাহল চোখ খুলে বলল, ওহে বকরীর রাখাল, নিশ্চয়ই তুমি অনেক উঁচু স্থানে চড়ে বসেছ। আমি বললাম : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ مَكَّنَنِىْ مِنْ ذٰلِكَ "প্রশংসা ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি আমাকে এ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" আবূ জাহল বলল, কার ভাগ্যে বিজয় সূচিত হয়েছে ? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। অতঃপর সে বলল, তোমার ইচ্ছা কি ? আমি বললাম, তোমার শিরোশ্ছেদ করা। সে বলল, আচ্ছা, তবে আমার তরবারি দিয়ে কাট, এটা খুবই তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট, এতে শীঘ্রই তোমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে। আমার মাথাটি তুমি পেছনের দিক থেকে কাটবে, যাতে দেখতে ভীতিপ্রদ হয়। এরপর যখন মুহাম্মদ-এর নিকট ফিরে যাবে, তখন আমার পক্ষ থেকে তাকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেবে যে, পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে আজ তার প্রতি আমার হিংসা ও শত্রুতা অনেক বেশি।

ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, এরপর আমি তার মাথা কর্তন করলাম এবং তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আল্লাহর দুশমন আবূ জাহলের মাথা এবং তার কথাও আমি তাঁর নিকট পৌঁছে দিলাম। তিনি তাকবীর ধ্বনি দিয়ে বললেন, এ ছিল আমার ও আমার উম্মতের জন্য ফেরাউন। এর অপকর্ম ও ফিতনা হযরত মূসা (আ)-এর ফেরাউনের অপকর্ম ও ফিতনা থেকে বেশিই ছিল। হযরত মূসা (আ)-এর ফেরাউন তো মৃত্যুকালে ঈমানের কালেমা পাঠ করেছিল, কিন্তু এ উম্মতের ফিরআওন মৃত্যুকালেও কুফরী ও অহংকারের বাক্য উচ্চারণ করেছে। রাসূল (সা) আবূ জাহলের তরবারিটি হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-কে প্রদান করলেন। যেমনটি ইমাম সারাখসী প্রণীত 'শারহুস সিয়ারিল কাবীর'-এ উল্লেখ আছে।[১]

অর্থাৎ যেমনভাবে হযরত নবী করীম (সা) মর্যাদায় ও সকল গুণের পূর্ণতায় সমস্ত নবী-রাসূল (আ) থেকে উত্তম ও অগ্রগামী ছিলেন, অনুরূপভাবে তাঁর উম্মতের ফিরআওনও সমস্ত উম্মতের ফিরআওন অপেক্ষা কুফর ও বৈরীতায় অগ্রগামী ছিল। মৃত্যুকালেও যার জ্ঞানচক্ষু খোলেনি এবং মৃত্যু যন্ত্রণায়ও যার কুফরী ও অহংকারে কাঁপন ধরেনি, বরং কুফর ও অহংকার প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে (আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এমন অবস্থা থেকে রক্ষা করুন)।

দ্রষ্টব্য : হযরত ইবন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, যে রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) জিন্নদের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন বললেন :

ليقم معى من لم يكن فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقام ابن مسعود فحمله رسول الله ﷺ مع نفسه -

---

১. সম্ভবত এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈগণের যুগে কোন পরিচিতি অথবা সম্পর্ক ছাড়াই যখন 'আবদুল্লাহ' বলা হতো, তা হলে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-কেই মনে করা হতো। কেননা তাঁর মধ্যে বান্দাত্বের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

"আমার সাথে যাওয়ার জন্য ঐ ব্যক্তি উঠুক, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। তাঁর এ কথা বলার পর হযরত ইবন মাসউদ (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান।" (হাফিয আইনী প্রণীত আল-বিদায়ার শরাহ গ্রন্থ আল-বিনায়াহ)।

আশ্চর্য নয় যে, আবূ জাহলকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করার সৌভাগ্য হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-এর এজন্যে অর্জিত হয় যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা, যাঁর অন্তর অহংকার-অহমিকা এবং গর্ব থেকে পাক-পবিত্র ছিল। আর আবূ জাহলের গোটা দেহসত্তা ছিল অহংকার ও ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ। তার অন্তরে বিন্দুমাত্রও বিনয়-নম্রতা ছিল না।

এ কারণে আবূ জাহলের হত্যাকর্ম এমন পবিত্র ও ভাগ্যবান ব্যক্তির হাতেই সম্পন্ন করান যিনি ছিলেন আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা, যাঁর অন্তরে ছিল না বিন্দুমাত্রও গর্ব ও অহংকার। মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞ এবং তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ ও সুবিবেচনা প্রসূত। আল্লাহ্ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদের প্রতি সন্তুষ্ট। ইসলামে তাঁর অবদানের জন্য আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন।

আরেকটি দ্রষ্টব্য : আবূ জাহলের[১] প্রকৃত উপাধি ছিল আবুল হাকাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে আবূ জহল উপাধি দেন। (ফাতহুল বারী ذكر النبى ﷺ من يقتل ببدر অধ্যায়)। অর্থাৎ নিরেট মূর্খতার পিতা বা মুরব্বী, যতদিন সে জীবিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত নবূওয়াত ও রিসালতের বিরোধিতায় সব সময় সব প্রকারের মূর্খতার জন্ম ও লালন সব তারই নেতৃত্বে হয়।

হযরত উক্কাশা[২] ইবন মিহসান (রা)-এর তরবারিটি যুদ্ধ করতে করতে ভেঙ্গে যায়। তখন নবী (সা) তাঁকে একটি ছড়ি প্রদান করেন। হযরত উক্কাশার হাতে ছড়িটি

১. 'আবূ জাহল' শব্দে 'আবূ' উদ্দেশ্য এবং 'জাহল' বিধেয় ও অনির্দিষ্টবাচক শব্দ, যদ্দারা কোন কিছু নির্দিষ্ট করা যায় না। এজন্যে 'জাহল' শব্দদ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২ একবার নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক কোন হিসাব-নিকাশ ছাড়াই বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা হবে চতুর্দশী চাঁদের মত উজ্জ্বল। এ কথা শোনামাত্র হযরত উক্কাশা (রা) দাঁড়ালেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যাতে আল্লাহ্ আমাকে ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যেই আছ। এতে একজন আনসারী দাঁড়ালেন এবং তিনিও এরূপ আবেদনই করলেন। তিনি বললেন, উক্কাশা অগ্রগামী হয়েছে। (বুখারী)
এর উদ্দেশ্য না-বোধক ছিল না যে, তুমি ঐ সত্তর হাজারের মধ্যে নও, বরং উদ্দেশ্য ছিল আবেদনের ধারাবাহিকতা শেষ করে দেয়া (এরপর এতে বুঝে নিন এবং স্থির থাকুন)। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে যখন তুলায়হা ইবন খুয়ায়লিদ আসদী মিথ্যা নবূওয়াতের দাবিদার হল এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) এ ফিতনা দমনের জন্য হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে প্রেরণ করেন, হযরত উক্কাশা (রা)-ও তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং তুলায়হার হাতে শহীদ হয়ে যান। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ৬৩, মুহাজিরীন অধ্যায়)।

পৌঁছামাত্র তরবারিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় প্রদান না করা পর্যন্ত তিনি এর দ্বারাই তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন। তরবারিটির নাম ছিল আওন। সকল যুদ্ধেই তিনি এ তরবারি সাথে রাখতেন।[১]

বদরের দিন উবায়দা ইবন সাঈদ ইবন আস লৌহ বর্ম পরিহিত ছিল। চক্ষুদ্বয় ছাড়া তার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। হযরত যুবায়র (রা) তার প্রতি তাক করে বর্শা ছুঁড়লে সাথে সাথে তার মৃত্যু ঘটে। হযরত যুবায়র (রা) বলেন, অতঃপর আমি তার শরীরের ওপর পা রেখে সজোরে টান দিলে বর্শাটি বেরিয়ে আসে। তবে তার একপাশ বাঁকা হয়ে গিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বর্শাটি স্মৃতি হিসেবে হযরত যুবায়র থেকে চেয়ে নেন। তাঁর ওফাতের পর যথাক্রমে এটা হযরত আবূ বকর (রা), এরপর হযরত উমর (রা), তারপর হযরত উসমান (রা), অতঃপর হযরত আলী (রা) এবং পরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর কাছে রক্ষিত থাকে।

বদর যুদ্ধে হযরত যুবায়র (রা) আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর কাঁধে একটি আঘাত এতই গভীর ছিল যে, হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) শৈশবে তাতে আঙুল ঢুকিয়ে খেলতেন। একবার আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান উরওয়া ইবন যুবায়রকে বললেন, তুমি কি তোমার পিতার তরবারিটি চেন ? উরওয়া বললেন, হ্যাঁ। আবদুল মালিক বললেন, কিভাবে ? উরওয়া বললেন, বদরের দিন তা ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। আবদুল মালিক বললেন, ঠিকই বলেছ। অতঃপর এর সমর্থনে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন : بهن فلول من قـراع الكتـائب "বড় বড় সেনাদল হত্যায় এ তরবারি ভোঁতা হয়েছে।" (সহীহ বুখারী, বদর যুদ্ধ অধ্যায়)।

বদর যুদ্ধের বন্দিগণ

আল্লাহর অনুগ্রহে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। কুরায়শের সত্তর[২] ব্যক্তি নিহত এবং সত্তরজন গ্রেফতার হয়ে বন্দী হল। নিহতদের লাশের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বদরের কূপে নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু উমায়্যা ইবন খালফের লাশকে তা করা গেল না। সেটা এতই ফুলে উঠেছিল যে, বর্ম খুলে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণে তা টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল। এজন্যে তা যথাস্থানে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ৯০।

২. যেমনটি হযরত বারা ইবন আযিব (রা) সূত্রে সহীহ বুখারী এবং হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে এবং এটাই বিশুদ্ধ। কারণ এর ওপর সমস্ত সীরাত গ্রন্থকার একমত। উহুদ যুদ্ধে যখন সত্তরজন মুসলমান শহীদ হন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে এ আয়াত নাযিল করেন : اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩৮, من فضل شهيد بدرا অধ্যায়।

উতবা ইবন রবী'আর লাশ যখন কূপে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন উতবার পুত্র হযরত আবূ হুযায়ফার চেহারায় রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যথা এবং দুঃখের ছাপ প্রত্যক্ষ করলেন। রাসূল (সা) বললেন, ওহে আবূ হুযায়ফা! পিতার এ অবস্থা দেখে কি তুমি কোন প্রতিক্রিয়া অনুভব করছ ? আবূ হুযায়ফা আরয করলেন, আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ভাবের উদয় হয়নি; কেবল এটুকু মনে হয়েছে যে, আমার পিতা ছিলেন সিদ্ধান্তদাতা, সহিষ্ণু, মীমাংসাকারী এবং সম্মানিত। তাই আশা ছিল, তার এ জ্ঞান ও দূরদর্শিতা তাকে ইসলামের দিকে পথ-নির্দেশ করবে। কিন্তু যখন তাকে কাফির অবস্থায় মরতে দেখলাম, তখন দুঃখ হল। রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ হুযায়ফা (রা)-এর কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন।

বদর যুদ্ধে নিহতদের লাশ কূপে নিক্ষেপকরণ

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হযরত আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) চব্বিশজন[1] কুরায়শ সর্দারের লাশ অপবিত্র,[2] নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত কূপে নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। যেসব লাশ কূপে নিক্ষেপ করা হয়, সেগুলো ছিল কুরায়শ সর্দারদের লাশ। এছাড়া অন্যান্য নিহতের লাশ অন্যত্র ফেলা হয়।

আর তাঁর পবিত্র অভ্যাস ছিল, কোন সম্প্রদায়ের ওপর যখন জয়লাভ করতেন, তখন সেখানে তিনরাত্রি অবস্থান করতেন। এ অভ্যাস অনুযায়ী যখন তৃতীয় দিন আসল, তখন তিনি সওয়ারীর পিঠের ওপর আসন (জিন) বাঁধার হুকুম দিলেন। এরপর তিনি রওয়ানা দেন এবং সাহাবায়ে কিরাম তাঁর পিছে পিছে চলতে থাকেন। সাহাবিগণের ধারণা ছিল হযরত (সা) কোনো প্রয়োজনে যাচ্ছেন। অতঃপর তিনি ঐ কূপের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং প্রত্যেকের নাম ধরে অমুকের পুত্র অমুক বলে সম্বোধন করে বললেন, ওহে উতবা, ওহে শায়বা, ওহে উমায়্যা, ওহে আবূ জাহল! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা তোমাদের কাছে ভাল মনে হয়নি। আমাদের সাথে আমাদের প্রভু যে ওয়াদা করেছেন, তা আমরা যথাযথ পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের প্রভুর ওয়াদা সঠিক পেয়েছ ?

এটা বুখারীর বর্ণনা, ইবন ইসহাকের বর্ণনায় এর অতিরিক্ত আছে যে, তোমরা নিজেদের নবীর সাথে আচরণে খুবই মন্দ সম্প্রদায় ছিলে। তোমরা আমাকে মিথ্যা বলেছ, অথচ লোকেরা আমাকে সত্য বলেছে। তোমরা আমাকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার

---

১. লাশ ছিল সত্তরটি, তন্মধ্যে চব্বিশটি ঐ কূপে নিক্ষেপ করা হয়। বাকীগুলো অন্য কোথাও নিক্ষেপ করা হয়েছিল। –ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩২, আবূ জাহল হত্যা অধ্যায়।

২ ঈমান হলো পবিত্রতা আর কুফর হলো নাপাকী। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : انما المشركون نجس। "নিশ্চয়ই মুশরিকগণ অপবিত্র।" শিরককারীদের জন্য এরূপ কূপই ছিল উপযুক্ত। কুফরের নাপাকী ঈমানের গোসল দ্বারাই দূর হওয়া সম্ভব। কুফর অদৃশ্য জগতে বড় ধরনের অপবিত্রতা এবং ঈমান গোসলের মত বিরাট পবিত্রতা। আর কুফরের সমস্ত শাখা অর্থাৎ গুনাহ, অপরাধ ইত্যাদি ছোট ধরনের অপবিত্রতার মত এবং ঈমানের সমস্ত শাখা অর্থাৎ আনুগত্য, ছোট পবিত্রতা বা উযূর মত। অতএব বুঝে নিন। বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ্ বিদায় হজ্জের বর্ণনায় আসবে।

করেছ, আর লোকেরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমার সাথে যুদ্ধ করেছ, আর লোকেরা আমাকে সাহায্য করেছে। হিফাযতকারীকে তোমরা খিয়ানতকারী বলেছ, আর সত্যবাদীকে বলেছ মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তোমাদেরকে মন্দফল দান করুন। হযরত উমর (রা) আরয করলেন, আপনি কি প্রাণহীন লাশের সাথে কথা বলছেন ? তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তুমি ওদের চেয়ে আমার কথা বেশি শুনতে পাচ্ছ না। পার্থক্য, ওরা উত্তর দিতে পারে না।[১]

হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা) এক দীর্ঘ কাসীদায় বলেন :

ينـاديـهـم رسـول الله لـمـا * قذفناهم كباكب فى القـليـب
الـم تـجدوا كلامى كان حقـا * وامـر الله يـاخـذ بـالقـلوب
فـمانطقوا ولو نطقوا لـقـالـوا * صدقت وكنت ذا رأى مصيب

"আমরা যখন ঐ দলকে কূপে নিক্ষেপ করি, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের আহ্বান করলেন, তোমরা কি আমার কথা সত্য পাওনি ? আল্লাহ্ অন্তরসমূহের মালিক। তারা কোন উত্তর দেয়নি। ধরে নিলাম, যদি উত্তর দিতও, তাহলে এটাই বলত যে, আপনি সত্য বলেছেন; আপনার সিদ্ধান্তই নির্ভুল ও সঠিক ছিল।"

দ্রষ্টব্য : এ হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মোটামুটিভাবে মৃতব্যক্তিও শুনতে পায়। বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিঈগণের এটাই অভিমত। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-ও মৃত ব্যক্তির শোনার ব্যাপারটি অস্বীকার করেননি। বিস্তারিত জানার জন্য হাদীসের কিতাবসমূহ এবং মাদারিজুন নুবূওয়াত দেখুন।

বিজয়-বার্তা নিয়ে মদীনায় দূত প্রেরণ

এ প্রকাশ্য বিজয়ের সুসংবাদ দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় দূত প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে উচ্চভূমির অধিবাসীদের প্রতি এবং হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে নিম্নভূমির অধিবাসীদের প্রতি প্রেরণ করেন।

হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা) বলেন, এ সুসংবাদ ঠিক এমন সময় আমাদের কানে পৌঁছে, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা, হযরত উসমান গনী (রা)-এর সহধর্মিণী মরহুমা হযরত রুকায়্যা (রা)-কে দাফন করছিলাম। তাঁর দেখাশোনা করার জন্যই নবী (সা) হযরত উসমান (রা)-কে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন। এ জন্যে হযরত উসমান (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু নবী (সা)-এর নির্দেশজনিত কারণে উসমান (রা) অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে যথারীতি বদর যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (তিনি বলেন,) আমি দেখলাম লোকজন যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে ঘিরে আছে, আর যায়দ (রা) একটি জায়নামাযে দাঁড়িয়ে বলছেন, উতবা ইবন রবীআ, শায়বা ইবন রবীআ, আবূ জাহল ইবন হিশাম, জামআ ইবন

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৩৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৫২।

আসওয়াদ, আবুল বুখতারী ইবন হিশাম. উমায়্যা ইবন খালফ এবং হাজ্জাজের দু'পুত্র নবীয়া ও মনীয়া নিহত হয়েছে।

আমি বললাম, আব্বাজান, এ খবর কি সত্য ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, পুরোপুরিই সত্য।

হযরত যায়দ ইবন হারিসা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে মদীনায় প্রেরণের পর তিনি (সা) রওয়ানা হলেন এবং বদরের যুদ্ধবন্দীদের কাফেলা ছিল তাঁর সহগামী। নবী (সা) হযরত আবদুল্লাহ ইবন কা'ব আনসারী (রা)-এর কাছে গনীমতের মালামাল সোপর্দ করলেন।

যখন তিনি রাওহায় পৌঁছলেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান তাঁকে এবং সাহাবিগণকে এ মহাবিজয়ের জন্য মুবারকবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে এসে মিলিত হন। এতে হযরত সালমা ইবন সালামা (রা) বললেন, তোমরা কি বিষয়ে মুবারকবাদ দিচ্ছ ? আল্লাহর শপথ, নেতাদের দল একত্রিত হয়েছিল, সবাইকে রশিতে বাঁধা উটের মতই হত্যা করে নিক্ষেপ করেছি (অর্থাৎ আমরা কোন বড় কাজ করিনি, যার জন্য মুবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত)। রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা শুনে মুচকি হেসে বললেন, এরাই তো মক্কার নেতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল।

গনীমতের মাল বন্টন

বিজয়লাভের পর নবী করীম (সা) তিনদিন বদরে অবস্থান করেন। তিনদিন পর তিনি মদীনা মুনাওয়ারা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং গনীমতের মালের দায়িত্ব হযরত আবদ ইবন কা'ব (রা)-এর ওপর ন্যস্ত করেন। 'সফরা' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি গনীমতের মাল বন্টন করেন। কারণ এ পর্যন্ত তা বন্টনের সুযোগ হয়নি।

সাহাবিগণ গনীমতের মাল বন্টন প্রশ্নে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়ে গেলেন। যুবকেরা বললেন, আমরা এ মালের হকদার, কেননা আমরাই কাফিরদের হত্যা করেছি। বৃদ্ধেরা পতাকার নিচে ছিলেন এবং যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বেশি অংশগ্রহণ করেননি। বৃদ্ধেরা বললেন, গনীমতের মালে আমাদেরকেও অংশীদার করা হোক। কেননা যে বিজয় অর্জিত হয়েছে, তা আমাদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই হয়েছে। আল্লাহ্ না করুন, যদি তোমরা পরাজিত হতে, তা হলে আমাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করতে। অপর দল, যারা নবী করীম (সা)-এর হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তারাও নিজেদেরকে এ মালের হকদার মনে করতেন।

এ অবস্থারই এক পর্যায়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, يَسْــئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَـالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ "লোকে আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের।" (সূরা আনফাল : ১) অর্থাৎ মালে-গনীমতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূল (সা) তাঁর প্রতিনিধি, যেভাবে তিনি তা বন্টন যথার্থ মনে করবেন, সেভাবেই বন্টন করবেন। সফরায় পৌঁছে তিনি এ মাল মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেন।[১]

---

১. তাফসীরে কুরতুবী, ৭খ. পৃ. ৩৬৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৩০১।

অধিকন্তু তিনি এ মালে-গনীমত থেকে আরো আট ব্যক্তিকে অংশ দেন, যারা তাঁর নির্দেশে কিংবা অনুমতিক্রমে বদরে উপস্থিত হতে পারেননি।

১. হযরত উসমান ইবন আফফান (রা), যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই উসমান (রা)-এর স্ত্রী ও রাসূল তনয়া অসুস্থা হযরত রুকায়্যা (রা)-কে দেখাশোনার জন্য মদীনায় রেখে যান।

২. হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)।

৩. হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা)।

৪. হযরত আবূ লুবাবা (রা), রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে মদীনার শাসক হিসেবে রেখে যান।

৫. হযরত আসিম ইবন আদী (রা), তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) উচ্চভূমিতে রেখে যান।

৬. হযরত হারিস ইবন হাতিব (রা), কোন কারণবশত রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বনী আমর ইবন আউফের দিকে ফেরত পাঠান।

৭. হযরত হারিস ইবনুস সাম্মাহ (রা)।

৮. হযরত খাররাত ইবন যুবায়র (রা)।

এ সাহাবিগণ যদিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তবুও রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে গনীমতের অংশ দান করেন এবং বদরের যোদ্ধাদের তালিকায় তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন।[১]

দ্রষ্টব্য : জানা আবশ্যক যে, يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَال قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰه وَالرَّسُوْلْ এ আয়াতে গনীমতের মাল বন্টনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে এবং وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰه خُمُسَهٗ আয়াতে বিস্তারিতভাবে গনীমতের মাল বন্টনের নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। আবূ উবায়দ এ মত পোষণ করেন যে, বদর যুদ্ধের গনীমত থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করা হয়নি; কিন্তু ইমাম বুখারী এবং ইমাম ইবন জারীর মনে করেন, বদর যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করা হয়েছিল। যেমনটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আলী (রা) বর্ণিত ঐ দু'টি উটনীর হাদীস, হযরত হামযা (রা) যে দু'টির কুঁজ কেটে দিয়েছিলেন, যার একটি উটনী তিনি গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে পেয়েছিলেন। হাফিয ইবন কাসীর বলেন, এ বর্ণনাই বিশুদ্ধ এবং অগ্রগণ্য।[২]

আর সফরায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা) বন্দীদের মধ্য থেকে নযর ইবন হারিসকে হত্যার নির্দেশ দেন। সফরা থেকে অগ্রসর হয়ে যখন 'ইরকুয-যবীয়াহ' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন উকবা ইবন আবূ মুঈতকে হত্যার নির্দেশ দেন। ফলে সেখানেই উকবাকে হত্যা করা হয়।[৩]

নযর ইবন হারিসকে হযরত আলী (রা) আর উকবা ইবন আবূ মুঈতকে হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা) হত্যা করেন এবং অবশিষ্ট বন্দীদের নিয়ে নবী (সা) মদীনায় যাত্রা করেন।

---

১. ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ১৮।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৩০১–৩০৩।

৩. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৪।

নযর এবং উকবা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কট্টর দুশমনদের অন্তর্ভুক্ত। অশ্রাব্য ভাষা এবং দুষ্টবুদ্ধি দিয়ে এরা কথা ও কাজের মাধ্যমে সব সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অপদস্থকরণ ও তাঁর ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন চালানোর কোন উপায় অবশিষ্ট রাখেনি। এজন্যে সমস্ত বন্দীর মধ্য থেকে তিনি কেবল এ দু'জনকেই হত্যার নির্দেশ দেন। মক্কী জীবনে যখন তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়েছিলেন, তখন এই উকবা ইবন আবূ মুঈতই উটের নাড়িভুঁড়ি এনে হযরতের পিঠের ওপর রেখেছিল এবং তাঁর গলা চেপে ধরেছিল। দালাইলে আবূ নুয়াইমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, একবার সে নবী (সা)-এর পবিত্র চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করেছিল।[১] মোটকথা, পবিত্র ও মহান গুণের অধিকারী রাসূল (সা)-কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যেন তার খাদ্যস্বরূপ ছিল। আল্লাহর নবীর সাথে মুকাবিলা, যুদ্ধ, মারামারি এবং বাদ-বিতণ্ডা করা মারাত্মক অপরাধ এবং প্রকাশ্য ক্ষতির কারণ তো বটেই, পরন্তু নবীর শানে বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করা, গালি-গালাজ করা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, যুদ্ধ ও মারামারি করা অপেক্ষাও ঘোরতর অপরাধ। কেননা এটা নবূওয়াতের পদমর্যাদাকে অবজ্ঞা করারই নামান্তর। এ মাসআলার ওপর বিস্তারিত বর্ণনা ইনশা আল্লাহ্ সুযোগমত অন্য কোথাও করা যাবে। ইলমের বিজ্ঞ অধিকারিগণ এ মাসআলা বিশ্লেষণের জন্য শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবন তায়মিয়া প্রণীত 'الصارم المسلول على شاتم الرسول' গ্রন্থটি[২] অধ্যয়ন করতে পারেন। এটি এ বিষয়ের ওপর এক বিরাট গ্রন্থ।

মোটকথা, নবী করীম (সা) মনযিলে মনযিলে থেমে থেমে বন্দীদেরকে কাফেলার সাথে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছেন।

বদর যুদ্ধবন্দীদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহের নির্দেশ

মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে তিনি বন্দীদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং বলেন : اِسْتَوْصُوْا بِالْأُسَارٰى خَيْرًا "বন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।" (তাবারানীর 'কাবীর' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এবং হাফিয হায়সামী বলেন, এর সনদ হাসান)।

সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা এরূপ ছিল যে, যার কাছে বন্দী ছিল, তিনি প্রথমে বন্দীতে খেতে দিতেন এবং পরে নিজে খেতেন। আর খাবার যদি না বাচত, তখন খেজুরের উপর সন্তুষ্ট থাকতেন।

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৪০৭।

২ ছয়শত পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ কিতাবটি হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্যের 'দাইরাতুল মাআরিফ' কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছে, যাতে বদর যুদ্ধবন্দীদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহের নির্দেশ রয়েছে।

হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-এর আপন ভাই আবূ আযীয ইবন উমায়র বন্দীদের অন্যতম ছিল। সে বলেছে, আমি যে আনসারীর গৃহে ছিলাম, তাদের অবস্থা ছিল এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় তারা কমবেশি যে রুটি বানাতেন, তা আমাকে খাওয়াতেন এবং নিজেরা শুধু খেজুর খেতেন। আমি লজ্জা পেতাম এবং যতই পীড়াপীড়ি করতাম যে, আপনারা রুটি খেয়ে নিন, কিন্তু তারা তা মানতেন না, বরং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। হায়সামী বলেন, তাবারানী হাদীসটি তাঁর 'সাগীর' ও 'কাবীর' গ্রন্থে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন (মাজমুয়াউয যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ. ৮৬)।

বদর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ

মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছার কয়েকদিন পর নবী (সা) বদর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন যে, এদের কি করা উচিত। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (সা) বদর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মতামত জানার জন্য তাদের পরামর্শ চাইলেন। তিনি প্রথমে নিজে বললেন : ان الله امكنكم منهم "আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাদের ওপর তোমাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন।"

হযরত উমর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তাদের সবাইকে হত্যা করাই সঙ্গত। বিশ্ববাসীর জন্য রহমত দয়ালু নবী (সা) এ প্রস্তাব পসন্দ করলেন না এবং দ্বিতীয়বার বললেন : يا ايها الناس ان الله قد امكنكم وانما هم اخوانكم بالامس "ওহে লোক সকল![1] আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের উপর তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করেছেন। এরা ইতোপূর্বে তোমাদেরই ভাই ছিল।"

হযরত উমর (রা) পুনরায় একই আরয করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-ও আবার বললেন, আল্লাহ্ তাদের ওপর তোমাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন। আর ইতোপূর্বে এরা তোমাদেরই ভাই ছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার প্রস্তাব হলো, মুক্তিপণ নিয়ে এদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক (আহমদ

১. রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমেই ان الله امكنكم منهم। বলে 'ক্ষমা এবং অনুগ্রহ' প্রদর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কিন্তু হযরত উমর (রা) যখন হত্যার পরামর্শ দিলেন, তখন দ্বিতীয়বার অতিরিক্ত তাগিদের সাথে ক্ষমা এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনের শিক্ষা দিলেন যে, শাস্তিদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অপরাধী, বিশেষ করে নিজের ভাইকে ক্ষমা করা চরিত্রের উত্তম গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আর 'ইয়া' শব্দটি আরবী ভাষায় দূরবর্তীতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ওহে লোক সকল! যারা ক্ষমা প্রদর্শন থেকে দূরে আছ, তাদের উচিত ক্ষমা ও অনুগ্রহের নিকটবর্তী হওয়া। আর আল্লাহ্ শব্দের সাথে ইয়া শব্দ ব্যবহার করায় এ অর্থ দাঁড়ায় যে, "আয় আল্লাহ্! আমরা গুনাহগার, নিজেদের অযোগ্যতা ও অন্যায় কাজের কারণে আপনার রহমত থেকে দূরে সরে গিয়েছি। আপন অনুগ্রহ দ্বারা আমাদেরকে নিকটবর্তী করুন।" আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার শাহরগ থেকেও নিকটবর্তী কিন্তু এতটা নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আহ্বানে ইয়া শব্দের ব্যবহার দূরবর্তী আল্লাহকে আহ্বানের মতই, যা আমাদেরকে শেখানো হয়েছে।

বর্ণিত, আর হায়সামী বলেন, আহমদ হাদীসটি তাঁর শায়খ আলী ইবন আসিম ইবন সুহায়ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তিনি অনেক ভুল বলতেন বলে কেউ তাকে ভাল বলেননি। তবে আহমদের সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারিগণ সহীহ্)।[১]

সহীহ্ মুসলিমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিন, তারা যেন নিজ প্রিয়জনকে হত্যা করে। আলীকে বলুন, তিনি যেন তার ভাই আকীলকে হত্যা করে, আমাকে অনুমতি দিন, আমি আমার প্রিয় অমুককে হত্যা করি। এটা এজন্যে যে, এরা কাফিরদের জন্য অনুকরণীয় সর্দার।[২]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা সব আপনারই সম্প্রদায়ের লোকজন, আমার প্রস্তাব, তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিন। আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে ইসলামের পথ দেখাবেন এবং এরাই একদিন কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। রাসূল (সা) এ প্রস্তাবটি পসন্দ করলেন (সহীহ্ মুসলিম, وابحته الغنائم الا مداد بالملائكة فى غزوة بدر অধ্যায়)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর এবং হযরত উমর (রা)-এর প্রস্তাব শুনে ইরশাদ করেন, ওহে উমর! তোমার বৈশিষ্ট্য হযরত নূহ (আ) এবং হযরত মূসা (আ)-এর মত, যাঁরা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জন্য এ দু'আ করেছিলেন। হযরত নূহ (আ)-এর দু'আ ছিল :

رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَايَاراً - اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا اِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً ·

"হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্যে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। ওদের তুমি অব্যাহতি দিলে ওরা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির জন্ম দিতে থাকবে।" (সূরা নূহ : ২৬-২৭)

---

১. মাজমুয়াউয যাওয়ায়েদ, ৭খ. পৃ. ৮৭।

২ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-এর বর্ণনায় আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার পরামর্শ দেন। আর হযরত উমর (রা) বলেন : يَا رَسُوْلَ اللهِ كَذَّبُوْكَ وَاَخْرَجُوْكَ وَقَاتَلُوْكَ فَاضْرِبْ اَعْنَاقَهُمْ "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করেছে। কাজেই এদেরকে হত্যা করার আদেশ দিন।" (তিরমিযী, ২খ. পৃ. ৩৪, কিতাবুত তাফসীর; ১খ. পৃ. ২০৪, কিতাবুল জিহাদ, ماجاء فى المشورة অধ্যায়; মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ২১০)। এ রিওয়ায়াত মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, মুস্তাদরাক ইত্যাদিতে উল্লেখিত আছে। ইমাম তিরমিযী এ বর্ণনাকে হাসান এবং হাকিম বকে সহীহ বলেছেন (দুররে মানসূর, ৩খ. পৃ. ২০১)। **(সতর্ক বাণী)** এ পরামর্শে হযরত আলী (রা)-ও শরীক ছিলেন, যেমন সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে। কিন্তু কোন বর্ণনায়ই হযরত আলী (রা)-এর কোন প্রস্তাবের উল্লেখ নাই। মহান আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞ। -যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৪১।

আর মূসা (আ) এ দু'আ করেছিলেন :

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ·

"হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের সম্পদ বিনষ্ট কর, ওদের হৃদয় কঠিন করে দাও, ওরা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।" (সূরা ইউনুস : ৮৮)

আর হে আবূ বকর! তোমার বৈশিষ্ট্য হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর মত। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ ছিল :

فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ·

"সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সেই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা ইবরাহীম : ৩৬)

আর হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের দিন বলবেন :

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ·

"তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি ওদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মায়িদা : ১১৮)

নবী (সা) রাহমাতুল লিল আলামীন বিধায় তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রস্তাব পসন্দ করলেন এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

হাকিম বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ, হাফিয যাহাবীও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ২১)

হাফিয ইবন কাসীর বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১] তিনি সাহাবিগণের সাথে পরামর্শরত, এমন সময় ওহী অবতীর্ণ হলো যে, আপনি হত্যা অথবা ফিদয়া (মুক্তিপণ) গ্রহণের ব্যাপারে সাহাবিগণকে এখতিয়ার দিয়ে দিন। যেমন হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে আপনি সাহাবিগণকে এখতিয়ার দিয়ে দিন, ইচ্ছা করলে তারা তাদের হত্যা করুক কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিক। তবে শর্ত হলো, আগামী যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে সমপরিমাণ নিহত হবে। সাহাবীগণ কাফিরদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ এবং পরবর্তী বছর নিজেদের নিহত হওয়াকে গ্রহণ করলেন। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন হিব্বান ও হাকিম সহীহ সনদে হযরত আলী (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।[২]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৯৮।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৪৯।

'মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক' এবং 'মুসান্নাফে ইবন আবূ শায়বা'-য় হযরত আবূ উবায়দা (রা) থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল আমীন (আ) রাসীলুল্লাহ (সা) সমীপে এসে আরয করেন, আপনার রব বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে আপনাকে এখতিয়ার দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা আজ মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্তি দিতে চাই, যাতে করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি একগুণ বৃদ্ধি পায় এবং আগামী বছর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মাঝে যাকে চান শাহাদতের সম্মান ও মর্যাদা দান করে ধন্য করবেন।[1] ইবন সা'দের বর্ণনায় আছে, আগামী বছর আমাদের সত্তরজনের জান্নাত নসীব হবে (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৪)।[2]

মুক্তিপণ গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহর অসন্তুষ্টি

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের মুক্তিদানের নির্দেশ দেন। অপরাপর সাহাবিগণেরও মুক্তিপণ গ্রহণের পক্ষে মত প্রদানের কারণ এটাই ছিল যে, সম্ভবত এরা পরবর্তীতে মুসলমান হবে এবং ইসলামের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারীতে পরিণত হবে। আর মুক্তিপণ গ্রহণের ফলে নগদে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা জিহাদের জন্য ও অন্যান্য দীনী কাজে সহায়ক হবে। সম্ভবত মুক্তিপণ গ্রহণের পরামর্শদাতাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও থেকে থাকবেন, যাদের উদ্দেশ্য ছিল অর্থ-সম্পদ আহরণ, যার লক্ষ্য দুনিয়ার প্রতি মহব্বত। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলার দরবার থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং এ আয়াতে বলা হয় :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ্ চান পারলৌকিক কল্যাণ, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ণ বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, এজন্য তোমাদের ওপর মহাশাস্তি আপতিত হতো।" (সূরা আনফাল : ৬৭-৬৮)

এ অসন্তুষ্টির লক্ষ্য ছিলেন ঐসব ব্যক্তি, যারা বেশি বেশি আর্থিক লাভবান হওয়া ও পার্থিব উপকারিতাকে সামনে রেখে মুক্তিপণ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا বাক্য দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায়। অবশিষ্ট যে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ

১. দুররে মানসূর, ৩খ. পৃ. ২০৩।

২ তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ১৪।

শুধুই দীনী ও পারলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তারা প্রকৃতপক্ষে এ অসন্তোষের অন্তর্ভুক্ত নন। রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং দয়ার্দ্র-চিত্তের কারণে এ সিদ্ধান্ত পসন্দ করেন—যাতে অপরের আর্থিক লাভ হয়। আর পরের উপকার করার ইচ্ছা ছিল তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। নিজের জন্য আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ তাঁর কাছে খুবই অপসন্দনীয় ছিল। এ আয়াতে অসন্তুষ্টি ছিল ঐ লোকদের জন্য, যাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আর্থিক লাভের প্রতি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) অসন্তুষ্টির এ আয়াত শুনে কেঁদে ফেলেন। হযরত উমর (রা) কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বলেন :

ابکی للذی عرض علی اصحابك من اخذهم القداء لقد عرض علی عذاب هم ادنی من هذه الشجرة ·

"তোমার সঙ্গীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির বিধান এসেছে, এজন্যে আমি কাঁদছি। তাঁর আযাব আমার সামনে এ বৃক্ষের নিকটে পেশ করা হয়েছে।" (সহীহ্ মুসলিম, ২খ. পৃ. ৯৩)

দ্রষ্টব্য : আযাব কেবল দেখানো হয়েছিল, নাযিল হয়নি। এর উদ্দেশ্য ছিল কেবল সতর্ক করা। এরপর তিনি বলেন, এখন যদি এ আযাব আসত তা হলে উমর ছাড়া কেউই রেহাই পেত না। অপর এক বর্ণনায় 'এবং সা'দ ইবন মু'আয ছাড়া'-ও বলা হয়েছে।[১]

কেননা হযরত সা'দ ইবন মু'আযের ও এ পরামর্শই ছিল যে, তাদের হত্যা করা হোক। এজন্যে হযরত উমরের সাথে তাঁকেও পৃথক করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) যদিও মুক্তিপণ গ্রহণের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছিল ওদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হোক, যা শরীআত অপসন্দ করে। ফলে হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার উল্লেখ করা হয়নি। যেহেতু এ যুদ্ধ সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং কুফরীর মূলোৎপাটন করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ - لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ·

"আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদের নির্মূল করেন; এটা এজন্যে যে, তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধিগণ এটা পসন্দ করে না।" (সূরা আনফাল : ৭-৮)

এজন্যই এ যুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে হত্যা করার জন্য মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৪২।

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۔

"সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাদের কাঁধে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে।" (সূরা আনফাল : ১২)

অপর আয়াতে আবার ইরশাদ করেছেন :

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوْا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۤءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۔

"অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা ওদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন ওদেরকে কষে বাঁধবে, এরপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ এর অস্ত্র নামিয়ে ফেলে।" (সূরা মুহাম্মদ : ৪)

এরদ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেল যে, আল্লাহর শত্রুরা যতক্ষণ পর্যন্ত এতটা হতাহত না হবে, যাতে তারা অস্ত্র সমর্পণ না করে এবং সত্যের ভীতি ও প্রাবল্য তাদের মনে কম্পন ধরায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিপণ গ্রহণ বৈধ নয়। হ্যাঁ, তাদের মনে ইসলামের বিশালত্ব, ভীতি, প্রাবল্য ও মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে যদি ছেড়ে দেয়া হয়, তবে এতে কোন দোষ নেই।

এক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে, পর্যাপ্ত রক্তপাত ঘটানো হোক, যাতে তাদের মনে ইসলামের ভীতি ও শান-শওকতের স্থায়ী প্রভাব পড়ে এবং কুফরীর মূল উৎপাটিত হয়ে যায়। আর কুফর যেন ভবিষ্যতের জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে না পারে। মুসলমানগণ যেহেতু আল্লাহর দুশমনদের পর্যাপ্ত রক্তপাত করার পূর্বেই মুক্তিপণ গ্রহণ করেছে, এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবার থেকে তিরস্কার এসেছে।[1] কেননা এটা অনুগ্রহ প্রদর্শনের সময় ছিল না, বরং এটা ছিল নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা প্রদর্শনের সময়। আবূ তায়্যিব বলেন :

ووضع الندى فى موضى السيف بالعلى * مضركوضع السيف فى موضع الندى ۔

"তরবারির স্থানে ক্ষমা ও অনুগ্রহ রাখা এতই ক্ষতিকর, যেমন ক্ষতিকর ক্ষমা ও অনুগ্রহের স্থানে তরবারি রাখা। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই সমাজদেহের বিষ ফোঁড়া, সমাজ-দুশমনদের হত্যা এবং রক্তপাত ছাড়া শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।"

لـن يسلم الشرف الرفيع من الاذى * حتى يراق على جوانبه الدم

"অর্থাৎ উচ্চতর মর্যাদাও কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না, যতক্ষণ না এর চারপাশে রক্ত প্রবাহিত করা হয়।"

ইসলাম তো কেবল অপরাধীদেরই হত্যার নির্দেশ দেয়। কিন্তু যেসব রাষ্ট্র সভ্যতা-সংস্কৃতির দাবিদার, তারা কেবল নিজেদের আধিপত্যবাদী প্রভাব প্রতিষ্ঠার

১. আল্লামা জাসসাস প্রণীত 'আহকামুল কুরআন', ৩খ. পৃ. ৭২।

মানসেই অপরাধী ও নিরপরাধের মধ্যে কোনই পার্থক্য করে না। কোন বাছ-বিচার ছাড়াই গণহত্যার নির্দেশ দেয়, যার মধ্যে নিরপরাধ নারী-শিশু-বৃদ্ধ সবই অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর এ সংস্কৃতিবান সৈন্যদের দ্বারা যেসব নির্লজ্জ কার্যকলাপ প্রকাশ পায়, তা আজ পৃথিবীতে গোপন নেই। মেশিনগান, কামান ও বিমান থেকে নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে বোমাবাজি করে পূর্ণ শহরকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে ফেলা হয়।

আলহামদু লিল্লাহ্, ইসলাম এ ধরনের কসাইপনা, নির্দয়তা এবং সংকীর্ণতামুক্ত, পাক-পবিত্র। জিহাদে যাত্রাকালে ইসলাম এর অনুসারীদেরকে শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও সন্ন্যাসীদেরকে হত্যা করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করে।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব

সন্দেহ এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তো মুক্তিপণ বা হত্যা, যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল, তা হলে তিরস্কার কেন করা হল ? আল্লামা তায়্যিবী (র) শারহে মিশকাতে বলেন, এ অধিকার কেবল দৃশ্যত ও প্রতীকীরূপে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু মূলত প্রকৃতিগতভাবে এ অধিকারদান ছিল পরীক্ষাস্বরূপ যে, দেখা যাক ওরা আল্লাহর দুশমনদেরকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, নাকি পার্থিব সম্পদকে অগ্রাধিকার দেয়। যেমন নবী (সা)-এর সহধর্মিণিগণ একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট খোরপোষ বৃদ্ধির দাবি জানাতে থাকলে এ আয়াত নাযিল হয় :

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً - وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ·

"হে নবী! আপনি নিজ স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর ভূষণই কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং তোমাদেরকে সৌজন্যের সাথে বিদায় দিয়ে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরা আহযাব : ২৮–২৯)

এ আয়াতে দৃশ্যত যদিও নবী-সহধর্মিণিগণকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছে করলে তাঁরা পার্থিব জীবন ও এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য গ্রহণ করতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতকে গ্রহণ করতে পারেন; প্রকৃতপক্ষে এটা অধিকার দেয়া নয়, বরং এটা ছিল তাঁদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।

যাদুবিদ্যা শেখার জন্য হারূত ও মারূতের যেমন ব্যাবিলনে অবতরণ করা ছিল কেবল বিপর্যয়, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের জন্য, যাদু শেখা বা না শেখার অধিকার প্রদান সেখানে উদ্দেশ্য ছিল না।

এভাবে শবে মি'রাজে নবী (সা)-এর সামনে শরাব ও দুধের পাত্র উপস্থিত করা হলে তিনি দুধ গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তা হলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

সার-সংক্ষেপ : সার কথা হলো এই যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর ও অপরাপর সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা মুক্তিপণ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁরা কেবল দীনী ও পরকালীন কল্যাণ চিন্তার ভিত্তিতে তা দিয়েছিলেন। আর অন্যরা আর্থিক লাভকে সামনে রেখে মুক্তিপণ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ ভৎসনার আয়াত এজন্যে নাযিল হয়। আর ভর্ৎসনার প্রকৃত লক্ষ্য তারাই ছিল, যারা অধিক আর্থিক চিন্তাকে সামনে রেখেছিলেন। যেমন تُرِدْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا এ বাক্যদ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়। আর ভর্ৎসনার তাৎপর্য ছিল যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলের সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর ধ্বংসশীল সম্পদ এবং তুচ্ছ মালামালের প্রতি কেন দৃষ্টিপাত কর ? হে রাসূলের সাহাবিগণ! তোমাদের মত প্রাচীন ও মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চতর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীর জন্য এটা কখনই সমীচীন নয় যে, পার্থিব হালাল বস্তুর (মুক্তিপণ ও গনীমত) প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আর রাসূল (সা) যে মুক্তিপণের সিদ্ধান্ত পসন্দ করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং দয়ার্দ্রচিত্তের অভিব্যক্তি। আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, নবী (সা) এবং সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর সামনে আর্থিক উপকারিতার চিন্তা বিন্দুমাত্রও ছিল না। এজন্যে তাঁরা এ ভর্ৎসনার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। রাসূলের দৃষ্টিতে তো সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা একইরূপ। সেখানে মুক্তিপণের সামান্য কয়েকটি দিরহামের মূল্যই বা কতটুকু ?

তাৎপর্যপূর্ণ উপকারিতা : এ আয়াত দ্বারা কতিপয় আলিম দলীল পেশ করেন যে, নবী (আ)-গণও মানবিক জ্ঞানদ্বারা কোন কোনক্ষেত্রে ইজতিহাদ করেন এবং সে ইজতিহাদ যদি ভুল হয়ে যায়, মহান আল্লাহ্ তখন তাঁর নবীকে সে ভুল ইজতিহাদের ওপর স্থির থাকতে দেন না, বরং ওহীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে দেন। তবে নবী (আ)-গণের ইজতিহাদ আর মুজতাহিদগণের ইজতিহাদের মধ্যে আসমান-যমীন পার্থক্য থাকে। তা হলো এই যে, ওহী নাযিল হওয়ার পরও নবীর ইজতিহাদের ওপর আমল করা বাতিল হয়ে যায় না। যেমন রাসূল (সা) যুদ্ধবন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আয়াত নাযিল হওয়ার পরও তা কার্যকর থাকে এবং এতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়নি। আর নবী (সা)-ও হত্যা করার প্রতি ফিরে যাননি; বরং মুক্তিপণের ওপর স্থির ছিলেন। মুজতাহিদগণের বেলায় এর বিপরীতটি হয়ে থাকে। যদি তার ইজতিহাদের পর প্রকাশ পায় যে, আমার এ ইজতিহাদ অমুক সূত্রটির বিরোধী, তখন তার পূর্বকৃত ইজতিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন তার ওপর আবশ্যিক হয়ে যায়। জানা আবশ্যক যে, নবী-রাসূলগণের ইজতিহাদও এক ধরনের গুপ্ত ওহী। যেমন আল্লাহর বাণী : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ "নবীর অন্তরে

যে ওহী প্রেরণ করা হয়, তা ছাড়া তিনি নিজ থেকে কোন কথা বলেন না।" যদি আল্লাহ্ তা'আলা নবীর ইজতিহাদের ওপর চুপ থাকেন, তা হলে এটা গুপ্ত ওহীর পর্যায়ে এসে যায় এবং এর বিধানও তদ্রুপই, যেমন প্রকাশ্য ওহীর বিধান। আর যদি নবীর ইজতিহাদের বিরোধী কোন ওহী নাযিল হয়, তা হলে এ প্রকাশ্য ওহী সেই গুপ্ত ওহীর (অর্থাৎ নবীর ইজতিহাদ) বাতিলকারীরূপে গণ্য হয়। যেমন এক আয়াত অন্য আয়াতের এবং এক হাদীস অপর হাদীসের বাতিলকারী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দলীল এবং প্রকাশ্য ওহী গুপ্ত ওহীর (অর্থাৎ নবীর ইজতিহাদ) রদকারী হয়ে থাকে। এ বাতিল করার রহস্য আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহর নবী দলীলহীন কোন ব্যাপারে ইজতিহাদ করলে তা-ও আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য ইশারায়ই ছিল। আল্লাহ্ বলেন : اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ "(হে নবী) আপনি যে সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ দেন, তাও ছিল আল্লাহর ইচ্ছা ও ইঙ্গিতে।" অতঃপর আল্লাহর যে বিধান নাযিল হয়, তা-ও হয় আল্লাহরই নির্দেশে। প্রেক্ষাপট বা অপর কোন অজ্ঞাত কারণে এক নির্দেশ অপর নির্দেশের রহিতকারী। وَيَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তা কাজে পরিণত করেন; তিনি যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করেন।" নবীর ইজতিহাদে কোন ভুল হয়ে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলাই ওহীর সাহায্যে তা শুধরিয়ে দেন। আল্লাহ্ মাফ করুন, কোন মানুষের জন্যই এটা সম্ভব নয় যে, সে কোন নবীর ইজতিহাদে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার মৌনতা ও নিশ্চিতকরণের পর নবীর ইজতিহাদের বিচার বিশ্লেষণ করা সেরূপ কুফরী কাজ, যেমন প্রকাশ্য ওহীর ব্যাপারে এমনটি করা কুফরী। মু'মিনের বৈশিষ্ট্য এটাই যে,

زبان تاز کردن باقرار تو * نینکیختـن علت ارکارتو ٠

"এটা নবূওয়াতের স্তর এবং রিসালাতের দরবার, যেখানে আত্মপ্রবৃত্তির পক্ষে মাইল ও মনযিলসমূহ অতিক্রম করা অসাধ্য, সেখানে অসাধ্য পদচারণা করা পরিপূর্ণ পাগলামী ও মূর্খতা।"

نه هر جائ مرکب توان تاختـن * که جاها سپر بایداند اختـن ٠

এ মাসআলার ব্যাপারে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে জ্ঞান পিপাসুগণ অনুগ্রহ করে 'শারহে তাহরীরুল উসূল' এবং বাহরুল উলূম প্রণীত 'মুসাল্লামুস সুবূত' দেখুন।

অধিকন্তু জানা উচিত যে, হযরত নবী (আ)-গণের ইজতিহাদী ভুলের অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্ মাফ করুন, নবী (আ)-গণ হক ছেড়ে বাতিল গ্রহণের পাপ করে বসেছেন। বরং তাঁদের ভুলের অর্থ হলো, কোন সময়ে যদি ভুলক্রমে ভাল এবং উত্তমের পরিবর্তে নিম্নমানেরটা করে বসেন এবং অত্যাবশ্যকীয় কাজের পরিবর্তে ঐচ্ছিক কাজের ওপর আমল করে বসেন। যেমন হযরত দাঊদ (আ) এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর কিয়াস-এর ক্ষেত্রে দাঊদ (আ)-এর কিয়াসের চেয়ে সুলায়মান (আ)-এর কিয়াসকে অগ্রগামী ও উত্তম ঘোষণা করা। যে প্রকাশ্য ওহী সুলায়মান

(আ)-এর কিয়াসকে উত্তম বলেছে, এর অর্থ এ নয় যে, দাঊদ (আ)-এর কিয়াস ভুল ছিল। বরং এর অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহর নিকট সুলায়মান (আ)-এর কিয়াস দাঊদ (আ)-এর কিয়াসের তুলনায় বেশি উত্তম ও কল্যাণের অধিক নিকটবর্তী ছিল। এ দু' কিয়াসের মধ্যে আল্লাহ্ মাফ করুন, এমন সম্পর্ক ছিল না, যেমন সম্পর্ক হক ও বাতিলের মধ্যে হয়ে থাকে; বরং এমন ছিল, যেমনটি থাকে পূর্ণ ও পরিপূর্ণ, উত্তম এবং সর্বোত্তম, উন্নত ও সর্বোন্নতের মধ্যে। অথবা আবশ্যিক ও ঐচ্ছিকের মধ্যে হয়ে থাকে। হানাফী ফকিহগণ যেরূপ কিয়াসকে কিয়াসে হুল্লী ও কিয়াসে ইসতিহসান—এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, যার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ হলো দাঊদ (আ) এবং সুলায়মান (আ)-এর কিয়াস। এর অধম (লিখক) নবী (আ)-গণের ইজতিহাদী ভুলের যে অর্থ বর্ণনা করেছে, তা তার কল্পনা ও নিজস্ব ধারণা মনে করুন। সম্মানিত শিক্ষকগণ মূলের প্রতি মনোনিবেশ করুন, এ অধম তো কেবল মুখপাত্র।

মুক্তিপণের পরিমাণ

মুক্তিপণের পরিমাণ সামর্থ্যের ওপর এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত ছিল। আর যে ব্যক্তি নিঃস্ব ছিল, মুক্তিপণ দেয়ার সামর্থ্য ছিল না, তাকে কোন বিনিময় কিংবা পণ ছাড়াই মুক্তি দেয়া হয়। আর তাদের মধ্যে যারা লিখা জানত, তাদের জন্য এ শর্ত আরোপ করা হলো যে, প্রত্যেকে দশটি করে শিশুকে লিখা শেখানোর পর তারা মুক্তি পাবে। এটাই তাদের মুক্তিপণ। হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা) এভাবেই লিখা শেখেন (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৪, প্রথম অংশ; সীরাতে ইবন হিশাম, দ্র. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৪২)।[১]

বদর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে আবূ উয্যা আমর ইবন আবদুল্লাহ ইবন উসমানের মুক্তিপণ দেয়ার সামর্থ্য ছিল না। সে নবী (সা)-এর খিদমতে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার জানা আছে যে, আমি অভাবী এবং অনেক পোষ্যের অভিভাবক। কাজেই আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি অনুগ্রহ করলেন এবং কোন পণ ছাড়াই তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। তবে এ শর্ত আরোপ করলেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে আর কাউকে সাহায্য করতে যেও না। আবূ উযযা এ শর্ত মেনে নিল এবং নবী (সা)-এর প্রশংসা সূচক কিছু কবিতাও আবৃত্তি করল; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করল না। উহুদ যুদ্ধে সে কুফরীর কারণে নিহত হয়। অনুরূপভাবে মুত্তালিব ইবন হানতাব ও সাইফী ইবন আবূ রিফাআকেও বিনাপণে মুক্তি দেয়া হয়।[২]

কুরায়শ বাহিনীর বিপর্যস্ত ও পরাজিত হওয়ার সংবাদ যে সময় মক্কায় পৌঁছল, তখন সারা শহরে হুলস্থুল পড়ে গেল। মক্কায় সর্বপ্রথম গিয়ে পৌঁছে হায়সামান খুযাঈ; লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল : বল, খবর কি ? সে বলল, উতবা ইবন রবী'আ,

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৪২।

২ সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ., পৃ, ৩১।

শায়বা ইবন রবীআ, আবুল হাকাম ইবন হিশাম (অর্থাৎ আবূ জাহল), উমায়্যা ইবন খালফ, যামআ ইবন আসওয়াদ, হাজ্জাজের দু'পুত্র নবীয়া ও মনীয়া এবং কুরায়শের অমুক অমুক সর্দার এরা সবাই নিহত হয়েছে। সাফওয়ান ইবন উমায়্যা তখন হাতীমে বসা ছিল। সে এসব শুনে বলল, সম্ভবত এ ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে। পরীক্ষাচ্ছলে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ তো সাফওয়ান ইবন উমায়্যা কোথায়। হায়সামান বলল, এই তো সাফওয়ান ইবন উমায়্যা, হাতীমে বসে আছে। আমি নিজ চোখে তার পিতা ও ভাইকে নিহত হতে দেখেছি।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ রাফে আমাকে বলেছেন যে, আব্বাসের পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করেছিল, কিন্তু আমরা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম।

কুরায়শ বাহিনী যখন বদর যুদ্ধের জন্য বের হল, তখন থেকে আমরা সংবাদের অপেক্ষায় ছিলাম। হায়সামান খুযাঈ যখন এসে কুরায়শ বাহিনীর পরাজিত হওয়ার খবর শোনাল, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জয়লাভের খবরে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আমি তখন যমযম কূপের ছায়ায় বসে ছিলাম। আমার স্ত্রী উম্মে ফযলও সেখানে ছিল, এমন সময় আবূ লাহাবও এসে পড়ল।

লোকজন আবূ সুফিয়ান[২] ইবন হারিসকে সামনের দিক থেকে আসতে দেখে আবূ লাহাবকে বলল, এই যে আবূ সুফিয়ান, সে বদর থেকে ফিরে এসেছে। আবূ লাহাব আবূ সুফিয়ানকে ডেকে তার পাশে বসাল এবং বদরের অবস্থা জিজ্ঞেস করল। আবূ সুফিয়ান বলল :

والله ماهو الا ان لقينا القوم فمنحناهم اكتافنا يضعون السلاح منا حيث شاؤ اوياسروننا كيف شاؤ او ايم الله مع ذلك مالمت الناس لقينا رجالا بيضاء بيض على خيل بلق بين السماء والارض والله ما تلقين شيئا ولايقوم لها شيئ .

"আল্লাহর কসম, কোন খবর নেই, খবর কেবল একটিই, আমরা এক সম্প্রদায়ের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হই আর নিজেদের মাথাগুলো তাদেরকে দিয়ে দেই। যেভাবে ওরা চেয়েছে, সেভাবেই আমাদের প্রতি অস্ত্র চালিয়েছে, আর যেভাবে চেয়েছে, বন্দী করেছে। আল্লাহর কসম, এতদসত্ত্বেও আমি লোকদের ভর্ৎসনা করিনি। আল্লাহর

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ., পৃ. ৩১।

২ আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম আল-হাশিমী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাত ভাই এবং দুধভাই ছিলেন। তাঁকে এবং একে হযরত হালিমা সাদিয়া (রা) দুধপান করান। ইনি মক্কা বিজয়ের কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রসঙ্গেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস বেহেশতের যুবকদের সর্দার হবে। বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ মক্কা বিজয় অধ্যায়ে আসবে। ইসাবা, হযরত হারিস ইবন সুফিয়ান (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যায়।

কসম, বিরাটাকৃতির সাদা-কালো ঘোড়ার আরোহী আসমান ও যমীনের মাঝে ঝুলন্ত বিরাট আকৃতির মানুষ আমাদের মুকাবিলা করেছে। আল্লাহর কসম, তারা কোনকিছুই অবশিষ্ট রাখেনি আর তাদের সামনে কিছুই টিকতে পারেনি।"

قال ابو رافع قلت والله تلك الملائكة ·

"আবূ রাফে বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম, ওরা ফেরেশতা ছিল।"

এ কথা শোনামাত্র আবূ লাহাব এতটা রাগান্বিত হল যে, আমাকে একটা থাপ্পড় দিল এবং ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে মারার জন্য বুকের ওপর চড়ে বসল। আর আমি ছিলাম দুর্বল শরীরবিশিষ্ট। উম্মে ফযল উঠে এসে একটা কাঠ দিয়ে আবূ লাহাবের মাথায় এত জোরে আঘাত করল যে, মাথা যখম হয়ে গেল। আর বলল, ওর মুরব্বী আব্বাস উপস্থিত ছিল না বলে তুই একে এত দুর্বল ভেবেছিস।

এক সপ্তাহও অতিক্রান্ত হয়নি, আবূ লাহাব গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তার লাশ এতই দুর্গন্ধযুক্ত হল যে, কেউই তার কাছে যেতে পারছিল না। তিনদিন পর লোকলজ্জার ভয়ে তার ছেলেরা একটি গর্ত খুঁড়ে লাশটি লাঠির সাহায্যে গর্তে ফেলে মাটিচাপা দিল।[১] (হায়সামী বলেন, তাবারানী ও বাযযার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদে হুসায়ন ইবন উবায়দুল্লাহ নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন যাকে আবূ হাতিম বিশ্বস্ত বলেছেন এবং অন্যরা যঈফ বলেছেন। সনদের অপরাপর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য)।[২]

বলা হয়ে থাকে যে, আবূ লাহাবের যেখানে মৃত্যু ঘটেছে, ঐ স্থান অতিক্রমকালে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিতেন।[৩]

যেমন নবী করীম (সা) সামূদ জাতি ধ্বংস হওয়ার উপত্যকা অতিক্রম করার সময় চেহারা মুবারক কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতেন এবং সওয়ারীকে দ্রুত হাঁকাতেন। এটা এদিকে ইঙ্গিত যে, আযাবের স্থান অতিক্রমকালে এরূপই করা উচিত। উম্মুল মু'মিনীন (রা) এ সুন্নতের উপরই আমল করতেন।[৪]

কুরায়শগণ যখন নিজেদের আত্মীয় ও আপনজনের নিহত হওয়ার সংবাদ জানতে পেল, তখন শোকে মাতম শুরু করে দিল। একমাসব্যাপী এ মাতম চলতে থাকল। অবশেষে ঘোষণা করলো যে, কেউ যেন আর মাতম না করে। কেননা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছবে, তখন তারা খুবই আনন্দিত হবে। আর মুহাম্মদকে কেউ মুক্তিপণও দেবে না, যাতে তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়।[৫]

---

১. আল্লামা সুয়ূতী বলেন, এ হাদীসটি ইবন ইসহাক, ইবন সা'দ, ইবন খুযায়মা, হাকিম, বায়হাকী ও আবূ নুয়াইম বর্ণনা করেছেন। খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২০৭।

২. মাজমুয়াউয যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ. ৮৯।

৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৩০৯।

৪. যারকানী, ১খ. পৃ. ২৫২।

৫. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৫৩।

কিন্তু এ ঘোষণা ও আহ্বান সত্ত্বেও মুত্তালিব ইবন আবূ ওয়াদা কুরায়শদের লুকিয়ে চার হাজার দিরহাম নিয়ে রাতে মদীনায় যাত্রা করে। মদীনায় পৌঁছে তার পিতা ওয়াদাআর মুক্তিপণ দিয়ে পিতাকে মুক্ত করে এবং মক্কায় নিয়ে আসে। এরপর এ ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পায় এবং লোকজন মুক্তিপণ প্রেরণ করে নিজ নিজ বন্দীদেরকে মুক্ত করে আনে।[1]

ঐ বন্দীদের মধ্যে সুহায়ল ইবন আমরও ছিল। সে ছিল অত্যন্ত চতুর ও শুদ্ধভাষী। জনসমাবেশে নবী (সা)-এর নিন্দাবাদ করত। হযরত উমর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি সুহায়লের নিচের দু'টি দাঁত উপড়ে ফেলি, যাতে তার সামর্থ্যই না থাকে যে, কোন সুযোগে আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, ওকে ছেড়ে দাও, এটা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দ্বারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেন (বায়হাকী তাঁর দালাইলে এবং ইসাবা সুহায়ল ইবন আমর-এর জীবন চরিতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)। পরবর্তীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি তারই চেষ্টায় ও মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাকে আল্লাহ্ 'ফাতহুম মুবীন' বা প্রকাশ্য বিজয় বলেছেন। সুহায়ল মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইবন হিশামের বর্ণনায় আছে, নবী (সা) হযরত উমর (রা)-এর জবাবে বলেছিলেন : لَا أُمَثِّلُ بِهِ فَيُمَثِّلُ اللّٰهُ بِيْ وَاِنْ كُنْتُ نَبِيًّا "আমি কারো অঙ্গচ্ছেদ করি না, আল্লাহ্ না করুন তিনি আমারও অঙ্গচ্ছেদ করতে পারেন, যদিও আমি নবী।"

ঐ বন্দীদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান ইবন হারব-এর পুত্র আমরও ছিল। আবূ সুফিয়ানকে বলা হলো, তোমার পুত্রকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আন। আবূ সুফিয়ান জবাব দিল, এমনও হতে পারে যে, আমার লোকও মারা যাবে এবং মুক্তিপণও দেব। আমার এক পুত্র হানযালা তো নিহত হয়েছে, আর দ্বিতীয় পুত্র আমরের মুক্তিপণ দেব ? যতদিন পারে, ওরা কয়েদ করে রাখুক। ইতোমধ্যে সা'দ ইবন নু'মান আনসারী উমরার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কায় এলেন। আবূ সুফিয়ান নিজ পুত্রের বদলা হিসেবে তাকে আটক করল। আনসারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নবী (সা) আমর ইবন আবূ সুফিয়ানের বিনিময়ে সা'দকে ছাড়িয়ে আনলেন।[2]

ঐ কয়েদীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জামাতা আবুল আস ইবন রবীও ছিলেন। হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর গর্ভজাত এবং নবী (সা)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা) আবুল আসের স্ত্রী ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন আবুল আসের খালা। তাকে তিনি নিজ সন্তানের মত মনে করতেন। নবূওয়াত লাভের পূর্বে হযরত খাদীজা (রা) নিজেই নবী (সা)-এর অনুমতিক্রমে আবুল আসের সাথে হযরত যয়নবকে বিয়ে দেন। আবুল আস ছিলেন ধনী, বিশ্বস্ত ও বড় ব্যবসায়ী। নবূওয়াত

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ২৭।

২ প্রাগুক্ত।

পাওয়ার পর হযরত খাদীজা এবং তাঁর কন্যাগণ সবাই ঈমান আনলেও আবুল আস শিরকের ওপরই অবিচল থাকেন।

কুরায়শগণ আবুল আসকে অনেক চাপ দেয় যে, আবূ লাহাবের পুত্রদের মত তুমিও মুহাম্মদের মেয়েকে তালাক দাও। তুমি যেখানে চাইবে, সেখানেই আমরা তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু আবুল আস পরিষ্কার অস্বীকার করেন এবং বলে দেন যে, যয়নবের মত সম্ভ্রান্ত মহিলার বিপরীতে আমি দুনিয়ার কোন মেয়েকেই পসন্দ করি না।

কুরায়শগণ যখন বদর যুদ্ধের জন্য যাত্রা করে, তখন রাসূল-জামাতা আবুল আসও তাদের সহগামী হন এবং অন্যান্য বন্দীদের সাথে তিনিও বন্দী হন। মক্কাবাসী যখন নিজ নিজ বন্দীদের মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ প্রেরণ করতে থাকে, তখন যয়নব (রা)-ও তাঁর স্বামী আবুল আসকে মুক্ত করার জন্য ঐ হারটি প্রেরণ করেন, যা তাঁদের বিয়ের সময় হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) এ হারটি দেখে ব্যথিত হলেন এবং সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা ভাল মনে করলে এ হারটি ফিরিয়ে দাও এবং ঐ বন্দীকেও ছেড়ে দাও।

তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণ তা মঞ্জুর করেন এবং কয়েদীকে ছেড়ে দেয়া হয় ও হারও ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) আবুল আস থেকে এ ওয়াদা নেন যে, মক্কায় পৌঁছে তিনি হযরত যয়নবকে মদীনায় পৌঁছিয়ে দেবেন। আবুল আস মক্কায় পৌঁছে হযরত যয়নবকে মদীনায় যাওয়ার অনুমতি দেন এবং আপন ভাই কিনানা ইবন রবীকে তাঁর সাথে দেন।

কিনান ভরদুপুরে হযরত যয়নবকে উটে আরোহণ করায়, নিজ হাতে তীর-ধনুক নিয়ে নেয় এবং যাত্রা শুরু করে। নবী (সা)-এর কন্যার ন্যায় উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিত্বের মক্কা থেকে চলে যাওয়া কুরায়শদের কাছে লজ্জাকর মনে হলো। কাজেই আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্যরা যী-তুয়ায় এসে উটের গতি রোধ করল এবং বলল, মুহাম্মদ-এর কন্যার চলে যাওয়ায় আমাদের আপত্তি নেই, তবে এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে চলে যাওয়া আমাদের জন্য অপমানকর। উত্তম হবে, তুমি এখন মক্কায় ফিরে চল এবং রাতের বেলা তাকে নিয়ে চলে যেও। কিনানা এ পরামর্শ গ্রহণ করল। আবূ সুফিয়ানের পূর্বে হাব্বার ইবন আসওয়াদ (যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন) গিয়ে উটের গতি রোধ করে এবং হযরত যয়নবকে ভয় দেখায়। ভয়ে হযরত যয়নবের গর্ভপাত ঘটে যায়। ঐ সময় কিনানা তার তীর-ধনুক ঠিক করে নেয় এবং বলে, যে ব্যক্তিই উটের নিকটবর্তী হবে, তাকে চালুনীর মত ঝাঝরা করে ফেলব। অতঃপর কিনানা মক্কায় ফিরে আসে এবং দু'-তিন রাত পর একদা রাতের বেলা মদীনা রওয়ানা হয়।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) এবং অপর এক আনসারী সাহাবীকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা বাতনে ইয়াজ্জে অপেক্ষা করবে এবং যখন যয়নব আসবে, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

এঁরা বাতনে ইয়াজ্জে পৌঁছেন আর ওদিকে কিনানা ইবন রবী এসে মিলিত হয়। কিনানা সেখান থেকেই ফিরে যায় এবং হযরত যায়দ ইবন হারিসা ও তাঁর সঙ্গী হযরত যয়নবকে নিয়ে মদীনায় যাত্রা করেন। বদর যুদ্ধের একমাস পর তাঁরা মদীনায় পৌঁছেন।

নবীদুহিতা নবীজীর কাছে অবস্থান করেন এবং আবুল আস মক্কায়ই বাস করতে থাকে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। যেহেতু তার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার ওপর মক্কাবাসীর আস্থা ছিল, সুতরাং অন্যান্য লোকের পণ্যও তার বাণিজ্যে শামিল হয়।

সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুসলমানদের একটি বাহিনীর সাথে সাক্ষাত হয়। তারা তার সকল মাল-মাত্তা, বাণিজ্য সম্ভার আটক করে। আবুল আস চুপিসারে মদীনায় হযরত যয়নবের নিকট এসে উপস্থিত হন।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ফজরের নামাযের জন্য আগমন করেন, তখন হযরত যয়নব (রা) মহিলা চত্বর থেকে আওয়াজ দেন, ওহে লোক সকল! আমি আবুল আস ইবন রবীকে আশ্রয় দিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামায শেষ করলেন, তখন লোকজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন :

اَيُّهَا النَّاسُ هَلْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ قَالُوا نَعَمْ - قَالَ مَا وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهٖ مَا عَلِمْتُ بِشَئٍ مِّنْ ذٰلِكَ حَتّٰى سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمْ اَنَّهٗ يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَدْنَاهُمْ ·

"ওহে লোক সকল! যা আমি শুনেছি, তা কি তোমরাও শুনেছ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর পবিত্র হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, এ ব্যাপারে আমার পূর্বে কিছুই জানা ছিল না, যা এবং যখন তোমরা শুনলে, আমিও তখনই শুনেছি। তবে খুব ভাল করে জেনে রাখ, মুসলমানদের মধ্যে ছোট থেকে ছোট এবং নিম্ন থেকে নিম্ন কোন ব্যক্তিও যে কাউকে আশ্রয় দিতে পারে।"

এ কথা বলে তিনি স্বীয় কন্যার ঘরে গেলেন এবং বললেন, ওহে কন্যা, ওকে সম্মান কর কিন্তু ওর সাথে মিলিত হয়ো না, কেননা তুমি তার জন্য বৈধ নও। অর্থাৎ তুমি মুসলমান আর সে মুশরিক ও কাফির। এছাড়া সেনাদলকে বললেন, আমাদের সাথে এ ব্যক্তির (আবুল আসের) সম্পর্ক কি, তা তোমাদের জানা। যদি তোমরা উপযুক্ত মনে কর, তা হলে তার মাল তাকে ফেরত দাও। অন্যথায় তা দান কর, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন এবং তোমরা এর হকদার।

এ কথা শোনামাত্র সাহাবিগণ সমুদয় মাল ফেরত দিয়ে দিলেন। কেউ বালতি নিয়ে আসছিলেন, কেউ রশি, কেউ লোটা আর কেউ চামড়ার টুকরা। মোট কথা, সমুদয় মালই তারা পাই পাই ফেরত দিলেন।

আবুল আস সমুদয় মাল নিয়ে মক্কায় এলেন এবং যার যা অংশ ছিল, তা পুরোপুরি দিয়ে দিলেন। যখন অংশীদারের অংশ দিয়ে দিলেন, তখন বললেন :

يا معشر قريش هل بقى لاحد منكم عندى مال ياخذه قالو الافجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما - قال فاذا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله والله ما منعنى مت الاسلام عنده الا تخوف ان اكل اموالكم فلما اداها الله اليكم وفرغت منها اسلمت ·

"ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! কারো কোন মালের অংশ কি বাকী রয়েছে যা আমার থেকে গ্রহণ করনি ? কুরায়শগণ বলল, না, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। অবশ্যই আমরা তোমাকে বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত হিসেবে পেয়েছি। তিনি বললেন, এরপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রভু নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এ যাবত আমি কেবল এজন্যে মুসলমান হইনি যে, লোকজন ধারণা করতে পারে, আমি তাদের মালামাল আত্মসাতের উদ্দেশ্যে এমনটি করেছি। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মালামাল তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং আমি এ যিম্মা থেকে মুক্ত হয়েছি, তখন মুসলমান হলাম।"

এরপর আবুল আস মদীনায় চলে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যয়নবকে তার স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে দেন।[১]

কিছু কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রথম বিয়েই যথেষ্ট মনে করা হয়, নতুন করে কোন বিয়ে হয়নি। আর কতিপয় বর্ণনায় এর বিপরীত পাওয়া যায়, অর্থাৎ পুনরায় বিয়ে হয়েছে। আর ফকীহগণের কাছে এ বর্ণনাই বিশুদ্ধ। কেননা যদি প্রথম বিয়েই যথেষ্ট হতো, তা হলে তিনি স্বীয় কন্যাকে বলতেন না যে, তুমি তার জন্য বৈধ নও।

ঐ বন্দীদের দলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাসও ছিলেন, যাকে কা'ব ইবন আমর ইবন লুবাবা (রা) গ্রেফতার করেছিলেন। হযরত আব্বাস ছিলেন শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী আর আবুল ইয়াসির (রা) ছিলেন খর্বকায়, দুর্বল ও ক্ষীণদেহী। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ওহে আবুল ইয়াসির! তুমি কিভাবে আব্বাসকে গ্রেফতার করলে ?

আবুল ইয়াসির (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জনৈক ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করেছেন, যাকে আমি পূর্বে কখনো দেখিনি, আর পরেও নয়। তার আকার-আকৃতি এমন এমন ধরনের ছিল। তিনি বললেন : لقد اعانك عليه ملك كريم "নিশ্চয়ই একজন সম্মানিত ফেরেশতা তোমাকে সাহায্য করেছেন।"

আর 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' হযরত আলী (রা) থেকে এবং এছাড়া বিভিন্ন সনদেও এটি বর্ণিত হয়েছে। 'মু'জামে তাবারানী'তে স্বয়ং হযরত ইয়াসির (রা) থেকে এবং 'মুসনাদে আহমদে' হযরত বারা ইবন আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ২৮।

'ফাতহুল বারী'তে شهود الملائكة ببدر অধ্যায়ের পর হাফিয হায়সামী বলেছেন. হাদীসটি আহমদ ও বাযযার বর্ণনা করেছেন। হারিসা ইবন মুযরাব ছাড়া তাঁর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য; তবে 'মাজমুয়াউয যাওয়াইদে'র বদর যুদ্ধ অধ্যায়ে তাকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে।

হযরত আব্বাসের বাঁধন কিছুটা শক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত আব্বাসের আওয়াজ শুনলেন, তাঁর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। আনসারিগণ তা জানতে পেরে তাঁকে বাঁধনমুক্ত করে দিলেন। অধিকন্তু আরয করলেন, নবী (সা) যদি অনুমতি দেন তাহলে আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রকে[১] মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেই ? তিনি জবাব দিলেন : والله لا تذرن منه درهما "আল্লাহর কসম, তার থেকে এক দিরহামও ছেড়ো না।"

হযরত আব্বাসের কাছে যখন মুক্তিপণ চাওয়া হলো, তখন তিনি তা পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করলেন। নবী (সা) বললেন, আচ্ছা ঐ মাল কোথায় যা আপনি এবং আপনার স্ত্রী উম্মে ফযল মিলে পুঁতে রেখেছিলেন ?

এ কথা শোনামাত্র হযরত আব্বাস বলে উঠলেন, নিঃসন্দেহে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আমি এবং উম্মে ফযল ছাড়া ঐ মালের সংবাদ কারোই জানা ছিল না। হাকিম বলেন, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ (মুস্তাদরাক, হযরত আব্বাসের জীবন চরিত)। দালাইলে আবূ নুয়াইমে হাসান সনদে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আব্বাসের জন্য একশ' উকিয়্যা এবং ফযল ইবন আব্বাসের জন্য আশি উকিয়্যা[২] মুক্তিপণ ধার্য করেন (সমস্ত বন্দীর মধ্যে হযরত আব্বাসের মুক্তিপণ ছিল সবচে' বেশি)।

হযরত আব্বাস আরয করলেন, আপনার নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে কি আমার মুক্তিপণ এত বেশি ধার্য করলেন ? (অর্থাৎ আত্মীয়তার দাবি তো এটাই ছিল যে, আমার মুক্তিপণে কিছুটা ছাড় দেয়া, কিন্তু ছাড় দেয়ার পরিবর্তে আপনি আমার মুক্তিপণ সব থেকে বেশি ধার্য করলেন)। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِىْ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

---

১. আনসারিগণ হযরত আব্বাসকে তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র এজন্যে বলেছিল যে, হযরত আব্বাসের দাদী আবদুল মুত্তালিবের মাতা আনসারীদের মধ্য থেকে ছিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৪৮)। আর ভ্রাতুষ্পুত্র বলার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, তাকে মুক্তিপণ থেকে অব্যাহতি দান করার অনুগ্রহের হক আমাদের ওপর বর্তায়, নবী (সা)-এর প্রতি নয়। এজন্যে যে, আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ার কারণে আমরা তার মুক্তিপণ ছেড়ে দিতে চাই, নবী (সা)-এর চাচা হওয়ার সুবাদে নয়। এটা আনসারীগণের মহানুভবতা ও সদাচরণের বহিঃপ্রকাশ ছিল। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

২ চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়্যা হয়।

"হে নবী, তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের নিকট থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে, তা থেকে উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আনফাল : ৭০)

হযরত আব্বাস (রা) পরবর্তীতে বলতেন, যদি তখন আমার থেকে দ্বিগুণ হারে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হতো, তবে সেটাই ভাল ছিল ![১] আল্লাহ তা'আলা আমার থেকে যা নিয়েছেন, তার থেকে উত্তম ও অতিরিক্ত আমাকে দিয়েছেন। একশ' উকিয়্যার পরিবর্তে তিনি আমাকে একশ' গোলাম দান করেছেন, যাদের প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা দুনিয়াতেই পূরা করেছেন। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্ষমা করার ওয়াদা, যার আমি প্রত্যাশী।[২]

এ অধম (গ্রন্থকার) বলে (আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন), আল্লাহর দ্বিতীয় ওয়াদাও অবশ্যই পূর্ণ হবে। اِنَّ اللّٰهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَاد "নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।" আর এ বাক্য কেবল বরকত লাভের জন্য বলছি, সম্পৃক্ততার জন্য নয়।

বদরের বন্দীদের মধে নওফেল ইবন হারিসও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাকে মুক্তিপণ দিতে বললেন, তখন সে বলল, আমার কাছে এমন কিছুই নেই, যা দিয়ে মুক্তিপণ দিতে পারি।

তিনি বললেন, ঐ বর্শাগুলো কোথায়, যা তুমি জেদ্দায় ছেড়ে এসেছ ? নওফেল বলল, আল্লাহর কসম, কেবল আল্লাহ্ ব্যতীত আমি ছাড়া আর কেউই এটা জানত না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। নওফেল (রা) ঐ বর্শাগুলো মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেন, যার সংখ্যা ছিল এক হাজার। নবী (সা) হযরত আব্বাস এবং হযরত নওফেলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বেঁধে দেন। আর জাহিলী যুগেও এঁরা দু'জন পরস্পর বন্ধু এবং বাণিজ্যের অংশীদার ছিলেন। (মুস্তাদরাক, নওফেল ইবন হারিসের জীবন চরিত)।

উমায়র ইবন ওহাব ছিল ইসলামের চরমতম দুশমনদের একজন। মক্কায় অবস্থানকালে সে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণকে চরম কষ্ট দিত। বন্দীদের মধ্যে তার পুত্র ওহাব ইবন উমায়রও ছিল।

একদিন ওহাব ইবন উমায়র এবং সাফওয়ান ইবন উমায়্যা হাতিমে উপবিষ্ট ছিল। সাফওয়ান বদর যুদ্ধে নিহতদের স্মরণ করে বলল, এখন আর জীবনের কোন স্বাদই নেই। উমায়র বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, কুরায়শ নেতাদের নিহত হওয়ার পর বাস্তবে জীবনের স্বাদই চলে যাচ্ছে। যদি আমার ধার-দেনা এবং সন্তানদের চিন্তা না থাকত, তা হলে এখনই গিয়ে মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করে আসতাম। এতে সাফওয়ান খুবই খুশি হল এবং বলল, তোমার দায়-দেনা এবং সন্তান-সন্তুতির দেখাশোনার ভার

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৪৮।

২. দুররে মানসূর, ৩খ. পৃ. ২০৪।

আমার যিম্মায় রইল। সাফওয়ান তখনই তরবারিতে ধার দিল এবং তাতে বিষ মাখিয়ে উমায়রকে দিয়ে দিল। উমায়র মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হলো এবং মসজিদে নববীর দরজায় গিয়ে উটকে বসিয়ে দিল।

হযরত উমর (রা) উমায়রকে দেখামাত্র বুঝে ফেললেন, এ কোন অপবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। তৎক্ষণাৎ হযরত উমর (রা) তার তরবারির খাপ ছিনিয়ে নিলেন এবং তাকে পাকড়াও করে নবী (সা)-এর সামনে হাযির করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমর (রা)-কে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। আর উমায়রকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন এসেছ ? উমায়র বলল, আমাদের বন্দীদের ছাড়িয়ে নিতে এসেছি। তিনি বললেন, সত্যি করে বল, তুমি কি কেবল এ উদ্দেশ্যেই এসেছ ? সত্যি করে বল দেখি, তুমি এবং সাফওয়ান হাতিমে বসে কি পরামর্শ করেছিলে ? উমায়র ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আমি আবার কি পরামর্শ করেছিলাম ! তিনি বললেন, তুমি এ শর্তে আমাকে হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলে যে, সাফওয়ান তোমার সন্তান-সন্তুতির দেখাশোনা করবে এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবে। উমায়র বলল :

اشهد انك رسول الله - ان هذا الحديث كان بينى وبين صفوان فى الحجر لم يطلع عليه احد غيرى وغيره فاخبرك به فامنت بالله ورسوله ·

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। এ ঘটনা তো সাফওয়ান ও আমি ছাড়া আর কেউই জানত না, কাজেই আল্লাহই আপনাকে এ খবর দিয়েছেন। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম।"

'মুজামে তাবারানী'তে বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে এবং 'দালাইলে বায়হাকী' ও 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' মুরসাল সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে।[১]

ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতে আছে যে, উমায়র বলেছিল :

والله انى لاعلم ما اتاك به الا الله فالحمد لله الذى هدانى للاسلام وساقنى هذاالمساق ثم تشهد ·

"আল্লাহর কসম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ ছাড়া কেউই আপনাকে এ ঘটনার সংবাদ দেয় নি; সুতরাং আমি সেই আল্লাহর শোকর করছি, যিনি আমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং এখানে টেনে এনেছেন। এরপর উমায়র কালেমা শাহাদত পাঠ করেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের ভাইকে দীন বুঝাও, কুরআন পাঠ করাও এবং তার বন্দীদের ছেড়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদেরকে উমায়র (রা)-এর কাছে সমর্পণ করা হলো।

উমায়র (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আল্লাহর নূর নিভিয়ে দেয়ার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি এবং যাঁরা আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের দীন গ্রহণ করেছিলেন

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২০৮।

তাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমাকে এখন অনুমতি দিন, মক্কায় ফিরে গিয়ে আমি লোকদের আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পথে আহ্বান করি এবং ইসলামের দাওয়াত দিই, সম্ভবত আল্লাহ ওদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং আল্লাহর দুশমনদেরকে নির্যাতন করি, যেমন ইতোপূর্বে আল্লাহর বন্ধুদের নির্যাতন করেছি। নবী (সা) তাকে অনুমতি দান করেন।

উমায়র যখন মদীনায় যাত্রা করেন, তখন সাফওয়ান ইবন উমায়্যা লোকদের বলে বেড়াচ্ছিল, লোক সকল, কয়েকদিনের মধ্যেই আমি তোমাদেরকে এমন একটি সুসংবাদ দেব যা তোমাদেরকে বদরের দুঃখ ভুলিয়ে দেবে। আর সে সকল স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগতকে উমায়রের খবর জিজ্ঞেস করে আসছিল। এমনকি উমায়রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদও এসে গেল। সাফওয়ান এ সংবাদ শোনামাত্র ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ল এবং শপথ করল যে, আল্লাহর কসম, উমায়রের সাথে কোন কথাই বলব না, আর তার কোন উপকারও করব না। উমায়র মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর মাধ্যমে অনেক লোক মুসলমান হলো। আর যে সমস্ত ব্যক্তি ইসলামের দুশমন ছিল, তাদেরকে তিনি যথেষ্ট নির্যাতন করলেন।

প্রথম ঈদের নামায

বদর থেকে ফিরে আসার পর পয়লা শাওয়াল নবী ঈদের নামায আদায় করেন। এটা ছিল প্রথম ঈদুল ফিতরের নামায (যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৫৪)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা

হযরত আলী (ক) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাতিব ইবন আবূ বালতাআ (রা)-এর ঘটনায় (বিস্তারিত ঘটনা ইনশা আল্লাহ সামনে আসবে) হযরত উমর (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন :

لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعلموا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ·

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সুনজর[1] দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন, তোমরা যা খুশি কর, জান্নাত তোমাদের জন্য অবধারিত রয়েছে।" (বুখারী শরীফ, فضل من شهد بدر অধ্যায়)।

আল্লাহ ক্ষমা করুন, اِعْلَمُوْا مَا شِئْتُمْ। (যা খুশি কর) আয়াত দ্বারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে গুনাহের কাজের অনুমতি দান করা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁদের সত্য পরায়ণতা ও নিষ্ঠা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলার দরবারে বদরে অংশগ্রহণকারীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, ভালবাসা এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী

---

১. মুসনাদে আহমদ, সুনানু আবূ দাউদ এবং মুসান্নাফে ইবন আবূ শায়বায় لعل الله اطلع পরিবর্তে ان الله اطلع على اهل بدرا। বাক্য এর সাথে বর্ণনায় এসেছে। এ জন্যে অর্থ করতে গিয়ে 'অবশ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩৭।

গৃহীত হয়েছিল। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ভালবাসা এবং আনুগত্য থেকে তাঁদের পদস্খলন ঘটেনি, তাঁদের অন্তর ছিল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের মহব্বত ও আনুগত্যে আপ্লুত। পাপ ও অবাধ্যতার কোন অবকাশই তাঁদের অন্তরে ছিল না। মানুষ হিসেবে স্বভাবজাত কোন পাপ ঘটে গেলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করতেন। মোট কথা, বদরে অংশগ্রহণকারিগণ যা কিছুই করুন না কেন, জান্নাত তাঁদের উপর ওয়াজিব হয়ে আছে। আনুগত্য করলে তো জান্নাত অবশ্যম্ভাবী, আর মানবীয় প্রবৃত্তির দরুন কোন পাপকাজ করে বসলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা, ইস্তিগফার, অনুশোচনা ও কান্নাকাটি করবেন, যদ্দরুন তাঁদের জন্য ক্ষমা ও জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। বরং আশ্চর্য নয় যে, এতে তাঁদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাবে, যেমন হযরত আদম (আ)-এর তাওবার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। (বিস্তারিতের জন্য মাদারিজুস সালিকীন দেখুন)।

আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে اعْلَمُوْا مَا شِئْتُمْ -এর সম্বোধন ঐ মহাত্মাগণের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, যাঁদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা, প্রভাব, ভয়-ভীতি, আকর্ষণ ও শংকায় প্রভাবিত। আর জান্নাতের সুসংবাদ তাঁদেরকেই দেয়া হয়, যাঁরা সব সময় অন্তরে নিফাকের আশঙ্কায় শংকিত থাকেন। (হাফিয ইবন কাইয়্যেম তাঁর আল-ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন, এটাই তার সার- সংক্ষেপ)।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি বদরে অংশগ্রহণ করেছে, সে কখনই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" (হাদীসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সনদ মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। ফাতহুল বারী, فضل من شهد بدر অধ্যায়)।

হযরত রিফাআ রাফে (রা) বলেন, একবার হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি বদরে অংশগ্রহণকারীদের কেমন মনে করেন? তিনি বললেন, সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ও উত্তম। জিবরাঈল (আ) বললেন, অনুরূপভাবে ঐ ফেরেশতাগণ, যাঁরা বদরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সমস্ত ফিরিশতা অপেক্ষা মর্যাদাশীল ও উত্তম। (সহীহ বুখারী, شهود الملائكة بدرا অধ্যায়)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সাহাবী (রা)-এর সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, যার মধ্যে তিনশ' তের সংখ্যাটি প্রসিদ্ধ।

সন্দেহ ও মতভেদের কারণে মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। হাফিয ইবন সায়্যিদুন-নাস এ সমুদয় মতবাদকে একত্র করে তিনশ' তেষট্টি নাম উল্লেখ করেছেন যাতে কোন মতামতের ভিত্তিতে কারো নাম বাদ পড়ে না যায়। সাবধানতা বশত তিনি এর সবগুলো উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, বদরে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা তিনশ' তেষট্টিজন। মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে বাযযার এবং মুজামে তাবারানীতে

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বদরে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল তিনশ' তেরজন।

হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বদর অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন কিছুদূর গিয়ে সাহাবিগণকে গণনা করার নির্দেশ দেন। গণনা করার পর দেখা গেল এ সংখ্যা ছিল তিনশ' চৌদ্দ। তিনি বললেন, পুনরায় গণনা কর । দ্বিতীয়বার গণনাকালে দেখা গেল, দূর থেকে একটি কৃশ উটে সওয়ার হয়ে এক ব্যক্তি আসছে। তাকে নিয়ে তিনশ' পনেরজন হল। (বায়হাকী কর্তৃক হাসান সনদে বর্ণিত)

বর্ণনা এ তিনটি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বর্ণনা একইরূপ। কেননা যদি ঐ শেষে আগত ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গণনায় শামিল করা হয়, তা হলে এ সংখ্যা ছিল তিনশ' পনর, আর যদি ঐ ব্যক্তি এবং নবী করীম (সা)-কে সাহাবীগণের সাথে গণনা করা না হয়, তা হলে এ সংখ্যা তিনশ' তের ছিল। এ সফরে কিছু সংখ্যক অল্প বয়স্ক বালকও তাঁদের সঙ্গী হয়েছিল, যেমন হযরত বারা ইবন আযিব, আবদুল্লাহ ইবন উমর, আনাস ইবন মালিক, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) প্রমুখ, কিন্তু তাঁদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি।

যদি এ অল্পবয়স্ক বালকদেরও গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা হলে এ সংখ্যা তিনশ' উনিশ হয়ে যায়। যেমন সহীহ মুসলিমে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, বদরে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল তিনশ' উনিশ।

হযরত বারা ইবন আযিব (রা) বলেন, বদরের দিন আমাকে এবং ইবন উমরকে ছোট মনে করা হয়। ঐ দিন মুহাজির ছিলেন ষাটের কিছু বেশি এবং আনসার ছিলেন দু'শো চল্লিশের কিছু বেশি। (বুখারী)

হযরত বারা ইবন আযিব (রা) বলেন, আমরা বলতাম বদরে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা তিনশ' দশের কিছু বেশি ছিল, তালূতের সাথে যাঁরা নহর অতিক্রম করেছিলেন, তাঁদের সমসংখ্যক। আর আল্লাহর কসম, নহর তাঁরাই পার হয়েছিলেন, যাঁরা ছিলেন পাক্কা মুমিন এবং নিষ্ঠাবান। (বুখারী)

এ সমুদয় বর্ণনা ফাতহুল বারীতে عدة اصحاب بدر। অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে।[1]

আল্লামা সুহায়লী বলেন, বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সহায়তার জন্য সত্তরজন জিন্নও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আট ব্যক্তি এমন ছিলেন, যাঁরা কোন কারণবশত বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি, কিন্তু তাঁদেরকে বদরে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে গণনা করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে গনীমতের মালের অংশ দিয়েছেন। (তাঁরা ছিলেন) :

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২২৬।

১. হযরত উসমান ইবন আফফান (রা), হযরত রুকাইয়্যা (রা)-এর পরিচর্যার জন্য রাসূল (সা) তাঁকে মদীনায় রেখে যান।

২-৩. হযরত তালহা এবং হযরত সা'দ ইবন যায়দ (রা), এ দু'জনকে রাসূলুল্লাহ (সা) গোপনে কুরায়শ কাফেলার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন।

৪. হযরত আবূ লুবাবা আনসারী (রা), যাঁকে নবী (সা) রুমা নামক স্থান থেকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে মদীনায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

৫. হযরত আসিম ইবন আদী (রা), যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার উচ্চাংশের তত্ত্বাবধানের জন্য রেখে গিয়েছিলেন।

৬. হযরত হারিস ইবন হাতিব (রা), বনী আমর ইবন আউফ থেকে নবী (সা)-এর কাছে কোন গোপন সংবাদ পৌঁছেছিল, এ জন্যে তিনি হযরত হারিস ইবন হাতিব (রা)-কে বনী আমর ইবন আউফের প্রতি প্রেরণ করেন।

৭. হযরত হারিস ইবন সাম্মা (রা), আঘাত পাওয়ায় তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) রাওহা নামক স্থান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

৮. হযরত খাওয়াত ইবন জুবায়র (রা), পায়ের গোছায় আঘাত পাওয়ায় তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) সাফরা নামক স্থান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

এটা ইবন সা'দের বর্ণনা। মুস্তাদরাকে হাকিমে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জাফর (রা)-কেও অংশ দেন, যিনি সে সময় আবিসিনিয়ায় অবস্থান করছিলেন। আরো বলা হয় যে, হযরত সা'দ ইবন মালিক, অর্থাৎ হযরত সাহল (রা)-এর পিতা পথিমধ্যে ইনতিকাল করেন এবং হুজ্জার মুক্ত দাস হযরত সুবাইহ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুন তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়।[১]

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী (রা)-গণের নামের বর্ণনা

হাদীসের ইমাম ও সীরাত গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সর্ব প্রথম ইমাম বুখারী (র)-ই আরবী বর্ণমালা অনুসারে ধারাবাহিকভাবে এ নামসমূহ সন্নিবেশ করেন। আর তিনি বদরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র চুয়াল্লিশজনের নাম তাঁর জামে সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর সহীহ হওয়ার শর্ত ও সনদ অনুযায়ী ছিল।[২]

আল্লামা যারকানী (র) বলেন, আমরা হাদীসের শায়খগণ থেকে শুনেছি যে, সহীহ বুখারীতে উল্লিখিত বদরের সাহাবীগণের নাম উল্লেখকালে দু'আ কবূল হয়ে থাকে, এ পরীক্ষা বার বার করা হয়েছে।[৩]

---

১. যারকানী, ১খ., পৃ. ৪০৯।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৫।

৩. যুরকানী, ১খ., পৃ. ৪০৯।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির সাহাবী (রা)-গণের নামের বর্ণনা

মুহাজির শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ বদরী, সমগ্র সৃষ্টির সেরা, নবী ও রাসূলগণের ধারা সমাপ্তকারী, আমাদের নেতা ও সর্দার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তাঁর প্রতি, তাঁর সঙ্গী-সাথী ও আহলে বায়তের প্রতি শেষ দিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক।

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা),
২. হযরত আবূ হাফস উমর ইবন খাত্তাব (রা),
৩. হযরত আবূ আবদুল্লাহ উসমান ইবন আফফান (রা)
৪. হযরত আবুল হাসান আলী ইবন আবূ তালিব (রা),
৫. হযরত হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা),
৬. হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা),
৭. রাসূল (সা)-এর মুক্ত দাস হযরত আনসা হাবশী (রা),
৮. রাসূল (সা)-এর মুক্ত দাস হযরত আবূ কাবশা ফারিসী (রা),
৯. হযরত আবূ মারসাদ কান্নায ইবন হিসন (রা)
১০. কান্নায ইবন হিসনের পুত্র মারসাদ ইবন আবূ মারসাদ (রা)
১১. হযরত উবায়দা ইবন হারিস (রা), এবং তাঁর দুই ভাই,
১২. হযরত তুফায়ল ইবন হারিস (রা) ও
১৩. হযরত হুসায়ন ইবন হারিস (রা),
১৪. হযরত মিসতাহ আউফ ইবন উসাসা (রা),
১৫. হযরত আবূ হুযায়ফা উতবা ইবন রবীয়া (রা),
১৬. আবূ হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালিম (রা),
১৭. আবুল আস উমায়্যার মুক্ত দাস হযরত সুবাইহ (রা),
১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহহাশ (রা),
১৯. হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা),
২০. হযরত শুজা' ইবন ওহাব (রা) ও তাঁর ভাই
২১. হযরত উকবা ইবন ওহাব (রা),
২২. হযরত ইয়াযীদ ইবন রাকিশ (রা),
২৩. হযরত আবূ সিনান ইবন মিহসান (রা), অর্থাৎ উক্কাশা ইবন মিহসানের ভাই,
২৪. হযরত সিনান ইবন আবূ সিনান (রা), আবূ সিনান ইবন মিহসানের পুত্র ও উক্কাশার ভ্রাতুষ্পুত্র,
২৫. হযরত মিহরায ইবন নাযলা (রা),
২৬. হযরত রবীয়া ইবন আকতাম (রা),
২৭. হযরত সাকাফ ইবন আমর (রা), তাঁর দুভাই[১]

---

১. ইনি হযরত উতবা ইবন গাযওয়ানের মুক্ত দাস ছিলেন। প্রথম পর্যায়ের মুসলমান হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা)-এর সাথে কেবল নামেই মিল আছে। কিন্তু ইনি অপর ব্যক্তি।

২৮. হযরত মালিক ইবন আমর (রা),
২৯. হযরত মুদলিজ ইবন আমর (রা),
৩০. হযরত সুয়ায়দ ইবন মাখশী (রা),
৩১. হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা),
৩২. উতবা ইবন গাযওয়ানের মুক্ত দাস হযরত জান্নাব (রা),
৩৩. হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা),
৩৪. হযরত হাতিব ইবন আবূ বালতাআ (রা),
৩৫. হাতিব ইবন আবূ বালতাআর মুক্ত দাস হযরত সা'দ কালবী (রা),
৩৬. হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা),
৩৭. হযরত সুয়ায়নিত ইবন সা'দ (রা),
৩৮. হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা),
৩৯. হযরত সাদ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা), ও তাঁর ভাই,
৪০. হযরত উমায়র ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা),
৪১. হযরত মিকদাদ ইবন আমর (রা),
৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা),
৪৩. হযরত মাসঊদ ইবন রবীয়াহ (রা),
৪৪. হযরত যু-শামালাইন ইবন আবদে আমর (রা),
৪৫. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা),
৪৬. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মুক্ত দাস হযরত বিলাল ইবন রাবাহ (রা),
৪৭. হযরত আমির ইবন ফুহায়রাহ (রা),
৪৮. হযরত সুহায়ব ইবন সিনান (রা),
৪৯. হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা),
৫০. হযরত আবূ সালমা ইবন আবদুল আসাদ(রা),
৫১. হযরত শাম্মাশ ইবন উসমান (রা),
৫২. হযরত আরকাম ইবন আবূ আরকাম (রা),
৫৩. হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা),
৫৪. হযরত মাতাব ইবন আউফ (রা),
৫৫. হযরত যায়দ ইবন খাত্তাব (রা), হযরত উমর ইবন খাত্তাবের ভাই,
৫৬. হযরত মাহজা (রা), হযরত উমর ইবন খাত্তাবের মুক্ত দাস,
৫৭. হযরত আমর ইবন সুরাকা (রা), ও তাঁর ভাই,
৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সুরাকা (রা),
৫৯. হযরত ওয়াকিদ ইবন আবদুল্লাহ (রা),
৬০. হযরত খাওলা ইবন আবূ খাওলা (রা),
৬১. হযরত মালিক ইবন আবূ খাওলা (রা),

৬২. হযরত আমির ইবন রবিয়াহ (রা),
৬৩. হযরত আমির ইবন বুকায়র (রা),
৬৪. হযরত আকিল ইবন বুকায়র (রা),
৬৫. হযরত খালিদ ইবন বুকায়র (রা),
৬৬. হযরত আয়াস ইবন বুকায়র (রা),
৬৭. হযরত সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা),
৬৮. হযরত উসমান ইবন মাযঊন জুমাহী (রা),
৬৯. হযরত সাইব ইবন উসমান (রা),
৭০. হযরত কুদামা ইবন মাযঊন (রা),
৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাযঊন (রা),
৭২. হযরত মা'মার ইবন হারিস (রা),
৭৩. হযরত খুনায়স ইবন খুরাফা (রা),
৭৪. হযরত আবূ সাবরা ইবন রাহম (রা),
৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাখরামা (রা),
৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সুহায়ল ইবন আমর (রা),
৭৭. হযরত সুহায়ল ইবন আমরের মুক্তদাস হযরত উমায়র ইবন আউফ (রা),
৭৮. হযরত সা'দ ইবন খাওলা (রা),
৭৯. হযরত আবূ উবায়দা আমির ইবন জাররাহ (রা),
৮০. হযরত আমর ইবন হারিস (রা),
৮১. হযরত সুহায়ল[১] ইবন ওহাব (রা), ও তাঁর ভাই
৮২. হযরত সাফওয়ান ইবন ওহাব (রা),
৮৩. হযরত আমর ইবন আবূ সারাহ (রা),
৮৪. হযরত ওহাব[২] ইবন সা'দ (রা),
৮৫. হযরত হাতিব ইবন আমর (রা),
৮৬. হযরত ইয়ায ইবন আবূ যুহায়র (রা)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবী (রা)-গণের নামের বর্ণনা

১. হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) ও তাঁর ভাই
২. হযরত আমর ইবন মু'আয (রা),
৩. হযরত হারিস ইবন আওস ইবন মু'আয (রা) অর্থাৎ হযরত সা'দ ইবন মু'আযের ভ্রাতুষ্পুত্র,

---

১. সুহায়ল এভং সাফওয়ানের পিতার নাম ওহাব এবং মাতার নাম বায়যা। এঁরা বায়যার পুত্র হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

২ ইবন হিশাম বলেন, এঁরা তিনজন, ইবন ইসহাকও তিনই বলেছেন। এছাড়া অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই বলেছেন, এঁরা তিনজনই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শুমার করেছেন।–সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ., পৃ. ৩২–৩৯।

৪. হযরত হারিস্ ইবন আনাস (রা),
৫. হযরত সা'দ ইবন যায়দ (রা),
৬. হযরত সালমা ইবন সালমা ইবন ওয়াক্কাশ (রা),
৭. হযরত আব্বাদ ইবন বিশর ইবন ওয়াক্কাশ (রা),
৮. হযরত সালমা ইবন সাবিত ইবন ওয়াক্কাশ (রা),
৯. হযরত রাফি ইবন ইয়াযীদ (রা),
১০. হযরত হারিস ইবন খুযামা (রা),
১১. হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা),
১২. হযরত সালমা ইবন আসলাম (রা),
১৩. হযরত আবুল হায়সাম ইবন তায়হান (রা),
১৪. হযরত উবায়দ ইবন তায়হান (রা),
১৫. হযরত উবায়দুল্লাহ ইবন সাহল (রা),
১৬. হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা),
১৭. হযরত উবায়দ ইবন আওস (রা),
১৮. হযরত নাসর ইবন হারিস (রা),
১৯. হযরত মুয়াত্তাব ইবন উবায়দ (রা),
২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন তারিক (রা),
২১. হযরত মাসঊদ ইবন সা'দ (রা),
২২. হযরত আবূ আবস ইবন জুবায়র (রা),
২৩. হযরত আবূ বুরদা হাই ইবন নিয়ায (রা),
২৪. হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা),
২৫. হযরত মুয়াত্তাব ইবন কুশায়র (রা),
২৬. হযরত আমর ইবন মা'বাদ (রা),
২৭. হযরত সাহল ইবন হুনায়ফ (রা),
২৮. হযরত মুবাশ্বির ইবন আবদুল মুনযির (রা),
২৯. হযরত রিফাআ ইবন আবদুল মুনযির (রা),
৩০. হযরত সাদ ইবন উবায়দ ইবন নুমান (রা),
৩১. হযরত আওয়াইম ইবন সাঈদা (রা),
৩২. হযরত রাফে ইবন আনজাদা[১] (রা),
৩৩. হযরত উবায়দ ইবন আবূ উবায়দ (রা),
৩৪. হযরত সালাবা ইবন হাতিব (রা),
৩৫. হযরত আবূ লুবাবা ইবন আবদুল মুনযির (রা),
৩৬. হযরত হারিস ইবন হাতিব (রা),

১. আনজাদা তাঁর মাতার নাম, পিতার নাম ছিল আবদুল হারিস।

৩৭. হযরত হাতিব ইবন আমর (রা),
৩৮. হযরত আসিম ইবন আদী (রা),
৩৯. হযরত উনায়স ইবন কাতাদা (রা),
৪০. হযরত মা'ন ইবন আদী (রা),
৪১. হযরত সাবিত ইবন আরকাম (রা),
৪২ হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালমা (রা),
৪৩. হযরত যায়দ ইবন আসলাম (রা),
৪৪. হযরত রিবঈ ইবন রাফে' (রা),
৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র (রা),
৪৬. হযরত আসিম ইবন কায়স (রা),
৪৭. হযরত আবূ যিয়াহ ইবন সাবিত (রা),
৪৮. হযরত আবূ হান্না ইবন সাবিত অর্থাৎ আবূ যিয়াহর ভ্রাতা,
৪৯. হযরত সালিম ইবন উমায়র (রা),
৫০. হযরত হারিস ইবন নুমান (রা),
৫১. হযরত খাওয়াত ইবন জুবায়র ইবন নু'মান (রা),
৫২. হযরত মুনযির ইবন মুহাম্মদ (রা),
৫৩. হযরত আবূ আকীল ইবন আবদুল্লাহ (রা),
৫৪. হযরত সাদ ইবন খায়সামা (রা),
৫৫. হযরত মুনযির ইবন কুদামা (রা),
৫৬. হযরত মালিক ইবন কুদামা (রা),
৫৭. হযরত হারিস ইবন আরফাজা (রা),
৫৮. সা'দ ইবন খায়সামার মুক্ত দাস হযরত তামীম (রা),
৫৯. হযরত জাবির ইবন আতীক (রা),
৬০. হযরত মালিক ইবন নুমায়লা (রা),
৬১. হযরত নু'মান ইবন আসর (রা),
৬২. হযরত খারিজা ইবন যায়দ (রা),
৬৩. হযরত সা'দ ইবন রবী (রা),
৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা),
৬৫. হযরত খাল্লাদ ইবন সুয়ায়দ (রা),
৬৬. হযরত বাশীর ইবন সা'দ (রা),
৬৭. হযরত সিমাক ইবন সা'দ (রা),
৬৮. হযরত সবী ইবন কায়স (রা), ও তাঁর ভাই
৬৯. হযরত আব্বাদ ইবন কায়স (রা),
৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবস (রা),
৭১. হযরত ইয়াযীদ ইবন হারিস (রা),

৭২. হযরত খুবায়ব ইবন উসাফ (রা),
৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন সালাবা (রা) এবং তাঁর ভাই
৭৪. হযরত হারিস ইবন যায়দ ইবন সালাবা (রা),
৭৫. হযরত সুফিয়ান ইবন বিশর (রা),
৭৬. হযরত তামীম ইবন ইউয়ার (রা),
৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমায়র (রা),
৭৮. হযরত যায়দ ইবন মাযিন (রা),
৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আরফাত (রা),
৮০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন রবী (রা),
৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উবাই (রা) অর্থাৎ মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূলের পুত্র,
৮২. হযরত আওস ইবন খাওলা (রা),
৮৩. হযরত যায়দ ইবন ওয়াদিয়া (রা),
৮৪. হযরত উকবা ইবন ওহাব (রা),
৮৫. হযরত রিফা'আ ইবন আমর (রা),
৮৬. হযরত আমির ইবন সালমা (রা),
৮৭. হযরত মা'বাদ ইবন আব্বাদ (রা),
৮৮. হযরত আমির ইবন বুকায়র (রা),
৮৯. হযরত নাওফেল ইবন আবদুল্লাহ (রা),
৯০. হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা),
৯১. হযরত আওস ইবন সামিত (রা),
৯২. হযরত নু'মান ইবন মালিক (রা),
৯৩. হযরত সাবিত ইবন হুযাল (রা),
৯৪. হযরত মালিক ইবন ওয়াশাম (রা),
৯৫. হযরত রবী ইবন আয়াস (রা),ও তাঁর ভাই
৯৬. হযরত ওয়ারাকা ইবন আয়াস (রা),
৯৭. হযরত আমর ইবন আয়াস (রা), বর্ণনার মতপার্থক্যে ওয়ারাকা ও রবীর ভাই অথবা আশ্রিত,
৯৮. হযরত মাজযার ইবন যিয়াদ (রা),
৯৯. হযরত আব্বাদ ইবন খাশখাশ (রা),
১০০. হযরত নুহাব ইবন সালাবা (রা), ও তাঁর ভাই
১০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাবা (রা),
১০২. হযরত উকবা ইবন রবীয়া (রা),
১০৩. হযরত আবূ দুজানা সিমাক ইবন খারাশা (রা),

১০৪. হযরত মুনযির ইবন আমর (রা),
১০৫. হযরত আবূ উসায়দ মালিক ইবন রবীয়াহ (রা),
১০৬. হযরত মালিক ইবন মাসউদ (রা),
১০৭. হযরত আবদে রাব্বিহ ইবন হক (রা),
১০৮. হযরত কা'ব ইবন জাম্মায (রা),
১০৯. হযরত যামরা ইবন আমর (রা),
১১০. হযরত যিয়াদ ইবন আমর (রা),
১১১. হযরত লাব্বাস ইবন আমর (রা),
১১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমির (রা),
১১৩. হযরত কারাশ ইবন সাম্মা (রা),
১১৪. হযরত হুবাব ইবন মুনযির (রা),
১১৫. হযরত উমায়র ইবন হুমাম (রা),
১১৬. খিরাশের মুক্ত দাস,হযরত তামীম (রা),
১১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা),
১১৮. হযরত মা'আয ইবন আমর ইবন জমূহ (রা),
১১৯. হযরত মু'আওয়ায ইবন আমর ইবন জমূহ (রা),
১২০. হযরত খাল্লাদ ইবন আমর ইবন জমূহ (রা),
১২১. হযরত উকবা ইবন আমির (রা),
১২২. হযরত হাবীব ইবন আসওয়াদ (রা),
১২৩. হযরত সাবিত ইবন সালাবা (রা),
১২৪. হযরত উমায়র ইবন হারিস (রা),
১২৫. হযরত বিশর ইবন বারা (রা),
১২৬. হযরত তুফায়ল ইবন মালিক (রা),
১২৭. হযরত তুফায়ল ইবন নু'মান (রা),
১২৮. হযরত সিনান ইবন সাইফী (রা),
১২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাদ ইবন কায়স (রা),
১৩০. হযরত উতবা ইবন আবদুল্লাহ (রা),
১৩১. হযরত জাব্বার ইবন সাখর (রা),
১৩২. হযরত খারিজা ইবন হুমায়র (রা),
১৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুমায়র (রা),
১৩৪. হযরত ইয়াযীদ ইবন মুনযির (রা),
১৩৫. হযরত মা'কাল ইবন মুনযির (রা),
১৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন নু'মান (রা),
১৩৭. হযরত যাহহাক ইবন হারিসা (রা),

১৩৮. হযরত সাদ ইবন যুরাইক (রা),
১৩৯. হযরত মা'বাদ ইবন কায়স (রা),
১৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন কায়স (রা),
১৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মানাফ (রা),
১৪২. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ ইবন রাবাব (রা),
১৪৩. হযরত খালিদ ইবন কায়স (রা),
১৪৪. হযরত নুমান ইবন সিনান (রা),
১৪৫. হযরত আবুল মুনযির ইয়াযীদ ইবন আমির (রা),
১৪৬. হযরত সুলায়ম ইবন আমর (রা),
১৪৭. হযরত কাতবা ইবন আমির (রা),
১৪৮. সুলায়ম ইবন আমরের মুক্ত দাস হযরত আনতারা (রা),
১৪৯. হযরত আয়াস ইবন আমির (রা),
১৫০. হযরত সালাবা ইবন গানামা (রা),
১৫১. হযরত আবুল ইয়াসার কা'ব ইবন আমর (রা),
১৫২. হযরত সাহল ইবন কায়স (রা),
১৫৩. হযরত আমর ইবন তালক (রা),
১৫৪. হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা),
১৫৫. হযরত কায়স ইবন মিহসান (রা),
১৫৬. হযরত হারিস ইবন কায়স (রা),
১৫৭. হযরত জুবায়র ইবন ইয়াস (রা),
১৫৮. হযরত সা'দ ইবন উসমান (রা), ও তাঁর ভাই,
১৫৯. হযরত উকবা ইবন উসমান (রা),
১৬০. হযরত যাকওয়ান ইবন আবদে কায়স (রা),
১৬১. হযরত মাসঊদ ইবন খালদা (রা),
১৬২. হযরত আব্বাদ ইবন কায়স (রা),
১৬৩. হযরত আস'আদ ইবন ইয়াযীদ (রা),
১৬৪. হযরত ফাকীহ ইবন বিশর (রা),
১৬৫. হযরত মু'আয ইবন মাইস (রা), ও তাঁর ভাই
১৬৬. হযরত আইয ইবন ইয়াইস (রা),
১৬৭. হযরত মাসঊদ ইবন সা'দ (রা),
১৬৮. হযরত রিফাআ ইবন রাফে (রা), ও তাঁর ভাই
১৬৯. হযরত খাল্লাদ ইবন রাফে (রা),
১৭০. হযরত উবায়দ ইবন যায়দ (রা),
১৭১. হযরত যিয়াদ ইবন লাবীদ (রা),

১৭২. হযরত ফারওয়া ইবন আমর (রা),
১৭৩. হযরত খালিদ ইবন কায়স (রা),
১৭৪. হযরত জাবালা ইবন সালাবা (রা),
১৭৫. হযরত আতিয়্যা ইবন নুয়ায়রা (রা),
১৭৬. হযরত খালীকা ইবন আদী (রা),
১৭৭. হযরত গাম্মারা খারাম (রা),
১৭৮. হযরত সুরাকা ইবন কাব (রা),
১৭৯. হযরত হারিশাহ ইবন নু'মান (রা),
১৮০. হযরত সুলায়ম ইবন কায়স (রা),
১৮১. হযরত সুহায়ল ইবন কায়স (রা),
১৮২. হযরত আদী ইবন যাগবার (রা),
১৮৩. হযরত মাসঊদ ইবন আওস (রা),
১৮৪. হযরত আবূ খুযায়মা ইবন আওস (রা),
১৮৫. হযরত রাফি ইবন হারিস (রা),
১৮৬. হযরত আউফ ইবন হারিস (রা),
১৮৭. হযরত মু'আউয়ায ইবন হারিস (রা),
১৮৮. হযরত মুআয ইবন হারিস (রা),তিনজনই হযরত আফরা (রা)-এর পুত্র,
১৮৯. হযরত নু'মান ইবন উমর (রা),
১৯০. হযরত আমির ইবন মাখলাদ (রা),
১৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন কায়স (রা),
১৯২. হযরত উসায়মা আশজাঈ (রা),
১৯৩. হযরত ওয়াদিকা ইবন আমর (রা),
১৯৪. হারিস ইবন আফরার মুক্ত দাস হযরত আবুল হামরা (রা),
১৯৫. হযরত তালিয়া ইবন আমর (রা),
১৯৬. হযরত সুহায়ল ইবন আতীক (রা),
১৯৭. হযরত হারিস ইবন সাম্মা (রা),
১৯৮. হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা),
১৯৯. হযরত আনাস ইবন মু'আয (রা),
২০০. হযরত আওস ইবন সাবিত (রা),
২০১. হযরত আবুশ-শায়খ উবাই ইবন সাবিত (রা), হাসসান ইবন সাবিতের ভাই,
২০২. হযরত আবূ তালহা যায়দ ইবন আসহাল (রা),
২০৩. হযরত হারিশাহ ইবন সুরাকা (রা),
২০৪. হযরত আমর ইবন সালাবা (রা),

২০৫. হযরত সালীত ইবন কায়স (রা),
২০৬. হযরত আবূ সালীত ইবন আমর (রা),
২০৭. হযরত সাবিত ইবন খানসা (রা),
২০৮. হযরত আমির ইবন উমায়্যা (রা),
২০৯. হযরত মিহ্রায ইবন আমির (রা),
২১০. হযরত সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যা (রা),
২১১. হযরত আবূ যায়দ কায়স ইবন সাকান (রা),
২১২. হযরত আবুল আওয়ার ইবন হারিস (রা),
২১৩. হযরত সুলায়ম ইবন মিলহান (রা),
২১৪. হযরত হারাম ইবন মিলহান (রা),
২১৫. হযরত কায়স ইবন আবূ সা'সা (রা),
২১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন কা'ব (রা),
২১৭. হযরত উসায়মা আসাদী (রা),
২১৮. হযরত আবূ দাঊদ উমায়র ইবন আমির (রা),
২১৯. হযরত সুরাকা ইবন আমর (রা),
২২০. হযরত কায়স ইবন মাখলাদ (রা),
২২১. হযরত নু'মান ইবন আবদে আমর (রা),
২২২. হযরত হিমাক ইবন আবদে আমর (রা),
২২৩. হযরত সুলায়ম ইবন হারিস (রা),
২২৪. হযরত জাবির ইবন খালিদ (রা),
২২৫. হযরত সা'দ ইবন সুহায়ল (রা),
২২৬. হযরত কা'ব ইবন যায়দ (রা),
২২৭. হযরত বুহায়র ইবন আবূ বুহায়র (রা),
২২৮. হযরত ইতবান ইবন মালিক (রা),
২২৯. হযরত আলীল ইবন ওয়াবরাহ (রা),
২৩০, হযরত ইসমাত ইবন হুসায়ন (রা),
২৩১. হযরত বিলাল ইবন মুআল্লা (রা)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতা (আ)-গণের নামের বর্ণনা

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফেরেশতাগণের অবতরণ ও যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও নবী (সা)-এর হাদীসের মাধ্যমে পূর্বেই জানা গিয়েছে। কিন্তু হাদীসের বর্ণনাদ্বারা কেবল তিনজন ফেরেশতার নাম জানা যায়। পাঠকগণকে উপহার স্বরূপ তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. ফেরেশতাকুল শিরোমণি,[১] নবী-রাসূল ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পারস্পরিক সম্পর্কের আমানতদার, সায়্যিদুনা হযরত জিবরাঈল (আ) [হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বুখারীতে বর্ণিত]।

২. সায়্যিদুনা হযরত মিকাঈল (আ) ও

৩. সায়্যিদুনা হযরত ইসরাফীল (আ)। (আহমদ, বাযযার, আবূ ইয়ালা ও হাকিম হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হাকিম একে সহীহ বলেছেন। ইমাম বায়হাকীও হযরত আলী (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)। খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২০১।

যেহেতু হাদীসের বর্ণনায় প্রথমে হযরত জিবরাঈল (আ), তারপর হযরত মিকাঈল (আ) এবং এরপর হযরত ইসরাফীল (আ)-এর নামোল্লেখ করা হয়েছে, এ জন্যে অবতরণের ধারাবাহিকতা অনুসারে এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

বদর যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সাহাবিগণের নাম (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট)

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তোমরা কখনও তাদের মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা রিযকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য এ কারণে আনন্দ প্রকাশ করে যে, তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা চিন্তিতও নয়।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬৯-১৭০)

مکن گریه برگور مقتول دوست * بروخر می کن که مقبول اوست

১. হযরত উবায়দা ইবন হারিস ইবন মুত্তালিব মুহাজিরী (রা) : বদর যুদ্ধে তাঁর পা কেটে গিয়েছিল। সফরা নামক স্থানে এসে ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সেখানেই দাফন করেন।

---

১. কুরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রকাশ্যত এটাই মনে হয় যে, হযরত জিবরাঈল (আ)-ই ফেরেশতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম। তাবারানী দুর্বল সনদে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : قال رسول الله الا اخبركم بالفضل الملائكة جبرائيل "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম ফেরেশতা সম্পর্কে সংবাদ দেব না ? তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ)।" রূহুল মা'আনী, ১খ., পৃ. ৩০১।

বলা হয়ে থাকে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণের সাথে সফরায় অবতরণ করেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমরা এখানে মিশকের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। তিনি বললেন, আশ্চর্যের কিছুই নেই, এখানে আবূ মুআবিয়ার কবর আছে (হযরত উবায়দা ইবন হারিসের উপাধি ছিল আবূ মুআবিয়া)। (হাফিয ইবন আবদুল বার প্রণীত আল-ইসতিয়াব, ১খ. পৃ. ৪২৫, ইসাবার পাদটীকাস্থ হযরত উবায়দা ইবন হারিসের জীবন চরিত)।

২. হযরত উমায়র ইবন আবূ ওয়াক্কাস মুহাজিরী (রা) : ইনি হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ছোট ভাই। হযরত সাদ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের জন্য যখন লোকজন একত্রিত হতে থাকে, তখন আমি দেখলাম, আমার ছোট ভাই এদিক সেদিক লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি বললাম, ভাই, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ছোট ভেবে ফিরিয়ে দেবেন। অথচ আমিও যুদ্ধে যেতে চাই। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা আমাকে শাহাদত নসীব করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বাহিনী পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তখন উমায়রকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলো। অল্পবয়স্ক হওয়ার দরুন তাকে তিনি ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এ কথা শুনে সে কেঁদে ফেলে। তার উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে নবীজী তাকে অনুমতি দান করেন। পরিশেষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। হযরত উমায়র (রা)-এর বয়স তখন ছিল মাত্র ষোল বছর।[১]

৩. হযরত যুশ-শামালায়ন ইবন আবদে আমর মুহাজিরী (রা) : ইমাম যুহরী, ইবন সা'দ ও ইবন সামআনী বলেন, যুশ-শামালায়ন এবং যুল-ইয়াদায়ন একই ব্যক্তির দু'টি নাম, কিন্তু প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের মতে এঁরা দু'ব্যক্তি। হযরত যুশ-শামালায়ন (রা) তো বদর যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন, আর হযরত যুল-ইয়াদায়ন (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পরও বেঁচে ছিলেন।

৪. হযরত আকিল ইবন বুকায়র মুহাজিরী (রা) : ইনি ছিলেন প্রথম পর্যায়ের মুসলমানগণের মধ্যে একজন এবং আরকামের গৃহে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল গাফিল (অলস), রাসূলুল্লাহ (সা) গাফিলের পরিবর্তে তাঁর নাম রাখেন আকিল (জ্ঞানী)। [ইসাবা, হযরত আকিল ইবন বুকায়র (রা)-এর জীবন চরিত]। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি আখিরাত সম্পর্কে গাফিল (উদাসীন) ছিলেন, ইসলাম গ্রহণের পর জ্ঞানী এবং সতর্ক হন, এ কারণে তাঁর জন্য এ নাম নির্বাচন করেন। শাহাদতকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চৌত্রিশ বছর।[২]

৫. হযরত উমর ইবন খাত্তাবের মুক্ত দাস হযরত মিহজা' ইবন সালিহ (রা) : হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যুদ্ধকালে হযরত মিহজা'

১. তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১০৬; ইসাবা, ৩খ. পৃ. ৩৫।

২ তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ২৮২।

(রা)-এর মুখে এ কথা উচ্চারিত হচ্ছিল : اَنَا مُهْجَعُ وَاِلَى رَبِّى اَرْجِعُ "আমি মিহজা' এবং আপন প্রভুর পথে প্রত্যাবর্তনকারী।" (ইবন আবূ শায়বা বর্ণিত)।[১]

৬. হযরত সাফওয়ান ইবন বায়যা মুহাজিরী (রা) : ইনি বদরে অংশগ্রহণ করেছেন, তা সর্বসম্মত, কিন্তু শাহাদত সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবন ইসহাক, মূসা ইবন উকবা এবং ইবন সা'দ বলেন, বদর যুদ্ধে তাঈমা ইবন আদীর হাতে তিনি শহীদ হন। ইবন হিব্বান বলেন ত্রিশ হিজরীতে এবং হাকিম বলেন আটত্রিশ হিজরী সনে ইনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন (ইসাবা, হযরত সাফওয়ান ইবন বায়যা (রা)-এর জীবন চরিত)।

৭. হযরত সা'দ ইবন খায়সামা আনসারী (রা) : ইনি সাহাবীর পুত্র সাহাবী এবং শহীদের পুত্র শহীদ। হযরত সাদ (রা) বদর যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁর পিতা হযরত খায়সামা (রা) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।

হযরত সা'দ (রা) আকাবার বায়আতে শরীক ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বনী আমরের ঘোষক মনোনীত করেন (ইসাবা)।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আবূ সুফিয়ানের কাফেলা আক্রমণের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দেন, তখন হযরত খায়সামা তাঁর পুত্র সাদকে বললেন, বাছা, নারী ও শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য আমাদের মধ্যে একজনকে বাড়িতে থাকা দরকার। তুমি আমাকে অগ্রাধিকার দাও, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহগামী হওয়ার অনুমতি দাও এবং তুমি এখানে অপেক্ষা কর। এতে হযরত সাদ তা সরাসরি অস্বীকার করেন এবং বলেন : لو كان غير الجنة اشرتك به انى ارجو الشهادة فى وجهى هذا "জান্নাতের সওদা না হয়ে যদি আর কোন বিষয় হতো, তা হলে আমি আপনাকে আমার উপর অগ্রাধিকার দিতাম কিন্তু এ সফরে আমি নিজে শহীদ হওয়ার পূরা ইচ্ছা রাখি।"

এরপর পিতাপুত্রের মধ্যে লটারী করা হলো। লটারীতে হযরত সাদের নাম বের হলো, পিতা থেকে পুত্র অধিক ভাগ্যবান প্রমাণিত হলো এবং তিনি আনন্দিত ও সন্তুষ্ট চিত্তে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহগামী হয়ে বদরের পথে যাত্রা করলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি মারিকা ইবন আবদুদ অথবা তুআঈমা ইবন আদীর হাতে শাহাদতবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

৮. হযরত মুবাশ্বির ইবন আবদুল মুনযির আনসারী (রা)।

৯. হযরত ইয়াযীদ ইবন হারিস আনসারী (রা)।

১০. হযরত উমায়র ইবন হুমাম আনসারী (রা) : হযরত আনাস (রা) সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, ওহে লোক সকল, ঐ জান্নাতের প্রতি অগ্রসর হও যার পরিধি আসমান-যমীন ব্যাপী। উমায়র

১. কানযুল উম্মাল, ৫খ., পৃ. ২৬৯।

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) ! আসমান-যমীনের সমান ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হাঁ। উমায়র বললেন, বাহ্, বাহ্। নবী (সা) বললেন, ওহে উমায়র, কিসে তোমাকে বাহ বাহ বলতে উদ্বুদ্ধ করল ? উমায়র বললেন, আল্লাহর কসম, কিছুই না ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), কেবল আমার আশা, আমিও যদি সেই জান্নাতীদের একজন হতাম ! তিনি বললেন : فانك من اهلها "নিঃসন্দেহে তুমি অবশ্যই তাদের একজন।" এরপর তিনি খেজুর বের করে খেতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন, যদি এগুলো খেতেই থাকি, তা হলে তো দীর্ঘ জীবন পেয়ে গেলাম। খেজুর ফেলে দিয়ে যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেন এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে যান। ইবন ইসহাক বলেন উমায়র যখন তরবারি হাতে নেন, তখন তাঁর মুখে এ বাক্যগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল :

ركضا الى الله بغير زاد * الا التقى وعمل المعاد والصبر فى الله على الجهاد

وكل زاد عرضة النفاد * غير التقى والبر والرشاد .

"আল্লাহর দিকে কোন উপঢৌকন ছাড়াই ধাবিত হও, কিন্তু আল্লাহ-ভীতি, পরকালের আমল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের ধৈর্যরূপ উপঢৌকন অবশ্যই সাথে নাও। আর সব উপঢৌকনই ধ্বংসশীল, কিন্তু আল্লাহভীতি, নেককাজ ও সুপথের উপঢৌকন কখনো নষ্ট হয় না এবং ধ্বংসও হয় না।"

(হাফিয ইবন আবদুল বার প্রণীত আল ইসতিয়াব, ২খ. পৃ. ৪৮২, ইসাবার পাদটীকা; ইসাবা, ২খ. পৃ. ৩১, উমায়র ইবন হুমাম (রা)-এর জীবন চরিত; যারকানী, ১খ. পৃ. ১৪৪; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৭৭)।

১১. হযরত রাফে' ইবন মুয়াল্লা আনসারী (রা)।

১২. হযরত হারিসা ইবন সুরাকা আনসারী (রা) : হযরত হারিসা ইবন সুরাকা ইবন হারিস (রা) ছিলেন সাহাবীর পুত্র সাহাবী এবং শহীদের পুত্র শহীদ। পুত্র অর্থাৎ হযরত হারিসা বদরের যুদ্ধে শহীদ হন এবং হযরত সুরাকা হুনায়নের যুদ্ধে। ফাতহুল বারীতে (আরবী) অধ্যায়ে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত হারিসা বদর যুদ্ধে শহীদ হন, তিনি তখন যুবক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন হযরত হারিসার মাতা রুবাঈ বিনতে নাযর তাঁর খিদমতে আগমন করলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আপনি ভাল করেই জানেন যে, হারিসা আমার কেমন প্রিয় ছিল। কাজেই যদি সে জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করব। আর অবস্থা যদি ভিন্নরূপ হয়, তা হলে আপনি দেখবেন আমি কি করি। অর্থাৎ খুবই হা-হুতাশ ও কান্নাকাটি করব। তিনি বললেন, তুমি কি পাগল হয়েছ ? একটি জান্নাত নয়, তার জন্য রয়েছে অনেক জান্নাত। আর অবশ্যই নিঃসন্দেহে সে জান্নাতুল ফিরদাউসে আছে (সহীহ বুখারী, বদর যুদ্ধ অধ্যায়)।

১৩. হযরত আউফ ইবন হারিস আনসারী (রা),

১৪. হযরত মুআউয়ায ইবন হারিস আনসারী (রা) : এঁরা দু'জন পরস্পর ভাই, তাঁদের মাতার নাম হযরত আফরা (রা)। হযরত আউফ ইবন হারিস (রা)-এর শাহাদতের ঘটনা তো পূর্বেই বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে সকল সাহাবী বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপর নূরের তাজাল্লী নিক্ষেপ করেন এবং দর্শন দান করে তাঁদের চোখ জুড়িয়ে দেন, আর বলেন, আমার বান্দাগণ, তোমরা আর কি চাও ?

শহিদগণ আরয করলেন, আয় পরওয়ারদিগার, জান্নাতের যে সমস্ত নিয়ামত দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন, এরও অতিরিক্ত আর কোন নিয়ামত আছে কি ? আল্লাহ তা'আলা বলেন, বল, কি চাও ? চতুর্থবার সাহাবাগণ আরয করলেন, আয় পরওয়ারদিগার, আমাদের শরীরে আমাদের আত্মাগুলো দিয়ে দিন যাতে আমরা পুনরায় আপনার রাস্তায় নিহত হতে পারি, যেমন বর্তমানে নিহত হয়েছি। (বিশুদ্ধ সনদে তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি শব্দগত দিক দিয়ে মওকূফ হলেও মরফূ হওয়ার মর্যাদা রাখে। আল্লাহই ভাল জানেন)।[১]

বদরের যুদ্ধবন্দীদের নাম

বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ দ্বারা পূর্বেই জানা গেছে যে, বদর যুদ্ধে সত্তরজন কাফির নিহত হয়েছে এবং বন্দী হয়েছে সত্তরজন। (মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী ইবন হিশাম)। আর হাফিয ইবন সায়্যিদুন-নাস উয়ূনুল আসার গ্রন্থে নিহত ও বন্দীদের নাম উল্লেখ করেছেন। এখানে বদর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে বিখ্যাতদের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের বিষয়েও বিশদ বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে।

১. আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য ছিলেন, যিনি বয়সে তাঁর থেকে মাত্র দু'বছরের বড় ছিলেন। মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

২. আকীল ইবন আবূ তালিব : ইনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাত ভাই ছিলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আকীল হযরত জাফর থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন। আর একইভাবে হযরত জাফরও হযরত আলী থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন। আর আবূ তালিবের সবচে' বড় পুত্রের নাম ছিল তালিব (যার নাম অনুযায়ী তার উপাধি হয়েছে), তালিবও হযরত আকীলের দশ বছরের বড় ছিল। সে ছিল ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৪৫।

থেকে বঞ্চিত। অবশিষ্ট তিন ভাই আকীল (রা), জাফর (রা) ও আলী (রা) ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন।

৩. নওফেল ইবন হারিস : তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের সময় অর্থাৎ পঞ্চম হিজরী সনে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪. সায়িব ইবন উবায়দ,

৫. নু'মান ইবন আমর,

৬. আমর ইবন সুফিয়ান ইবন আবূ হারব,

৭. হারিস ইবন আবূ ওয়াহরাহ,

৮. আবুল আস ইবন রবী : ইনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৯. আবুল আস ইবন নওফেল,

১০. আবূ রীশাহ ইবন আবূ উমর,

১১. আমর ইবন আযরাক,

১২. উকবা ইবন আবদুল হারিস,

১৩. আদী ইবনুল খিয়ার,

১৪. উসমান ইবন আবদে শামস,

১৫. আবূ সাওর,

১৬. আযীয ইবন উমায়র আবদারী : ইনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[১]

১৭. আসওয়াদ ইবন আমির,

১৮. সায়িব ইবন আবূ হুবায়শ : ইনি মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন, ইস্তিহাযা রোগিণী হযরত ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শের ভাই।[২]

১৯. হুয়ায়রিস ইবন আব্বাদ,

২০. সালিম ইবন শাদাখ,

২১. খালিদ ইবন হিশাম : অর্থাৎ আবূ জাহল ইবন হিশামের ভাই, কতিপয় আলিম তাকে 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৩]

২২. উমাইয়্যা ইবন আবূ হুযায়ফা,

২৩. ওলীদ ইবন ওলীদ ইবন মুগীরা,

২৪. সাইফী ইবন আবূ রিফা'আ,

২৫. আবুল মুনযির ইবন আবূ রিফা'আ,

---

১. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১০৬; প্রাগুক্ত, অধিকন্তু ইসাবা, ২খ. পৃ.৬; উয়ূনুল আসার, পৃ.৩০০।

২ ইসাবা, ১খ. পৃ. ৪১২ ও ৪খ. পৃ. ১৩৩।

৩. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১০৬; উয়ূনুল আসার, পৃ.৩০৭।

২৬. আবূ আতা আবদুল্লাহ ইবন আবূ সায়িব : ইনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার কারিগণ, মুজাহিদ প্রমুখ তাঁর কাছে ইলমে কিরআত শিক্ষা করেন।

২৭. মুত্তালিব ইবন হানতাব : পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

২৮. খালিদ ইবন আ'লাম,

২৯. আবূ ওয়াদাআ সাহমী : মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৩০. সুরওয়া ইবন কায়স,

৩১. হানযালা ইবন কাবীসা,

৩২. হাজ্জাজ ইবন হারিস : আল্লামা সুহায়লী বলেন, হযরত হাজ্জাজ ইবন হারিস (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের মধ্যে একজন। উহুদ যুদ্ধের পর আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় আগমন করেন। সুতরাং তাঁর নাম বদর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে উল্লেখ করা গ্রন্থকারের কল্পনা মাত্র (রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১০৭)।

৩৩. আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন খালফ : ইনি মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উষ্ট্রের যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন।

৩৪. আবূ উযযা আমর ইবন আবদুল্লাহ,

৩৫. উমাইয়্যা ইবন খালফের মুক্ত দাস, ফাকীহ,

৩৬. ওহাব ইবন উমায়র : হযরত ওহাব এবং তাঁর পিতা হযরত উমায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের বিষয় পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৩৭. রবীয়া ইবন দাররাজ,

৩৮. সুহায়ল ইবন আমর : ইনি হুদাবিয়ায় কুরায়শের পক্ষে সন্ধির জন্য এসেছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সিরিয়ায় শহীদ হন।

৩৯. আবদ ইবন যাম'আ : ইনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিনতে যাম'আর ভাই, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪০. আবদুর রহমান ইবন মাশনূর,

৪১. তুফায়ল ইবন আবূ কানী',

৪২. উকবা ইবন আমর,

৪৩. কায়স ইবন সায়িব মাখযুমী : পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন, ইনি জাহিলী যুগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন, যা পূর্বে বলা হয়েছে।

৪৪. উমায়্যা ইবন খালফের মুক্ত দাস, নুসতাস : ইনি উহুদ যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।[২]

---

১. প্রাগুক্ত।

২ রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১০৭।

ইসলামের বিরুদ্ধে সম্প্রদায় এবং স্বদেশের সহযোগিতা

বদরের যুদ্ধ ছিল ইসলাম এবং কুফরের মধ্যকার সংগ্রাম। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা বদরের দিনকে ইয়াওমুল ফুরকান বা হক ও বাতিলের মধ্যে পৃথকীকরণের দিনরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

মক্কায় এমন কিছুলোকও ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করে চলে যান, তখন তারা নিজেদের গোত্র ও সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে মক্কায়ই থেকে যায়। যখন বদর যুদ্ধের সময় এলো, তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক কাফিরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসে এবং বদর যুদ্ধে নিহত হয়। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় :

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ・ اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلاَ يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً ・ فَاُولٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ・

"যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফিরিশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তারা বলে: দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহর যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে ? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কতই না মন্দ আবাস ! তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না আল্লাহ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, কারণ আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।" (সূরা নিসা : ৯৭-৯৯)

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে :

ان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين على رسول الله ﷺ ياتى السهم فيرمى به فيصيب احدهم فيقتله اويضرب فيقتل فانزل الله اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ ... ... ・

"বদর যুদ্ধে[১] কিছু সংখ্যক মুসলমান মুশরিকদের সংখ্যা ও দল ভারী করার জন্য মক্কার কাফিরদের সাথে বের হয়। যুদ্ধের ময়দানে কোন তীর সেই মুসলমানকে বিদ্ধ

১. বদর যুদ্ধ শীর্ষক কোন শব্দ বুখারী শরীফে নেই, বরং অন্যান্য বর্ণনায় উল্লিখিত আছে। যেমন হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ১৯৮-তে, কিতাবুত তাফসীরে, এবং কিতাবুল ফিতানে ১৩খ. পৃ. ৩২-এ এবং আল্লামা কাসতাল্লানী তাঁর ইরশাদুস সারী গ্রন্থে ৭খ. পৃ.৯০ এবং ১০খ. পৃ. ১৭৭-এ উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখা যেতে পারে।

করে এবং এতে সে নিহত হয় আবার কখনো তরবারির আঘাতে নিহত হয়। সুতরাং বদর যুদ্ধে যে সব মুসলমান কাফিরদের সাথে এসেছে এবং নিহত হয়েছে, তাদের প্রসঙ্গে... ... اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰـهُمُ الْـمَلٰـئِكَةُ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। (সহীহ বুখারী, পৃ. ৬৬১, তাফসীরে সূরা নিসা অধ্যায়)।

আর হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর এ বর্ণনাই ইমাম বুখারী কিতাবুল ফিতানে পৃ. ১০৪৯-এ দ্বিতীয়বার এনেছেন এবং এর শিরোনাম দিয়েছেন, 'ফিতনাবাজ ও কাফির-গুনাহগারদের সংখ্যা বৃদ্ধি অপসন্দনীয় হওয়ার বর্ণনা।' হযরত শাহ ওলীউল্যাহ (র) তাঁর তাফসীরে কুরআনে اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْـمَلٰـئِكَةُ আয়াতের পাদটীকায় লিখেছেন يعنى بترك هجرت از دار الحرب بدار الاسلامو بتكثير سواد كفار আল্লাহই ভাল জানেন। ফলে জানা গেল যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য কাফির বাহিনীতে শুধু কাফিরদের সংখ্যা বেশি দেখানোর উদ্দেশ্যে যোগ দেয়াটাও অবৈধ (নাজায়েয)। যদিও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা না করে বা যুদ্ধ না করে। মুসলমানদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে কাফির সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়াও হারাম। সম্মানিত জ্ঞান পিপাসুগণ ফাতহুল বারী ১৩খ. পৃ. ১৩২ এবং কাসতাল্লানী দেখুন। আর এর চেয়ে বিস্তারিত জানার প্রয়োজনবোধ করলে তাফসীরে ইবন কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী এবং তাফসীরে দুররে মানসূর ২খ. পৃ. ২০৫ পাঠ করুন।

আর হাদীস শরীফে এসেছে : من كثر سواد قوم فهوم منهم অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের দল ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে, সে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত।

বদর যুদ্ধের উপর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত

বদর যুদ্ধের বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও সহীহ এবং সরাসরি বর্ণনা পাঠকদের সামনে এসে গেছে, যদ্দরুন এ বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরায়শদের ঐ কাফেলা আক্রমণ করা যা আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিল। মক্কার কুরায়শদের কোন আক্রমণ প্রতিহত করা উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লামা শিবলীর সীরাতুন-নবী গ্রন্থের ভাষ্য হলো, বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্য বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ করা ছিল না, বরং মদীনায় থেকেই তিনি এ সংবাদ পেয়েছিলেন যে, কুরায়শগণ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বের হন এবং বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ করাই বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং কুরায়শের আক্রমণের মুকাবিলাই উদ্দেশ্য ছিল। আল্লামা শিবলীর ধারণা এখানে শেষ হলো।

আল্লামা শিবলীর এ ধারণা সমস্ত মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরের স্পষ্ট বক্তব্য এবং সমস্ত সহীহ ও সরাসরি বর্ণনার বিপরীত।

روى ابن ابى حاتم عن ابى ايوب قال قال رسول الله ﷺ ونحن بالمدينة انى اخبرت عن عير ابى سفيان فهل لكم ان تخرجوا اليها لعل الله يغنمناها قلنا نعم فخرجنا فلما رسرنا يوما او يومين قال قد اخبر واخبرنا فاستعدوا للقتال فقالوا لا والله ما لنا طاقة بقتال القوم (ولكنا اردنا العير) فاعاده فقال له المقداد لانقول لك كما قالت بنوا اسرائيل ٠

১. "ইবন আবূ হাতিম হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) মদীনায় আমাদেরকে বলেন, আমার কাছে এ সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা আসছে। তোমাদের কি ইচ্ছা হয় যে, তোমরা ঐ বাণিজ্য কাফেলা করায়ত্ব করার জন্য বের হও ? আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ কাফেলার মালামাল গনীমত হিসেবে আমাদেরকে দান করবেন। সাহাবাগণ আরয করলেন, হ্যাঁ, এতে আমাদের আগ্রহ আছে। অতঃপর আমরা রওয়ানা হই এবং এক অথবা দু'দিনের মনযিল অতিক্রম করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন যে, মক্কার কাফিরগণ আমাদের অভিযানের সংবাদ পেয়ে গেছে এবং তারা আমাদের সাথে মুকাবিলা ও যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আসছে। তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা ও জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), (বাহ্যিক সরঞ্জামের দিক থেকে) আমাদের এ শক্তি নেই যে, আমরা শক্তিশালী কুরায়শের বলিষ্ঠ বাহিনীর মুকাবিলা করি। আমরা তো কেবল আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। অর্থাৎ আমাদের এ ধরনের কোন চিন্তা কিংবা ধারণাই ছিল না যে, আমাদেরকে কুরায়শের এভাবে মুকাবিলা করতে হবে। তা হলে অন্তত কিছুটা প্রস্তুতি নিয়ে বেরুতে পারতাম।[1] তিনি একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন হযরত মিকদাদ (রা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আমরা আপনাকে বনী ইসরাঈলের মত বলব না যে, اذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ "আপনি এবং আপনার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব।" (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২২৪)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় আছে :

لما سمع رسول الله ﷺ بابى سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين اليهم وقال هذه عير قريش فيها اموالهم فاخرجوا اليها لعل الله ان ينفلكموها فانتدب

১. এ বাক্য আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৬২ এবং তাফসীরে ইবন কাসীর ২খ. পৃ. ২৮৭ সূরা আনফালের বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে। এ জন্যে এ বাক্য সেখান থেকে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন।

الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك انهم لم يظنوا ان رسول الله ﷺ يلقى حربا وكان ابو سفيان قد استنفرحين دنا من الحجاز يتجسس الاخبار ٠

"নবী (সা) যখন শুনলেন যে, আবূ সুফিয়ান বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে আসছে, তখন তিনি মুসলমানদেরকে সেদিকে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানালেন এবং বললেন, কুরায়শের কাফেলা আসছে, যাতে তাদের অগণিত মালামাল রয়েছে। কাজেই তোমরা তাতেআক্রমণ করার জন্য বের হও। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা এ সমুদয় মাল তোমাদেরকে গনীমত হিসেবে দান করবেন। কিছু লোক তাঁর সাথে বের হলো আর কিছু বের হলো না।যার কারণ ছিল, লোকদের এমন কোন ধারণা কিংবা চিন্তাও ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুশমনদের কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। আবূ সুফিয়ান সব সময় এ আশঙ্কায় ছিল। কাজেই সে আগাগোড়াই পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিল। এমন কি আবূ সুফিয়ান যখন এ সংবাদ পেয়ে গেল যে, নবী (সা) কাফেলায় আক্রমণ চালানোর জন্য বেরিয়ে পড়েছেন, তখন তাড়াতাড়ি যমযম গিফারীকে দূত হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করল।" ঘটনার শেষ পর্যন্ত। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৫৬; তাফসীরে ইবন কাসীর, ২খ. পৃ. ২৮৮, সূরা আনফাল; যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১১)।[১]

এ জন্যে হাফিয আসকালানী শারহে বুখারীতে লিখেন :

والسبب فى ذلك ان النبى ﷺ ندب الناس الى تلقى ابى سفيان لاخذ ما معه من اموال قريش وكان من معه قليلا فلم يظن اكثر الانصار انه يقع قتال فلم يجز معه منهم الا القليل ولم ياخذوا اهبة الا ستعداد كما ينبغى بخلاف المشركين فانهم خرجوا مستعدين ذابين عن اموالهم ٠

"বদর যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) লোকজনকে আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের জন্য বের হওয়ার আহ্বান জানালেন, যাতে তাদের ব্যবসায়ের মালামাল হস্তগত করতে পারেন। কেননা এ কাফেলায় মালামাল ছিল বেশি এবং লোক ছিল কম (ত্রিশ অথবা চল্লিশজন)। কাজেই অধিকাংশ আনসারীর এ চিন্তাও হয়নি যে, যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। সামান্য মানুষই তাঁর সাথে বের হয় এবং তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতিও ছিল না। এর বিপরীতে মুশরিকরা আগমন করেছিল পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে, যাতে তারা নিজেদের মালের হিফাযত করতে এবং হামলা প্রতিহত করতে পারে।"[২]

আবূ সুফিয়ান যখন এ সংবাদ পেয়ে গেল যে, নবী (সা) কাফেলায় আক্রমণ চালানোর জন্য বেরিয়ে পড়েছেন, তখন তাড়াতাড়ি যমযম গিফারীকে দূত হিসেবে এ পয়গামসহ মক্কায় প্রেরণ করল :

---

১. যেমনটি যারকানী কৃত শারহে মাওয়াহিবে আছে, ১খ. পৃ. ৩১০।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২২২।

يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة اموالك مع ابى سفيان قد عرض لها محمد فى اصحابه لا ارى ان تدركوها الغوث - الغوث ·

"ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়, দ্রুত ধাবিত হও এবং ঐ উটগুলোর সংবাদ নাও, যেগুলো কাপড় এবং মালামালে পরিপূর্ণ বোঝাই । আর খবর নাও নিজেদের মালামালের যা মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীগণ দখল করার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। আমার ধারণা তোমাদের মাল নিরাপদে নেই। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব, নিজেদের মালের কাছে উপস্থিত হও।" [১]

যমযম গিফারীকে প্রেরণের পর আবূ সুফিয়ান ধীরস্থীরভাবে কাজ করলেন এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী পথে কাফেলাকে নিরাপদে পার করে নিলেন। আর কাফেলা যখন মুসলমানদের লক্ষ্যস্থল থেকে বেরিয়ে গেল, তখন আবূ সুফিয়ান কুরায়শদের নামে অপর একটি সংবাদ প্রেরণ করলেন। তা ছিল এই :

قال ابن اسحاق ولما راى ابو سفيان انه قد احزر عيره ارسل الى قريش انكم انما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالك واموالكم فقد نجاها الله فارجعوا ·

"মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, আবূ সুফিয়ান যখন দেখল যে, কাফেলা মুসলমানদের আক্রমণস্থল পার হয়ে গেছে তখন কুরায়শদের নামে একটি সংবাদ পাঠাল যে, তোমাদের তো কেবল নিজেদের বাণিজ্য কাফেলা, মালামাল এবং লোকজনের হিফাযতের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তা রক্ষা করেছেন। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও।"[২]

আবূ সুফিয়ানের এ বার্তা কুরায়শদের কাছে ঠিক ঐ সময় পৌঁছলো যখন তারা জুহফা নামক স্থানে উপস্থিত হয়েছিল। লোকজন ফিরে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু আবূ জাহল শপথ করল যে, আমরা এ অবস্থায়ই বদর পর্যন্ত যাব এবং যুদ্ধ না করে ফিরব না। কিন্তু আখনাস ইবন শুরায়ক আবূ জাহলের এ কথা শুনল না, সে বনী যুহরাকে উদ্দেশ্য করে বলল :

يا بنى زهرة قد نجى الله لكم اموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة ابن نوفل وانما نفرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا بى جنبها وارجعوا فانه لاحاجة لكم بان تخرجوا فى غير صنعة لاما يقول هذا قال فرجعوا فلم يشهدها زهرى واحد ·

"ওহে বনী যুহরা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ধন-সম্পদ রক্ষা করেছেন এবং তোমাদের সঙ্গী মাখরামাকেও রক্ষা করেছেন। আর তোমরা তো কেবল তাকে এবং নিজেদের মালামালকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলে, আর তা রক্ষা পেয়েছে। কাজেই আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা ফিরে যাও, বিনা প্রয়োজনে

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৫৮।

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

অগ্রসর হওয়ায় কি ফায়দা? আখনাসের কথা অনুসারে বনী যুহরার সমস্ত লোক রাস্তা থেকেই ফিরে গেল। এমন কি বনী যুহরার একটি লোকও বদর যুদ্ধে অংশ নেয়নি।"[১]

বনী হাশিম তো প্রথম থেকেই যুদ্ধে যেতে চাচ্ছিল না, আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্নের কারণে অগ্রসর হতেই প্রস্তুত ছিল না। আবার জুহমের স্বপ্ন তাদেরকে আরো নিরুৎসাহিত করে তুলেছিল। যখন আবূ সুফিয়ানের এ বার্তা এসে পৌঁছল যে, বাণিজ্য কাফেলা বিপদমুক্ত হয়েছে, তখন তারা আরো সংশয়াপন্ন হয়ে পড়ল। সুতরাং তালিব ইবন আবূ তালিব এবং তার সাথে আরো কয়েকজন মক্কায় ফিরে গেল। এরপর যখন আখনাস ইবন শুরায়ক বনী যুহরার লোকজন সাথে নিয়ে ফিরে গেল, তখন তারা আরো দোটানায় পড়ে গেল। কিন্তু আবূ জাহলের জিদ, যুদ্ধোন্মাদনা এবং উৎসাহের দরুন তারা বদরের দিকে রওয়ানা হলো।

উতবা এবং শায়বা প্রথম থেকেই যাত্রায় উৎসাহী ছিল না এবং শেষ পর্যন্তই তারা চাচ্ছিল যে, মক্কায় ফিরে যাবে, যেমনটি পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

এক্ষণে এ ধরনের বিশদ ও প্রাঞ্জল বর্ণনার পরও কি এ প্রশ্নের অবকাশ আছে যে, রাসূল (সা) ও সাহাবাগণ বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হননি, বরং কুরায়শের যে বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য বের হয়েছিল, রাসূল (সা) তা প্রতিহত করার জন্য বদরে গিয়েছিলেন।

নবী (সা) যখন সাহাবাগণ সহ মদীনা থেকে রওয়ানা হন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শুধু কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করা, আবূ জাহল এবং তার বাহিনী সম্পর্কে কোন কল্পনাই তাঁর ছিল না, বরং মনের মধ্যেও এ ধরনের সম্ভাবনার নাম-নিশানাও ছিল না।

যেমন আবূ জাহল ও কুরায়শ বাহিনীর মনেও এ কল্পনা ছিল না যে, তারা কোন বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করবে। বরং যখন আবূ সুফিয়ানের দূত যমযম গিফারী মক্কায় উপস্থিত হয়ে এ সংবাদ শোনাল যে, তোমাদের বাণিজ্য কাফেলা বিপদের মধ্যে আছে, মুসলমানগণ এতে আক্রমণ করতে চাচ্ছে, তখন মক্কায় হুলস্থূল পড়ে গেল এবং কুরায়শগণ আবূ জাহলের নেতৃত্বে পূর্ণ শান-শওকতের সাথে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য বের হয়। জুহফা নামক স্থানে পৌঁছে কুরায়শগণ আবূ জাহলের পক্ষ থেকে সংবাদ পায় যে, কাফেলা নিরাপদে পার হয়ে এসেছে। আর রাসূল (সা) সফরা নামক স্থানে পৌঁছে খবর পান যে, বাণিজ্য কাফেলা তো পার হয়ে গেছে আর কুরায়শ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। মুসলমানগণ যেহেতু যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হননি, এ জন্যে তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন যে, এখন কি করা উচিত (যার পূর্ণ বিবরণ পূর্বে বলা হয়েছে)। কাজেই আল্লামার এ ধারণা করা যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কখনই বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের কোন চিন্তাই করেন নি, বরং প্রথম

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৬৬।

থেকেই নবী (সা) যে সফর শুরু করেন, তা কুরায়শের ঐ সেনাবাহিনীর মুকাবিলা এবং ধ্বংস করার জন্য ছিল, যারা স্বয়ং মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এটা এক উদ্ভট ধারণা যা তাঁর স্বপ্রণোদিত বর্ণনা এবং স্বউদ্ভাবিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা আনা হলে নবী (সা)-এর সমস্ত হাদীসের ভাণ্ডার, কুরআনের বাণীসমূহ, সীরাত রচয়িতাদের বর্ণনা এবং ইতিহাসবিদগণের রচনাসমূহকে অস্বীকার করতে হয়। সেই আল্লাহর দুশমনদের জন্য শত শত আফসোস, যারা আল্লাহর নবী এবং তাঁর অনুসারীগণের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করেছিল, তাঁদেরকে নিজ ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছিল, তাদের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করেছিল এবং ভবিষ্যতেও তাদের পরিকল্পনা এমনটিই ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টায় আলস্য করেনি। কাজেই মুসলমানগণ যদি তাদের জান বা মালের ক্ষতি করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে, তা হলে একে সভ্যতা বিরোধী ও মানবতা বিরোধী মনে করা এবং যে সকল বর্ণনায় কিছুটা ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে, সেখানে ব্যাখ্যা করা আর যেখানে ব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই তা উল্লেখই না করা—যাতে নিজেদের স্ব নির্ধারিত মূলনীতির বিপরীত কিছু না হয়, এরূপ বৈশিষ্ট্য জ্ঞান ও বিশ্বস্ততার পরিপন্থি। قراطيس تبدرنها وتخفون كثيرا

বদর যুদ্ধের পূর্বে যত অভিযান প্রেরণ করা হয়েছে, তার কমবেশি সবগুলোই কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। তা হলে কেবল বদর যুদ্ধের ব্যাপারে কেন সমস্যার সৃষ্টি হলো ?

এখন এ দাবি অবশিষ্ট রইল যে, কাফিরদেরকে প্রথমেই আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফির পূর্বে আক্রমণ না করে। অর্থাৎ জিহাদের জন্য প্রথমেই আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়, বরং কাফির যদি প্রথমে আক্রমণ করে বসে, তখন তা প্রতিহত করা যাবে। তবে এর জবাব জিহাদ অধ্যায়ের শুরুতে বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে, সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে। যে মক্কার কাফিরগণ তেরটি বছর ধরে মুসলমানদের দৈহিক ও আর্থিক সব ধরনের ক্ষতি করতে পারে, তাদের ইপর সব ধরনের নির্যাতন চালাতে পারে, আর ভবিষ্যতের জন্য হুমকি ধমকি দিতে পারে, মুসলমানদের অভিসন্ধির ব্যাপারে উদগ্রীব থাকে এবং এর জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করতে থাকে, তাদের জানমালের প্রতি মুসলমানদের অগ্রগামী হয়ে আক্রমণ করা বৈধ না হওয়া যুক্তি ও ঐতিহ্য, উভয়টিরই বিরোধী।

সার সংক্ষেপ

সার কথা হলো এই যে, এতদসমুদয় বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে, মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবিগণ বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের জন্য মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মক্কার কুরায়শ ও আবূ জাহল এ বাণিজ্য কাফেলা রক্ষার জন্যই বেরিয়েছে। মুমিন এবং কাফির সবারই লক্ষ্য ছিল এই বাণিজ্য কাফেলার

প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। আর উভয় পক্ষই এটাই বুঝেছিল, আল্লামা তা বুঝুন আর নাই বুঝুন। অধিকন্তু বদর যুদ্ধের পূর্বে যত যুদ্ধ ও অভিযান এসেছিল, এর সবগুলোই ছিল আক্রমণাত্মক, প্রতিরক্ষামূলক ছিল না। এ সবের সূচনা মহানবী (সা)-এর পক্ষ থেকেই হয়েছিল।

ইয়াহূদী মহিলা আসমাকে হত্যা (২৬ রমযানুল মুবারক, দ্বিতীয় হি.)

আসমা ছিল এক ইয়াহূদী স্ত্রীলোক, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা রচনা করত এবং তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিত। মানুষকে নবী (সা) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলত। নবী (সা) বদর থেকে তখনো ফেরেননি, পুনরায় সে এ ধরনের কবিতা বলল। এতে হযরত উমায়র ইবন আদী (রা)-এর জিদ চেপে গেল। তিনি মান্নত করলেন যে, আল্লাহর অনুগ্রহে যদি রাসূলুল্লাহ (সা) নিরাপদে বদর থেকে ফিরে আসেন, তা হলে আমি একে হত্যা করব।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বদর থেকে আল্লাহর অনুগ্রহে সুস্থভাবে ও নিরাপদে ফিরে এলেন, তখন উমায়র (রা) রাত্রিকালে তরবারি নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করলেন। যেহেতু তিনি অন্ধ ছিলেন, সেহেতু হাতড়িয়ে আসমার আশেপাশে থাকা শিশুদের সরিয়ে দিলেন এবং তার বুকের উপর তরবারি রেখে এত জোরে চাপ দিলেন যে, তা পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মান্নত পূর্ণ করে তিনি ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি তাঁকে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), এ জন্যে আমার কোন জরিমানা তো হবে না? তিনি বললেন, না। لا ينتطح فيها غنزان "এ ব্যাপারে দু'টি মেষও মাথা দিয়ে গুঁতোগুঁতি করবে না।" অর্থাৎ এটা এমন কোন কাজই নয়, যে ব্যাপারে কেউ মতপার্থক্য বা প্রতিবাদ করতে পারে।

সত্যিকারের পয়গম্বরগণের মর্যাদা পরিপন্থী কোন অপরাধকারীকে হত্যা করা কোথায় প্রতিশোধ গ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হয়, বরং তা সর্বোচ্চ নৈকট্যলাভ ও উত্তম ইবাদতের মধ্যে গণ্য। কেউ এর প্রতিবাদ করতে পারে না, পশুও একে বৈধ মনে করে।

মুসান্নাফে হাম্মাদ ইবন সালমায় বর্ণিত আছে যে, এ স্ত্রীলোকটি মহিলাদের ঋতুস্রাব মাখা কাপড় এনে মসজিদে রাখত।

মোটকথা, হযরত উমায়র (রা)-এর এ কাজে রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই খুশি হন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন : اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عمير بن عدى "যদি কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখতে চায়, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গোপনে সাহায্য করে, তা হলে যেন উমায়র ইবন আদীকে দেখে।"

হযরত উমর (রা) বলেন, ঐ অন্ধকে দেখ, সে কেমন গোপনে আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ওকে তোমরা অন্ধ বলো না, ও তো চক্ষুষ্মান। অর্থাৎ দৃশ্যত যদিও সে অন্ধ, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে সে চক্ষুষ্মান। পবিত্র রমযানের পাঁচটি রাত বাকী থাকতে এ মহিলাকে হত্যা করা হয়। বিস্তারিত জানার জন্য যুরকানী, ১খ. পৃ. ৪৫৩ এবং হাফিয ইবন তায়মিয়া প্রণীত الصارم المسلول على شاتم الرسول গ্রন্থ দেখুন। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৮ ও উয়ূনুল আসার, ২খ. পৃ. ২৯৩ দ্র.)।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে একবার হযরত উমায়র (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : انطلقوا ابنا الى البصر الذى فى بنى واقف لعوده "আমাদেরকে ঐ চক্ষুষ্মানের কাছে নিয়ে চল, যে বনী ওয়াকিফে বাস করে। আমরা তার সেবা করব।"

হাফিয ইরাকী বলেন :

فبعثه عميرا الخطميا * لقتل عصما هجت النبيا ۔

কারকারাতুল কুদর-এর যুদ্ধ

বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শাওয়াল মাসের প্রারম্ভে বনী সুলায়ম এবং বনী গাতফানের মিলিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে নবী (সা) দু'শ লোক নিয়ে বের হন। 'কুদর' নামক ঝর্ণার কাছে গিয়ে জানতে পান যে, ইসলামের দুশমনেরা পূর্বেই তাঁর আগমনের কথা জানতে পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। তিন দিন সেখানে অবস্থান করে যুদ্ধ ও লড়াই ছাড়াই তাঁরা ফিরে আসেন।

কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, এখান থেকে তিনি একটি ক্ষুদ্র দল তাদের শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যাঁরা গনীমত হিসেবে পাঁচশত উট নিয়ে ফিরে আসেন।

শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনসমূহ এবং যিলকাদ মাস তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। আর ইত্যবসরে বদর যুদ্ধবন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদের মুক্তি দেয়া হয়।[১]

আবূ আফক ইয়াহূদীকে হত্যা

শাওয়াল মাসেই রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ আফক ইয়াহূদীকে হত্যা করার জন্য হযরত সালিম[২] ইবন উমায়র (রা)-কে প্রেরণ করেন।

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৫৪।

২. হযরত সালিম ইবন উমায়র (রা) ছিলেন বদরী সাহাবী। আকাবায়ও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহর ভয়ে তিনি অত্যধিক কাঁদতেন। কান্নার চিহ্ন বিশেষভাবে তাঁর চেহারায় বিদ্যমান ছিল। (ইসাবা, হযরত সালিম ইবন উমায়র (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যায়)। হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর সময়ে ইনতিকাল করেন। چون خدا خواهد که ما یاری کند ثرمیل مار اجانب زاری کند

আবূ আফক ছিল ধর্মের দিক থেকে ইয়াহূদী এবং সে ছিল এক'শ কুড়ি বছর বয়সী এক বৃদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিন্দা করে কবিতা বলত এবং লোকজনকে তাঁর শত্রুতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। যখন তার পশুসুলভ আচরণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন হযরত (সা) তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে ইরশাদ করলেন : من لى بهذا الخبيث "কে আছ, যে আমার জন্য অর্থাৎ আমার মান-মর্যাদার খাতিরে এ খবীসকে হত্যা করবে।"

হযরত সালিম ইবন উমায়র (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি আগে থেকেই মান্নত করেছি যে, হয় আবূ আফককে হত্যা করব আর না হয় আমি নিজেই নিহত হব। রাসূলের কথা শোনামাত্রই সালিম (রা) তরবারি নিয়ে রওয়ানা দিলেন। গরমের রাত ছিল, আবূ আফক ছিল আলস্যের নিদ্রায় বিভোর। পৌঁছেই তিনি তার কলিজা বরাবর তরবারি রেখে এত জোরে চাপ দিলেন যে, আঘাত তার পিছন পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আল্লাহর দুশমন আবূ আফক জোরে একটা চিৎকার দিল। লোকজন দৌড়ে এলো, কিন্তু ততক্ষণে কাজ শেষ হয়ে গেছে।[১]

হাফিয ইরাকী (র) বলেন :

فبعثه سالما الى عفك * قتله اذى النبى وافك ·

"আর তিনি সালিমকে পাঠালেন আফকের প্রতি, তিনি তাকে হত্যা করেন নবী (সা)-কে কষ্ট দেয়া এবং মিথ্যে দুর্ণাম করার অভিযোগে।" (كذب وافترى على النبى ﷺ পৃ. ২৪)

বনী কায়নুকার যুদ্ধ (১৫ শাওয়াল, শনিবার, দ্বিতীয় হি.)

বনী কায়নুকা ছিল সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর ভ্রাতৃ সম্পর্কীয় গোত্র। এরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সাহসী। স্বর্ণকারের কাজ করত। শাওয়ালের পনের অথবা ষোল তারিখ শনিবারে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বাজারে গেলেন এবং তাদেরকে একত্র করে ওয়ায করলেন :

يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقرش من النقمة واسلموا فانكم قد عرفتم انى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله اليكم ·

"ওহে ইয়াহূদী সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অন্যথায় বদরের দিন যেভাবে কুরায়শ সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছিল, তেমনি তোমাদের উপর এসে না পড়ে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, এ জন্যে যে, তোমরা নিশ্চয়ই ভাল করেই জান যে, যেমনটি তোমরা তোমাদের কিতাবে লিখিত পেয়েছ এবং আল্লাহ যার

---

১. ইবন সাদ প্রণীত, তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ১৯; ইবন তায়মিয়া প্রণীত الصارم المسلول على شاتم الرسول পৃ. ১০৩; উয়ূনুল আসার, পৃ. ২১৪ ও ৩১৪; যুরকানী, ১খ. পৃ. ৪৫৫।

প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যের ব্যাপারে তোমাদের ওয়াদা নিয়েছেন, নিঃসন্দেহে আমিই আল্লাহর সেই নবী ও রাসূল।"

ইয়াহূদীরা তাঁর কথা শোনামাত্র ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ল এবং উত্তরে বলল, আপনি এক অখ্যাত ও অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের অর্থাৎ কুরায়শের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে এতটা গর্ব করবেন না, আল্লাহর কসম, যদি আমাদের সাথে লাগতে আসেন, তা হলে বুঝবেন আমরা কতটা বীর পুরুষ। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ·

"দু'টি দলের পরস্পরে সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল আর অন্যদল ছিল কাফির, ওরা তাদের চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এতে অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান : ১৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন, তখন বনী কায়নুকা, বনী কুরায়যা এবং বনী নাযীরের সঙ্গে এ চুক্তি হয়েছিল যে, আমরা আপনার সাথে যুদ্ধও করব না এবং আপনার কোন শত্রুকে সাহায্যও করব না। কিন্তু সর্বপ্রথম বনী কায়নুকা এ চুক্তি ভঙ্গ করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রূঢ় জবাব দেয় ও যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করে।

এরা মদীনা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে বাস করত। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে হযরত আবূ লুবাবা ইবন আবদুল মুনযির আনসারী (রা)-কে নিযুক্ত করে বনী কায়নুকার উদ্দেশ্যে বের হন। ওরা কিল্লায় প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) পনেরই শাওয়াল থেকে পনরই যিলকদ পর্যন্ত তাদেরকে ঘিরে রাখেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তারা ষোলই তারিখে বেরিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের পানি গ্রহণের অনুমতি দান করেন।

মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলূলের অনুরোধের দরুন তিনি তাদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন কিন্তু ধন-সম্পদ দখল করে নিয়ে তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং গনীমতের মালসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। মালের এক-পঞ্চমাংশ নিজে গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ মুজাহিদগণের মধ্যে বিতরণ করে দেন। বদর যুদ্ধের পর এটা ছিল প্রথম এক-পঞ্চমাংশ যা রাসূলুল্লাহ (সা) স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা) বলেন, বনী কায়নুকার সাথে আমার মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। তাদের নষ্টামী এবং অমানবিকতা দেখে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি এবং তাদের সাথে বৈরী সম্পর্কের ঘোষণা করি :

يا رسول الله اتبرا الى الله والى روسله واتولى الله ورسوله والمؤمنين وابرا من حلف الكفار وولايتهم ·

"ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি আপনার দুশমনদের সাথে বৈরী এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণকে আমার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী বানিয়ে নিচ্ছি এবং কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং চুক্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজকে মুক্ত করে নিচ্ছি।"[১]

দ্রষ্টব্য : এ হাদীস দ্বারা প্রকাশ পেল যে, ঈমানের জন্য যেমন আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিন বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যিক, অনুরূপভাবে আল্লাহর দুশমনদের সাথে শত্রুতা, ঘৃণা, অসন্তুষ্টি ও বৈরিতার ঘোষণা দেয়াও জরুরী।[২] ফিরে আসা, সম্পর্ক নয়, কেবল এ স্থানেই সত্যে পরিণত হয়। বিস্তারিতভাবে প্রয়োজন হলে আরিফে রব্বানী, মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র)-এর মাকতুবাত দেখুন যে, ঈমানের জন্য কেবল সত্যায়নই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দুশমনদের সাথে বৈরিতা ও অসন্তুষ্টির উদ্রেক না হয়। আর তাই ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কুফরীর সাথে শত্রুতা ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত। তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে এমনটিই উল্লেখ আছে।

সাবীকের যুদ্ধ (দ্বিতীয় হিজরীর ৫ যিলহজ্জ)

মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় এবং ক্ষয়-ক্ষতির সংবাদ যখন মক্কায় পৌঁছল, তখন আবূ সুফিয়ান ইবন হারব এ মর্মে শপথ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মদীনা আক্রমণ না করেছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অপবিত্রতার গোসল করব না।

কাজেই এ শপথ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যিলহজ্জ মাসের প্রথমভাগে দু'শ অশ্বারোহী সহ মদীনার দিকে রওয়ানা হয়। মদীনা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী 'উরায়য' নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করে। সেখানে দু'জন মানুষ কৃষিকাজে নিমগ্ন ছিল। একজন আনসার এবং অপরজন ছিল মজুর। সে উভয়কে হত্যা করে এবং খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়ে ধারণা করে আমার শপথ পূর্ণ হয়েছে। অতঃপর পলায়ন করে।

এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) দু'শ আনসার ও মুহাজির সহ পাঁচই যিলহজ্জ রোববার আবূ সুফিয়ানকে প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু কাউকেই পাওয়া যায়নি, কেননা তারা পূর্বেই পালিয়েছিল। চলার পথে বোঝা হালকা রাখার জন্য ওরা সঙ্গে আনা ছাতুর থলেগুলো ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ ছাতুর থলেগুলো মুসলমানগণ হস্তগত করেন বিধায় এ যুদ্ধের নাম 'গাযওয়াতুস সাবীক বা ছাতুর যুদ্ধ'।[৩]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৩।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৩।

৩. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৫৮।

ঈদুল আযহা

রাসূলুল্লাহ (সা) নয়ই যিলহজ্জ সাবীক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দশই যিলহজ্জ দু'রাকাআত ঈদের নামায আদায় করেন ও দু'টি দুম্বা কুরবানী করেন এবং মুসলমানগণকেও কুরবানী করার নির্দেশ দেন। এটাই ছিল মুসলমানদের প্রথম কুরবানীর ঈদ।[১]

হযরত ফাতিমাতুয যোহরা (রা)-এর বিয়ে

একই বছর[২] রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে হযরত ফাতিমা যোহরার বিয়ে হযরত আলী (রা)-এর সাথে সুসম্পন্ন করেন।

প্রথমত হযরত আবূ বকর (রা) এবং এরপর হযরত উমর (রা) এ সৌভাগ্য হাসিলের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি চুপ থাকেন। এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেছিলেন, আমি আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করছি। অতঃপর হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর মিলে হযরত আলী (রা)-কে পরামর্শ দেন যে, তুমি নিজের জন্য নবী-দুহিতাকে বিয়ের প্রস্তাব দাও। হযরত আলী এ নিঃস্বার্থ শুভাকাঙ্ক্ষীদ্বয়ের পরামর্শ অনুযায়ী নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ আরয পেশ করেন। তিনি ওহীর নির্দেশ[৩] অনুসারে এ প্রস্তাব মঞ্জুর করেন।

হযরত আলী (রা) বলেন, আমি যখন বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহর কসম, আমার কাছে তো কিছুই নেই, অথচ বিয়েতে কিছু না কিছুর প্রয়োজন তো হয়ই। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ, বিবেচনা আমার প্রতি সদয় দৃষ্টি ও দয়ার ফলে সাহস সঞ্চার করে তাঁর দরবারে এ আবেদন পেশ করলাম।

তিনি বললেন, মোহরানা পরিশোধ করার মত তোমার কাছে কিছু আছে কি ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, যে বর্মটি তুমি বদর যুদ্ধ পেয়েছিলে, সেটি কোথায় ? আমি আরয করলাম, তা তো আছে। তিনি বললেন, উত্তম, সে বর্মটিই ফাতিমাকে মোহর হিসেবে দিয়ে দাও। হাদীসটি আহমদ, ইবন সা'দ ও ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। [ইসাবা, হযরত ফাতিমা যোহরা (রা)-এর জীবন চরিত]।

হযরত আলী বর্মটি হযরত উসমানের কাছে চারশ আশি দিরহামে বিক্রি করেন এবং সমুদয় দিরহাম নবী (সা)-এর খিদমতে পেশ করেন। তিনি বললেন, এর মধ্য থেকে সুগন্ধি এবং পোশাক ক্রয় করে নাও।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

২. অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীতেই। তবে মাসের ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, কোন মাসে যিলহজ্জ, মুহররম, নাকি সফর মাসে ? আল্লাহই ভাল জানেন।

৩. মু'জামে তাবারানীতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ফাতিমার বিয়ে আলীর সাথে দিয়ে দাও। এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য।–যারকানী, ৫খ. পৃ. ২২০।

৪. যারকানী, ২খ. পৃ. ৩।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কন্যাকে যেসব দ্রব্য উপহার দিয়েছিলেন, তা ছিল, একটি লেপ, একটি বালিশ, যার মধ্যে তুলার পরিবর্তে কোন গাছের আঁশ ভর্তি ছিল, দু'টি চাক্কি (যাঁতা), একটি মশক এবং দু'টি মাটির কলস। [আল্লামা মুনযিরী প্রণীত আত তারগীব ওয়াত তারহীব, الترغيب فى الاذكار بعد المكتوبات অধ্যায়[1] এবং ইমাম আহমদও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]।

যখন বাসরের সময় এলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে বললেন, একটি ঘরের ব্যবস্থা কর। হযরত আলী ভাড়ায় একটি ঘর নিলেন এবং সেখানে বাসর উদযাপন করলেন। হযরত ফাতিমা পরামর্শ দিলেন যে, হারিসা ইবন নু'মানের ঘর চেয়ে নাও। হযরত আলী বললেন, আমি লজ্জাবোধ করি। যে কোনভাবে এ সংবাদ হযরত হারিসার কাছে পৌঁছে গেল। হারিসা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আল্লাহর কসম, আপনি আমার জন্য যা পরিত্যাগ করবেন, তার চেয়ে আপনি যা গ্রহণ করবেন, তাই আমার নিকট বেশি প্রিয়। তিনি বললেন, صدقت بارك الله فيك "তুমি সত্য বলেছ, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।"[2] হারিসা নিজে অন্যত্র চলে গেলেন এবং হযরত আলী এবং হযরত ফাতিমাকে নিজ গৃহে এনে নামিয়ে দিলেন। [ইবন সা'দ বর্ণিত। ইসাবা, হযরত ফাতিমা যোহরা (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যায়]।

গাতফান যুদ্ধ (তৃতীয় হিজরী)

এ যুদ্ধকে আনমার যুদ্ধ এবং যী আমর-এর যুদ্ধও বলা হয়।

সাবীক যুদ্ধ থেকে ফিরে যিলহজ্জ মাসের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। ইত্যবসরে তিনি এ সংবাদ পান যে, বনী সালাবা এবং বনী মুহারিব (যা গাতফান গোত্রের দুটি শাখা ছিল) নজদ-এ একত্রিত হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মদীনার আশেপাশে লুট-তরাজ করা। দাসূর গাতফানী নামক জনৈক ব্যক্তি ছিল তাদের সর্দার। তৃতীয় হিজরীর মুহররম মাসে তিনি গাতফান গোত্রকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে নজদের পথে মদীনা ত্যাগ করেন। হযরত উসমান ইবন আফফান (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং চারশ' পঞ্চাশজন সাহাবী তাঁর সঙ্গী হন। গাতফানীরা তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়েই পাহাড়ে আত্মগোপন করে, কেবল বনী সালাবার একটি লোক ধরা পড়ে। সাহাবীগণ তাকে ধরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির করে। তিনি লোকটিকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে।

---

১. প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ. ২৬০।

২ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমার সত্তাকে অদৃশ্য বরকত এবং আসমানী কল্যাণের খনি বানিয়ে দিন। এ অর্থ ইসমে যরফের কারণে বুঝা যায়। অতএব বুঝে নিন এবং এর উপর অবিচল থাকুন।

পূর্ণ সফর মাস তাঁরা সেখানেই অবস্থান করেন, কিন্তু কেউই তাদের মুকাবিলা করার জন্য এলো না। ফলে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই রবিউল আউয়াল মাসে মদীনায় ফিরে আসেন।[১]

এ সফরে এ ঘটনা সংঘটিত হয় যে, পথিমধ্যে বৃষ্টি আসে এবং সাহাবাগণের কাপড়-চোপড় ভিজে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের কাপড় শুকানোর জন্য একটি গাছে ঝুলিয়ে দেন এবং ঐ বৃক্ষের নীচে শুয়ে পড়েন। সেখানে এক বেদুঈন তাঁকে দেখছিল। বেদুঈন তাদের সর্দার দাসূর, যে তাদের মধ্যে বড় বীরও ছিল, তাকে গিয়ে সংবাদ দেয় যে, মুহাম্মদ (সা) ঐ বৃক্ষের নীচে একাকী শুয়ে আছেন এবং তাঁর সাহাবীগণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে আছেন। তুমি গিয়ে তাঁকে হত্যা করে এসো। দাসূর একটি ধারালো তরবারি নেয় এবং খোলা তরবারি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বলে, ওহে মুহাম্মদ, এবার বল, আজ তোমাকে আমার তরবারি থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করবেন। এ কথা বলার অপেক্ষামাত্র ছিল, হযরত জিবরাঈল (আ) তার বুকে জোরে করাঘাত করেন। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে তরবারি ছিটকে পড়ে যায় এবং নবী (সা) তরবারিটি উঠিয়ে নেন এবং দাসূরকে বললেন, এবার বল, তোমাকে আমার তরবারি থেকে কে রক্ষা করবে? সে বলল, কেউই নেই। এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং কালেমা أَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ পাঠ করে। অতঃপর শপথ করে যে, এখন আর আপনার বিরুদ্ধে কোন ফৌজ জমা করব না। তিনি দাসূরকে তার তরবারি ফিরিয়ে দেন। দাসূর কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলো এবং বলল, আল্লাহর শপথ, আপনি আমার চেয়ে উত্তম। দাসূর যখন নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলো, তখন লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি যে কথা বলে গেলে, তা কোথায় গেল? দাসূর তখন সমুদয় ঘটনা খুলে বলল এবং বলল, এভাবে অদৃশ্য থেকে আমার বুকে জোরে করাঘাত করা হলো, যাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। এভাবে পড়ে যাওয়ায় আমি চিনে ফেললাম এবং বিশ্বাস করলাম যে, ঐ করাঘাতকারী কোন ফেরেশতা হবেন। এ জন্যে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম, তাঁর রিসালতের সাক্ষ্য দিলাম এবং নিজ সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۔

"হে মু'মিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ তাদের হাত তোমাদের থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন।" (সূরা মায়িদা : ১১)

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২।

ইমাম বায়হাকী বলেন, এ ধরনের ঘটনা ও বর্ণনা যাতুর রিকা যুদ্ধের সময়েও বর্ণিত হয়েছে। ওয়াকিদী এ ঘটনাটিকে গাতফান যুদ্ধের সাথে বর্ণনা করেছেন। যদি তা যথার্থ হয় তবে এ দু'টি ছিল ভিন্ন ঘটনা। একটি গাতফান যুদ্ধের সময় এবং অপরটি যাতুর রিকা যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল, যেমনটি সামনে বর্ণনা আসবে।[১] আল্লামা যারকানী বলেন, বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো, এ ঘটনা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন।[২]

বুহরান যুদ্ধ

গাতফান যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর নবী (সা) রবিউল আউয়াল মাস মদীনাতেই কাটান। রবিউস সানী মাসে তাঁর নিকট সংবাদ এলো যে, হিজায ভূমির খনিস্বরূপ, বুহরান নামক স্থানে বনী সুলায়ম[৩] গোত্র ইসলামের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে। সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি তিনশ সাহাবী সঙ্গে নিয়ে বুহরানের দিকে যাত্রা করলেন। মদীনার ভার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উম্মে মাকতূমের হাতে সোপর্দ করলেন।

নবী (সা)-এর আগমনের সংবাদ পাওয়ামাত্র তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং তিনি লড়াই ছাড়াই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। বুহরানে তিনি কত দিন অবস্থান করেছিলেন এ ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, মাত্র দশ রাত অবস্থান করেছেন, আর কেউ বলেন, ষোলই জমাদিউল আউয়াল পর্যন্ত অবস্থান করেন।[৪]

ইয়াহূদী কা'ব ইবন আশরাফকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান (তৃতীয় হিজরীর ১৪[৫] রবিউল আউয়াল রাত্রিতে)

বদর যুদ্ধের বিজয় সংবাদ যখন মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছল, তখন ইয়াহূদী কা'ব ইবন আশরাফ খুবই দুঃখিত হলো এবং বলল, যদি এ সংবাদ সত্য হয় যে, মক্কার বড় বড় সর্দার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিহত হয়েছে, তা হলে জমির উপরিভাগের চেয়ে নিম্নভাগই শ্রেয়। অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম—যাতে এ অপমান-অপদস্থতা দেখতে না হয়।

কিন্তু যখন এ সংবাদ সত্য প্রমাণিত হলো, তখন সে বদর যুদ্ধে নিহতদের জন্য সমবেদনা প্রকাশের লক্ষ্যে মক্কায় যাত্রা করল। নিহতদের স্মরণে শোকগাঁথা রচনা করে ও তা পাঠ করে করে নিজেই ক্রন্দন করছিল এবং অপরকেও কাঁদাচ্ছিল। সে

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২১০; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ১৬।

৩. এ কারণে এ যুদ্ধকে বনী সুলায়মের যুদ্ধ ও বলা হয়।

৪. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২৪।

৫. যারকানী, ২খ. পৃ. ৮; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৫৯।

সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে লোকজনকে উৎসাহ দিয়ে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করছিল। একদিন সে কুরায়শদের নিয়ে হরম শরীফে আসে এবং কা'বার গিলাফ ধরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করে। কয়েকদিন পর সে মদীনায় ফিরে আসে এবং মুসলমান মহিলাদের জড়িয়ে প্রেম নিবেদনমূলক অশ্লীল কবিতা বলা শুরু করে।[১]

হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কা'ব ইবন আশরাফ একজন বড় কবি ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিন্দা করে কবিতা রচনা করত, মক্কার কাফিরদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সব সময় উস্কানি দিত এবং মুসলমানদেরকে নানা ধরনের কষ্ট দিত।

রাসূলুল্লাহ (সা) সব সময় মুসলমানদেরকে ধৈর্য ও সহনশীলতার আদেশ দিতেন কিন্তু যখন সে সব ধরনের অপকর্মের কোনটি থেকেই ক্ষান্ত হলো না, রাসূলুল্লাহ (সা) তখন নিজে শরীআতের প্রধান বিচারক হিসেবে কা'ব ইবন আশরাফকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে হত্যার আদেশ দেন। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযীর বরাতে ফাতহুল বারী, কা'ব ইবন আশরাফ হত্যা অধ্যায়)।

এক বর্ণনায় আছে যে, একবার কা'ব ইবন আশরাফ তাঁকে দাওয়াতের বাহানায় আমন্ত্রণ করে এবং কিছু ব্যক্তিকে এ জন্যে মোতায়েন করে যে, যখন তিনি আসবেন, তখন যেন তাঁকে হত্যা করে। হযরত (সা) এসে বসেছেন এমন সময় জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে ওর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিবরাঈল (আ)-এর পাখার ছায়ায় ফিরে চলে আসেন এবং তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।[২]

সহীহ্ বুখারীতে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যার জন্য কে প্রস্তুত আছ, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে খুবই কষ্ট দিয়েছে।[৩] এ কথা শোনামাত্র হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আপনি কি তার হত্যা কামনা করেন ? তিনি (সা) বললেন, হ্যাঁ। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তাহলে আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন (অর্থাৎ এমন কিছু দুর্বোধ্য, প্রশংসাসূচক এবং দ্ব্যর্থক বাক্য), যা শুনে সে দৃশ্যত আনন্দিত হয়। তিনি বললেন, অনুমতি রইল।

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৯; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৭১।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৫৯।

৩. অপর এক বর্ণনায় আছে যে, নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি তার কবিতা দ্বারা আমাদেরকে খুবই কষ্ট ও নির্যাতন করছে এবং মক্কার মুশরিকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে শক্তি (উৎসাহ) দিচ্ছে। (হাকিম তাঁর আল ইকলীল গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)–ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৫৯; যারকানী, ৩খ. পৃ. ১০।

মুহাম্মদ[১] ইবন মাসলামা (রা) একদিন কা'বের সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন এবং আলোচনার শুরুতে বললেন, এ ব্যক্তি [রাসূলুল্লাহ (সা)] (ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করার জন্য) আমাদের নিকট থেকে সদকা ও যাকাত চায়। আর এ ব্যক্তি আমাদেরকে কষ্টে ফেলেছে (নিঃসন্দেহে এটা লোভী ও অতৃপ্ত আত্মার জন্য খুবই কষ্টদায়ক কিন্তু নিঃস্বার্থ ও সত্যবাদীদের জন্য সৎ অন্তঃকরণে সদকা দান করা এবং ফকীর-মিসকীনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা অত্যন্ত প্রিয় ও উন্নতমানের সুস্বাদু বস্তু, বরং আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় না করাটাই তাদের নিকট কষ্টদায়ক)।

আমি এক্ষণে আপনার নিকট ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছি। কা'ব বলল, এখনই কেন, এর পরে দেখ, আল্লাহর কসম, তোমরা তার দ্বারা উত্যক্ত হবে। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা বললেন, এখন তো আমরা তাঁর অনুসারী হয়েছি, তাঁকে ত্যাগ করা আমরা পসন্দ করছি না, পরিণতির অপেক্ষায় আছি। (আর অন্তরে ছিল, পরিণতি তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিজয় ও দুশমনের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এবং নিশ্চিত, যাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই)। এ সময় আমরা চাচ্ছি যে, কিছু খাদ্যশস্য আমাদেরকে ঋণ হিসেবে দিন। কা'ব বলল, উত্তম, তবে তোমরা আমার কাছে বন্ধক হিসেবে কিছু রাখ। তারা বললেন, আচ্ছা, কি জিনিস বন্ধক রাখতে চান ? কা'ব বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে[২] বন্ধক রাখ। তারা বললেন, নিজেদের স্ত্রীদেরকে কিভাবে বন্ধক রাখতে পারি, প্রথমত আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ এর পরিপন্থি। আর এটাও সঠিক যে, আপনি অত্যন্ত সুন্দর, সুদর্শন এবং যুবক।[৩] কা'ব বলল, তোমরা তোমাদের কন্যাদেরকে বন্ধক রাখ। তারা বললেন, এটা তো সমস্ত জীবনের জন্য কলঙ্কস্বরূপ, মানুষ আমাদের সন্তানদেরকে এ বলে অভিসম্পাত দেবে যে, তোমরা তো তারাই, যারা দু' অথবা তিন সের খাদ্যশস্যের জন্য নিজ কন্যাদেরকে বন্ধক দিয়েছিলে। তবে হ্যাঁ, আমরা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আপনার কাছে বন্ধক রাখতে পারি।

হযরত ইকরামা সূত্রে একটি মুরসাল বর্ণনায় আছে যে, তারা বলেছিলেন, আপনি জানেন, আমরা কতটা অস্ত্রের মুখাপেক্ষী এবং তা আমাদের কাছে কতটা প্রয়োজনীয়।

১. ইবন আবদুল বার-এর বর্ণনায় আছে, মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ ওয়াদা করার পর কয়েকদিন পর্যন্ত চিন্তিত থাকেন। অবশেষে কাব ইবন আশরাফের দুধভাই আবূ নায়েলা সিলকান ইবন সালামা ইবন ওয়াক্কাশ, আব্বাদ ইবন বিশর, হারিস ইবন আওস এবং আবূ আবস ইবন জিবরান প্রমুখের সাথে মিলে পরামর্শ করেন। এতে সবাই ঐকমত্য প্রকাশ করেন এবং সমস্বরে বলে উঠেন, আমরা সবাই মিলে তাকে হত্যা করব। অতঃপর সবাই মিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা), সেখানে গিয়ে কিছু না কিছু তো বলতে হবে। তিনি বললেন, যা ভাল মনে কর, তাই বলো, এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে অনুমতি রইল। ইরশাদুস সারী।

২. এর দ্বারা এ ব্যক্তির অভ্যন্তরীন পাপচারের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩. যুবক শব্দটি ইবন ইসহাকের বর্ণনা থেকে নেয়া হয়েছে।

কিন্তু এমতাবস্থায় আমরা আমাদের অস্ত্র আপনার কাছে বন্ধক রাখতে পারি। কিন্তু নিজেদের স্ত্রী ও কন্যা বন্ধক রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কা'ব তা মেনে নিল এবং সিদ্ধান্ত হলো যে, রাত্রিকালে এসে শস্য নিয়ে যাবে ও অস্ত্র বন্ধক রেখে যাবে।

ওয়াদামাফিক এরা রাত্রিতে এসে উপস্থিত হলেন এবং কা'বকে ডাকলেন। কা'ব তার ঘর থেকে বের হতে চাইল। তার স্ত্রী বলল, এ সময় কোথায় যাচ্ছ ? কা'ব বলল, মুহাম্মদ ইবন মাসলামা এবং আমার দুধভাই আবূ নায়লা এসেছে, অপর কেউ নয়, তুমি চিন্তা করো না। স্ত্রী বলল, এ আওয়াজ থেকে আমি রক্তের আভাস পাচ্ছি। কা'ব বলল, সম্ভ্রান্ত বংশের কাউকে যদি রাত্রিকালে বর্শাঘাত করার জন্যও ডাকা হয়, তবুও তার যাওয়া দরকার। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা তার সঙ্গীদেরকে বুঝালেন যে, কা'ব এলে আমি তার চুলের ঘ্রাণ নেব। যখন দেখবে যে, আমি মযবূতভাবে তার চুল ধরেছি, তখন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য দ্রুত তার মাথাটা কেটে ফেলবে। কাজেই যখন কা'ব এলো, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা বললেন, আজকের মত এমন সুগন্ধির ঘ্রাণ তো আমি কখনো পাইনি। কা'ব বলল, আমার কাছে আরবের সর্বাপেক্ষা সুদর্শন, সুন্দরী এবং সবচে' সুগন্ধিযুক্ত স্ত্রীলোক রয়েছে। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা বললেন, আপনি কি আমাকে আপনার সুগন্ধিযুক্ত চুলের ঘ্রাণ নেয়ার অনুমতি দেবেন ? কাব বলল, হ্যাঁ, অনুমতি দিলাম। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা অগ্রসর হয়ে নিজেও তার চুল শুঁকলেন এবং সঙ্গীদেরকেও শোঁকালেন। কিছুক্ষণ পর মুহাম্মদ ইবন মাসলামা বললেন, আপনি কি দ্বিতীয়বার আমাকে চুল শোঁকার অনুমতি দেবেন ? কা'ব বলল, তোমার ইচ্ছেমত। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা উঠলেন এবং চুল শুঁকতে মনযোগী হলেন। যখন মাথার চুল দৃঢ়ভাবে ধরলেন ও সঙ্গীদেরকে ইঙ্গিত দিলেন, তারা সবাই তখন দ্রুত তার মাথা কেটে ফেলল এবং চটজলদি কাজ সমাপ্ত করল।[১]

আর শেষরাতে তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদের দেখামাত্র বললেন : افلحت الوجوه। "ঐ চেহারাগুলো সফল হয়েছে।" তারা উত্তরে বললেন : ووجهك يا رسول الله। "আর সর্ব প্রথম হে আল্লাহর রাসূল, আপনার পবিত্র চেহারা।"

এরপ তারা কা'ব ইবন আশরাফের কর্তিত মাথা তাঁর সামনে পেশ করলেন। তিনি আলহামদু লিল্লাহ বলে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।[২]

ইয়াহূদীরা যখন এ ঘটনার সংবাদ পেল, তখন অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হয়ে পড়ল এবং প্রভাত হলে ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলো এবং আরয করল, আমাদের সর্দারকে এভাবে মারা হয়েছে। তিনি বললেন, সে

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৬০।

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

মুসলমানদেরকে নানা ধরনের কষ্ট দিত এবং লোকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উস্কানি দিত। ইয়াহূদীরা রুদ্ধশ্বাসে বসে রইল এবং কোন উত্তর দিতে সক্ষম হলো না। এরপর তিনি তাদের নিকট থেকে এ মর্মে চুক্তিনামা লিখিয়ে নিলেন যে, ভবিষ্যতে ইয়াহূদীদের মধ্যে কেউ এ ধরনের তৎপরতায় লিপ্ত হবে না। (তাবাকাতে ইবন সা'দ)

কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যার কারণসমূহ

হাদীসের বর্ণনাসমূহ দ্বারা কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যার যে সমস্ত কারণ পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ :

১. নবী করীম (সা)-এর মর্যাদার পরিপন্থি অমানবিক অপবাদ, গালি গালাজ এবং বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ,

২. তাঁর নিন্দাসূচক কবিতা বলা,

৩. কবিতা এবং চটুল ছড়া কেটে মুসলমান মহিলাদের প্রতি অশালীন অপবাদ আরোপ করা,

৪. বিশ্বাস ঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গ করা,

৫. মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা ও উস্কানি দেয়া এবং তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা,

৬. দাওয়াতের বাহানায় তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা এবং

৭. ইসলাম ধর্মকে বিদ্রূপ করা।

কিন্তু তাকে মৃত্যুদণ্ডদানের সবচে' শক্তিশালী কারণ হলো আল্লাহর রাসূলের প্রতি অপবাদ আরোপ, তাঁকে গালি গালাজ করা ও তাঁর নিন্দায় কবিতা রচনা করা ।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়মিয়া (র) তাঁর الصارم المسلول على شاتم الرسول গ্রন্থে (পৃ. ৭০-৯১) এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইমাম যুহরী বলেন, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا (তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের এবং মুশরিকদের নিকট থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে।–সূরা আলে ইমরান : ১৮৬) কা'ব ইবন আশরাফ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। (উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৩০০)।

হযরত আব্বাদ ইবন বিশর (রা) এ প্রসঙ্গে এই কবিতা বলেন :

صرخت به فلم يعرض لصوتى * واوفى طالعا من راس جدم

فعدت له فقال من المنادى * فقلت اخوك عباد بن بشر

وهذای در عنار هنا فخذها * لشهر ان اوفی او نصف شهر

فاقبل نحونا یهوی سریعا * وقال لنا لقد جئتم لامر

وفی ایمانا بیض حداد * مجربه بها الکفار نفری

فعانقه ابن مسلمة المردی * به الکفار کاللیث الهزیر

وشد بسیفه صلتا علیه * فقطره کاللیث الهزبر

وشد بسیفه صلتا علیه * فقطره ابو عبس به جبر

وکان اللّه سادسنا فابنا * بانعم نعمة واعز نصر

وجاء برأسه نفر کرام * هم ناهیك من صدق وبر

হাফিয ইরাকী তার আলফিয়াতুস সিয়ার গ্রন্থে বলেন :

فبعثه محمد بن مسلمة * فی رفعة لقتل کعب الملامة

جاؤا برأسه فاقدموه * قال لهم افلحت الوجوه

হযরত হুয়ায়সা ইবন মাসঊদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

কা'ব ইবন আশরাফকে মৃত্যুদণ্ডদানের পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাগণকে এ নির্দেশ দেন যে, এ চরিত্রের ইয়াহূদীদের যেখানে পাও, তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তাদের হত্যা করো। কাজেই এই দণ্ডাদেশ অনুযায়ী হুয়ায়সা ইবন মাসঊদের ছোট ভাই মুহায়সা ইবন মাসঊদ ইবন সুবায়না নামক জনৈক ইয়াহূদীকে হত্যা করে ফেলেন। সে ছিল ব্যবসায়ী এবং স্বয়ং হুয়ায়সা, মুহায়সা এবং অপরাপর মদীনাবাসীর সাথে শত্রুতা পোষণ করত।

হুয়ায়সা তখনো মুসলমান হননি কিন্তু মুহায়সা পূর্বে থেকেই মুসলমান ছিলেন। হুয়ায়সা যেহেতু বয়সে বড় ছিলেন, ছোটভাইকে ধরে মারতে শুরু করলেন এবং বললেন, রে আল্লাহর দুশমন, তুই তাকে হত্যা করলি ! আল্লাহর কসম, ওর মাল দ্বারা তোর পেটে কতটা চর্বি জমেছে। মুহায়সা বললেন : واللّٰهُ لقد امرنی بقتله من لو امرنی بقتلك لضربت عنقك "আল্লাহর কসম, তাকে হত্যার জন্য আমাকে এমন সত্তার পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যদি সে মহান সত্তা তোমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতেন, তা হলে আমি নিঃসন্দেহে তোমাকেও হত্যা করতাম।

হুয়ায়সা বললেন : اللّه لو امرك بقتلی لقتلتنی "আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ যদি আমাকে হত্যার জন্য তোকে নির্দেশ দেন, তা হলে সত্যি সত্যিই তুই কি আমাকে হত্যা করবি ?"

মুহায়সা বললেন : نعم واللّه لو امرنی بضرب عنقك لضربتها "হ্যাঁ, আল্লাহ কসম, যদি তোমার মাথা কেটে ফেলারও নির্দেশ দিতেন তবে অবশ্যই আমি তাই করতাম।"

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশ পেলে তুমি যে আমার ভাই এ চিন্তাও করতাম না। শুনে হুয়ায়সা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল এবং অবচেতনভাবে বলে উঠল, আল্লাহর কসম, এটাই প্রকৃত দীন, যা অন্তরে এমনিভাবে দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার সৃষ্টি করে। এরপর হুয়ায়সা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং সাচ্চা দিলে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর অভিযান (তৃতীয় হিজরীর জমাদিউস সানীর প্রথমভাগ)

বদর যুদ্ধের ঘটনার পর মক্কার কুরায়শগণ মুসলমানদের প্রতি এতটা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, তাদের আক্রমণের ভয়ে নিজেদের পুরাতন পথে চলাচল পর্যন্ত ছেড়ে দিল। সুতরাং সিরিয়ার পথ বর্জন করে তারা ইরাকের পথ গ্রহণ করল এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে মজুরীর বিনিময়ে ফুরাত ইবন হায়্যান আজালীকে সঙ্গে নিল। আর মক্কা থেকে প্রচুর পণ্য সামগ্রী সহ একটি বাণিজ্য কাফেলা ইরাকের পথে রওয়ানা হলো। এ কাফেলায় আবূ সুফিয়ান ইবন হারব, সাফওয়ান ইবন উমায়্যা, হুয়ায়তিব ইবন আবদুল উযযা এবং আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়াও ছিলেন (মক্কা বিজয়ের সময় এ চারজনই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন)।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর নেতৃত্বে একশত সাহাবীর একটি দল প্রেরণ করলেন। তারা উপস্থিত হয়েই বাণিজ্য বহরে আক্রমণ করে বসলেন। এতে কাফেলা তো দখল করলেন, কিন্তু গোত্রপতি, সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং কাফেলার লোকজন পালিয়ে গেল। কেবল ফুরাত ইবন হায়্যান আজালীকে গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে এলেন। ফুরাত মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। মালে গনীমতের প্রাচুর্য এরদ্বারা বুঝা যায় যে, যখন এ মালের এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করা হলো, তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল বিশ হাজার দিরহাম। এতে বুঝা যায়, সমুদয় মালের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ দিরহাম।[১]

আবূ রাফে'র মৃত্যুদণ্ড (তৃতীয় হিজরীর মধ্য জমাদিউস সানী)

আবূ রাফে' ছিল একজন ধনাঢ্য ইয়াহূদী ব্যবসায়ী। আবূ রাফে' ছিল তার উপাধি, আর তার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন আবুল হুকায়ক। তাকে বাল্লাম ইবন আবুল হুকায়কও বলা হতো। খায়বরের নিকটে এক উপত্যকায় সে বাস করত। সে ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভয়ঙ্কর শত্রু এবং তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিত। সে ছিল কাব ইবন আশরাফের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারী। এই ব্যক্তিই আহযাব যুদ্ধে মক্কার কুরায়শদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করে এবং প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২৫; যারকানী, ২খ. পৃ. ১৭।

তাদেরকে সাহায্য করে। এছাড়া সে সব সময়েই মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করত।[১]

কা'ব ইবন আশরাফের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকারী হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা এবং তাঁর সঙ্গীগণ (রা) যেহেতু সবাই আওস গোত্রের লোক ছিলেন, সেহেতু খাযরাজ গোত্রের মনে এ ধারণার উদয় হলো যে, আওস গোত্র তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একজন প্রাণঘাতী শত্রু, রাসূলের দরবারের একজন অপরাধী ও উদ্ধত আচরণকারী কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যা করে সৌভাগ্য ও মর্যাদা হাসিল করেছে, কাজেই আমাদেরও উচিত রাসূলের অপর শত্রু, অপরাধী ও উদ্ধত আচরণকারী আবূ রাফে'র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে হত্যার উভয় জাহানের সম্মান ও মর্যাদা লাভ করা। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবূ রাফে'র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি অনুমতি দান করেন।[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আতীক, মাসঊদ ইবন সিনান, আবদুল্লাহ ইবন উনায়স, আবূ কাতাদা, হারিস ইবন রিবঈ এবং খুযাঈ ইবন আসওয়াদ (রা)-কে তাকে হত্যার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা)-কে এ দলের নেতা মনোনীত করেন এবং বিশেষভাবে নির্দেশ দেন, কোন শিশু ও স্ত্রীলোকে যেন কখনই হত্যা না করা হয়।[৩]

তৃতীয় হিজরীর জমাদিউস সানী মাসের মাঝামাঝি[৪] সময়ে আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা) তাঁর সঙ্গিগণ সহ খায়বরের দিকে যাত্রা করেন (তারিখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ৬)। সহীহ বুখারীতে হযরত বারা ইবন আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মানুষ যখন নিজ নিজ পশুপালকে চারণভূমি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, তখন এঁরা খায়বরে এসে উপস্থিত হন। আবূ রাফে'-এর কিল্লা যখন নিকটবর্তী হলো, তখন আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা) তার সঙ্গীদের বললেন, তোমরা এখানেই বসে অপেক্ষা কর। আমি ভিতরে প্রবেশের কোন উপায় খুঁজে বের করি। যখন দরজার একদম নিকটবর্তী হলাম, তখন কাপড় মুড়ি দিয়ে এভাবে বসে পড়লাম, যেমনভাবে মানুষ তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য বসে থাকে। দারোয়ান আমাকে

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৩৭।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৬২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

৪. এটা ইমাম তাবারীর বক্তব্য, ইবন সাদ বলেন আবূ রাফে' নিহত হওয়ার ঘটনা ষষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে সংঘটিত হয়। কেউ বলেন, এটা চতুর্থ অথবা পঞ্চম হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ঘটনা আর কেউ বলেছেন, তৃতীয় হিজরীর রজব মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে ইমাম যুহরী সূত্রে বলেন, আবূ রাফে' কাব ইবন আশরাফের পর নিহত হয়েছে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৬৩।

তাদের নিজেদের লোক ভেবে বলল, ওহে আল্লাহর বান্দা, ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি এসো। আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। আমি দ্রুত ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং লুকিয়ে একপাশে বসে পড়লাম।

আবূ রাফে' প্রাসাদে বাস করত এবং রাতে সেখানে গল্পের আসর বসত। যখন গল্পের আসর শেষ হয়ে গেল এবং লোকজন নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল, তখন দারোয়ান দরজা বন্ধ করে দিল এবং চাবির গোছা এনে একটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখল।

যখন সবাই নিদ্রা গেল, আমি উঠে খুঁটি থেকে চাবির গোছা নামিয়ে নিয়ে দরজা খুলে প্রসাদের ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমি যে দরজাই খুললাম, ভিতরে প্রবেশ করে তা বন্ধ করে দিলাম যাতে লোকজন আমার আগমন সংবাদ পেলেও আমি আমার কাজ শেষ করতে পারি।

প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তা অন্ধকারাচ্ছন্ন, আর আবূ রাফে' তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে শুয়ে ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, আবূ রাফে' কোথায় এবং কোনদিকে। আমি ডাক দিলাম, ওহে আবূ রাফে'। আবূ রাফে' বলল, কে ? আমি ভয়ে ভয়ে তার আওয়াজ লক্ষ্য করে তরবারি চালালাম। কিন্তু তা বিফল হলো। আবূ রাফে' একটা চিৎকার দিল। একটু পরে আমি কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে সহানুভূতির সুরে বললাম, আবূ রাফে' এটা কিসের শব্দ ? আবূ রাফে' বলল, এক্ষুণি কোন ব্যক্তি আমার উপর তরবারি চালিয়ে ছিল। শোনামাত্র আমি দ্বিতীয়বার তরবারি চালালাম, যার ফলে সে গুরুতর আহত হলো। এরপর আমি তরবারির সম্মুখভাগ তার পেটের উপর রেখে এত জোরে চাপ দিলাম যে, তা পিঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ফলে আমি বুঝতে পেলাম, আমি তার সমাপ্তি ঘটাতে পেরেছি। এবারে আমি ফিরে চললাম এবং একটি একটি দরজা খুলে অগ্রসর হলাম। যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম, তখন মনে হলো মাটির কাছে এসে পড়েছি। এতে নামতে গিয়ে পড়ে গেলাম এবং আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। চাঁদনী রাত ছিল, আমি আমার পাগড়ি খুলে পা বাঁধলাম এবং সঙ্গীদের কাছে এসে বললাম, তোমরা যাও এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ সুসংবাদ দাও। আমি এখানেই বসে রইলাম এবং ওর মৃত্যু ও নিহত হওয়ার ঘোষণা শুনে আসব। কাজেই যখন প্রভাত হলো এবং মোরগ বাঁক দিতে শুরু করল, তখন ঘোষণাকারী কিল্লার চূড়ায় উঠে তার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করল। তা শুনে আমি সেখান থেকে রওয়ানা হলাম এবং সঙ্গীদের মিলিত হয়ে বললাম, দ্রুত চল, আল্লাহ আবূ রাফে'কে ধ্বংস করেছেন। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম ও তাঁকে এ সুসংবাদ দিলাম এবং সমুদয় ঘটনা তাঁর কাছে খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পা বিছিয়ে দাও। আমি পা বিছিয়ে দিলাম। তিনি তাতে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন। আমার মনে হল যে, পায়ে কোনদিন কোন আঘাতই ছিল না। (সহীহ বুখারী, আবূ রাফে' হত্যা অধ্যায়; ফাতহুল বারী, আবূ রাফে' হত্যা অধ্যায়; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৩৮)।

হাফিয ইরাকী (র) বলেন :

فبختّه لابن عتيك معه * قوم من الخروج كى تمنعه
لخيبر لابن ابى الحقيق * لقتله اعين بالتوفيق
واختلفوا فقيل ذا فى السادسه * او ثالث او رابع او خامسه

উহুদ[১] যুদ্ধ
(তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাস)

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ : "স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট থেকে প্রভাতে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করছিলে" (সূরা আলে ইমরান : ১২১)।

মক্কার কুরায়শগণ যখন বদর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে, তখন জানতে পায় যে, ঐ বাণিজ্য কাফেলা যা আবূ সুফিয়ান সমুদ্রোপকূলবর্তী পথ দিয়ে নিরাপদে নিয়ে এসেছিলেন, তা মূলধন ও লভ্যাংশসহ আমানত হিসেবে দারুন নাদওয়ায় সুরক্ষিত রয়েছে। বদরে এভাবে অত্যন্ত শোচনীয় ও অপমানজনক পরাজয়ের বেদনা তো সবার অন্তরেই ছিল, কিন্তু যাদের পিতা বা পুত্র, ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয় বা আপনজন বদরে নিহত হয়েছিল, থেকে থেকে তাদের অন্তর দগ্ধীভূত হচ্ছিল। আর প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তো প্রত্যেকের বুকেই ছিল লুক্কায়িত।

অবশেষে আবূ সুফিয়ান ইবন হারব,[২] আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়া, ইকরামা ইবন আবূ জাহল, হারিস ইবন হিশাম, হুয়ায়তিব ইবন আবদুল উযযা, সাফওয়ান ইবন উমায়্যা এবং অপরাপর নেতৃস্থানীয় কুরায়শগণ এক বৈঠকে একত্রিত হল। এ উদ্দেশ্যে যে, বাণিজ্য কাফেলার মালামাল আমানত হিসেবে সংরক্ষিত আছে, তন্মধ্যে মূলধন তো অংশীদারদের মধ্যে তাদের অংশ অনুযায়ী বন্টন করা হবে, আর লভ্যাংশ সম্পূর্ণটাই মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যয় করা হবে যাতে আমরা

---

১. মদীনা মুনাওয়ারার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়ের নাম উহুদ, যা মদীনা থেকে কম-বেশি দু'মাইল দূরে অবস্থিত। উহুদকে এ জন্যে উহুদ বলা হয় যে, এ পাহাড়টি অন্য কোন পাহাড়ের সাথে সংযুক্ত নয়, বরং একক একটি পৃথক পাহাড়। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৫।

২ বদর যুদ্ধে আবূ সুফিয়ানের পুত্র হানযালা, ইকরামার পিতা আবূ জাহল, হারিস ইবন হিশামের ভাই আবূ জাহল ইবন হিশাম এবং সাফওয়ান ইবন উমায়্যার পিতা উমায়্যা নিহত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আবূ সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইবন উবাই, রবীয়া, ইকরামা ইবন আবূ জাহল, হারিস ইবন হিশাম, হুয়ায়তিব এবং সাফওয়ান সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন (রা)। যারকানী, ২খ. পৃ. ২০।

মুসলমানদের থেকে নিজেদের পিতা ও পুত্র, আত্মীয় ও আপনজন, নেতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। একবাক্যে এবং আগ্রহভরে সবাই এ প্রস্তাব সমর্থন করল এবং বাণিজ্যের সম্পূর্ণ লভ্যাংশ, যার পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার দীনার, এর সবটাই এ উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হলো।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ٠

"আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিরগণ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর তা তাদের মনোকষ্টের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে।" (সূরা আনফাল : ৩৬)

কুরায়শগণ কর্তৃক স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া

মোট কথা, কুরায়শগণ যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং স্ত্রীলোকদেরও সঙ্গে নিল যাতে তারা ছড়া (রাজায) ও কবিতা আবৃত্তি করে যোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে পারে এবং পলায়নকারীদের ধিক্কার দেয়। অধিকন্তু যোদ্ধারা স্ত্রীলোকের কাছে অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সর্বান্তকরণে প্রাণপণ যুদ্ধ করে পিছনে বসে থাকার চিন্তাও না করে। তারা বিভিন্ন গোত্রের প্রতি দূতও প্রেরণ করে যাতে তারা অংশগ্রহণ করে শক্তি বৃদ্ধি করে। এভাবে তিন হাজার যোদ্ধা জমা হয়ে যায়, যাদের মধ্যে সাতশত ছিল বর্ম পরিহিত। অধিকন্তু দু'শত ঘোড়া, তিন হাজার উট ও পনেরজন স্ত্রীলোক সহযাত্রী ছিল। এই তিন হাজার সুসজ্জিত যোদ্ধা আবূ সুফিয়ান ইবন হারবের নেতৃত্বে খুবই শান-শওকতের সাথে তৃতীয় হিজরী সনের পাঁচই শাওয়াল মক্কা থেকে যাত্রা করল। (তাবাকাতে ইবন সাদ, ২খ. পৃ. ২৫, প্রথম ভাগ; যারকানী, ২খ. পৃ. ২০; তারিখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ৯)।

হযরত আব্বাস (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুরায়শের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ

হযরত আব্বাস (রা) এ সমুদয় ঘটনা লিখে দ্রুতগামী এক ভৃত্যের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে প্রেরণ করেন এবং ভৃত্যকে তাগিদ দেন যে, যেভাবেই হোক, তিনদিনের মধ্যেই এ পত্র তাঁর কাছে পৌঁছাবে।[১]

মহানবী (সা) কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ

এ সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি হযরত আনাস এবং মূনিস (রা)-কে কুরায়শ বাহিনীর

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ২১।

সংবাদ নেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা ফিরে এসে সংবাদ দেন যে, কুরায়শের বাহিনী মদীনার অত্যন্ত নিকটে এসে পড়েছে। এরপর তিনি হযরত হুবাব ইবন মুনযির (রা)-কে শত্রুসেনার সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করার জন্য প্রেরণ করেন যে, তাদের সেনা সংখ্যা কত হতে পারে। তিনি এসে সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত করলেন। হযরত সা'দ ইবন মু'আয, হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র এবং হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) সমস্ত রাত মসজিদে নববী পাহারা দেন এবং শহরের চারপাশেও পাহারা বসানো হয় (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২৫, প্রথম ভাগ)। এটা ছিল জুমুআর রাত, প্রভাত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে ডেকে পরামর্শ করেন। প্রবীণ মুহাজির ও আনসারগণ পরামর্শ দেন যে, মদীনাতেই অবস্থান নিয়ে প্রতিরোধ করা হোক। কিন্তু যে সকল যুবক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, এবং শাহাদত লাভের আগ্রহে অস্থিরচিত্ত ছিলেন, তাদের পরামর্শ ছিল মদীনা থেকে বেরিয়ে আক্রমণ করা হোক। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি স্বপ্নে[১] দেখলাম আমি একটি শক্তিশালী বর্ম পরিধান করে আছি এবং একটি গাভী যবেহ করছি। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, মদীনা একটি শক্তিশালী বর্মের মত আর গাভী যবেহে এদিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, এতে আমার সাহাবিগণের মধ্যে কিছু লোক শহীদ হয়ে যাবে। কাজেই আমার সিদ্ধান্ত হলো, মদীনাকেই দূর্গ হিসেবে অবস্থান করে মুকাবিলা করা হোক। আমি স্বপ্নে আরো দেখেছি যে, আমি তরবারি ঘুরাতেই এর সামনের অংশ ভেঙে পড়ে গেল। আবার ঐ তরবারি দ্বিতীয়বার ঘুরানোর সময় তা পূর্বের চেয়ে উত্তম হয়ে গেল। যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তরবারি সদৃশ, যাঁদের তিনি শত্রুর প্রতি প্রেরণ করতেন। সাহাবীগণকে জিহাদে নিয়ে যাওয়া ছিল তরবারি ঘুরানোর মত, প্রথমবার ঘুরানো অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধে এর সামনের অংশ ভেঙে পড়ে যায়, অর্থাৎ কিছু সাহাবা শহীদ হয়ে যান। আবার ঐ তরবারিকেই অপর যুদ্ধে ব্যবহার করাকালে তা পূর্বাপেক্ষা উত্তম ও তীক্ষ্ণ প্রমাণিত হয় এবং দুশমনদের উপর ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই থেকেও তার সাবধানতা ও অভিজ্ঞতার দরুন পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। সে বলল, আমার অভিজ্ঞতা এই যে, যখন কোন দুশমন মদীনা আক্রমণ করেছে এবং মদীনাবাসী শহরে অবস্থান করে মুকাবিলা করেছে, তখন বিজয় লাভ হয়েছে, আর যখন বাইরে বেরিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে, তখন পরাজিত হয়েছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আপনি মদীনা থেকে বেরুবেন না, আল্লাহর কসম, যখনই আমরা মদীনা থেকে বাইরে বেরিয়েছি, তখনই শত্রুর দ্বারা কষ্ট পেয়েছি। আর যখন আমরা মদীনায় অবস্থান করেছি আর শত্রু আমাদের উপর আক্রমণ করেছে, তখন তারাই আমাদের হাতে কষ্ট পেয়েছে। আপনি মদীনায়ই অবস্থান করুন আর যদি শত্রু একান্তই মদীনায় ঢুকে পড়ে, তখন আমাদের পুরুষেরা

---

১. এ স্বপ্ন তিনি ঐ জুমুআর রাতেই দেখেছিলেন। যেমনটি তাবাকাতে ইবন সা'দে (২খ. পৃ. ২৬) বর্ণিত হয়েছে।

তরবারি দিয়ে তাদের মুকাবিলা করবে আর মহিলা ও শিশুগণ ছাদ থেকে তাদের উপর পাথর বর্ষণ করবে। আর যদি তারা বাইরে থেকেই অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায়, তবে তা হবে ভিন্ন ব্যাপার।[১]

কিন্তু কতিপয় প্রবীণ এবং যুবক এ ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখায় যে, মদীনার বাইরে গিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালানো হোক। আর তারা আরয করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তো এ দিনটির কামনা ও আশায় ছিলাম এবং এর জন্যে প্রার্থনা করে আসছিলাম। আল্লাহ ঐ দিন এনেছেন এবং সময়ও সন্নিকটে। হযরত হামযা, হযরত সা'দ ইবন উবাদা ও হযরত নু'মান ইবন মালিক (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! যদি আমরা মদীনায় বসেই তাদের প্রতিহত করি, তাহলে তো তারা আমাদেরকে আল্লাহর পথে কাপুরুষ ভাববে। হযরত হামযা (রা) আরো বললেন : والذى انزل عليك الكتاب لا اطعم اليوم طعاما حتى اجالدهم بسيفى خارج المدينة "ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যতক্ষণ না আমি মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খাদ্য গ্রহণ করব না।"[২]

হযরত নুমান ইবন মালিক আনসারী (রা) আরয করলেন : يا رسول الله لاتحرمنا الجنة فوالذى بعثك بالحق لادخلن الجنة "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন না। কসম ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করব।"

তিনি বললেন, কিসের ভিত্তিতে ? নুমান (রা) আরয করলেন : لانى اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ولا افر ليوم الزحف "এ জন্যে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি যুদ্ধ থেকে কখনই পলায়ন করি না।"

অপর এক বর্ণনায় এ বাক্যাবলী রয়েছে : لانى احب الله ورسوله "এ জন্যে যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি।" তিনি বললেন : صدقت "তুমি সত্যিই বলেছ।"

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন দেখলেন জান্নাতের ভালবাসায় এবং শাহাদতের কামনায় যুবকদের দাবি তো প্রথম থেকেই ছিল যে, মদীনা থেকে বাইরে গিয়ে আক্রমণ করা হোক। অন্যদিকে মুহাজির ও আনসারী প্রবীণ সাহাবীর মধ্যেও কয়েকজন, যেমন হযরত হামযা, হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) প্রমুখ শাহাদতের কামনায় ব্যাকুল এবং অস্থির হয়ে পড়েছেন, তাঁদের রায়ও অনুরূপ। কাজেই তিনিও এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন।

---

১. তারিখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ১০।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৩; যারকানী, ২খ. পৃ. ২৩।

দিনটি ছিল শুক্রবার। জুমু'আর নামায আদায় শেষে তিনি বক্তব্য রাখলেন এবং জিহাদে উদ্বুদ্ধ করলেন ও প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন।

এ কথা শোনামাত্র নিঃস্বার্থ মহব্বতকারী, আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আল্লাহ-প্রেমিকগণের মনে আশার সঞ্চার হলো যে, পার্থিব এ ঝঞ্ঝাটময় জেলখানা থেকে আমাদের মুক্তির সময় সমাগত।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রস্তুতি ও অস্ত্র সজ্জা

আসরের নামায শেষে তিনি হুজরায় প্রবেশ করলেন এবং সাহিবায়ন (তাঁর দু' সঙ্গী, যাঁরা পৃথিবীতেও তাঁর সাথে আছেন, আলমে বরযখে তাঁর সঙ্গে থাকবেন, হাশরের ময়দান, কাউসার নহরের পার্শ্বে এবং জান্নাতেও তাঁর সাথে থাকবেন) অর্থাৎ হযরত আবূ বকর এবং হযরত উমর (রা)-ও তাঁর সাথে হুজরায় প্রবেশ করলেন।

তিনি তখনো হুজরা থেকে বের হননি, ইত্যবসরে হযরত সা'দ ইবন মু'আয এবং হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) লোকজনকে বলছিলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শহরের বাইরে গিয়ে আক্রমণ করতে বাধ্য করেছ, অথচ তাঁর প্রতি আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে। উচিত কর্ম এটাই যে, তাঁর সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হোক। এমনি সময়ে তিনি বর্ম পরিধান করে, যুদ্ধ সাজ এবং অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এলেন। সাহাবিগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমরা ভুলক্রমে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপ দিয়েছি, যা আমাদের জন্য উচিত ছিল না। এখন আপনি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন। তিনি বললেন, অস্ত্র সজ্জিত হওয়ার পর আল্লাহর দুশমনদের সাথে যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা কোন নবীর জন্য[১] বৈধ নয়। এখন আল্লাহর নাম নিয়ে অগ্রসর হও এবং আমি যা নির্দেশ দিই, তা মান্য কর। আর মনে রেখো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ধৈর্যধারণকারী ও অবিচল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাহার্য ও বিজয় তোমাদের জন্যই অবধারিত।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুদ্ধযাত্রা এবং সেনাবাহিনীর বিন্যাস

এগারই শাওয়াল জুমুআর দিন আসরের নামায অন্তে এক হাজার সঙ্গীসহ তিনি মদীনা থেকে যাত্রা করেন। তিনি ছিলেন অশ্বারোহী এবং হযরত সা'দ ইবন মু'আয ও হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) বর্ম পরিহিত অবস্থায় তাঁর সামনে ছিলেন। আর অপরাপর মুসলমানগণ তাঁর ডানে-বামে চলছিলেন। (এতদসমুদয় বিবরণ বিস্তারিতভাবে 'তাবাকাতে ইবন সা'দ' এবং 'যারকানী'তে উল্লিখিত আছে)।

---

১. এরদ্বারা বুঝা যায় যে, এ নির্দেশ কেবল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, বরং সকল পয়গাম্বর (আ)-এর প্রতিই এ নির্দেশ ছিল যে, অস্ত্র সজ্জিত হওয়ার পর শত্রুর মুকাবিলা না করে তা খুলে ফেলা বৈধ নয়। এর দ্বারা এও জানা গেল যে, নফল ও মুস্তাহাব কাজ শুরু করার পর তার হুকুম ওয়াজিব হয়ে যায়।

মদীনা থেকে বেরিয়ে যখন তিনি শায়খাইন[১] নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন সেনাবাহিনীর পরিসংখ্যান নিলেন। এর মধ্যে যারা অল্পবয়স্ক ও ছোট ছিল তাদের তিনি ফিরিয়ে দিলেন। যাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ছিল :

১. হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা),
২. হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা),
৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা),
৫. হযরত উসায়দ ইবন যুহায়র (রা),
৬. হযরত আরাবা ইবন আওস (রা),
৭. হযরত বারা ইবন আযিব (রা),
৮. হযরত যায়দ ইবন আরকাম (রা)।

ইমাম শাফিঈ বলেন, তাঁর খিদমতে সতরজন সাহাবীকে উপস্থিত করা হয়েছিল, যাদের বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর, নবী (সা) তাদেরকে নাবালক বলে ফিরিয়ে দেন। একবছর পর যখন পনর বছর বয়সে উপস্থিত করা হয়, তখন তাদের অনুমতি দান করেন। (যারকানী, ২খ. পৃ. ২৫)।

এই অল্পবয়স্কদের মধ্যে হযরত রাফে' ইবন খাদীজ (রা)-ও ছিলেন। তিনি সাবধানতার সাথে পায়ের অগ্রভাগে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ান, যাতে তাঁকে লম্বা দেখায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে অনুমতি দান করেন। অধিকন্তু তার ব্যাপারে এও বলা হয় যে, এ একজন দক্ষ তীরন্দাজ।

হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র) একবার নাফে'-কে জিজ্ঞেস করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) কোন্ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন ? নাফে' বলেন, আমাকে হযরত ইবন উমর নিজেই বলেছেন, যখন বদর যুদ্ধ হলো, তখন আমার বয়স ছিল তের বছর, উহুদ যুদ্ধকালে আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। বদর যুদ্ধকালে তো আমি যাওয়ার ইচ্ছাই করিনি, কিন্তু উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমি নবী (সা)-এর দরবারে প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু অল্পবয়স্ক হওয়ায় তিনি আমার আরযী নাকচ করে দেন। একইভাবে হযরত যায়দ ইবন সাবিত এবং আওস ইবন আরাবা (রা)-কেও বয়সের স্বল্পতার দরুন ফিরিয়ে দেন। কিন্তু হযরত রাফে' ইবন খাদীজ (রা)-কে দীর্ঘদেহী হওয়ার কারণে অনুমতি দেন। যখন খন্দকের যুদ্ধ এসে পড়ল, তখন আমার বয়স ছিল পনের বছর, সে সময় তিনি আমাকে অনুমতি

১. দু'টি টিলার নাম শায়খাইন, যা মদীনা এবং উহুদের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। সেখানে একজন অন্ধ ও বৃদ্ধ ইয়াহূদী পুরুষ এবং একজন অন্ধ ও বৃদ্ধা ইয়াহূদী স্ত্রীলোক বাস করত বলে স্থানটির নাম শায়খাইন হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাবারী ৩খ.।

দান করেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হই। উমর ইবন আবদুল আযীয এ হাদীসটি শুনে তৎক্ষণাৎ কাতিবকে ডেকে শীঘ্র হাদীসটি লিখে নেয়ার নির্দেশ দেন।

লোকজন নিজেদের পুত্র এবং ভাইয়ের জন্য বায়তুল মাল থেকে বৃত্তির আবেদন করত বিধায় যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যাদের বয়স পনর বছর সাব্যস্ত হতো,তাদের নাম যোদ্ধাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হতো এবং তাদের জন্য বায়তুলমাল থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা রাখা হতো। আর যার বয়স পনর বছরের কম, তার নাম বৃত্তির তালিকায় স্থান পেত না। (উয়ূনুল আসার, পৃ. ২৩৩)

হযরত সামুরা ইবন জুনদুব (রা), যিনি তাদের সমবয়স্ক ছিলেন, তিনি খুবই হতাশাব্যঞ্জক বাক্যে বিপিতা হযরত মুররা ইবন সিনান (রা)-কে বললেন, আব্বা, রাফে‘ তো অনুমতি পেয়ে গেল আর আমি থেকে গেলাম। অথচ আমি তার চেয়ে শক্তিশালী, কুস্তি লড়ে তাকে ফেলে দিতে পারি। হযরত মুররা ইবন সিনান (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি রাফে‘কে অনুমতি দিয়েছেন আর আমার পুত্রকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অথচ আমার পুত্র রাফে‘কে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারে।

তিনি রাফে‘ এবং সামুরাকে কুস্তি লড়তে দিলেন। এতে সামুরা রাফে‘কে ফেলে দিলেন। তিনি সামুরাকেও অনুমতি দান করলেন। (তাবারী, ৩খ. পৃ. ১৩)। শিশু-বৃদ্ধ, যুবক-প্রৌঢ় সবাই যেন একই নেশায় নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন, একই নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন, শহীদ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণের ছুরিকাঘাতে ‘শহীদ’ হয়েই ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

ইসলামী বাহিনী থেকে মুনাফিকদের পৃথক হওয়া এবং ফিরে যাওয়া

যখন তিনি উহুদের সন্নিকটে পৌঁছলেন, তখন মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই, যে তিনশত যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, এ কথা বলে ফিরে গেল যে, আপনি তো আমাদের কথা শোনেননি, অকারণে কেন আমরা নিজেদের জীবন ধ্বংস করব। এটা কোন যুদ্ধই নয়, যদি আমরা একে যুদ্ধ মনে করতাম তাহলে আপনাদের সঙ্গী হতাম। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় :

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ اتَّبَعْنٰكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلاِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ.

“এবং মুনাফিকদেরকে জানার জন্য তাদেরকে বলা হয়েছিল, এসো, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তারা বলেছিল, যদি যুদ্ধ জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর বেশি

নিকটবর্তী ছিল। যা তাদের অন্তরে নাই, তা তারা মুখে বলে। আর তারা যা গোপন রাখে, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬৭)

এখন নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে মাত্র সাতশ সাহাবী থাকলেন, যাদের মধ্যে মাত্র একশত ছিলেন বর্ম পরিহিত। আর সমস্ত বাহিনীতে ঘোড়া ছিল মাত্র দু'টি, একটি নবী (সা)-এর এবং অপরটি হযরত আবূ বুরদা ইবন নায়্যার হারিসী (রা)-এর।[১]

খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বনী সালমা এবং আওস গোত্রের মধ্যে বনী হারিসাও ইবন উবাইয়ের মত ফিরে যেতে মনস্থ করেছিল, আর এ দু'টি গোত্র ছিল বাহিনীর দু'পাশে। আল্লাহর ইচ্ছা তাদেরকে বাধা দেয়, আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেন এবং তারা ফিরে যায়নি। তাদের প্রসঙ্গেই এ আয়াত নাযিল হয় :

اِذْهَمَّتْ طَّائِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلاَ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ·

"যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল, অথচ আল্লাহ উভয়ের বন্ধু ছিলেন, আল্লাহর প্রতিই যেন মুমিনগণ নির্ভর করে।" (সূরা আলে ইমরান : ১২২)

তিনি তখনো শায়খাইন নামক স্থানেই ছিলেন, সূর্য ডুবে গেল। হযরত বিলাল (রা) আযান দিলেন। তিনি মাগরিবের নামায পড়ালেন এবং এখানেই রাত্রি যাপন করলেন। আর মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) সারা রাত সেনাবাহিনীর দেখাশোনা, মাঝে মাঝে চক্কর দেয়া এবং নবী (সা)-এর তাঁবু পাহারা দেয়ার দায়িত্ব পালন করতেন।

রাতের শেষ প্রহরে নবী (সা) রওয়ানা হলেন, উহুদের নিকটে পৌঁছলে ফজরের ওয়াক্ত হলো। তিনি বিলাল (রা)-কে আযান দেয়ার আদেশ দিলেন। বিলাল (রা) আযান ও ইকামত বলেন এবং তিনি সমস্ত সাহাবা সহ নামায আদায় করলেন।

সেনা বিন্যাস

নামায শেষ করে সেনাবাহিনীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন। মদীনাকে সামনে এবং উহুদকে পিছনে রেখে যোদ্ধাদের কাতারবন্দী করলেন। যে কাতারগুলো মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বেই মহামহিম আল্লাহর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়েছিল, এখন তারাই সেই মহান সত্তার পথে আত্মোৎসর্গ এবং জীবন বাজি রেখে তাঁর পথে লড়াইয়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেল।[২]

সহীহ বুখারীতে হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে উহুদ পাহাড়ের পিছনের একটি গিরিপথে বসিয়ে রাখেন যাতে কুরায়শ বাহিনী পিছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে। তিনি হযরত আবদুল্লাহ

১. তাবারী, ৩খ. পৃ ১২।

২. ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২৭৪।

ইবন জুবায়র (রা)-কে তাদের নেতা নির্ধারণ করে নির্দেশ দেন যে, যদি তোমরা আমাদেরকে মুশরিকদের উপর বিজয়ী হতে দেখ, তবুও এ জায়গা থেকে নড়বে না, আর যদি মুশরিকদেরকে আমাদের উপর বিজয়ী হতে দেখ, তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য হলেও এ জায়গা থেকে সরবে না।

ইমাম যুহরীর বর্ণনায় আছে, যদি পাখিও আমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে দেখ, তবুও এ স্থান ছাড়বে না।

মুসনাদে আহমদ, মুজামে তাবারানী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা এ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক এবং পিছনদিক থেকে আমাদেরকে হিফাযত কর। যদি আমাদেরকে নিহত হতেও দেখ, তবুও আমাদের সাহায্যের জন্য আসবে না। আর যদি গনীমত সংগ্রহ করতে দেখ, তবুও তাতে অংশগ্রহণ করবে না।[১]

কুরায়শ বাহিনীর অবস্থা

কুরায়শ বাহিনী বুধবারেই মদীনায় পৌঁছে উহুদ প্রান্তরে শিবির স্থাপন করে। এদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার, যার মধ্যে সাতশত বর্ম পরিহিত যোদ্ধা, দু'শত ঘোড়া এবং তিন হাজার উট ছিল। এছাড়া তাদের সঙ্গে মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশীয়া পনরজন স্ত্রীলোক ছিল, যারা কবিতা আবৃত্তি করে যোদ্ধাদেরকে উৎসাহিত করছিল।[২] আত্মপূজারী, প্রবৃত্তির পূজারী এবং শয়তানের পূজারীদের উদ্দেশ্য এমনটিই হয়ে থাকে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ছিল :

১. হিন্দা বিনতে উতবা, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী এবং হযরত মু'আবিয়ার মাতা;

২. উম্মে হাকাম বিনতে হারিস ইবন হিশাম, আবূ জাহলের পুত্র হযরত ইকরামার মাতা;

৩. ফাতিমা বিনতে ওলীদ, হারিস ইবন হিশামের স্ত্রী;

৪. বারযা বিনতে মাসঊদ, সাফওয়ান ইবন উমায়্যার স্ত্রী;

৫. রায়তা বিনতে শায়বা, হযরত আমর ইবন আসের স্ত্রী;

৬. ইয়ালাফা বিনতে সাদ, হযরত তালহা ইবন আবূ তালহা জুমাহীর স্ত্রী;

৭. খিনাস বিনতে মালিক, হযরত মুস'আব ইবন উমায়রের মাতা;

৮. আমরা বিনতে আলকামা।

আল্লামা যারকানী বলেন, এঁদের মধ্যে কেবল খিনাস এবং আমরা ছাড়া সবাই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

কুরায়শগণ তাদের বাহিনীর ডানদিকে খালিদ ইবন ওয়ালিদকে এবং বামদিকে ইকরামা ইবন আবূ জাহলকে, পদাতিক বাহিনীতে সাফওয়ান ইবন উমায়্যাকে, আর

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৭০।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ২৬।

বলা হয় আমর ইবন আসকেও এবং তীরন্দাজদের জন্য আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়াকে প্রধান হিসেবে নির্বাচন করে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এ পাঁচ সেনাধ্যক্ষের সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা)-এর ভাষণ

যখন উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হাতে একটি তরবারি নিয়ে বলেন : من يأخذ هذالسيف بحقه "কে আছ যে এ তরবারিটির হক আদায়ে সক্ষম ?"

এ কথা শুনে এ মহা সৌভাগ্য লাভের জন্য অনেক হাত সামনে এগিয়ে আসে। কিন্তু নবী (সা) নিজের হাত টেনে নেন। ইতোমধ্যে হযরত আবূ দুজানা (রা) দাঁড়ান এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ তরবারির হক কি ? তিনি বললেন, এর হক এই যে, এটা দ্বারা আল্লাহর দুশমনদের আঘাত করবে এবং এমনকি সে নিহত হবে।

এ রিওয়ায়াত মুসনাদে আহমদ এবং সহীহ মুসলিম হযরত আনাস (রা) থেকে, মুজামে তাবারানী হযরত কাতাদা ইবন নুমান (রা) থেকে এবং মুসনাদে বাযযার হযরত যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয আবূ বিশর দুলাবী এ হাদীসটি তাঁর কিতাবুল কিনা-তে হযরত যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, তিনি (সা) বলেছেন তারবারির হক এই যে, এর দ্বারা কোন মুসলমানকে হত্যা না করা এবং কোন কাফিরকে হত্যা করা থেকে পলায়ন না করা।

হযরত আবূ দুজানা (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটি এর হকসহ গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ আমি এর হক আদায় করব। তিনি তৎক্ষণাৎ তরবারিটি হযরত আবূ দুজানার হাতে অর্পণ করলেন।

সম্ভবত তিনি আল্লাহর ওহী মারফত জানতে পেরেছিলেন যে, হযরত আবূ দুজানা (রা) ছাড়া কেউই এ তরবারির হক আদায় করতে সক্ষম হবে না, এ জন্যে কেবল আবূ দুজানা (রা)-কেই প্রদান করলেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।[২]

দ্রষ্টব্য : হযরত আবূ দুজানা (রা) অত্যন্ত সাহসী বীর পুরুষ ছিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁর ক্রোধ চেপে যায় এবং চেহারায় অত্যন্ত বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠে। যুদ্ধকালে লাল রঙের পাগড়ি পরিধান করতেন এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হতেন। সম্ভবত এ জন্যেই নবী (সা) তাঁকে এ তরবারি দান করেন, যেমন পরবর্তীতে তাঁর যুদ্ধ ও মুকাবিলা সম্পর্কে জানা যাবে।

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৭।

২. ইসাবা, ৪খ. পৃ. ৫৮; যারকানী, ২খ. পৃ. ২৮।

যুদ্ধের সূচনা এবং যুদ্ধবাজ কুরায়শগণের এক এক করে নিহত হওয়া

কুরায়শের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আবূ আমের যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে আসে, যে জাহিলী যুগে আওস গোত্রের সর্দার ছিল এবং তপস্যা ও নির্লোভের কারণে যাকে দরবেশ বলে ডাকা হতো। মদীনায় যখন ইসলামের নূর উদ্ভাসিত হলো, সে এ নূরের ঝলক সইতে পারল না, কাজেই মদীনা থেকে মক্কায় চলে এলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তার নাম রাহিব-এর স্থলে ফাসিক নির্ধারণ করেন।

এ ফাসিক মক্কায় এসে কুরায়শদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহী করে তোলে এবং উহুদ যুদ্ধে নিজেই তাদের সাথে আগমন করে। আসার কালে সে দাবি করে যে, আওস গোত্রের লোকজন আমাকে দেখলে মুহাম্মদ (সা)-কে ছেড়ে আমার সাথে যোগ দেবে।

প্রথম যুদ্ধবাজ : সুতরাং উহুদ যুদ্ধে এই আবূ আমেরই ময়দানে উপস্থিত হয় এবং চিৎকার দিয়ে বলে, يا معشر الاوس انا ابو عامر "ওহে আওস গোত্রের লোকজন, আমি আবূ আমের।"

আল্লাহ তা'আলা আওস গোত্রের ঐ লোকদের চক্ষু শীতল করুন, যারা সঙ্গে সঙ্গে এ উত্তর দিলেন, لا انعم الله بك عينا يا فاسق "ওহে ফাসিক, নাফরমান, আল্লাহ যেন তোমার চক্ষু কখনই শীতল না করেন।"

আবূ আমের এ দাঁতভাঙ্গা জবাব শুনে নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম হয়ে ফিরে গেল এবং বলল, আমার অবর্তমানে আমার গোত্রের অবস্থা বদলে গেছে। (যারকানী, ২খ. পৃ. ৩০; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৭৯; তাবারী, ৩খ. পৃ. ১৬; উয়ূনুল আসার, পৃ. ৩৩৬; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৬)।

দ্বিতীয় যুদ্ধবাজ : কিছুক্ষণ পর মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহা ইবন আবূ তালহা ময়দানে আসে এবং চিৎকার করে বলল, ওহে মুহাম্মদের সাথিগণ, তোমাদের ধারণা তো এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তরবারি দিয়ে আমাদেরকে শীঘ্রই জাহান্নামে প্রেরণ করেন এবং আমাদের তরবারি দিয়ে তোমাদেরকে দ্রুত জান্নাতে প্রেরণ করেন। কাজেই তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি, যাকে আমার তরবারি জান্নাতে পাঠিয়ে দেবে অথবা তার তরবারি আমাকে জাহান্নামে প্রেরণ করবে?

এ কথা শোনামাত্র হযরত আলী (রা) মুকাবিলার জন্য বেরিয়ে এলেন এবং তরবারি দিয়ে আঘাত করতেই তার পা কেটে গেল, সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল এবং পরিধেয় বস্ত্র খুলে গেল। হযরত আলী (রা) লজ্জা পেয়ে পিছে হটে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আলী, কেন পিছে সরলে? তিনি বললেন, তার লজ্জাস্থান প্রকাশ পাওয়ায় আমার লজ্জা পেয়েছে।[১]

ইবন সা'দ বলেন, হযরত আলী (রা) তার মাথায় তরবারির আঘাত হানেন।

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ২১; ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২৮।

ফলে তার মাথা দু'ভাগ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দিত হন এবং আল্লাহু আকবর বলেন। সাথে সাথে মুসলমানগণও আল্লাহু আকবর বলে উঠেন।

সম্ভবত হযরত আলীর তরবারির প্রথম আঘাত তার পায়ের উপর পড়ে, যাতে পা কেটে যায় এবং দ্বিতীয় আঘাত তার মাথায় পড়ে, যা তার মাথার খুলি দু'টুকরা করে ফেলে। ইবন জরীরের বর্ণনায় প্রথম আঘাতের উল্লেখ আছে এবং ইবন সা'দের বর্ণনায় দ্বিতীয় আঘাতের বর্ণনা আছে। কাজেই এ দু' বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই।

তৃতীয় যুদ্ধবাজ : কিছুক্ষণ পর উসমান ইবন আবূ তালহা পতাকা নিয়ন্ত্রণ করে এবং এ রাজায আওড়াতে আওড়াতে যুদ্ধক্ষেত্রে আসে :

ان على اهل اللواء حقا * ان تخضب الصعدة او تندقا

"নিশানবর্দারের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যুদ্ধ করতে করতে তার বর্শা শত্রুর রক্তে রঞ্জিত হয় অথবা ভেঙে যায়।"

হযরত হামযা (রা) অগ্রসর হয়ে আক্রমণ চালান এবং তার উভয় হাত ও উভয় কাঁধ কেটে ফেলেন, হাত থেকে পতাকা পড়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে।

চতুর্থ যুদ্ধবাজ : এরপর আবূ সা'দ ইবন আবূ তালহা পতাকা তুলে নেয়। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) দ্রুত একটি তীর বের করে তার কণ্ঠনালি বরাবর ছোঁড়েন, এতে তার জিহ্বা বেরিয়ে আসে। এগিয়ে গিয়ে সাথে সাথে তাকে হত্যা করেন।

পঞ্চম যুদ্ধবাজ : এরপর মুসাফি ইবন তালহা ইবন আবূ তালহা পতাকা উঠিয়ে নেয়। হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা) তাকে এক আঘাতেই হত্যা করে ফেলেন।

ষষ্ঠ যুদ্ধবাজ : এরপর হারিস ইবন তালহা ইবন আবূ তালহা পতাকা উঠিয়ে নেয়। তাকেও হযরত আসিম (রা) এক আঘাতেই খতম করেন। অপর এক বর্ণনামতে হযরত যুবায়র (রা) তাকে হত্যা করেন।

সপ্তম যুদ্ধবাজ : এরপর কিলাব ইবন তালহা ইবন আবূ তালহা পতাকা তুলে নেয়। হযরত যুবায়র (রা) অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করেন।

অষ্টম যুদ্ধবাজ : এরপর জুলাস ইবন তালহা ইবন আবূ তালহা পতাকা উঠায়। সঙ্গে সঙ্গে হযরত তালহা (রা) তাকে হত্যা করেন।

নবম যুদ্ধবাজ : এরপর আরতাত শারজীল পতাকা হাতে নিলে হযরত আলী (রা) তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

দশম যুদ্ধবাজ : এবারে শুরায়হ ইবন কারিয পতাকা তুলে নিয়ে অগ্রসর হয়। সাথে সাথে তাকেও হত্যা করা হয়। শুরায়হ-এর হত্যাকারী কে ছিলেন তা জানা যায়নি।

একাদশতম যুদ্ধবাজ : এরপর এক গোলাম—যার নাম ছিল সওয়াব, সে পতাকা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। হযরত সাদ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) অথবা হযরত হামযা (রা) কিংবা হযরত আলী (রা) এঁদের যে কোন একজন (বর্ণনায় মতপার্থক্য রয়েছে) তাকেও হত্যা করেন।[১]

এভাবে কুরায়শদের বাইশজন সর্দার নিহত হয়, যাদের নাম আল্লামা ইবন হিশাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে এও বলেছেন যে, অমুক অমুক সর্দার অমুক অমুক সাহাবীর হাতে নিহত হয়েছে।[২]

হযরত আবূ দুজানা (রা)-এর বীরত্ব

হযরত আবূ দুজানা (রা), যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ তরবারি অর্পণ করেছিলেন, তিনি খুবই শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমে তিনি একটি লাল রঙের পাগড়ি পরিধান করেন। অতঃপর ধীরে ধীরে ময়দানে এগিয়ে আসেন। তখন তাঁর মুখে ছিল এ কবিতা :

انا الذى عاهد نى خليلى * ونحن بالسفح النخيل
ان لا اقوم الدهر فى الكيول * اضرب بسيف الله والرسول

"আমি ঐ ব্যক্তি যার থেকে আমার সেই বন্ধু শপথ নিয়েছেন (যাঁর ভালবাসা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে রয়েছে, অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ), এ অবস্থায় যখন আমি ছিলাম পাহাড়ের চূড়ায় এক উদ্যানে—

"ঐ শপথ ছিল এই যে, কখনো পিছনের কাতারে দন্ডায়মান হবো না, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের তরবারি দ্বারা দুশমনদের হত্যা করতেই থাকব।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ দুজানাকে গর্বভরে বীরদর্পে চলতে দেখে বললেন, এ চলন আল্লাহর নিকট খুবই অপসন্দনীয়, কিন্তু এ অবস্থায় ছাড়া। অর্থাৎ যখন শুধুই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দুশমনের সাথে মুকাবিলা করা হয়, নিজের জন্য না হয়।

হযরত আবূ দুজানা (রা) শত্রু বাহিনীর কাতার ভেদ করে চলতে থাকলেন। যেই বাধা দিচ্ছিল, তারই লাশ মাটিতে পড়ছিল, এমনকি আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা সামনে পড়ে গেল। আবূ দুজানা (রা) তার উপর তরবারি উঠালেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ ভেবে নামিয়ে ফেললেন যে, বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরবারি কোন স্ত্রীলোকের রক্তে রঞ্জিত হবে, এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অপর এক বর্ণনায় আছে, যখন হযরত আবূ দুজানা (রা) হিন্দার নিকটে পৌঁছে গেলেন, তখন সে লোকদের ডাকাডাকি করল, কিন্তু কেউই তার সাহায্যে এগিয়ে এলো না। হযরত আবূ দুজানা (রা) বলেন, ঐ সময়ে আমার কাছে এটা মোটেই

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ২১; ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২৮।
২ ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৩; যারকানী, ২খ. পৃ. ৩১।

সমীচীন মনে হলো না যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরবারি কোন আশ্রয়হীনা ও অসহায় স্ত্রীলোকের প্রতি চালনা করি।[১]

হযরত হামযা (রা)-এর বীরত্ব ও তাঁর শাহাদতের বর্ণনা

হযরত আলী (রা)-এর ব্যাঘ্র সদৃশ আক্রমণে কাফিরেরা অত্যন্ত আতঙ্কিত ছিল, তিনি যার উপরই তরবারি উত্তোলন করতেন, তারই লাশ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ছিল।

ওয়াহশী ইবন হারব ছিল জুবায়র ইবন মুতইমের হাবশী গোলাম। বদর যুদ্ধে জুবায়রের চাচা তায়মা ইবন আদী হযরত হামযার হাতে নিহত হয়েছিল, এ কারণে জুবায়র অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। ফলে জুবায়র ওয়াহশীকে বলেছিল, যদি তুমি হামযাকে হত্যা করে আমার চাচার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পার, তাহলে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। কুরায়শগণ যখন উহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হলো, ওয়াহশীও তাদের সাথে রওয়ানা হলো।

যখন ওহুদ প্রান্তরে উভয় দল যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হলো এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, তখন সাবা ইবন আবদুল উযযা 'আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ আছ কি' বলে আহ্বান করতে করতে ময়দানে এলো।

হযরত হামযা (রা)-ও তখন তার দিকে 'ওহে সাবা, স্ত্রীলোকের খাতনাকারিণী নারীর পুত্র, তুই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করতে চাস,' বলতে বলতে তার উপর তরবারির একটি কোপ দিলেন। এতেই সে বিপর্যস্ত হয়ে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল।

হযরত হামযা (রা)-এর উদ্দেশ্যে ওয়াহশী একটা পাথরের চাঁইয়ের পিছনে লুকিয়ে বসেছিল। যখন হযরত হামযা (রা) সেদিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, ওয়াহশী তাঁর নাভী বরাবর বর্শা ছুঁড়ে মারল যা তাঁর পিঠ ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

এ অবস্থায়ও হযরত হামযা (রা) কয়েক কদম অগ্রসর হলেন। কিন্তু গড়িয়ে পড়ে গেলেন এবং শাহাদতের সুধা পান করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এ বর্ণনা সহীহ বুখারীর। মুসনাদে আবূ দাঊদ তায়ালিসীতে আছে, ওয়াহশী বলেছে, আমি যখন মক্কায় পৌঁছলাম, তখন মুক্ত হয়ে গেলাম। আর আমি কেবল হামযা (রা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যেই কুরায়শদের সাথে এসেছিলাম, যুদ্ধ-বিগ্রহ আমার উদ্দেশ্য ছিল না।[২]

হযরত হামযাকে হত্যার পর আমি সেনাবাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে বসে পড়ি। এ জন্যে যে, আমার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল নিজে মুক্তিলাভের জন্যই হযরত হামযাকে হত্যা করি।

দ্রষ্টব্য : মক্কা বিজয়ের পর তায়েফের প্রতিনিধি দলের সাথে ওয়াশীও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনা আগমন করে। লোকজন তাকে দেখে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৬।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৮২।

(সা), এই যে ওয়াহশী, আপনার শ্রদ্ধেয় চাচার হত্যাকারী। তিনি বললেন : رجل واحد احب الى من قتل الف كافر "ওকে ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই একজনের ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে সহস্র কাফির হত্যা করার চেয়েও বেশি প্রিয়।"

এরপর তিনি ওয়াহশীর নিকট তাঁর চাচার হত্যার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। ওয়াহশী খুবই বিমর্ষ ও লজ্জিত অবস্থায় কেবল আদেশ পালনহেতু ঘটনার বর্ণনা দিল। তিনি তার ইসলাম গ্রহণকে অনুমোদন করলেন এবং বললেন, তুমি আমার সামনে না এলেই ভাল হয়। কেননা তোমাকে দেখলে আমার চাচার বিয়োগ ব্যথা নতুনভাবে আমার অন্তরে জাগরূক হয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ব্যথা দেয়া উদ্দেশ্য ছিল না, তাই ওয়াহশী (রা) যখন নবী দরবারে আসতেন, তখন পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকতেন এবং সব সময় ভাবতেন, কিভাবে এর প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। সুতরাং এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি মুসায়লামা কাযযাবকে ঐ বর্শা দিয়েই হত্যা করে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। সে খাতামুন-নাবিয়্যীন (সা)-এর পর মিথ্যা নবূওয়াতের দাবি করেছিল। আর যেভাবে হযরত হামযা (রা)-এর নাভী বরাবর বর্শাঘাত করে শহীদ করেছিলেন, ঠিক একইভাবে মুসায়লামা কাযযাবকেও নাভী বরাবর বর্শা মেরে হত্যা করেন। এভাবেই তিনি একজন উত্তম মানুষের হত্যার প্রায়শ্চিত্তে একটি অধম মানুষকে হত্যা করেন।[১]

সহীহ বুখারীতে আছে, মুসায়লামা কাযযাবের হত্যাকালে ওয়াহশীর সাথে একজন আনসারীও শরীক ছিলেন। ওয়াকিদী, ইসহাক ইবন রাহওয়াই এবং হাকিম বলেন, তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আসিম আল মাযিনী (রা)। এছাড়া কেউ ঐ আনসারীর নাম আদী ইবন সাহল, কেউবা আবূ দুজানা আবার কেউ যায়দ ইবন খাত্তাব বলে থাকেন। আবার কেউ বলেন, তিনি ছিলেন শন ইবন আবদুল্লাহ, যেমন এ কবিতার মাধ্যমে জানা যায় :

الم ترانى ووحشيهم * ضربنا مسليمة المفتتن

ليسائلنى الناس عن قتله * فقلت ضربت وهذا طعن

فلست بصاحبه دونه * وبس بصاحبه دون شن

"তোমার কি জানা নেই যে, আমি এবং ওয়াহশী দু'জনে মিলে ফিতনা সৃষ্টিকারী মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যা করি।

"মানুষ আমাকে মুসায়লামার হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে যে, তাকে কে হত্যা করেছে। আমি উত্তর দিয়েছি, আমি তরবারি দিয়ে আঘাত করেছি আর ওয়াহশী বর্শাদ্বারা;

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৮৩-৩৮৫।

"মোটকথা এই যে, এককভাবে মুসায়লামার হত্যাকারী আমিও নই আর ওয়াহশীকেও শন-এর অংশগ্রহণ ছাড়া একক হত্যাকারী বলা যায় না।"[১]

ওয়াহশী থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমিই কি আমার চাচাকে হত্যা করেছ ? আমি আরয করলাম, نعم والحمد لله الذى اكرمه بيدى ولم يهنى بيده "হ্যাঁ, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি হযরত হামযাকে আমার হাত দিয়ে শাহাদতের মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন এবং তাঁর হাত দিয়ে আমাকে অপদস্থ করেন নি।"

কেননা ওয়াহশী যদি ঐ সময় হযরত হামযার হাতে নিহত হতেন, তাহলে কুফরী অবস্থায় তার মৃত্যু হতো, যা অপেক্ষা অধিক কোন অপদস্থতা ও অমর্যাদা নেই। এরপর নবী (সা) বললেন, ওহে ওয়াহশী, যাও এবং আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমনটি করেছিলে আল্লাহর পথে বাধা দিতে। (হাদীসটি তাবারানী হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)।[২]

ফেরেশতা কর্তৃক গোসলদানকৃত হযরত হানযালা (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

আবূ আমের ফাসিক, যার উল্লেখ ইতোপূর্বে করা হয়েছে, তার পুত্র হযরত হানযালা (রা) এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলেন।

আবূ সুফিয়ান ও হযরত হানযালা (রা) মুখোমুখি হলেন। হযরত হানযালা দৌড়ে গিয়ে আবূ সুফিয়ানের উপর তরবারির আঘাত হানতে চাইলেন কিন্তু পিছন থেকে শাদ্দাদ ইবন আসওয়াদ তরবারি দিয়ে আঘাত করায় হযরত হানযালা (রা) শহীদ হয়ে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, আমি দেখলাম ফেরেশতাগণ বরফের পানি দিয়ে রৌপ্যের বাসনে করে হযরত হানযালাকে গোসল করাচ্ছে।

তাঁর স্ত্রীকে[৩] জিজ্ঞেস করা হলে জানা গেল যে, তিনি সহবাসজনিত অপবিত্র অবস্থায়ই জিহাদে অংশ-গ্রহণের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন এবং ঐ অবস্থায়ই শাহাদতবরণ করেন। (ইবন ইসহাক ও হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম একে সহীহ্ বলেছেন। এছাড়া ইবন সা'দ ও অন্যান্যরাও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।[৪]

যেদিন হযরত হানযালা (রা) শহীদ হবেন, ঐদিন রাতে তাঁর স্ত্রী স্বপ্নে দেখেন যে, আসমানের একটি দরজা খোলা হল এবং হানযালা সেই দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন। তাঁর প্রবেশের পর দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হল। স্ত্রী এ স্বপ্ন দেখে বুঝতে

---

১. প্রাগুক্ত।

২ মাজমুয়াউয যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ ১৩১।

৩. তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল জামিলা, যিনি সাহাবী এবং মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের বোন ছিলেন। রাউযুল উনূফ ও ইসাবা।

৪. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২১৬।

পেরেছিলেন যে, হানযালা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পথে। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন তাঁর লাশ খোঁজ করা হচ্ছিল, তখন তাঁর মাথার চুল থেকে পানি পড়ছিল। এ জন্যে হযরত হানযালা (রা)-কে ফেরেশতাকর্তৃক 'গোসলদানকৃত' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১]

হযরত হানযালা (রা)-এর পিতা আবূ আমের ফাসিক যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, সেহেতু হানযালা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আপন পিতাকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি নিষেধ করেন। (ইবন শাহীন হাসান সনদে এবং ইসাবা, হযরত হানযালা ইবন আমের (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

মুসলমানদের এহেন বীরত্বব্যঞ্জক ও দুঃসাহসী আক্রমণের কারণে যুদ্ধের ময়দান থেকে কাফিরদের পা টলে যায়। তারা মুখ লুকিয়ে এদিক সেদিক পলায়নে উদ্যত হয়। মহিলারাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পাহাড়ের দিকে পলায়ন করতে থাকে এবং মুসলমানগণ গনীমতের মালামাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

মুসলমান তীরন্দাজদের স্থান ত্যাগ এবং যুদ্ধের গতিতে পরিবর্তন

তীরন্দাজদের ঐ দলটি (যাদের গিরিপথের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল) যখন দেখল যে, বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং মুসলমানগণ গনীমত সংগ্রহে ব্যস্ত, তখন তারাও সেদিকে অগ্রসর হলেন। তাদের নেতা হযরত আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র (রা) অনেক নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাগিদ করেছিলেন যে, তোমরা এ স্থান থেকে নড়বে না, কিন্তু তারা তা শুনলেন না এবং ঘাঁটি ছেড়ে গনীমত সংগ্রহকারীদের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র এবং তাঁর দশজন সঙ্গী (রা)-এর শাহাদতবরণ

ঘাঁটিতে কেবল হযরত আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র এবং তাঁর দশজন সঙ্গী (রা) ছিলেন। নবীর আদেশ অমান্য করার অপেক্ষামাত্র ছিল, সাথে সাথে বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। খালিদ ইবন ওলীদ, যিনি তখন ছিলেন মুশরিক বাহিনীর ডানদিকের অধিনায়ক, গিরিপথ প্রহরাশূন্য দেখে পেছনদিক থেকে আক্রমণ করে বসলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র (রা) তাঁর সঙ্গিগণসহ শহীদ হয়ে গেলেন।

হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-এর শাহাদতবরণ

মুশরিকদের এ অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক আক্রমণে মুসলমানদের শৃঙ্খলাপূর্ণ সারিগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং শত্রু সেনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্নিকটে পৌঁছে গেল।

---

১. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১৩৩।

মুসলমানদের পতাকাবাহী হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) নবী (সা)-এর নিকটে ছিলেন। তিনি কাফিরদের মুকাবিলা করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর শাহাদতবরণের পরে নবী (সা) পতাকা হযরত আলী (রা)-এর হাতে সোপর্দ করলেন।

হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) যেহেতু দেখতে প্রায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সদৃশ ছিলেন, এ জন্যে কোন শয়তান গুজব ছড়ালো যে, দুশমনদের মূল লক্ষ্য নবী (সা) শহীদ হয়েছেন। ফলে সমস্ত মুসলমানের মধ্যে আতংক ও হতাশা ছেয়ে গেল এবং এ বেদনাদায়ক সংবাদ শোনামাত্র সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় শত্রু-মিত্র পার্থক্য না করেই তারা একে অপরের প্রতি তরবারি চালাতে থাকলেন।

মুসলমানদের হাতে ভুলক্রমে হযরত হুযায়ফা (রা)-এর পিতার শাহাদতবরণ

হযরত হুযায়ফার পিতা ইয়ামানও এ গোলমালের মধ্যে পড়ে গেলেন। হযরত হুযায়ফা (রা) দূর থেকে দেখলেন যে, মুসলমানগণ তার পিতাকে মেরে ফেলছে। তিনি চিৎকার করে বললেন, ওহে আল্লাহর বান্দারা, উনি আমার পিতা। কিন্তু এ হট্টগোলের মধ্যে কে শোনে কার কথা, শেষ পর্যন্ত ইয়ামান শহীদ হয়ে গেলেন। মুসলমানগণ যখন জানতে পারলেন যে, ইনি হুযায়ফার পিতা ছিলেন, তখন খুবই লজ্জিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা চিনতে পারিনি। হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন, يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين "আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, তিনি সবচে' বেশি মেহেরবান।"

রাসূলুল্লাহ (সা) রক্তপণ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু হযরত হুযায়ফা তা গ্রহণ করেন নি। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তরে হযরত হুযায়ফা (রা)-এর মর্যাদা বহু গুণ বৃদ্ধি পায়।[১]

খালিদ ইবন ওয়ালিদের আকস্মিক আক্রমণে ইসলামী বাহিনীর চাঞ্চল্য এবং রাসূল (সা)-এর দৃঢ়তা

খালিদ ইবন ওয়ালিদের ক্ষিপ্রতা ও আকস্মিক আক্রমণে যদিও বড় বড় বীর-বাহাদুরের পা টলে গিয়েছিল, নবী করীম (সা)-এর দৃঢ়তা ও স্থৈর্যে কোনরূপ পরিবর্তন আসেনি। আর কেনই বা আসবে, আল্লাহর নবী-রাসূলগণ তো আল্লাহ ক্ষমা করুন, কাপুরুষ হতে পারেন না, পাহাড় টলে যেতে পারে, কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পা টলতে পারে না। একজন পয়গাম্বরের একক বাহাদুরী কুল মাখলুকের বাহাদুরী অপেক্ষা বেশি ওযনদার ও মযবূত হয়ে থাকে।

১. তাবারী, ৩খ.পৃ. ২৬; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৭৯; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩২; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৮৭।

যেমন দালাইলে বায়হাকীতে হযরত মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

فوالذى بعثه بالحق مازالت قدمه شبرا واحدا وانه لقى وجه العدو ولفئى اليه طائفة من اصحابه مرة وتفترق مرة فربما رايته قائما يرمى عن قوسه ويرمى بالحجر حتى انحازوا عنه ·

"কসম ঐ মহান পবিত্র সত্তার, যিনি তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কদম মুবারক নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক চুলও নড়েনি এবং নিঃসন্দেহে তিনি শত্রুর মুকাবিলায় স্থির ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের একটি দল কখনো তাঁর কাছে যেত, আবার কখনো দূরে সরে যেত। কোন কোন সময় আমি দেখতাম তিনি একাকীই তীর ও পাথর নিক্ষেপ করছেন। এমন কি শত্রুরা দূরে সরে যায়। (যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৪)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিরাপত্তা রক্ষিগণ

ইবন সা'দ বলেন, এহেন চাঞ্চল্য ও হট্টগোলের মধ্যে চৌদ্দজন সাহাবী নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। এঁদের মধ্যে সাতজন ছিলেন মুহাজির এবং সাতজন ছিলেন আনসার। তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো :

মুহাজিরগণের নাম

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা),
২. হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা),
৩. হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা),
৪. হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা),
৫. হযরত তালহা (রা),
৬. হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা),
৭. হযরত আবূ উবায়দা (রা),

আনসারগণের নাম

১. হযরত আবূ দুজানা (রা),
২. হযরত হুবাব ইবন মুনযির (রা),
৩. হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা),
৪. হযরত হারিস ইবন সম্মা (রা),
৫. হযরত সুহায়ল ইবন হুনায়ফ (রা),
৬. হযরত সাদ ইবন মু'আয (রা),
৭. হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা)।

মুহাজিরগণের মধ্যে হযরত আলী (রা)-এর নাম এ জন্যে উল্লেখ করা হয়নি যে, হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-এর শহীদ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম

বাহিনীর পতাকা হযরত আলী (রা)-এর হাতে অর্পণ করেছিলেন। তিনি তখন জিহাদে নিমগ্ন ছিলেন।

এ চৌদ্দজন সাহাবী তাঁর সাথেই ছিলেন। তবে কোন প্রয়োজনে কেউ কেউ অন্যত্রও যেতেন, আবার শীঘ্রই ফিরে আসতেন।

এ জন্যে কখনো তাঁর সাথে বারজনও ছিলেন, যেমনটি সহীহ্ বুখারীতে হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আর কখনো এগারজনও ছিলেন, যেমন নাসাঈ এবং দালাইলে বায়হাকী হযরত জাবির (রা) সূত্রে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

আবার কখনো সাতজনও ছিলেন, যেমন সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সময়ের পার্থক্যে এবং অবস্থার পার্থক্যের দরুন নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত সাহাবীদের সংখ্যায় মতপার্থক্য ঘটেছে। প্রত্যেক বর্ণনাকারীর বর্ণনা তাঁদের স্ব স্ব সময়ে সঠিক ও নির্ভুল ছিল। কোন সময় বারজন, কোন সময় এগারজন আর কোন সময় সাত ব্যক্তি তাঁর সাথে ছিলেন। আল্লাহর প্রশংসা, সমস্ত বর্ণনাই সুসমঞ্জস, কোনই বৈপরীত্য নেই।

(বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৭৭ এবং যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৫ দেখুন)।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর কুরায়শদের আকস্মিক আক্রমণ এবং সাহাবায়ে কিরামের আত্মত্যাগ

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরায়শরা যখন আকস্মিকভাবে তাঁকে আক্রমণ করে বসে, তখন তিনি বললেন, কে আছ, যে এদেরকে আমার নিকট থেকে সরিয়ে দেবে এবং জান্নাতে আমার বন্ধু হবে ? তখন সাতজন আনসার সাহাবী তাঁর কাছে ছিলেন। একে একে তাঁদের সাতজনই যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। (সহীহ্ মুসলিম, ২খ. পৃ. ১০৭, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায় এবং আহমদ সূত্রে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২৬)।

ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, তিনি ইরশাদ করেন : من رجل ليشرى لنا نفسه "কোন্ ব্যক্তি আছে যে আমাদের জন্য নিজের জীবন বিক্রি করবে।" এ কথা শোনামাত্র হযরত যিয়াদ ইবন সাকান ও পাঁচজন আনসার (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে একে একে সবাই শহীদ হয়ে যান। আর জান্নাতের মূল্যে নিজেদের জীবনকে বিক্রি করেন।

হযরত যিয়াদ ইবন সাকান (রা)-এর শাহাদতবরণ

হযরত যিয়াদ (রা)-এর এ মর্যাদা অর্জিত হয়েছিল যে, যখন তিনি আহত হয়ে পড়ে যান, তখন নবী করীম (সা) বলেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকজন

তাকে নবী (সা)-এর কাছে নিয়ে এলে তিনি নিজের গণ্ডদেশ নবী (সা)-এর পায়ের উপর রাখেন এবং এ অবস্থায়ই তিনি ইনতিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৮৪)

উতবা ইবন আবূ ওয়াক্কাস কর্তৃক নবী (সা)-এর উপর আক্রমণ

হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ভাই উতবা ইবন আবূ ওয়াক্কাস সুযোগ বুঝে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। এতে তাঁর নিচের পাটির দাঁত পড়ে যায় এবং নিচের ঠোঁটে আঘাত পান। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, এ সময় আমি আপন ভাইকে হত্যার জন্য যতটা আগ্রহী ও উৎসাহী হয়ে পড়ি, অপর কাউকে হত্যার জন্য ততটা উৎসাহী ছিলাম না।[১] (ইবন হিশাম)

আবদুল্লাহ ইবন কুমায়্যা কর্তৃক নবী (সা)-এর উপর আক্রমণ

কুরায়শের বিখ্যাত পাহলোয়ান আবদুল্লাহ ইবন কুমায়্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এত জোরে আঘাত করে যে, তাঁর গণ্ডদেশ যখম হয়ে যায় এবং বর্মের দু'টি লৌহখণ্ড তাঁর গণ্ডে ফুটে যায়। আর আবদুল্লাহ ইবন শিহাব[২] যুহরী পাথর মেরে পবিত্র কপাল আহত করে। পবিত্র মুখমণ্ডল বয়ে যখন রক্ত পড়তে থাকে, তখন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর পিতা হযরত মালিক ইবন সিনান (রা) মুখ দিয়ে সমস্ত রক্ত চুষে মুখমণ্ডল পরিস্কার করে দেন। তিনি (সা) বলেন, তোমাকে জাহান্নামের আগুন কখনই স্পর্শ করবে না।

মুজামে তাবারানীতে হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবন কুমায়্যা তাঁকে আহত করার পর বলে : خذها وانا ابن قمية "এটা গ্রহণ কর, আর আমি ইবন কুমায়্যা।"

নবী (সা) বলেন : اقماك الله "আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অপমান-অপদস্থ এবং ধ্বংস করুন।"

এর পর কয়েকদিনও অতিক্রান্ত হয়নি, আল্লাহ তা'আলা ইবন কুমায়্যার প্রতি একটি পাহাড়ী বকরি প্রেরণ করেন, যে তার শিং দিয়ে তাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।[৩]

হযরত আলী (রা) এবং হযরত তালহা (রা) কর্তৃক নবী (সা)-কে সহায়তা দান

পবিত্র দেহে যেহেতু দু'টি লৌহখণ্ডের যন্ত্রণার বোঝা ছিল এ জন্যে নবী (সা) একটি গর্তে পড়ে যান, যেটি আবূ আমের ফাসিক মুসলমানদের জন্য তৈরি করেছিল।

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৮১।

২ আবদুল্লাহ ইবন শিহাব যুহরী উহুদ যুদ্ধের সময় কাফিরদের সাথে আগমন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা মুকাররমায় ইনতিকাল করেন। যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৮।

৩. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৮১; যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৮।

তখন হযরত আলী তাঁর হাত ধরেন এবং হযরত তালহা তাঁর কোমরে ভর দিতে সহায়তা করেন, ফলে তিনি দাঁড়াতে সক্ষম হন।

তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শহীদকে জীবিতাবস্থায় পৃথিবীতে চলাফেরা করতে দেখতে চায়, সে যেন তালহাকে দেখে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলে বর্মের দু'টি লৌহখণ্ড ঢুকে গিয়েছিল। হযরত আবূ উবায়দা ইবন জাররাহ (রা) তা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে টান দেন, এতে তার দু'টি দাঁত ভেঙে যায়। আল্লাহ তাঁকে কিয়ামতের দিন হাস্যোজ্জ্বল দাঁত নিয়ে পুনরুত্থিত করুন। (বর্ণনাটির সনদ বিশুদ্ধ)।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পাহাড়ের ওপর আরোহণ করতে মনস্থ করেন কিন্তু দুর্বলতা, অসামর্থ্য এবং দু'টি লৌহখণ্ডে ভারে উঠতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, তখন তালহা (রা) বসে পড়েন এবং তিনি তারপিঠে পা রেখে আরোহণ করেন। হযরত যুবায়র (রা) বলেন, এ সময় আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, اوجب طلحة। "তালহা নিজের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।" (ইবন ইসহাক)

কায়স ইবন হাযম বলেন, আমি হযরত তালহার ঐ হাত দেখেছি, যা দিয়ে তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন, তা ছিল সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্থ। (বুখারী)

হাকিম তাঁর ইকলীল গ্রন্থে বলেন, ঐ দিন হযরত তালহা (রা) পঁয়ত্রিশ অথবা ঊনচল্লিশটি আঘাত পান।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন উহুদ যুদ্ধের উল্লেখ করতেন, তখন বলতেন : كان ذلك اليوم كله لطلحة "এ দিনের পুরোটাই ছিল তালহার জন্য।"

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দুশমনের আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে যখন হযরত তালহার হাতের অঙ্গুলীসমূহ কেটে যায়, তখন তিনি অবলীলায় বলে উঠেন, حسن উত্তম হয়েছে।[২] রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

لوقلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون اليك حتى تلج بك فى جو السماء ·

"যদি তুমি উত্তম না বলে বিসমিল্লাহ বলতে, তা হলে ফিরিশতাগণ তোমাকে নিয়ে যেতেন এবং লোক তোমার প্রতি তাকিয়ে থাকত। এমনকি তারা তোমাকে নিয়ে

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৮; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৮৪।

২ ফাতহুল বারীতে নূন অক্ষর সহ হাসান (উত্তম) বর্ণিত হয়েছে, আর আল্লামা যারকানী নূন অক্ষর বাদ দিয়ে 'হাসা' বলেছেন। যা আমাদের ভাষায় উহ্ আহ্ ইত্যাদি শব্দের মত, যা ব্যথা পেলে মুখ থেকে বের হয়।

আসমানে প্রবেশ করতেন।" (নাসাঈ এবং বায়হাকী হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন)।[১]

হযরত আয়েশা (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমরা তালহা (রা)-এর শরীরে সত্তরটিরও বেশি যখম দেখেছি। (আবূ দাঊদ তায়ালিসী বর্ণিত; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৬৬, হযরত তালহার প্রশংসা অধ্যায়)

হযরত আনাস (রা)-এর বিপিতা হযরত আবূ তালহা (রা) তাঁকে ঢাল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ, ঐ দিন তিনি দুই অথবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন। যে কেউ সেদিক দিয়ে তূণীর নিয়ে যেতেন, তাকেই নবী করীম (সা) বলতেন, এ তূণীর আবূ তালহার জন্য রেখে যাও। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) দৃষ্টি উঠিয়ে লোকদের দেখতে চাইতেন, তখন হযরত আবূ তালহা (রা) বলতেন :

لابابى انت وانى نحرى تشرف يصبك سهم من سهام القوم دون نحرك ۔

"আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোন, আপনি মাথা উঠাবেন না, শত্রুর কোন তীর এসে লাগতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের জন্য ঢাল স্বরূপ।" (বুখারী, পৃ. ৫৮১)

হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ। উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তূণীর থেকে সমস্ত তীর তার সামনে ঢেলে দেন এবং বলেন : ارم فداك ابى وامى "তীর নিক্ষেপ কর, তোমার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক।"

হযরত আলী (রা) বলেন, সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস ছাড়া[২] আর কারো জন্যে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর পিতামাতাকে উৎসর্গ করতে শুনিনি। (বুখারী, পৃ. ৫৮১)

হাকিম থেকে বর্ণিত যে, উহুদের দিন হযরত সা'দ (রা) এক সহস্র তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। (যারকানী, ২খ. পৃ. ৪২)

হযরত আবূ দুজানা (রা)-এর কুরবানী

হযরত আবূ দুজানা[৩] (রা) স্বয়ং ঢাল হয়ে নবী (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে যান

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৭৮; যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৯।

২. অর্থাৎ উহুদের দিন তিনি হযরত সা'দ (রা) ছাড়া অন্য কারো জন্য এ বাক্য উচ্চারণ করতে শোনেননি। অন্যথায় বনী কুরায়যার যুদ্ধের দিনে তিনি হযরত যুবায়র (রা)-এর জন্যও এ বাক্য উচ্চারণের কথা সহীহ বুখারীর হযরত যুবায়র (রা)-এর প্রশংসা অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৬৬, হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর প্রশংসা অধ্যায়।

৩. হাফিয ইবন আবদুল বার বলেন, হযরত আবূ দুজানা (রা) মুসায়লামা কাযযাবের হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এ যুদ্ধকালেই শহীদ হন। ইসতিয়াব।

এবং পিঠ দেন শত্রুদের প্রতি। তীরের পর তীর আসতে থাকে, আর হযরত আবূ দুজানা (রা)-এর পিঠই ছিল এর লক্ষ্যস্থল। কিন্তু পাছে নবী (সা)-কে তীরের আঘাত লাগে, এ ভয়ে তিনি নড়াচড়া পর্যন্ত করছিলেন না। (ইবন ইসহাক)।[১]

সতর্ক বাণী : রাসূলুল্লাহ (সা) যেমনটি শেষ নবী বা নবী আগমনের ধারার সমাপ্তকারী ছিলেন, নবী আগমনের ধারা তাঁর মাধ্যমেই পূর্ণ হয়, অনুরূপভাবে ভালবাসাও পূর্ণতা পেয়েছিল এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মাধ্যমে এ ভালবাসা চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্ণতা লাভ করেছিল। আল্লাহর শপথ, এ কুরবানীর সামনে লায়লী-মজনুর কিসসাও হার মানে।

মহানবী (সা) কর্তৃক মুশরিকদের জন্য দুঃখ প্রকাশ

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন, ঐ সম্প্রদায় কিরূপে কল্যাণ লাভ করতে পারে, যারা নিজেদের নবীর চেহারা রক্তাপ্লুত করে অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে। (আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

মহানবী (সা) কর্তৃক কতিপয় কুরায়শ সর্দারের জন্য বদ দু'আ করা এবং এ প্রসঙ্গে ওহী নাযিল হওয়া

সহীহ বুখারীতে হযরত সালিম থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সাফওয়ান ইবন উমায়্যা, সুহায়ল ইবন আমর এবং হারিস ইবন হিশামের প্রতি বদ দু'আ করেন, এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ·

"তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন—এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই; কারণ তারা তো যালিম।" (সূরা আলে ইমরান : ১২৮)

হাফিয আসকালানী বলেন, এ তিন ব্যক্তিই মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি বদ দু'আ করতে নিষেধ করেন এবং এ আয়াত নাযিল করেন। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৭১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যেন আমার দু' চোখের সামনে রয়েছেন, তিনি পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন : رب اغفر لقومى فانهم لا يعلمون "আয় পরোয়ারদিগার, আমার কওমকে ক্ষমা করুন, কেননা তারা জানে না।" (সহীহ মুসলিম, ২খ. পৃ. ১০৮, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়)

উদারতা ও দয়া প্রবণতার দরুন তিনি فانهم لا يعلمون 'তারা জানে না' বলেছেন, فانهم لا يجهلون 'ওরা জাহিল' (মূর্খ) বলেন নি।

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৪৩।

আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য বিশ্লেষণের পর, যদিও অজ্ঞতা এবং না জানা কোন ওজর হতে পারে না, কিন্তু পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ ও দয়ার আধার নবী করীম (সা) পরিপূর্ণ উদারতা ও অনুগ্রহ স্বরূপ মহান দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু, শ্রেষ্ঠতম দাতা ও শ্রেষ্ঠতম সম্মানের অধিকারী আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে না জানা কে ওযর হিসেবে পেশ করেন যাতে আল্লাহর সনাতন অনুগ্রহ তাদেরকে কুফর ও শিরকের আবর্ত থেকে বের করে ঈমান ও ইসলামের নিরাপদ আশ্রয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন। নিষ্ঠা ও অনুগ্রহের অমিয় সুধা পান করিয়ে ভালবাসার নেশায় এমন বুঁদ করে দেন যাতে এ নশ্বর পৃথিবীর অপমান ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতের ইযযত ও নিয়ামত অনুভব ও চাক্ষুস সাক্ষী হতে পারে। আর পাপাচারের জেলখানা থেকে বেরিয়ে চিরকালের জন্য ঈমান ও ইসলাম, নিষ্ঠা ও অনুগ্রহের নিরাপদ প্রাসাদে এসে স্থায়ী হতে পারে, যাতে কোনকালেই সেখান থেকে বের হতে না হয়।

দ্রষ্টব্য : কাফির যখন পর্যন্ত কুফরী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্যে এ উদ্দেশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা বৈধ যে, যাতে করে আল্লাহ্ তাকে কুফর ও শিরক থেকে তওবা করার এবং ঈমান ও হিদায়েত গ্রহণের তৌফিক দান করেন। যাতে সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা ও অনুকম্পার হকদার হতে পারে। হ্যাঁ, যদি কারো জীবনের সমাপ্তি কুফর ও শিরকের উপর হয়ে যায়, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়েয নেই। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ‏.

"আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয়, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চয়ই ওরা জাহান্নামী।" (সূরা তাওবা : ১১৩)

যুদ্ধকালে হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা)-এর চোখের মণি বেরিয়ে যাওয়া এবং নবী (সা) কর্তৃক তা পুনঃস্থাপন ও তা পূর্বাপেক্ষা উত্তম হয়ে যাওয়া

হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি নবীজীর মুখের সামনে দাঁড়ালাম এবং নিজের চেহারা দুশমনদের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম যাতে শত্রুর তীর আমার চেহারায় আঘাত করে এবং তাঁর পবিত্র চেহারা নিরাপদে থাকে। শত্রুর শেষ তীরটি এসে আমার চোখে এভাবে আঘাত করে যে, আমার চোখের মণি বেরিয়ে আসে। সেটি আমি নিজের হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হই। রাসূলুল্লাহ (সা) তা দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে আমার জন্য এ বলে দু'আ করলেন যে, আয় আল্লাহ্, কাতাদা যেভাবে তোমার নবীর চেহারার

হিফাযত করেছে, অনুরূপভাবে তুমি তার চেহারা নিরাপদ রাখ। আর এ চোখটিকে তার অপর চোখ অপেক্ষা সুন্দর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন বানিয়ে দাও। এ বলে তিনি মণিটিকে যথাস্থানে রেখে দিলেন। তৎক্ষণাৎ চোখটি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং পূর্বাপেক্ষা সুন্দর ও জ্যোতির্ময় হয়ে গেল। (তাবারানী ও আবূ নুয়াইম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং দারু কুতনী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।[১]

একটি বর্ণনায় আছে, হযরত কাতাদা (রা) চোখের মণিটি হাতে নিয়ে নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, যদি তুমি সবর কর, তাহলে তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত, আর যদি চাও তা হলে মণিটি যথাস্থানে রেখে তোমার জন্য দু'আ করি। হযরত কাতাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার একজন স্ত্রী আছে, যাকে আমি খুবই ভালবাসি। আমার আশঙ্কা হয় যে, যদি আমি চোখবিহীন থেকে যাই, তা হলে সে আমাকে ঘৃণা করে না বসে। তিনি নিজ হাতে মণিটি চোখের যথাস্থানে রেখে দিলেন এবং এ দু'আ করলেন : اللهم اعطه جمالا। "আয় আল্লাহ তাকে পূর্ণ সৌন্দর্য দান কর।"[২]

নবী (সা) নিহত হওয়ার মিথ্যা সংবাদের প্রসার লাভ

যখন এ খবর রটে গেল যে, শত্রুদের লক্ষ্যস্থল রাসূলুল্লাহ (সা) নিহত হয়েছেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান হতোদ্যম হয়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তো শহীদ হয়ে গেছেন, এখন আর লড়াই করে কি হবে। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-এর চাচা হযরত নযর ইবন মালিক (রা) বললেন, লোক সকল ! মুহাম্মদ (সা) যদি নিহত হয়েই থাকেন তবুও মুহাম্মদের প্রভু তো আর নিহত হন নি। তিনি যে বিষয়ের জন্য জিহাদ ও লড়াই করেছেন, তোমরাও সে বিষয়ে জিহাদ ও লড়াই চালিয়ে যাও এবং এরই ওপর মৃত্যুবরণ কর। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তিরোধানের পর জীবিত থেকে কি করবে ? এ কথা বলেই তিনি শত্রু বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। (ইবন ইসহাক, তাবারানী এবং যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৪)।

হযরত আনাস ইবন নযর (রা)-এর শাহাদতবরণের ঘটনা

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমার চাচা হযরত আনাস ইবন নযর (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারায় খুবই ব্যথিত ছিলেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আফসোস, আমি মুশরিকদের সাথে সংঘটিত প্রথম জিহাদেই অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আগামীতে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে কোন জিহাদে শরীক হওয়ার সুযোগ দেন, তা হলে

১. আল ইসাবা, ৩খ. পৃ. ২২৫।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ৪২।

আল্লাহ্ দেখবেন যে, আমি তাঁর রাহে কিরূপ চেষ্টা-সাধনা, বিক্রম প্রকাশ ও আত্মোৎসর্গ করতে সক্ষম। উহুদ যুদ্ধে যখন কিছু লোক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল, তখন হযরত আনাস ইবন নযর (রা) বলেন, আয় আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে এ কর্ম থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা ঐ মুসলমানগণ করেছে। অর্থাৎ জিহাদের ময়দান থেকে পিছু হটেছে, আর মুশরিকগণ যা করেছে, আমি তাতেও অসন্তুষ্ট। এ কথা বলে তিনি তরবারি নিয়ে অগ্রসর হলেন। সামনে থেকে হযরত সাদ ইবন মুআয (রা)-কে আসতে দেখে হযরত আনাস ইবন নযর (রা) বললেন : اين يا سعد انى اجد ريح الجنة دون احد "কোথায় যাচ্ছ ওহে সা'দ,[১] আমি তো উহুদের নিচে থেকে বেহেশতের সুগন্ধি পাচ্ছি।"

এ বাক্যাবলী কিতাবুর মাগাযীর, আর কিতাবুল জিহাদের বর্ণনায় বাক্যাবলী হলো : يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر انى اجد ريحما دون احد "ওহে সা'দ ইবন মু'আয, এই যে, জান্নাত, নযরের প্রভুর কসম,[২] আমি নিঃসন্দেহে উহুদের নিদেশ থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি।"

হাফিয ইবন কায়্যিম (র) বলেন, কোন কোন সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদেরকে রূহানীভাবে নয়, বরং বাস্তবেও পৃথিবীতেই জান্নাতের সুগন্ধি আঘ্রান করান। যেভাবে ঐ মহাত্মাগণ আখিরাতের জীবনে গোলাপ ও চামেলী ফুলের সুগন্ধি লাভ করবেন, অনুরূপভাবে তাঁরা কখনো কখনো আল্লাহর অনুগ্রহে পৃথিবীতেই জান্নাতের সুগন্ধি লাভ করেন। যার প্রভাব পাঁচশত মাইল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। আশ্চর্য নয় যে, হযরত আনাস ইবন নযর (রা) অনুভূতি দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি লাভ করেছিলেন। যেমনটি 'হাবিল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ' গ্রন্থে (১খ. পৃ. ২৫০) বলা হয়েছে।

যে সমস্ত লোক পার্থিব নেশায় বিভোর এবং আখিরাতের ব্যাপারে সর্দিতে আক্রান্ত, তাদের অস্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য নয়, তারা তো ازحواس اوليا ء بيگانه ان এর উপাধিযোগ্য। সর্দিতে আক্রান্ত ব্যক্তির গোলাপ ও চামেলী ফুলের সুবাসকে অস্বীকার করা সুস্থ মস্তিষ্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য (যাঁদের ঘ্রাণশক্তি শত মাইল দূরবর্তী ফুলের ঘ্রাণও পেয়ে যায়) প্রমাণ হতে পারে না।

---

১. এ ধরনের বাক্য আরবী ভাষায় দূরবর্তী লোককে আহ্বানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আশ্চর্য নয় যে, হযরত আনাস (রা) কর্তৃক 'ইয়া সা'দ' বলার উদ্দেশ্য ছিল, ওহে সা'দ, তুমি এ সৌভাগ্য থেকে কত দূরে পড়ে আছ। অনুরূপভাবে এখানে 'আয়না' (কোথায়) শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট স্থান উদ্দেশ্য ছিল না, বরং মর্যাদার স্থান উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

২. নযর ছিল হযরত আনাস (রা)-এর পিতার নাম। নযর শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো চাকচিক্য ও তরতাজা। সম্ভবত হযরত আনাস (রা) নযর শব্দদ্বারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'নাদরাতুন নাঈম' নামক জান্নাতের চাকচিক্য ও তরতাজা দৃশ্য অবলোকন করেই নযরের প্রভুর কসম বলে থাকবেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মোটকথা হযরত আনাস ইবন নযর (রা) واها الريح الجنة اجده دون احد "বাহ, বাহ, উহুদ থেকে আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।" বলতে বলতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকে পড়েন এবং জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। তাঁর শরীরে তীর ও তরবারির আশিটিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর প্রসঙ্গেই এ আয়াতটি নাযিল হয় :

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

"মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।" (সূরা আহযাব : ২৩)

صدق جان دادن بود هين سابقوا * ازنبى بر خوان رجال صدقوا

ইমাম বুখারী তাঁর জামে সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি তিন জায়গায় বর্ণনা করেছেন। কিতাবুল জিহাদ, ১খ. পৃ. ৩৯২; কিতাবুল মাগাযী, পৃ. ৫৭৯-তে বিস্তারিতভাবে এবং কিতাবুত-তাফসীরে পৃ. ৭০৫-এ সংক্ষেপে। আরিফ রূমীর বক্তব্য অনুসারে হযরত আনাস ইবন নযর (রা)-এর অবস্থা ছিল এরূপ :

وقت ان امد كه من عريان شوم * جسم بگزارم سراسر جان شوم

بوئ جانان سوئ جانم مى رسد * بوئ يار مهر بانهم مى رسد

মুসলমানদের চিন্তা এবং অস্থিরতার সবচে' বড় কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাদের চোখের সামনে না দেখা। সর্বপ্রথম হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে চিনে ফেলেন। তিনি বর্মাবৃত ছিলেন, পবিত্র মুখমণ্ডলও ছিল অবগুণ্ঠিত। কা'ব বলেন, আমি বর্মের ভিতর থেকে তাঁর উজ্জ্বল চোখ দেখেই তাঁকে চিনেছি। তৎক্ষণাৎ আমি উচ্চস্বরে চিৎকার দিলাম, ওহে মুসলমানগণ, তোমাদের জন্য সুসংবাদ, এই যে রাসূলুল্লাহ (সা) এখানে। তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত দিলেন যে, চুপ থাক। যদিও তিনি দ্বিতীয়বার বলতে নিষেধ করলেন, কিন্তু সবারই কান এবং মস্তিষ্ক তো এদিকেই নিবদ্ধ ছিল। কাজেই কা'ব (রা)-এর এক চিৎকারের শব্দ শোনামাত্র সবাই পতঙ্গের মত ছুটে এসে তাঁর চারপাশে জমায়েত হলেন। হযরত কা'ব (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বর্ম খুলে আমাকে পরিয়ে দেন এবং আমার বর্ম তিনি পরিধান করেন। শত্রুরা রাসূলুল্লাহ (সা) ভেবে আমার প্রতি তীর বর্ষণ শুরু করে, যাতে আমি বিশটিরও অধিক আঘাত পাই। (হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন, তাঁর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য)।

যখন কিছু সংখ্যক মুসলমান তাঁর কাছে জমায়েত হলেন, তখন তিনি পাহাড়ী ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত তালহা ও হযরত হারিস ইবন সাম্মা (রা) তাঁর সঙ্গী ছিলেন। যখন পাহাড়ে আরোহণ করতে ইচ্ছা করলেন, তখন দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং বর্মের ভারে উঠতে পাচ্ছিলেন

না। ফলে হযরত তালহা (রা) বসে পড়েন এবং নবীজী তাঁর পিঠে পা রেখে আরোহণ করেন।

উবাই ইবন খালফকে হত্যা

ইত্যবসরে উবাই ইবন খালফ ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে এসে পড়ল। ঘোড়াটিকে সে দানাভূষি খাইয়ে এ জন্যে মোটাতাজা করে তুলেছিল যে, এর উপর সওয়ার হয়ে সে মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করবে। নবী (সা) যখন তার উদ্দেশ্য জানতে পেরেছিলেন, তখন বলেছিলেন, ইনশা আল্লাহ আমিই তাকে হত্যা করব।

যখন সে তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন সাহাবায়ে কিরাম অনুমতি চাইলেন যে, আমরা একে খতম করে দিই। তিনি বললেন, কাছে আসতে দাও। যখন সে নিকটে চলে এলো, তখন নবী (সা) হযরত হারিস ইবন সাম্মা (রা)-এর হাত থেকে বর্শা নিয়ে তার ঘাড়ে একটা খোঁচা দিলেন, যাতে সে বিচলিত হয়ে উঠল এবং চিৎকার করতে করতে প্রত্যাবর্তন করল যে, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ আমাকে মেরে ফেলেছেন।

লোকজন বলল, এ তো সামান্য একটু খোঁচামাত্র, কোন গুরুতর আঘাত তো নয়, যার জন্য তুমি এত চেঁচাচ্ছ ! উবাই বলল, তোমাদের কি স্মরণ নেই যে, মুহাম্মদ মক্কায় থাকতেই বলেছিলেন, আমিই তোমাকে হত্যা করব। এ খোঁচার কষ্ট আমার অন্তর টের পাচ্ছে। আল্লাহর কসম, যদি এ খোঁচা সমস্ত হিজাযবাসীর মধ্যেও বন্টন করে দেয়া হয়, তবে সবারই ধ্বংসের জন্য তা-ই যথেষ্ট হবে। এভাবে চেঁচামেচি করতে করতে সরফ নামক স্থানে পৌঁছে সে মৃত্যুবরণ করে।[১]

হযরত আলী এবং হযরত ফাতিমা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আঘাতের স্থানসমূহ ধৌত করা

যখন তিনি ঘাঁটিতে পৌঁছলেন, যুদ্ধ ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। তিনি সেখানে পৌঁছে বসে পড়লেন। হযরত আলী (রা) পানি নিয়ে এলেন এবং তাঁর পবিত্র চেহারা থেকে রক্ত ধুয়ে দিলেন এবং কিছু পানি তাঁর মাথায়ও ঢেলে দিলেন। এরপর তিনি উযূ করলেন এবং বসে বসে যোহরের নামায আদায় করলেন। সাহাবায়ে কিরামও তাঁর পিছনে বসে বসে ইকতিদা করলেন।[২]

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৩৫।

২. প্রথমে শরীআতের নির্দেশ এরূপই ছিল যে, কোন ওযরবশত ইমাম যদি বসে বসে নামায আদায় করেন, তখন মুক্তাদীগণও তার পিছনে বসে বসে ইকতিদা করবে, যদিও মুক্তাদীগণ সুস্থ থাকেন। পরে এ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। ফলে ইমাম ওযরবশত বসে নামায আদায় করলেও মুক্তাদীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতকালীন অসুস্থতার সময়ে তিনি বসে বসে ইমামতি করেন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন।

কুরায়শগণ কর্তৃক মুসলমানদের লাশের অঙ্গচ্ছেদ করা

মুশরিকগণ মুসলমানদের লাশের অঙ্গচ্ছেদ করা শুরু করে। অর্থাৎ তাঁদের নাক ও কান কেটে ফেলে, পেট চিরে ফেলে এবং গুপ্তাঙ্গ কেটে ফেলে। পুরুষদের সাথে সাথে মহিলারাও এ কাজে অংশগ্রহণ করে।

হিন্দা, যার পিতা উতবা বদর যুদ্ধে হযরত হামযা (রা)-এর হাতে নিহত হয়েছিল, সে হযরত হামযা (রা)-এর অঙ্গচ্ছেদ করে। পেট ও বুক চিরে কলিজা বের করে চিবোয়, কিন্তু গলাধঃকরণ করতে না পেরে ফেলে দেয় এবং এ আনন্দেই সে নিজের অলঙ্কার খুলে ওয়াহশীকে দান করে।

আর সে মুসলমান শহীদদের কর্তিত নাক-কান দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় পরিধান করে।[১]

আবূ সুফিয়ানের প্রশ্ন এবং হযরত উমর (রা)-এর জবাব

কুরায়শগণ যখন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তখন আবূ সুফিয়ান একটি পাহাড়ে আরোহণ করে চিৎকার করে বলল, افى القوم محمد "তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মদ (সা) জীবিত আছেন ?" নবী (সা) বললেন, কেউ জবাব দেবে না। এভাবে আবূ সুফিয়ান তিনবার প্রশ্ন করল, কিন্তু কোন জবাব এলো না। কিছুক্ষণ পর সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, افى القوم ابن ابى قحافة "তোমাদের মধ্যে কি ইবন আবূ কুহাফা (অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক) জীবিত আছেন ?" নবী (সা) বললেন, কেউ জবাব দেবে না। সে এ প্রশ্নটিও তিনবার করে তারপর চুপ হয়ে গেল। একটু পরে আবার চিৎকার দিল, افى القوم ابن الخطاب "তোমাদের মধ্যে কি উমর ইবন খাত্তাব জীবিত আছেন ?" এ প্রশ্নও সে তিনবার করল, কিন্তু যখন কোন জবাব পেল না, তখন আনন্দিত চিত্তে আপন সঙ্গীদেরকে বলল, اما هؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا احياء لا جابوا "মনে হয় এরা সবাই নিহত হয়েছে। যদি জীবিত থাকত, তা হলে অবশ্যই জবাব দিত।"[২]

এতে হযরত উমর (রা) ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না এবং চিৎকার করে বললেন : كذبت والله يا عدو الله ابقى الله عليك ما يحزنك "ওহে আল্লাহর দুশমন, আল্লাহর

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৪৪–৪৭।

২. সহীহ বুখারীর কিতাবুল জিহাদে কেবল (আরবী) এ বাক্য রয়েছে, اما هؤلاء فقد قتلوا فلو ان هؤلاء فقد قتلوا كانوا احياء جابوا বাক্যের উল্লেখ নেই, কিতাবুল মাগাযীর বর্ণনায় كانوا احياء لا جابوا আছে। এ অধম (লেখক) উভয় রিওয়ায়াত একত্র করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত আবূ বকর এবং হযরত উমর (রা)-কে তিনবার করে আহ্বান করার উল্লেখ কিতাবুল জিহাদে আছে, কিতাবুল মাগাযীতে কেবল এক-একবার আহ্বানের উল্লেখ রয়েছে।

কসম, তুই মিথ্যে বলেছিস, তোর চিন্তা ও দুঃখের কারণকে আল্লাহ্ তা'আলা এখনও জীবিত রেখেছেন।"

এরপর আবূ সুফিয়ান (নিজ দেশ ও গোত্রের এক মূর্তির নামে জয়ধ্বনি দিল) এবং বলল, اعل هبل اعل هبل "হে হুবল তুমিই মহান, হে হুবল তুমিই সর্বোচ্চ।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমরকে বললেন, ওর জবাবে বল, الله اعلى واجل। "আল্লাহই সবচে' বড় ও মহান।"

আবূ সুফিয়ান বলল, ان لنا العزى ولا عزى لكم "আমাদের কাছে উযযা আছে, তোমাদের উযযা নেই।"

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমরকে বললেন, ওর জবাবে বল, الله مولنا ولا مولى لكم فنعم المولى ونعم النصير "আল্লাহ আমাদের প্রভু, আর আমাদের প্রভু কত উত্তম এবং উত্তম সাহায্যকারী, তোমাদের তা নেই।"

আবূ সুফিয়ান বলল, يوم بيوم بدر والحرب سجال "এ দিনটি বদর যুদ্ধের প্রতিউত্তর প্রদানের দিন, যুদ্ধে তোমরা এবং আমরা একইরূপ, কখনো তোমরা জয়লাভ কর, আর কখনো আমরা।"

সহীহ বুখারীতে হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী হযরত উমর (রা) এ জবাব দেন : لا سواء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار "আমরা ও তোমরা একইরূপ নই, আমাদের নিহতরা জান্নাত লাভ করেছে, আর তোমাদের নিহতরা গেছে জাহান্নামে।"[২]

আবূ সুফিয়ানের বক্তব্যে এর জবাব দেয়া হয়নি, কেননা তা ছিল সত্য। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, تلك الايام نداولها بين الناس -এর সমার্থক।

এরপর আবূ সুফিয়ান হযরত উমর (রা)-কে বলল, هلم الى يا عمر "হে উমর, আমার কাছে এসো।"

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমরকে বললেন, যাও এবং দেখ, সে কি বলে। হযরত উমর (রা) তার কাছে গেলে সে বলল, انشدك الله يا عمر اقتلنا محمدا "ওহে উমর, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি সত্য বল দেখি, আমরা কি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি ?"

হযরত উমর (রা) বললেন, اللهم لا وانه ليسمع كلامك الان "আল্লাহর কসম, অবশ্যই নয়, তিনি নিশ্চয়ই এক্ষণে তোমার কথা শুনছেন।"

আবূ সুফিয়ান বলল, انت عندى اصدق من ابن قمية وابر "তুমি আমার কাছে ইবন কুমায়্যা থেকে বেশি সত্যবাদী এবং সৎ।"

---

১. কিতাবুল জিহাদের বর্ণনায় اعل هبل اعل هبل দু'বার আছে। আর কিতাবুল মাগাযীর বর্ণনায় একবার উল্লেখ করা হয়েছে।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৭; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৭৩।

একটু পর আবূ সুফিয়ান বলল, انه قد كان قتلاكم مثل والله ما رضيت ولا نهيت ولا امرت। "আমাদের লোকদের হাতে তোমাদের নিহতদের অঙ্গচ্ছেদন হয়েছে, আল্লাহর কসম, আমি এ কাজে খুশি-অখুশি কোনটাই নই। না আমি এ কাজের নির্দেশ দিয়েছি, আর না নিষেধ করেছি।"

প্রত্যাবর্তনকালে সে চিৎকার দিয়ে বলল, موعدكم بدر للعام القابل "আগামী বছর বদরে তোমাদের সাথে লড়াইয়ের ওয়াদা রইল।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, نعم هو بينا وبينك موعد انشاء الله "হ্যাঁ, এটা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ওয়াদা রইল ইনশা আল্লাহ।"[১] (তারিখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ২৪; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৭৯)

মুশরিকদের প্রত্যাবর্তনের পর মুসলমান মহিলাগণ সংবাদ গ্রহণ এবং অবস্থা জানার জন্য মদীনা থেকে বের হন। সায়্যিদাতুন নিসা হযরত ফাতিমা যোহরা (রা) এসে দেখেন, নবীজীর পবিত্র চেহারা থেকে রক্ত ঝরছে। হযরত আলী (রা) ঢালে করে পানি আনলেন এবং হযরত ফাতিমা পবিত্র চেহারা ধুয়ে দিলেন, কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। তাঁরা যখন দেখলেন রক্ত বেড়েই চলছে, তখন এক টুকরা চাটাই পুড়িয়ে এর ছাই আঘাতের স্থানে লেপে দিলেন, ফলে রক্ত বন্ধ হলো। ইমাম বুখারী ও তাবারানী হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২]

দ্রষ্টব্য

১. এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করা জায়েয।

২. অধিকন্তু চিকিৎসা করাটা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার বিপরীত নয়।

৩. এটাও জানা গেল যে, হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামেরও শারীরিক অসুস্থতা এবং দৈহিক অসুবিধা হয়, যাতে তাঁদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের অনুসারীগণ তাঁদের দেখে ধৈর্য-স্থৈর্য, সন্তুষ্টি ও মেনে নেয়ার শিক্ষা লাভ করতে পারেন। অধিকন্তু এ মানবীয় বাস্তবতা ও মানুষের জন্য অপরিহার্যতা দেখে বুঝতে পারেন যে, এঁরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র এবং নিষ্ঠাবান বান্দা, আল্লাহ ক্ষমা করুন, এঁরা আল্লাহ নন। এ মহাত্মাগণের মু'জিযা ও প্রকাশ্য নিদর্শন তাঁদের নবূওয়াত ও রিসালাতের প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণ বলেই মনে করেন, খ্রিস্টান হাওয়ারীদের (হযরত ঈসা (আ)-এর সাহায্যকারী) মত ফিতনায় জড়িয়ে পড়ে তাঁকে আল্লাহ মনে করে না বসেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই, আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও

---

১. 'ইনশা আল্লাহ' বাক্যটি আল্লামা যারকানী উদ্ধৃত করেছেন, তাবারী এবং ইবন হিশামের বর্ণনায় নেই। যারকানী, ২খ. পৃ. ৪৮।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ৪৯।

রাসূল। আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর বংশধরগণের প্রতি, তাঁর সাহাবিগণের প্রতি, তাঁর স্ত্রীগণের ও সন্তানদের প্রতি অযুত অসংখ্য বরকত ও শান্তি বর্ষিত করুন।[1]

৪. অধিকন্তু এ ঘটনা দ্বারা এ বিষয়টিও সুচারুরূপে প্রকাশ পেল যে, নবী করীম (সা)-এর পরে হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁর পর হযরত উমর (রা)-এর মর্যাদা। আর এ বিন্যাস এতদূর প্রকাশ্য ও প্রসিদ্ধ ছিল যে, কাফিররাও এটাই মনে করত যে, নবী (সা)-এর পর হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁর পরে হযরত উমর (রা)-এর অবস্থান। মোট কথা, এ দু'জনের মর্যাদার ক্রমবিন্যাস কাফিরদেরও জানা ছিল। দৃষ্টান্ত দ্বারা কাফিররা এটা বুঝে নিয়েছিল যে, নবী-দরবারে প্রথম স্থান হযরত আবূ বকর (রা)-এর এবং এর পরবর্তী অবস্থান হযরত উমর (রা)-এর, আর এঁরা দু'জনই নবী (সা)-এর প্রধান উপদেষ্টা।

হযরত সা'দ ইবন রবী (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

কুরায়শদের চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ ইবন সাবিত[2] (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, সা'দ ইবন রবী আনসারী (রা)-কে খোঁজ কর, সে কোথায় এবং বললেন, ان رأيته فاقرأه منى السلام وقل له يقول رسول الله كيف تجدك "যদি দেখতে পাও, তবে তাকে আমার সালাম বলবে এবং বলবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেছেন, এখন তুমি কিরূপ অনুভব করছ?"

হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা) বলেন, আমি খুঁজে খুঁজে হযরত সা'দ ইবন রবী (রা)-এর নিকটে পৌঁছলাম। তাঁর জীবনের এখনো কিছুটা অবশিষ্ট ছিল, তাঁর শরীরে তীর এবং তরবারির সত্তরটি আঘাত ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী তাঁকে শোনালাম। হযরত সা'দ ইবন রবী (রা) জবাব দিলেন :

على رسول الله السلام وعليك السلام قل له يا رسول الله اجدانى اجد ريح الجنة وقل لقومى الانصارى لاعذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله ﷺ وله وسلم شفر يطرف قال وفاضت نفسه رحمه الله ·

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিও সালাম এবং তোমাদের প্রতিও ; রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গিয়ে বলবে, আমি এখন জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। আর আমার সম্প্রদায় আনসারগণকে বলবে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যদি কোন কষ্ট হয় আর তোমাদের মধ্যে একটা চোখও

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৪৯।

২. এটা হাকিমের বর্ণনা যে, হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন। হাফিয ইবন আবদুল বার-এর বর্ণনানুযায়ী হযরত উবাই ইবন কাব (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন, আর ওয়াকিদীর বর্ণনানুযায়ী হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে, তিনি একের পর এক তিনজনকেই প্রেরণ করেছিলেন অথবা একই সময়ে তিনজনকেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। যারকানী, ২খ. পৃ. ৪৯।

যদি তা দেখার জন্য অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ যদি তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও জীবিত[১] থাকে, তা হলে মনে রাখবে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তোমাদের কোন ওজরই টিকবে না। এ বলে তিনি ইনতিকাল করলেন।"

হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহ সনদবিশিষ্ট এবং হাফিয যাহবীও তাঁর তালখীস গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

অপর এক বর্ণনায়, হযরত সা'দ (রা) হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা)-কে বলেছিলেন :

اخبر رسول الله ﷺ انى فى الاموات واقرأه السلام وقل له يقول جزاك الله عنا وعن جميع الامة خيرا ٠

"রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলবে যে, এখন আমি মারা যাচ্ছি। আর তাঁকে সালাম দিয়ে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আল্লাহ আপনাকে আমাদের এবং সমস্ত উম্মতের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কেননা আপনি আমাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন।" [মুস্তাদরাকে হাকিম, হযরত সাদ ইবন রবী (রা)-এর জীবন চরিত]

ইবন আবদুল বার-এর বর্ণনায় হযরত উবাই ইবন কাব (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আমি ফিরে এলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হযরত সাদ (রা)-এর সংবাদ শোনালাম। তিনি বললেন : رحمه الله نصح الله ولرسوله حيا و ميتا "আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, সে জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুকালেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষী ও বিশ্বস্ত ছিল।" (হাফিয ইবন আবদুল বার কৃত আল ইসতিয়াব, ২খ. পৃ. ৩৫ এবং ইসাবার ফুটনোট)।

হযরত হামযা (রা)-এর লাশ অনুসন্ধান

রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং হযরত হামযা (রা)-এর খোঁজে বের হলেন। বাতনে ওয়াদীতে তাঁকে অঙ্গচ্ছেদ করা অবস্থায় পাওয়া গেল। নাক এবং কান ছিল কর্তিত, পেট এবং বুক ছিল ফাঁড়া। এ অন্তর কাঁপানো হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, আমি যতদূর জানি, অবশ্যই তুমি কল্যাণকামী এবং পরোপকারী ছিলে। যদি সাফিয়্যার দুঃখ-বেদনার ব্যাপার না থাকত, তবে আমি তোমাকে এ অবস্থায়ই রেখে দিতাম যাতে তোমাকে পশু-পাখি আহার করত এবং তাদের পেট থেকেই উত্থিত হতে। আর তিনি ঐ স্থানেই দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কসম, যদি তিনি আমাকে কাফিরদের উপর বিজয় দান করেন, তা হলে আমি তোমার প্রতিশোধে সত্তরজন কাফিরের অঙ্গচ্ছেদন করব। তিনি তখনো ঐ স্থান ত্যাগ করেন নি, এমন সময় এ আয়াত নাযিল হলো :

---

১. এক রিওয়ায়াতে شفر স্থলে وفيكم عين تطرف রয়েছে। যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৯।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ - وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَتَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ - اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ٠

"যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। তুমি ধৈর্যধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহরই সাহায্যে। ওদের দরুন দুঃখ করো না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। আল্লাহ তাদের সঙ্গেই আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ। (সূরা নাহল : ১২৬-১২৮)

ফলে তিনি ধৈর্যধারণ করলেন এবং শপথের কাফফারা দিয়ে ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন।[১]

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত হামযা (রা)-কে দেখলেন, তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, এমনকি তাঁর হিক্কা এসে গেল। তিনি বললেন, سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة "কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে হামযাই হবেন সমস্ত শহীদের সর্দার।"

হাকিম বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং হাফিয যাহবীও একে সহীহ বলেছেন।[২]

মু'জামে তাবারানীতে হযরত আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব সমস্ত শহীদের সর্দার।[৩]

এ কারণেই হযরত হামযা (রা)-কে সাইয়্যেদুশ শুহাদা (শহীদগণের সর্দর) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

এ যুদ্ধেই হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-ও শহীদ হন। মুজামে তাবারানী ও দালাইলে আবূ নুয়াইমে উত্তম সনদে হযরত সাদ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, উহুদের দিন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ আমাকে

---

১. মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ১৯৭।

২. আল্লামা যুরকানী বলেন, এ হাদীসটি হাকিম, বায়হাকী, বাযযার ও তাবারানী বর্ণনা করেছেন। হাফিয আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন, হাদীসটির সনদ যঈফ (যুরকানী, ২খ. প. ৫১)। তবে তিনি এ হাদীসটি উল্লেখের পর বলেন, এটি কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার কোন কোন সনদ অপর সনদকে শক্তিশালী করেছে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৮২।

৩. সহীহ বুখারীর মুতাদাউলের কপিতে 'হযরত হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর কতল' শীর্ষক একটি অধ্যায় রয়েছে। কিন্তু নাসাফী কপিতে 'কাতলে হামযা সায়্যিদুশ শুহাদা' নামে অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে। সম্ভবত ইমাম বুখারী তাঁর তরজমাতুল বাবে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

একপাশে ডেকে নিয়ে চুপে চুপে বললেন, এসো আমরা দু'জন কোন পৃথক স্থানে বসে দু'আ করি এবং একে অপরের দু'আয় আমিন বলি।

সা'দ (রা) বলেন, আমরা দু'জন সবার থেকে পৃথক হয়ে কোন এক কোণায় বসে পড়লাম। প্রথমে আমি দু'আ করলাম, আয় আল্লাহ, আজ এমন একজন দুশমনের সাথে মুকাবিলা হোক যে অত্যন্ত শক্তিশালী, বীর যোদ্ধা এবং হিংস্র। আমি তার সাথে কিছুক্ষণ লড়াই করব এবং সেও আমার সাথে লড়াই করবে। অতঃপর আয় আল্লাহ, আমাকে তার ওপর বিজয়দান কর। এমনকি আমি যেন তাকে হত্যা করি এবং তার মালামাল ছিনিয়ে নিতে পারি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) আমিন বললেন এবং এরপর তিনি এ দু'আ করলেন, আয় আল্লাহ, আজ এমন এক দুশমনের সাথে সংঘর্ষ হোক, যে কঠিন হৃদয়, শক্তিশালী এবং হিংস্র। আমি কেবল তোমারই উদ্দেশ্যে ওর সাথে লড়াই করতে যাচ্ছি। আর সেও আমার সাথে লড়বে। অবশেষে সে আমাকে হত্যা করুক এবং আমার নাক-কান কাটুক। আয় পরোয়ারদিগার, আমি যখন তোমার সাথে সাক্ষাত করব, আর তুমি জিজ্ঞেস করবে, ওহে আবদুল্লাহ, তোমার নাক এবং কান কোথায় কাটা গেছে ? তখন আমি আরয করব, আয় আল্লাহ, তোমার এবং তোমার পয়গম্বরের পথে। তখন তুমি বলবে, তুমি সত্যই বলেছ। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, তার দু'আ আমার দু'আ অপেক্ষা কতই না উত্তম ছিল ! সন্ধ্যায় দেখলাম, তার নাক এবং কান কর্তিত।[১]

হযরত সা'দ (রা) বলেন, আমার দু'আও কবূল হয়েছিল, আমিও এক শক্তিশালী ভয়ঙ্কর কাফিরকে হত্যা করি এবং তার মালামাল ছিনিয়ে নিই।[২]

হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) এ দু'আ করেছিলেন :

اللهم انى اقسم عليك ان القى العدد فيقتلونى ثم يبقروا بطنى ويجدعوا انفى واذنى ثم قالنى بم ذلك فاقول فيك .

"আয় আল্লাহ, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি যে, আমি তোমার শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করি এবং তারা আমাকে হত্যা করুক, আমার পেট ফেঁড়ে ফেলুক, আমার নাক-কান কেটে ফেলুক। এরপর তুমি আমাকে জিজ্ঞেস কর যে, এটা কেন হলো ? আমি বলব, কেবল তোমারই জন্যে।"

হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) বলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশা রাখি যে, যেরূপে আল্লাহ বিশেষভাবে শাহাদতের ব্যাপারে তাঁর দু'আ কবূল করেছেন, একইভাবে তাঁর অপর দু'আটিও আল্লাহ নিশ্চয়ই কবূল করবেন। অর্থাৎ শাহাদতের পর তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করবেন এবং তিনিও ঐ উত্তর দেবেন।

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৫১।

২ রাউযুল উনুফ, ২খ. পৃ. ১৪৩।

হাকিম বলেন, এ হাদীসটি যদি মুরসাল না হতো, তা হলে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হতো। হাফিয যাহবী বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল সহীহ। (মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ২০০)

এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-কে مجدع فى الله (অর্থাৎ যে ব্যক্তির নাক ও কান আল্লাহর রাস্তায় কাটা গেছে) উপাধিতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন।[১]

আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমিক এবং নিষ্কলুষ মহব্বতকারীদের অবস্থা এমনটিই হয়ে থাকে যে, আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করাকে তাঁরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সৌভাগ্য বলে মনে করেন। পার্থিব জীবনের চেয়ে মৃত্যুই তাঁদের কাছে বেশি উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় মনে হয়। এ জন্যে যে, মৃত্যুকে তাঁরা প্রকৃত প্রেমাষ্পদের (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার) সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যম এবং পার্থিব জীবনের জিন্দানখানা থেকে মুক্তিলাভ করে জান্নাতী বাগ-বাগিচায় পৌঁছার উপায় মনে করেন।

تلخ بنو وپیش ایشان مرگ تن * چون روندا ز چاه زندان درچمن

تلخ کی باشد کی راکش برند * از میان زهرماران سوئ قنام

দ্রষ্টব্য : আল্লাহ্ তা'আলা যখন মানুষকে খলীফা বানানোর ইচ্ছা করেন, তখন ফেরেশতাগণ আরয করেন :

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ·

"তুমি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো তোমার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।" (সূরা বাকারা : ৩০)

মানুষের মধ্যে দু'ধরনের শক্তি থাকে। একটি বাসনার শক্তি, যার মাধ্যমে ব্যভিচার ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে, যাকে ফেরেশতাগণ مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا দ্বারা প্রকাশ করেছেন, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাশবিক শক্তি, যাকে ফেরেশতাগণ وَيَسْفِكُ دِمَاءَ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। ফেরেশতাগণ মানুষের এ ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু এটা খেয়াল করেন নি যে, এই বাসনা শক্তির লক্ষ্য যদি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ফিরিয়ে দেয়া হয়, তা হলে এর ফলাফল যা প্রকাশ পাবে, তাতে ফেরেশতাগণও আফসোস করতে শুরু করবেন। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ভালবাসার আধিক্য ও তাঁর প্রেমের উন্মাদনা দেখে। অনুরূপভাবে যখন পাশবিক শক্তিকে আল্লাহর কুদরতের কাজে ব্যয় করা হয়, তখন তা থেকেও আশ্চর্য ও অভূতপূর্ব ফলাফল প্রকাশ পায়, যা দেখে ফেরেশতাগণ পর্যন্ত হতবাক হয়ে যান। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পথে আত্মদান, তাঁর দুশমনের সাথে যুদ্ধ করা দেখে।

১. ইসাবা, ২খ. পৃ. ২৮৭; যারকানী, ২খ. পৃ. ৫১।

نشود نصيب دسمن كه شود هلاك تغيت * سردوستان سلامت كه تو خنجر از مائ

ফেরেশতাগণ যদিও দিবারাত্র মহান আল্লাহর তসবীহ-তাহলীল করেন, কিন্তু তাঁর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মোৎসর্গ করেন না, তাঁরা এ সম্পদের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। আর এই প্রকৃত প্রেমিকের জন্য জীবন দেয়া, তাঁর পথে শাহাদতবরণ করার সাধ্যই ফেরেশতাদের নেই। মানুষ যদিও ফেরেশতাদের মত নিষ্পাপ নয়, কিন্তু পাপকাজের পর মানুষের অস্থির অনুশোচনা, লজ্জিত অবস্থায় আত্মদহন ও কান্নাকাটি দ্বারা মর্যাদা এতই উচ্চে তুলে দেয়, ফেরেশতাগণের অবস্থান যার অনেক নীচে পড়ে থাকে।

مركب توبه عجائب مركب است * برفلك تازوبيك لحظئ زبست

چون برار نداز پيشمانى انين * عرش لرزد ازانين المذنبين

এ জন্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, নবী-রাসূলগণ পদস্থ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন এবং সাহাবী, তাবিঈন, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশিলগণ আসমান ও যমীনের ফেরেশতাগণ অপেক্ষা মর্যাদাবান। (যেমনটি বাহরুর রায়েক, ১খ. পৃ. ৩৩৩-এ বলা হয়েছে; বিস্তারিত জানতে চাইলে সেখানে দেখুন)। আর সৎকর্মশীল ঈমানদার স্ত্রীলোকগণ জান্নাতের আনত নয়না হূরদের চেয়ে উত্তম, যেমনটি মাওয়াকিতুল জাওয়াহির গ্রন্থে বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

হযরত জাবির (রা)-এর শ্রদ্ধাষ্পদ পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম আনসারী (রা) এ যুদ্ধেই শাহাদতবরণ করেন। হযরত জাবির (রা) বলেন, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কাফিররা তাঁর অঙ্গচ্ছেদন করে। তাঁর লাশ যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে এনে রাখা হলো, তখন আমি কাপড় উঠিয়ে আমার পিতার মুখ দেখতে চাইলাম, কিন্তু সাহাবিগণ নিষেধ করলেন। আমি আবার তাঁর মুখ দেখতে চাইলাম, কিন্তু সাহাবিগণ আবার নিষেধ করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে অনুমতি দিলেন।

আমার ফুফু ফাতিমা বিনতে আমর যখন খুবই কাঁদতে শুরু করলেন, তখন তিনি বললেন, কাঁদছ কেন, তার উপর তো ফেরেশতাগণ ছায়া দিয়ে রেখেছেন, এমন কি তারা জানাযাও হয়েছে (বুখারী শরীফ)।[1] অর্থাৎ এ অবস্থা শোক এবং বেদনার নয়, বরং আনন্দ ও খুশির, কেননা ফেরেশতা তোমার ভাইকে ছায়াদান করছেন।

হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে দেখে বললেন, ওহে জাবির, তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমাকে হতোদ্যম দেখতে পাচ্ছি? আমি

১. এ হাদীসটি বুখারী শরীফের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যেমন, কিতাবুল জানায়েয, পৃ. ১৬৬ ও ১৭২, কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ৩৯৫ এবং কিতাবুল মাগাযী, পৃ. ৫৮৪।

আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমার পিতা এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আর তিনি অনেক সন্তান-সন্তুতি এবং প্রচুর ঋণ রেখে গেছেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ শোনাব না ? আমি আরয করলাম, কেন নয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার অন্তরাল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেন না, কিন্তু তোমার পিতাকে জীবিত করে তিনি খোলাখুলি কথা বলেছেন এবং বলেছেন, ওহে আমার বান্দা, তোমার কোন ইচ্ছা থাকলে আমাকে বল। তখন তোমার পিতা আরয করেছে, আয় পরোয়াদিগার, আমার ইচ্ছা এই যে, আমি পুনরায় জীবিত হই এবং তোমার পথে পুনরায় নিহত হই। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, এটা তো হবে না, কেননা এটা নির্ধারিত হয়েই আছে যে, মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার কাউকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে দেয়া হবে না।[১] (তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, তাফসীরে সূরা আলে ইমরান)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধের পূর্বে আমি হযরত মুবাশ্বির ইবন আবদুল মুনযির (রা)-কে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি বলছেন, ওহে আবদুল্লাহ, তুমিও শীঘ্রই আমাদের কাছে আসছ। আমি বললাম, তোমরা কোথায় ? তিনি বললেন, জান্নাতে, যেখানে ইচ্ছা, ঘুরে বেড়াই। আমি বললাম, তুমি কি বদর যুদ্ধে নিহত হওনি ? মুবাশ্বির (রা) বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু পুনরায় জীবিত করে দেয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি এ স্বপ্ন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, হে আবূ জাবির, এর ব্যাখ্যা হলো শাহাদত।[২]

হযরত আমর ইবন জমূহ (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা)-এর ভগ্নিপতি হযরত আমর ইবন জমূহ (রা)-ও এ যুদ্ধেই শহীদ হন। তাঁর শাহাদত লাভের ঘটনাও আশ্চর্যজনক। হযরত আমর ইবন জমূহ (রা) খোঁড়া ছিলেন এবং তা সামান্য নয়, বরং বেশ খোঁড়া ছিলেন। তাঁর চার পুত্রের সবাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করতেন। উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি তাদের বললেন, আমিও তোমাদের সাথে জিহাদে যাচ্ছি। তাঁর ছেলেরা বললেন, আপনি অপারগ, আল্লাহ্ আপনাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আপনি এখানেই অবস্থান করুন। কিন্তু কোন কর্তব্যনিষ্ঠ নিবেদিতপ্রাণ মর্যাদা প্রত্যাশী ব্যক্তি কি কখনও অব্যাহতির উপর নির্ভর করেন ? শাহাদত লাভের আগ্রহে তিনি এতই উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলেন যে, ঐ অবস্থায়ই খোঁড়াতে খোঁড়াতে

১. হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী নামক গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে একে হাসান বলেছেন এবং হাকিম সহীহ বলেছেন। ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ২৫, تمنى المجاهد ان يرجع الى الدنيا অধ্যায়।

২ যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৯৬; ফাতহুল বারী, ৩খ. পৃ. ১৭২।

নবীজীর দরবারে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমার ছেলেরা আমাকে আপনার সাথে যেতে বারণ করে। والله انى لارجو ان اطأبعر حتى هذه فى الجنة "আল্লাহর কসম, আমি আশা করি এ খোঁড়া অবস্থাতেই আমি জান্নাতের যমীনে পদচারণা করব।"

তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে অসমর্থ করেছেন, তোমার ওপর জিহাদ ফরয নয়। আর তিনি তার পুত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, যদি তোমরা ওকে বাধা না দাও তা হলে অসুবিধা কোথায়, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা এর ভাগ্যে শাহাদত রেখেছেন। কাজেই তিনি জিহাদ করতে বের হলেন এবং শহীদ হলেন।[১]

আর মদীনা থেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় তিনি কিবলামুখী হয়ে এ দু'আ করলেন, اللهم ارزقنى الشهادة ولاتردنى الى اهلى "আয় আল্লাহ আমাকে শাহাদত নসীব করো এবং আমাকে আমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে এনো না।"

এ যুদ্ধেই তাঁর পুত্র হযরত খাল্লাদ ইবন আমর ইবন জমূহ-ও শহীদ হন। হযরত আমর ইবন জমূহ (রা)-এর স্ত্রী হযরত হিন্দা বিনতে আমর ইবন হারাম (যিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম-এর ভগ্নী এবং হযরত জাবিরের ফুফু ছিলেন) ইচ্ছা করলেন যে, এ তিন শহীদ অর্থাৎ ভ্রাতা হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম, পুত্র হযরত খাল্লাদ ইবন আমর ইবন জমূহ এবং স্বামী হযরত আমর ইবন জমূহ (রা)-কে একটি উটের পিঠে উঠিয়ে নেবেন এবং মদীনায় গিয়ে তিনজনকেই দাফন করবেন। কিন্তু মদীনার দিকে ফিরতেই উট বসে পড়ত আর উহুদের দিকে ফিরলে দ্রুত অগ্রসর হতো।

হিন্দা এসে ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানালেন। তিনি বললেন, আমর ইবন জমূহ মদীনা থেকে আসার সময় কিছু বলেছিল কি ? হিন্দা তখন তার যাত্রাকালের দু'আর কথা নবী (সা)-কে অবহিত করলেন। তখন তিনি বললেন, এ জন্যেই উট যাচ্ছে না। তিনি আরো বললেন :

والذى نفسى بيده ان منكم من لو اقسم على الله لابره منهم عمر بن الجموه ولقد رأيته يطاء بعرجه فى الجنة ·

"ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমনও কেউ কেউ আছে, সে যখন কোন কসম করে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তা পূর্ণ করেন। আমর ইবন জমূহও তাদের মধ্যে একজন। আর অবশ্যই আমি তাকে জান্নাতে খুঁড়িয়ে চলতে দেখেছি।"[২] (আল ইস্তিয়াব, ২খ. পৃ. ৫০৪, হযরত আমর ইবন জমূহ-এর জীবন চরিত অধ্যায় এবং ইসাবার ফুটনোট)।

১. ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৮৮; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৩৭।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ৫০;রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১৩৯; উয়ূনুল আসার, পৃ. ৩৪৭।

উহুদের সন্নিকটে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম এবং হযরত আমর ইবন জমূহ (রা) উভয়কে একই কবরে দাফন করা হয়।

হযরত খায়সামা (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

হযরত খায়সামা (রা), [রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যার পুত্র শহীদ হয়েছিলেন], নবী-দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আফসোস, আমার বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হয়নি, যাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি খুবই আগ্রহী এবং উদগ্রীব ছিলাম। এমন কি এ সৌভাগ্য অর্জনের লক্ষ্যে আমি আমার পুত্রের সাথে লটারী[১] করলাম, কিন্তু সৌভাগ্য ছিল আমার পুত্র সার্দের নসীবে, লটারীতে তার নাম উঠে এবং সে শাহাদত লাভে ধন্য হয়েছে আর আমি রয়ে গেছি।

আজ রাতে আমি পুত্রকে স্বপ্নে দেখেছি, খুবই সুন্দর ও নিখুঁত দেহে সে জান্নাতের বাগান এবং ঝর্ণায় আনন্দের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সে আমাকে বলল, পিতা, আপনিও এখানে চলে আসুন, উভয়ে মিলে আমরা জান্নাতে একসাথে থাকব। আমার পরোয়ারদিগার আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, আমি তা সম্পূর্ণ সঠিক পেয়েছি।

ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), তখন থেকেই আমি আমার পুত্রের সাহচর্য লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে পড়েছি। আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমার হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, এখন আশা একটাই যে, যে কোনভাবে আপন প্রভুর সাথে মিলিত হই। ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমার শাহাদত লাভ এবং জান্নাতে গিয়ে পুত্র সা'দের সাহচর্য নসীব করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) খায়সামা (রা)-এর জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ তাঁর দু'আ কবূল করলেন এবং হযরত খায়সামা (রা) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।[২]

ইনশা আল্লাহ আমরা আশা রাখি যে, হযরত খায়সামা (রা) তাঁর পুত্র হযরত সা'দ (রা)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছেন।

হযরত উসায়রিম (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

হযরত আমর ইবন সাবিত (রা), যিনি উসায়রিম উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন, সব সময় ইসলামের বিরোধিতা করতেন। উহুদের দিনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তরবারি নিয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করে অবশেষে আহত হয়ে পড়ে যান। লোকজন উসায়রিমকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাকে এ যুদ্ধে নিয়ে এলো, ইসলামের প্রতি উৎসাহ নাকি সম্প্রদায়ের সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন ? হযরত উসায়রিম (রা) জবাব দিলেন :

---

১. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২ যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৯৬।

بل رغبة فى الاسلام فأمنت بالله ورسوله فاسلمت واخذت سيفى وقالت مع رسول الله ﷺ حتى اصابنى ما اصابنى - انه لمن اهد الجنة ٠

"বরং ইসলামের প্রতি ভালবাসা এবং উৎসাহ। আমি আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি; মুসলমান হয়েছি এবং তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছি। এমনকি আমি এভাবে আহত হয়ে পড়েছি। এ কথা শেষ হওয়ামাত্র তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।" (ইবন ইসহাক হাসান সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন, বল দেখি কে ঐ ব্যক্তি, যিনি জান্নাতে দাখিল হয়েছেন অথচ এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েন নি ? তিনিই এই সাহাবী (রা)। (ইসাবা, হযরত আমর ইবন সাবিত-এর জীবন চরিত অধ্যায়)।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিরাপদ ও সুস্থ আছেন কিনা, তা জানার জন্য মদীনার নারী-পুরুষের ভিড় জমানো

যুদ্ধের ব্যাপারে মদীনায় যেহেতু হৃদয় বিদারক খবরই পৌঁছেছিল, এ জন্যে মদীনার পুরুষ-স্ত্রীলোক, শিশু-বৃদ্ধ সবাই নিজ নিজ আপনজন অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সুস্থ ও নিরাপদ দেখতে উৎসুক ও আগ্রহী ছিল।

যেমন হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈক আনসারী মহিলার সাথে সাক্ষাত হয়, যার স্বামী, ভাই এবং পিতা এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, যখন তাঁকে তাঁর স্বামী, ভাই এবং পিতার শাহাদতের সংবাদ শোনানো হলো, তখন তিনি বললেন, প্রথমে বলুন, রাসূলুল্লাহ (সা) কেমন আছেন ? লোকজন যখন বলল, আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি ভাল আছেন, তখন ঐ মহিলা বললেন, আমাকে তাঁর পবিত্র চেহারা দেখিয়ে দিন। তাঁকে স্বচক্ষে দেখে নিশ্চিত হতে চাই। লোকজন ইশারায় বলল, ইনিই তিনি। তখন ঐ মহিলা বললেন, كل مصيبة بعدك جلل "আপনার পরে আর সমস্ত মুসীবত নিতান্তই মূল্যহীন।" (ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১২)

যুদ্ধের দুশ্চিন্তার মধ্যে নিষ্ঠাবান আল্লাহ-প্রেমিকদের জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তাঁদের তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া

যখন কোন শয়তান এ সংবাদ রটনা করল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) শহীদ হয়েছেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান মানবীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এ সংবাদ শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লেন, আর এ হতবিহ্বল ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে কিছুক্ষণের জন্য তাদের দৃঢ়তা শিথিল হয়ে গেল এবং এ সঙ্কটকালে যার নসীবে শাহাদতের সৌভাগ্য বরাদ্দ ছিল, তিনি শহীদ হয়ে গেলেন, যাদের ভাগ্যে সরে যাওয়া ছিল তারা

সরে গেলেন। আর যারা যুদ্ধের ময়দানে থেকে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে যারা ছিলেন নিষ্ঠাবান মুমিন, নিশ্চিত বিশ্বাসী এবং আল্লাহর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটা তন্দ্রাভাব এসে তাদের ছেয়ে ফেলল। এঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুতে লাগলেন, যাঁদের মধ্যে হযরত আবূ তালহা (রা)-ও ছিলেন। হযরত আবূ তালহা (রা) বলেন, কয়েকবার আমার হাত থেকে তরবারি মাটিতে পড়ে যায়। তরবারি পড়ে যেত আর আমি উঠিয়ে নিতাম, এ ছিল এক অনুভূতির ব্যাপার। এ এক গুপ্ত প্রশান্তি যা আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসীদের দান করেছিলেন, যার ফলে কাফিরদের ভীতি মু'মিনদের অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল, আর মুনাফিকের যে দলটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তারা কেবল নিজের জান বাঁচানোর চিন্তায় ব্যস্ত ছিল, এ হতভাগাদের চোখে তন্দ্রা আসেনি। এ প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াত নাযিল হয় :

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِا اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ... .

"অতঃপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল...." (সূরা আলে ইমরান : ১৫৪)

হাফিয ইবন কাসীর[১] বলেন, যে দলটির উপর তন্দ্রা এসেছিল, তারা ছিল ঐ দল যারা ঈমান ও বিশ্বাসে, দৃঢ়তা ও অবিচলতায়, আল্লাহর প্রতি প্রকৃত নির্ভরশীলতার গুণে গুণান্বিত। তাদের এ বিশ্বাস ছিলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাঁর রাসূলকে সাহায্য করবেন এবং তিনি তাঁর রাসূলের সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

আর অপর দল, যারা ছিল নিজেদের জীবন রক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত, আর এ চিন্তায়ই তাদের তন্দ্রা উড়ে গিয়েছিল, এটা ছিল মুনাফিকদের দল। তাদের কেবল নিজেদের জীবন রক্ষার চিন্তাই ছিল, ফলে প্রশান্তির নিদ্রা থেকে তারা ছিল বঞ্চিত।

কতিপয় স্ত্রীলোকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও তাঁদের ব্যাপারে নির্দেশ

এ যুদ্ধে কয়েকজন মুসলমান স্ত্রীলোকও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি হযরত আয়েশা (রা) এবং আমার মা উম্মে সুলায়ম (রা)-কে দেখলাম, তাঁরা পায়জামা পরিধান করে পানির মশক ভর্তি করে করে পিঠে ঝুলিয়ে আনছিলেন এবং লোকজনকে পানি পান করাচ্ছিলেন। যখন মশক শূন্য হয়ে যেত, তখন আবার ভরিয়ে নিয়ে আসতেন।

১. তাফসীরে ইবন কাসীর, ১খ. পৃ. ৪১৮।

সহীহ বুখারীতে হযরত উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর মাতা হযরত উম্মে সালীত (রা)-ও উহুদ যুদ্ধের দিন আমাদের জন্য মশক ভরে ভরে পানি এনেছেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত রবী বিনতে মুআউয়ায (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে যেতাম যাতে আমরা লোকজনকে পানি পান করাতে পারি, আহতদের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে পারি এবং নিহতদের সরিয়ে আনতে পারি।

হযরত খালিদ ইবন যাকওয়ান (রা)-এর বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথা রয়েছে যে, فلا نقاتل "আমরা যুদ্ধ করতাম না।"

এ তিনটি বর্ণনাই সহীহ বুখারীর কিতাবুল জিহাদে উল্লেখিত আছে। বিস্তারিতের জন্য ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৫৭–৬০ দেখুন।

সুনানু ইবন মাজাহ-এ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, মহিলাদের জন্যও কি জিহাদ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য এমন জিহাদ রয়েছে যাতে লড়াই নেই, অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা। (ফাতহুল বারী, কিতাবুল হজ্জ, মহিলাদের হজ্জ অধ্যায়)।

সহীহ বুখারীর কিতাবুল ঈদায়ন-এ হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমরা রোগীদের দেখাশোনা এবং আহতদের চিকিৎসা করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম।

এ সমস্ত স্ত্রীলোক কেবল লোকজনকে পানি পান করাতেন এবং রোগী ও আহতদের দেখাশোনা করতেন, প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করতেন না। কিন্তু হযরত উম্মে আম্মারা (রা) যখন দেখলেন যে, ইবন কুমায়্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আক্রমণোদ্যত, তখন তিনি এ অবস্থায় অগ্রসর হয়ে মুকাবিলা করেন, এতে তিনি মাথায় গুরতর আঘাত পান। হযরত উম্মে আম্মারা (রা) বলেন, আমিও অগ্রসর হয়ে ইবন কুমায়্যার উপর তরবারির আঘাত হানি, কিন্তু ঐ আল্লাহর দুশমন বর্ম পরিহিত ছিল।[১]

এ যুদ্ধে কেবল উম্মে আম্মারা (রা) একাই প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করেছিলেন। এছাড়া সমস্ত যুদ্ধেই মাত্র দু'একজন মহিলা ছাড়া মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রমাণ হাদীসের ভাণ্ডারের কোথাও নেই। আর রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, এমন কোন প্রামাণ্য হাদীসও নেই। এ জন্যে সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত হলো, মহিলাদের জন্য জিহাদ ফরয নয়, তবে কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ডামাডোলে জড়িয়ে পড়লে প্রয়োজন অনুসারে বাধ্য হলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

মহিলাদের স্বাভাবিক দূর্বলতা ও প্রকৃতিগত অসামর্থ্যই এর প্রমাণ যে, তাদের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ আবশ্যকীয় করা তাদের স্বভাব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৩৪; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৮৪।

বলেছেন : عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرِيْضِ وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ "দুর্বল, অসুস্থ এবং যারা অসমর্থ, তাদের জন্য জিহাদ ফরয নয়।"

সমস্ত যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাগিদ দিতেন যে, কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করো না। একবার তিনি একটি স্ত্রীলোককে নিহত দেখতে পান (যাকে ভুলবশত হত্যা করা হয়েছিল) এবং বলেন, এ তো হত্যা করার উপযুক্ত ছিল না।

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা জিহাদকে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং মর্যাদাপূর্ণ আমল মনে করি। আমরা মহিলারা কি এতে অংশগ্রহণ করতে পারি না ? তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের জিহাদ তো কবূলযোগ্য হজ্জ।

মহিলাদের জন্য প্রকৃত নির্দেশ তো, নিজেদের গৃহে অবস্থান কর, বাইরে বেরিও না। (দ্র. শারহে সিয়ারুল কাবীর, ১খ. পৃ. ৯২)।

এ জন্যেই নবী করীম (সা) মহিলাদের নামাযের জামাআতে উপস্থিত হওয়াটাও পসন্দ করতেন না। আর আতর ইত্যাদি সুগন্ধি লাগিয়ে এবং উত্তম পোশাক পরিধান করে মসজিদে আসতে সরাসরি বারণ করে দিয়েছেন। তিনি উঠানের পরিবর্তে গৃহে এবং গৃহের পরিবর্তে প্রকোষ্ঠে নামায আদায়কে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই শরীয়ত যেহেতু নামাযের কাতারে মহিলাদের উপস্থিত হওয়াকেই অপসন্দ করেছে, সেখানে বিনা প্রয়োজনে যুদ্ধের কাতারে তাদের উপস্থিতি কি করে পসন্দ করতে পারে ?

এ জন্যে প্রাচীন ফকিহগণ এ রায় দিয়েছেন যে, নামাযের জামাআতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি অপসন্দনীয়। বরং মুজাহিদগণকে সাহায্য-সহযোগিতা, অসুস্থ ও আহতদের দেখাশোনার উদ্দেশ্যে কেবল ঐ মহিলাদের অংশগ্রহণ জায়েয যাদের কারণে ফিতনার সৃষ্টি না হয়, অর্থাৎ বয়স্কা মহিলা। তাও এ শর্তে যে, তাদের সঙ্গে তাদের স্বামী অথবা মুহরিম পুরুষ থাকবে। যেমনটি হাদীসে এসেছে যে, স্বামী অথবা কোন মুহরিম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া মহিলাদের জন্য হজ্জ অথবা অন্য কোন ধরনের সফর জায়েয নেই। এ কারণে কতিপয় ফকীহের বক্তব্য হলো, যে স্ত্রীলোকের উপর শরীয়তের শর্তানুসারে হজ্জ ফরয হয়েছে, অথচ তার স্বামী কিংবা কোন মুহরিম আত্মীয় নেই, তার বিয়ে করা ওয়াজিব, যাতে সে স্বামীসহ হজ্জ আদায় করতে যেতে পারে এবং তাকে মুহরিম পুরুষ আত্মীয় ছাড়া সফর করতে না হয়।

মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মহিলাদের আগমন এ শর্তে জায়েয যে, তাতে কোন ফিতনার সৃষ্টি হবে না, অন্যথায় তা নাজায়েয এবং হারাম।

একইভাবে হাসপাতালসমূহে মহিলাদের পরপুরুষের সেবাযত্ন করাও নিঃসন্দেহে হারাম। হে আমার বন্ধুগণ, বিদ্যমান সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি দিও না। বিদ্যমান এ

সংস্কৃতি তো প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ এবং শয়তানী উপভোগ্য বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। আর হযরত নবী (আ)-গণের শরীয়ত তো ক্ষমা ও নিষ্কলুষ পবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা যাকে জ্ঞান দিয়েছেন, সে তো ক্ষমা এবং প্রবৃত্তির লালসার পার্থক্য বুঝতে পারবে আর যে প্রবৃত্তি এবং শয়তানের দাসে পরিণত হয়েছে, তাকে বলাটাই বৃথা, তার কাছে তো বিয়ে এবং ব্যভিচারের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহু আকবর, কেমন সময় এসে পড়ল যে, পবিত্র শরীয়তের ক্ষমা ও নিষ্কলুষতার প্রতি যখন মানুষকে আহ্বান করা হয়, তখন এ প্রবৃত্তি পূজারীরা তাতে ছিদ্রান্বেষণ করে।

উহুদের শহীদদের কাফন-দাফন

এ যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন, যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন আনসার। সরঞ্জামের অপ্রতুলতা এতই প্রকট ছিল যে, কাফনের জন্য চাদরও পুরোপুরি ছিল না। সুতরাং হযরত মুসআব ইবন উমায়র (রা)-এর বেলায় এ ঘটনা ঘটেছিল, তাঁর কাফনের চাদর এতটা ছোট ছিল যে, পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়ত, আর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা) বললেন, তার মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে দাও এবং পা ইযখির (এক প্রকার ঘাস) দ্বারা ঢেকে দাও। (সহীহ্ বুখারী, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়)

আর একই ঘটনা সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা)-এর বেলায়ও ঘটেছিল। যেমনটি মুজামে তাবারানী হযরত আবূ উসায়দ (রা) সূত্রে এবং মুস্তাদরাকে হাকিম হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাবারানীর সনদের সকল বর্ণনাকারীই বিশ্বস্ত।

আর কারো কারো ভাগ্যে তাও জোটেনি, দু'-দু'জনকে একই চাদরে কাফন দেয়া হয়েছে এবং দু' অথবা তিনজনকে[১] একই কবরে দাফন করা হয়েছে। দাফনকালে জিজ্ঞেস করতেন এদের মধ্যে বেশি পরিমাণে কুরআন কার মুখস্থ ছিল ? যার দিকে ইশারা করা হতো, তাকেই প্রথমে কিবলামুখী করে কবরে রাখা হতো। আর তিনি বলতেন, انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة "কিয়ামতের দিন আমি এ লোকদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেব।" এবং তিনি নির্দেশ দেন যে, এদেরকে গোসল ছাড়াই রক্তাপ্লুত অবস্থায় দাফন কর। (সহীহ্ বুখারী, জানাযা অধ্যায়)।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়ান নি। অথচ প্রত্যেক সীরাত বিশেষজ্ঞই এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। এর সমর্থনে অনেক হাদীসও বিদ্যমান। হাফিয আলাউদ্দীন

১. তিন-তিনজন বাক্যটি সহীহ বুখারীতে নেই, বরং সুনানের বর্ণনায় তাই রয়েছে যা ইমাম তিরমিযী সহীহ বলেছেন। ফাতহুল বারী, ৩খ. পৃ. ১৬৯, জানাযা অধ্যায়।

মুগালতাঈ তাঁর সীরাত গ্রন্থে আলিমদের ঐক্যমত্যের[১] উল্লেখ করেছেন। অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণের জন্য হাদীসের কিতাবসমূহ দেখা যেতে পারে।

কেউ কেউ এ ইচ্ছা করেছিলেন যে, আপন প্রিয়জনকে মদীনায় নিয়ে গিয়ে দাফন করবেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেন এবং নির্দেশ দেন, যে যেখানে শহীদ হয়েছে, সেখানেই দাফন করা হোক। (ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৯১)

শহীদ সম্প্রদায়

উহুদ যুদ্ধের দিন কুযমান নামক জনৈক ব্যক্তি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তেজোদীপ্তভাবে যুদ্ধ করে। সে একাই সাত কিংবা আটজন মুশরিককে হত্যা করে এবং পরিশেষে নিজে আহত হয়। যখন তাকে উঠিয়ে ঘরে আনা হয়, তখন কোন কোন সাহাবী তাকে বললেন, والله لقد ابليت اليوم ياقزمان فابشر "আল্লাহর কসম, ওহে কুযমান, আজকের দিনে তুমি বড়ই কৃর্তিত্ব দেখিয়েছ, তোমার জন্য সুসংবাদ।" কুযমান জবাব দিল, اذا ابشر فوالله ان قاتلت الا عن احساب قومى ولولا ذالك ما قاتلت "তোমরা আমাকে কি জন্য সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দিচ্ছ, আল্লাহর কসম, আমি তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য যুদ্ধ করিনি, আমি কেবল নিজের গোত্রের সম্মানকে সমীহ করে তাকে রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করেছি, আর এ লক্ষ্য সামনে না থাকলে আমি যুদ্ধই করতাম না।"

এরপর আঘাতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেলে সে আত্মহত্যা করে বসল। ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বুখারী এবং ফাতহুল বারীর উদ্ধৃতিসহ জিহাদ অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : এ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক ছিল, মুসলমানদের সাথে মিশে সে যে বীরত্ব দেখিয়েছে, তা কেবল নিজ গোত্র এবং দেশের প্রতি সহমর্মিতার কারণেই ছিল। আর এতে সে মারা যায়। এ প্রেক্ষিতে নবী করীম (সা) বলেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। আল্লাহর নিকট শহীদ তারাই, যারা আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে জিহাদ করে। আর যে ব্যক্তি নিজ গোত্র বা দেশের জন্য যুদ্ধ করে জীবন দান করে, যুগের পরিভাষায় তাকে ঐ জাতির শহীদ বলা যায়, কিন্তু ইসলামের শহীদ সে নয়। এই কুযমানের বিস্তারিত ঘটনা এ অধ্যায়ের শুরুতে জিহাদের তাৎপর্য শিরোনামের অধীনে বলা হয়েছে। সেখানে দেখে নিতে পারেন।

---

১. সুতরাং বর্ণিত হাফিয সাহেব الصلاة على الشهداء من غير غسل এ প্রসঙ্গে বলেন : وصلى على زة والشهداء من غير غسل وهذا اجماع الا شذبه بعض التابعين قال السهيلى لم يرو عنه ﷺ انه صلى على شهيد فى شئى من مغازيه الاف هذه وفيه التظر لما ذكره النسائى من انه صلى على اعرابى فى غزوة اخرى সীরাতে মুগালতাঈ, পৃ. ৫০।

সতর্ক বাণী : আল্লামা ইবন কাসীর বলেন, এ ধরনের একটি ঘটনা খায়বর যুদ্ধেও সংঘটিত হয়েছে, যা ইনশা আল্লাহ সামনে আসবে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৩৬)

রহস্য এবং কৌশল

আল্লাহ তা'আলা وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ থেকে ষাটটি আয়াত নাযিল করেছেন, যার মধ্যে কিছু আয়াতে মুসলমানদের পরাজয় এবং এর কারণ, রহস্য এবং কৌশলের প্রতিও ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা সংক্ষেপে পাঠকদের উদ্দেশ্যে পেশ করা হলো।

১. যাতে বুঝতে পারে, পয়গম্বেরের নির্দেশ অমান্য করলে, উদ্দীপনা হারিয়ে ফেললে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করলে পরিণাম কি দাঁড়ায়।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

"আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস, তা তোমাদেরকে দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাচ্ছিল এবং কতক পরকাল চাচ্ছিল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫২)

২. যাতে কাঁচা এবং পাকা, সত্য এবং মিথ্যা পরীক্ষিত হয়ে যায় ও নিষ্ঠাবান এবং মুনাফিক, সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীর নিষ্ঠা এবং কপটতা, সত্য এবং মিথ্যা এভাবে প্রকটরূপে প্রকাশ পায় যাতে কোন প্রকার সংশয় অবশিষ্ট না থাকে।

আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে যদিও পূর্ব থেকেই একনিষ্ঠ মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য চিহ্নিত ছিল, কিন্তু আল্লাহর নিয়ম এটাই যে, কেবল তাঁরই জানার ভিত্তিতে কাউকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হয় না। যে বিষয় আল্লাহর জ্ঞানে লুক্কায়িত আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা অনুভূত ও প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এতে সওয়াব কিংবা আযাব প্রযোজ্য হয় না।

درمحبت هركه او دعوى كند * صد هزاران امتحان بردى تند
گبود صادق كشد بار جفا * دربود كاذب گريز وازبلا
عاشقان رادرد دل بسيارمى بايد كيد * جوريار وغصه اغيار مى بايد كشيد

৩. আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ ভালবাসার পাত্র, একনিষ্ঠ, তাঁর দর্শন লাভে উন্মুখ ব্যক্তি আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মত বিশাল নিয়ামত ও সর্বোৎকৃষ্ট বাসনা পূরণ করে ধন্য হতে পারেন; যার আগ্রহ তারা পূর্বেই পোষণ করতেন। আর বদর যুদ্ধে তারা মুশরিক বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ এ জন্যেই গ্রহণ করেছিলেন যে, আগামী বছরে আমাদের মধ্য থেকে সত্তর ব্যক্তি শাহাদত লাভে ধন্য হবেন। এ বিষয়ে ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে। এ নিয়ামত আল্লাহ্ তা'আলা আপন বন্ধুদেরকেই দান করেন, যালিম এবং ফাসিকদেরকে নয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ·

"যাতে আল্লাহ্ মু'মিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ যালিমদেরকে পসন্দ করেন না।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪০)

৪. আর যাতে মুসলমানগণ এ শাহাদত ও বিপর্যয়ের মাধ্যমে গুনাহসমূহ থেকে পাক-পবিত্র হতে পারেন এবং যে পাপ তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, এ শাহাদতের বদৌলতে তা মাফ হয়ে যায়।

৫. আর যাতে এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। এ জন্যে যে, যখন আল্লাহর বন্ধু, নিঃস্বার্থ ভালবাসার পাত্রদের এভাবে রক্তপাত ঘটানো হয়, তখন আল্লাহর সম্ভ্রমবোধে আঘাত লাগে এবং আল্লাহর বন্ধুদের রক্ত বিচিত্র রং ধারন করে, যার পরিণাম এই হয় যে, যে আল্লাহর দুশমনেরা আল্লাহর বন্ধুদের রক্তপাত ঘটিয়েছে, তারা আশ্চর্যজনকভাবে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

ديدى كه خون ناحق پروانه شمع را * چند ان امان نداد كه شب راسحر كند

যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ·

"এবং যাতে আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪১)

৬. যাতে বুঝা যায়, আল্লাহর নিয়ম এটাই যে, ভালমন্দ পরস্পরের মধ্যে ঘূর্ণায়মান, কখনো তিনি বন্ধুদেরকে বিজয় দান করেন আর কখনো দুশমনদেরকে প্রাধান্য দান করেন। যেমন :

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ·

"আর মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির আমি পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটাই।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪০)

কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় বন্ধুদের পক্ষেই থেকে যায়। وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (এবং পরিণাম ফল মুত্তাকীদের জন্য) এ জন্যে যে, সব সময় যদি ঈমানদারগণই বিজয়ী হতে থাকেন, তাহলে অনেক লোক কেবল কপটভাবে ইসলামের গণ্ডিভুক্ত হবে। ফলে মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য থাকবে না। আর এটা বুঝা যাবে না যে, এদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র খাস বান্দা আর কে দীনার ও দিরহামের দাস।

আর যদি ঈমানদারগণ সব সময় পরাজিত হতেই থাকেন, তা হলে উত্থানের উদ্দেশ্য (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালেমাকে বুলন্দ করা) অর্জিত হবে না। এ জন্যে আল্লাহ্‌র কৌশল এভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, কখনো সাহায্য এবং বিজয় দেয়া হবে আর কখনো পরাজিত ও বিপর্যস্ত করা হবে, যাতে আসল ও মেকীর পরীক্ষা হয়ে যায়। আল্লাহ্ বলেন :

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ·

"অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, আল্লাহ্ মুমিনদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না এবং যাতে শেষ পর্যন্ত আধিপত্য ও বিজয় অর্জিত হয়। ।" (সূরা আলে ইমরান : ১৭৯)

৭. অধিকন্তু যদি সব সময় বন্ধুদেরই বিজয় অর্জিত হতে থাকে এবং সমস্ত যুদ্ধে সৌভাগ্য এবং সাফল্য তাদেরই সহগামী হয়, তা হলে এ সন্দেহও দেখা দিতে পারে যে, বন্ধুদের পাক-পবিত্র আত্মা ঔদ্ধত্য-অহংকার, আলস্য ও অবহেলায় নিমগ্ন[১] হয়ে না যায়। এ জন্যে উপযুক্ত এটাই যে, কখনো আরাম এবং প্রশান্তিআর কখনো কষ্ট এবং যন্ত্রণা, কখনো কঠোর, কখনো কোমল, কখনো বিতৃতি, কখনো সংকোচন।

چونکه قبضی ایدت ای راهرو * ان صلاح تست آیس دل مشو

چونکه قبض آمدتو دردی بسط بین * تازه باش وچین می فکن بر جبین

৮. আর যাতে পরাজিত হয়ে পরাজয়ের গ্লানিসহ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ভীতি ও কাতরতার সাথে, কাকুতি-মিনতি সহকারে দীনহীনভাবে প্রত্যাবর্তন করে। ফলে এ সময় আল্লাহ্‌র দরবার হতে সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হয়। কেননা সম্মাননা ও সাহায্যের উপহার অপদস্থ ও কাতরতার পরই অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন : وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ "আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহই তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১২৩)

---

১. নিঃসন্দেহে নবী (আ)-গণের পর শ্রেষ্ঠতম মানব হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি উর্ধ্বতন সাহাবায়ে কিরাম এবং বদর যোদ্ধাদের কেন মর্যাদা দিচ্ছেন না ? তখন তিনি বললেন, আমি চাই যে, পৃথিবী যেন এ মহাত্মাগণকে পঙ্কিল ও ময়লাযুক্ত না করে ফেলে। সম্ভবত এ রিওয়ায়াতটি হিলয়াতুল আউলিয়া অথবা অন্য কোন কিতাবে আছে। এক্ষণে আমার মনে আসছে না। আল্লাহ ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَيَوْمَا حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ‏.

"এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্যে, কিন্তু তা তোমাদের কোনই কাজে আসেনি।" (সূরা তাওবা : ২৫)

আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বিশিষ্ট বান্দাকে সম্মান অথবা বিজয় কিংবা সাহায্য করতে চান, তখন প্রথমে তাকে অপদস্থতা, অমর্যাদা, অক্ষমতা এবং কাতরতায় নিমজ্জিত করেন, যাতে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং অহমিকা ও আত্মগর্বের অলীক বিশ্বাস মূলশুদ্ধো দূরীভূত হয়। এভাবে তিনি অপদস্থতার পর সম্মান, বিপর্যয় ও পরাজয়ের পর বিজয় ও সাহায্য এবং ধ্বংসের পর অস্তিত্ব দান করেন।

আরিফ রূমী বলেন :

بس زیادتها دردن نقصهاست * مرشهیدان راحیات اندر فناست

مرده شوتا مخرج الحی الصمد * زنده زین مرده بیرون آورد

آن کی راکه چنین شاهی کشد * سوئ تخت وبهترین جاهی کشد

نیم جان بتاند وصد جان دهد * آنچه دردهمت نیاید آن دهد

৯. আর যাতে বুঝা যায় যে, বিপুল অধ্যাবসায় এবং পরিপূর্ণ সাধনা ছাড়া সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদা লাভের ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল করে নেয়া সমীচীন নয়। যেমন আল্লাহ বলেন :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ‏.

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনো পরীক্ষার মাধ্যমে জানার ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি ? (সূরা আলে ইমরান : ১৪২)

১০. যাতে তোমাদের পবিত্র আত্মাসমূহ পৃথিবীর নোংরামী থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে আর কখনো পার্থিব হালাল বস্তু (অর্থাৎ মালে গনীমত) অর্জন সম্পর্কে অন্তরে বিন্দুমাত্র চিন্তাও না করে। বরং খেয়াল করবেন যে, আমরা রাসূলের কথার বিরুদ্ধে গনীমতের মাল দেখে পাহাড় থেকে কেন নিচে অবতরণ করলাম। (আল্লাহ তা'আলা বলেন,) আমি তোমাদের এ বিজয়কে এ জন্যে পরাজয়ে পরিবর্তন করে দিলাম, যাতে তোমাদের অন্তর ভবিষ্যতের জন্য পার্থিব হালাল মালের (মালে গনীমত) প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকেও পাক-পবিত্র হয়ে যায় এবং এ নশ্বর জগতের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব তোমাদের কাছে একইরূপ হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلاَ تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا اَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

"ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৩)

অর্থাৎ এ সাময়িক বিপর্যয় এবং পরাজয় বরণে আমার এক কৌশল ও সিদ্ধান্ত এই যে, যাতে তোমরা চেষ্টা-সাধনা এবং ধৈর্যের ঐ উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হও, যেখানে থেকে পার্থিব বিষয়াদির অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব একইরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِيْ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ - لِّكَيْلاَ تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوْا بِمَا اٰتٰكُمْ وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ .

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, আমি তা সংঘটিত করবার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। এটা এ জন্যে যে, তোমরা যা হারিয়েছ, তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, তজ্জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পসন্দ করেন না ঔদ্ধত্য ও অহংকারীদেরকে।" (সূরা হাদীদ : ২২-২৩)

পার্থিব বস্তুর আগমনে অন্তরে আনন্দবোধ না করা এবং পার্থিব বস্তুর বিদায়ে অন্তরে দুঃখবোধ না করা, এটা বৈরাগ্যবাদ এবং ধৈর্যের উন্নততর স্তর। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, উহুদ যুদ্ধে বিজয়কে পরাজয়ে পরিবর্তিত করে দিয়ে সাহাবায়ে কিরামকে চিন্তায় নিমগ্ন করেন। এতে আল্লাহর এ কৌশল কাজ করেছিল যে, ভবিষ্যতে পার্থিব বস্তু হারানোর ফলে সাহাবায়ে কিরাম যেন কোন দুঃখবোধ না করেন এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব তাদের দৃষ্টিতে সমান হয়ে যায় এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর সিদ্ধান্তে রাযী-খুশি থাকেন, মুনাফিক এবং জাহিলদের মত আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ না করেন যে, আল্লাহ কেন আমাদেরকে সাহায্য করলেন না। আল্লাহর প্রিয় একনিষ্ঠ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য তো এটাই হওয়া উচিত যে,

زنده كنى عطائ تو * دربكشى فدائ تو
جان شده مبتلائ تو * هرچه كنى رضائ تو
سپر وريم دشمن ويامى كشيم دوست * جرآت كسى كه جرح كندور قضائ ما

১১. অধিকন্তু এ ঘটনা তাঁর ওফাতের পূর্বাভাস ছিল। যদ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, যদিও এখন তোমাদের মধ্যে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিহত হওয়ার খবর শুনে মানবীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দরুন তাদের পা টলে গিয়েছিল, যদিও (আল্লাহ ক্ষমা করুন) তা তাদের ভীরুতা কিংবা মুনাফিকী ছিল না, বরং তা ছিল তাদের ঈমান, নিষ্ঠা, নবীর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ও নিবিড় সম্পর্ক থাকার কারণে এ অসহনীয় সংবাদ শুনে তাদের অন্তর তা বরদাশত করতে পারেনি। কাজেই এতে তারা এতটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, যুদ্ধের ময়দানে তাদের পা টলে গিয়েছিল। এ জন্যে আয়াত নাযিল হয় :

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

"অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫২)

কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান ও সতর্ক হয়ে যাও যে, তাঁর ওফাতের পর যেন তাঁর দীন, তাঁর সুন্নত, তাঁর প্রবর্তিত রীতি-নীতি থেকে কখনই ফিরে যাবে না। তাঁর ওফাতের পর কিছু লোক তাঁর দীন থেকে ফিরে যাবে, যদ্বারা মুরতাদী ফিতনার প্রতি ইঙ্গিত ছিল, এবং সেই সাথে এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল যে, নবী (সা)-এর তরীকার উপর বাঁচো এবং তাঁরই তরীকার ওপর মৃত্যুবরণ কর। মুহাম্মদ (সা) যদি ইনতিকাল করেন কিংবা নিহত হন, তা হলে তাঁর আল্লাহ তো জীবিত। এ প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُوْلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ۔

"মুহাম্মদ একজন রাসূলমাত্র,তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না; বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তিরোধানের পর ইয়েমেনের হামদান গোত্র যখন মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হতে শুরু করল, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন মালিক (রা) হামদান গোত্রের লোকজনকে একত্র করে এ ভাষণ দেন :

يا معشر همدان انكم لم تعبدوا محمد عليه السلام انما عبدتم رب محمد (عليه سلام) وهو الحى الذى لايموت غير انكم اطعتم رسوله بطاعة الله – واعلموا انه استنقذكم من النار ولم يكن الله ليجمع اصحابه على ضلالة الى اخير الخطبة ... ... ۔

"ওহে হামদান গোত্র, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইবাদত করতে না, বরং মুহাম্মদ (সা)-এর প্রভুর ইবাদত করতে। আর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রভু চিরঞ্জীব, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। হ্যাঁ, তোমরা আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করতে, যাতে রাসূলের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে পরিণত হয়। ভাল করে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আগুন থেকে রক্ষা করেছেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-এর সাহাবীগণকে পথভ্রষ্টতার উপর একত্র করবেন না।"...খুতবার শেষ পর্যন্ত এরপর তিনি নিম্নের কবিতা বলেন :

لعمری لئن مات النبی محمد * لما مات یا ابن القیل رب محمد

دعـاه الـیـه ربـه فـاجـابـه * فـیـاخـیـر غـوری ویـا خـیـر مـنـجـد

"আমার জীবনের শপথ, যদি নবী মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করে থাকেন, ওহে সরদার পুত্র, তা হলে তাঁর পরোয়ারদিগার জীবিত আছেন। তাঁর পরোয়াদিগার তাঁকে নিজের কাছে দাওয়াত দেন, তিনি তাঁর প্রভুর দাওয়াত কবূল করেন। সুবহানাল্লাহ্, নবী করীম (সা) প্রাসাদে এবং বস্তিতে বসবাসকাবী সবার থেকে উত্তম ছিলেন।" (ইসাবা, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মালিকের জীবন চরিত অধ্যায়, ২খ. পৃ. ৩৬৫ এবং হুসনুস সাহাবা ফী শারহে আশআরিস সাহাবা, ১খ. পৃ. ৩১২)।

সতর্ক বাণী : নবী (আ)-গণের হায়াতের ব্যাপারে নবী (সা)-এর ওফাত অধ্যায়ে ইনশা আল্লাহ্ কিছু উল্লেখ করব।

উহুদ যুদ্ধে জয়লাভের পর বিপর্যয় ঘটার দর্শন ও যৌক্তিকতার উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য

আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদামাফিক দিনের শুরুতে মুসলমানগণ কাফিরদের উপর প্রাধান্য বজায় রাখেন কিন্তু যখন তারা ঐ কেন্দ্র থেকে সরে গেলেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং গনীমতের মাল আহরণের জন্য পাহাড় থেকে নিচে নেমে এলেন, তখন যুদ্ধের পাশা উল্টে গেল এবং বিজয় পরাজয়ে পরিবর্তিত হয়ে গেল। আল্লাহ্ প্রেমিক, একনিষ্ঠ এবং আল্লাহ্র পথে প্রকৃত নিবেদিতপ্রাণ বান্দাগণের তুচ্ছ তুচ্ছ কথায়ই আল্লাহর দরবারে ধরা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এটা অপসন্দনীয় ছিল যে, নিবেদিতপ্রাণ সাহাবায়ে কিরাম (রা) আল্লাহর রাসূলের আদেশ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হবেন, যদিও তা কোন প্রকার ভুল বুঝার বা কোন ক্রুটি-বিচ্যুতির দরুনেও হয়ে যায়। অধিকন্তু এটা সত্যিকারের প্রেমিকের প্রেমের রীতি বিরুদ্ধ যে, তারা পার্থিব সম্পদ এবং গনীমতের মাল একত্র করার জন্য তারা পাহাড়ী অবস্থান থেকে অবতরণ করে যুদ্ধের ময়দানে আসবেন। যে গনীমতের মাল জমা করার জন্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) পাহাড় থেকে অবতরণ করেছিলেন, যদিও তা পৃথিবীতে আল্লাহর বাণী : فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا অনুযায়ী হালাল ও পবিত্র ছিল, কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের মত প্রকৃত আল্লাহ-প্রেমিকদের

জন্য এটা উপযুক্ত কাজ ছিল না যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ও নির্দেশ ছাড়া এ হালাল ও পবিত্র বস্তুর প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন।

موسیا آداب دانه دیگرند * سوخته جانان روانان دیکرند

আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা তাঁর প্রকৃত প্রেমিক ও একনিষ্ঠ বান্দাদের সতর্ক করার জন্য সাময়িকভাবে বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দেন; যাতে তারা সতর্ক হয়ে যান যে, গায়রুল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাত জায়েয নয়। আর সৃষ্টির সূচনায় এটা নির্ধারণ করে দেন যে, সাময়িকভাবে যদিও তারা পরাজয়বরণ করবে, কিন্তু শীঘ্রই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এর ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া হবে এবং পরবর্তীতে রোম ও পারস্য সম্রাটদের ধনভাণ্ডার তাদের হাতে দিয়ে দেয়া হবে। উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, একনিষ্ঠ প্রেমিকদের অন্তর পার্থিব হালাল বস্তুর আকর্ষণ থেকেও পবিত্র ও নিষ্কলুষ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নিরে আয়াত নাযিল করেন :

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

"আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাচ্ছিল এবং কতক পরকাল চাচ্ছিল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫২)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলে দিয়েছেন যে, একবারেই ঘটনা বিপরীতমুখী হয়ে গিয়েছিল যে, কাফির সেনারা যারা মুসলমানদের হাতে নিহত হচ্ছিল এখন তারা মুসলমানদের হত্যায় মগ্ন হয়ে পড়ল। একে তো তা এ জন্য ঘটল যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ সত্ত্বেও তা অমান্য করেছ, আর তোমাদের মধ্যকার কতিপয় ব্যক্তি ধ্বংসশীল দুনিয়ার মাল-সম্পদের (মালে গনীমত) আগ্রহ ও লোভে পাহাড়ী অবস্থান থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছ, যার খেসারত সবাইকেই দিতে হয়েছে। আর কয়েকজনের ভুলের কারণে সমগ্র ইসলামী বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। কিন্তু এরপরও মুসলমানদের থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনুগ্রহ ও কৃপাদৃষ্টি ছিন্ন হয়নি, ফলে

তিনি এ ভালবাসাসিক্ত ভর্ৎসনা সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে বারবার সান্ত্বনা দেন, তোমরা নিরাশ এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ো না, আমি তোমাদের ভ্রান্তি সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিয়েছি। সুতরাং তিনি ক্ষমার ঘোষণা وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ এ আয়াতে দান করেছেন, আবার একই রুকুর শেষে মুসলমানদেরকে অতিরিক্ত সান্ত্বনা দিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমা ঘোষণা করেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَنِ اِنَّمَا اسْتَزَ لَّهُمُ الشَّيْطٰنِ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ.

"যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠ পদর্শন করেছিল, তাদির কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৫)

আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামের এ কাজকে ভ্রান্তি আখ্যায়িত করেছেন যা اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়। আর ভ্রান্তি (লাগজেশ) অর্থ এই যে, উদ্দেশ্য তো অন্যকিছু ছিল, কিন্তু ভুলভ্রান্তির কারণে অনিচ্ছায় এবং অজ্ঞাতসারে পা ফসকে পথ থেকে পড়ে গিয়েছে। ইঙ্গিত এদিকে যে, যা কিছু হয়েছে, তা ছিল ভুলক্রমে। জেনেশুনে তোমরা তা করনি, আর উত্তম, যা কিছুই তোমরা করেছ, আমি নিজ অনুগ্রহ ও সহ্যগুণে তা ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে তা অবহিত করেছি এ জন্যে যে, তোমরা হতোদ্যম, দুঃখভারাক্রান্ত ও নিরাশ হয়ে বসে পড়ো না। আর তোমাদেরকে ক্ষমা করার কথা বিশ্বব্যাপী ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান কিভাবে রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণের উপর বিতৃত হয় এবং কিভাবে তাদের ক্ষণে ক্ষণে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যাতে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য না করতে পারে। কেননা যাদেরকে আল্লাহ স্বয়ং ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তা হলে এখন আর কেউ তাদেরকে মাফ করুক বা না করুক, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোক বা না হোক, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও সন্তুষ্টির পর আর কারো ক্ষমা ও সন্তুষ্টির কোনই প্রয়োজন নেই। রাদি আল্লাহ তা'আলা আনহুম ওয়া রাদূ আনহু।

বদর যুদ্ধে মুক্তিপণ গ্রহণের ফলে যে অসন্তুষ্টির আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, তার কারণও এটাই ছিল যে, আল্লাহর দুশমনদেরকে নিধন ও ধ্বংস করার পরিবর্তে অর্থ-সম্পদকে কেন অগ্রাধিকার দেয়া হলো ?

একইভাবে উহুদ যুদ্ধে তুচ্ছ ধন-সম্পদের (মালে গনীমত) প্রতি আগ্রহের কারণে এ শাস্তি দেয়া হয় এবং পরে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়।

উহুদ যুদ্ধে জয়লাভের পর বিপর্যয় ঘটার দর্শন ও যৌক্তিকতা বর্ণনার পর

আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী নবী (আ)-গণের সাহাবীদের কার্যক্রম বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর পথে তাঁদের প্রতি নানা ধরনের কষ্ট এবং নানা প্রকার বিপদাপদ এসেছে, কিন্তু তারা না সাহস হারিয়েছেন, আর না শত্রুর মুকাবিলায় অসমর্থ হয়েছেন; বরং অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদে অবস্থান নিয়েছেন।

কিন্তু এ সময় তাঁরা নিজেদের বীরত্ব, শক্তি, সাহস, ধৈর্য ও অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করেননি; বরং দৃষ্টি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিই রেখেছেন এবং সব সময় নিজেদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও অবিচল থাকার জন্য প্রার্থনা করতে থাকতেন। আল্লাহ্ তা'আলাও তাদেরকে পৃথিবী ও আখিরাতে আপন অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ. فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"এবং কত নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা ছিল। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। এ কথা ছাড়া তাদের আর কোন কথা ছিল না, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬-১৪৮)

হামরাউল আসাদ যুদ্ধ (১৬ই শাওয়াল, রোববার, তৃতীয় হিজরী)

কুরায়শগণ যখন উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করতে থাকে এবং মদীনা থেকে যাত্রা করে রাওহা নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করে, তখন তাদের এ ধারণা হলো যে, কাজ তো অসম্পূর্ণই থেকে গেল। যখন আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর অনেক সাহাবীকে হত্যা করেছি এবং কয়েক শতকে আহত করেছি, তখন উত্তম কাজ এটাই হবে যে, ফিরে গিয়ে দ্বিতীয়বার মদীনা আক্রমণ করি। এ সময়ে মুসলমানগণ সম্পূর্ণ ক্লান্ত ও আহত, কাজেই তারা মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। সাফওয়ান ইবন উমায়্যা বলল, তার চেয়ে উত্তম এটাই হবে যে, তোমরা মক্কায় ফিরে চল।

মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গিগণ পরিপূর্ণ উৎসাহের সাথে আছেন, সম্ভবত দ্বিতীয়বার আক্রমণে তোমরা সফলকাম হতে পারবে না।

১৫ই শাওয়াল, শনিবার রাতে কুরায়শ বাহিনী রাওহায় পৌঁছে এবং রোববার রাতে এ কথাবার্তা হয়। রোববারের এ রাত তখনো বাকী ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংবাদদাতা সুবহে সাদিকের প্রাক্কালে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করে। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত বিলাল (রা)-কে দিয়ে সমগ্র মদীনায় ঘোষণা করিয়ে দেন যে, যারা উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, কেবল তারাই পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। বোনদের দেখাশোনার দরুন আমি উহুদে অংশগ্রহণ করতে পারিনি, এবারে আমি আপনার সাথে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করছি। তিনি তাকে অনুমতি দান করলেন। এ অভিযানে নবীজীর উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল যে, দুশমন যেন এ ধারণা করতে না পারে যে, মুসলমানগণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। যদিও মসলমানগণ পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং একটি রাতও আরাম করতে পারেননি, তবুও একবার ঘোষণা শোনামাত্র পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

رشته در گردنم افگنده دوست * می بردهر جاکه خاطر خواه اوست

১৬ই শাওয়াল রোববার মদীনা থেকে যাত্রা করে তিনি হামরাউল আসাদ নামক স্থানে অবস্থান নিলেন, যা মদীনা থেকে প্রায় আট-দশ মাইল দূরে ছিল। তিনি হামরাউল আসাদে অবস্থানরত ছিলেন, এ সময়ে খুযাআ গোত্রের সর্দার মা'বাদ খুযাঈ উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের খবর শুনে সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর ঐ সাহাবিগণের জন্য শোক প্রকাশ করেন যারা উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। মা'বাদ নবীজীর খিদমত থেকে বিদায় নিয়ে আবূ সুফিয়ানের সাথে মিলিত হলেন। আবূ সুফিয়ান নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করল যে, আমার ইচ্ছা এই যে, দ্বিতীয়বার মদীনায় আক্রমণ করা হোক। মা'বাদ বললেন, মুহাম্মদ (সা) তো বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমাদের মুকাবিলা ও প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। আবূ সুফিয়ান তা শোনামাত্র মক্কায় ফিরে চলল। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে তিনদিন অবস্থান করে শুক্রবারে মদীনায় ফিরে এলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ

"যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" (সূরা আলে ইমরান : ১৭২)

(ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৮৭, আলস্নাহ তা'আলার বাণী الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ অধ্যায়; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৪৮; যারকানী, ২খ. পৃ. ৫৯)।

বিভিন্ন ঘটনাবলী (তৃতীয় হিজরী)

১. এ বছরেই রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমর (রা)-এর কন্যা হযরত হাফসা (রা)-কে শাবান মাসে বিয়ে করেন।[১]

২. এ বছরেই ১৫ই রমযান হযরত ইমাম হাসান (রা) জন্মগ্রহণ করেন এবং এর পঞ্চাশ দিন পর হযরত সায়্যিদা ফাতিমা (রা) ইমাম হুসায়ন (রা)-কে গর্ভে ধারণ করেন।[২]

৩. এ বছরেই শাওয়াল মাসে মদ্যপান নিষিদ্ধের আদেশ নাযিল হয়।[৩]

হযরত আবূ সালমা আবদুল্লাহ ইবন আবদুল আসাদ (রা)-এর অভিযান (চতুর্থ হিজরী)

চতুর্থ হিজরীর পয়লা মুহররম নবী (সা) এ সংবাদ পেলেন যে, খুয়ায়লিদের পুত্র তুলায়হা[৪] এবং সালমা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মুকাবিলা করার জন্য লোকজনকে একত্রিত করছে। তখন তিনি হযরত আবূ সালমা আবদুল্লাহ ইবন আবদুল আসাদ (রা)-কে একশত পঞ্চাশজন মুহাজির এবং আনসারসহ তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ওরা এ সংবাদ পাওয়ামাত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মুসলমানগণ গনীমত হিসেবে প্রচুর পরিমাণে উট ও বকরি নিয়ে ফিরে আসেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে গনীমতের মাল বন্টন করা হয়। এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার পরও প্রত্যেকের অংশে সাত-সাতটি করে উট ও বকরি পড়ে।[৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা)-এর অভিযান

পাঁচই মুহররম, সোমবার তিনি এ সংবাদ পান যে, খালিদ ইবন সুফিয়ান হুযালী

১. তাবারী, ৩খ. পৃ. ২৯।

২ প্রাগুক্ত।

৩. যারকানী, ৩খ. পৃ. ৬১।

৪. তুলায়হা ইবন খুয়ায়লিদ পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এ ইনতিকালের পর ধর্ম ত্যাগ করে এবং নিজেই নুবূওয়াত দাবি করেন। হযরত আবূ বকর (রা) তার মুকাবিলা করার জন্য হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে প্রেরণ করেন। তুলায়হা পলায়ন করে সিরিয়া চলে যান এবং তওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে মুসলমানদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে কাদিসিয়া এবং নিহাওয়ান্দের যুদ্ধেও শরীক হন। বলা হয় যে, ২১ হিজরীতে নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তুলায়হার অপর ভাই সালমা মুসলমান হয় নি। যারকানী, ৩খ. পৃ. ৬৩।

৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৬১।

লিহয়ানী তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী সংগঠিত করছে। তিনি তাকে হত্যা করার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স আনসারী (রা)-কে প্রেরণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা) গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং আলোচনার অজুহাতে সুযোগ বুঝে এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করেন। আর তার মাথাটি নিয়ে এক গর্তে লুকিয়ে পড়েন। মাকড়সা গর্তটির মুখে জাল তৈরি করে। লোকজন তাকে খুঁজতে এসে গর্তের মুখে মাকড়সার জাল দেখে ফিরে যায়। এরপর হযরত আবদুল্লাহ (রা) গর্ত থেকে বের হন এবং রাত্রিকালে পথ চলতেন ও দিবাভাগে লুকিয়ে থাকতেন। এভাবে তিনি ২৩শে মুহররম মদীনায় উপস্থিত হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে খালিদের মাথা রেখে দেন। এতে তিনি খুবই খুশি হন এবং তাকে একটি ছড়ি উপহার দেন আর বলেন : تَخَصَّرْ بِهٰذِهٖ فِى الْجَنَّةِ فَاِنَّ الْمُتَخَصِّرْ فِى الْجَنَّةِ قَلِيْلَ "এ ছড়ি নিয়ে তুমি জান্নাতে চলাফেরা করবে আর জান্নাতে ছড়ি নিয়ে চলাফেরাকারীর সংখ্যা খুব সামান্যই হবে।"

তিনি আরো বলেন, এটা তোমার ও আমার মধ্যে কিয়ামতের দিনের একটি নিদর্শন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) ছড়িটির হিফাযত করতে থাকেন। মৃত্যুকালে তিনি ওসীয়ত করেন যে, ছড়িটি আমার কাফনের মধ্যে রেখে দিও। সুতরাং তাই করা হলো।[১]

মুজামে তাবারানীর এক বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এ ব্যক্তি অপরাধী এবং বাকপটু ছিল। (মাজমুআউয যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ.২০৪, খালিদ ইবন সুফিয়ান হুযালীর হত্যা অধ্যায়)।

হযরত মূসা ইবন উকবা (রা) বলেন, লোকজন দাবি করে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা)-এর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ ইবন সুফিয়ান হুযালীর নিহত হওয়ার সংবাদ দিয়েছিলেন।[২]

রাজী'র ঘটনা

সফর মাসে আযাল ও কারা গোত্রের[৩] কতিপয় লোক নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে যে, আমাদের গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেছে। কাজেই আমাদের সাথে এমন কয়েকজন লোক দিন যারা আমাদেরকে কুরআন পড়াবে এবং ইসলামী শরীয়ত শিক্ষা দেবে। তিনি দশ ব্যক্তিকে তাদের সঙ্গে দিলেন, যাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ :

---

১. ইবন সা'দকৃত তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৩৫; যারকানী, ২খ. পৃ. ৬৩; যাদুর মা'আদ, ২খ. পৃ. ১০৯।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ৬৪।

৩. এটা ইবন সা'দের বর্ণনা। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী (সা) ঐ দশজনকে মক্কার কুরায়শদের সংবাদ গ্রহণ এবং তাদের অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। এটা আশ্চর্য নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্য এটাই ছিল, ইতোমধ্যে আযাল ও কারা গোত্র এসে পড়ার দরুন তাদেরকে দীন ও কুরআন শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করে তাঁদেরকে প্রেরণ করেন। যারকানী, ২খ. পৃ. ৬৫।

১. হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা),

২. হযরত মারসাদ ইবন আবূ মারসাদ (রা),

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন তারিক (রা),

৪. হযরত খুবায়ব ইবন আদী (রা),

৫. হযরত যায়দ ইবন দাসিনা (রা),

৬. হযরত খালিদ ইবন আবূ বুকায়র (রা),

৭. হযরত মুআত্তাব ইবন উমায়র (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবন তারিক (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। তিনি হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা)-কে তাদের নেতা নিযুক্ত করেন।[১]

এঁরা যখন রাজী' নামক স্থানে উপস্থিত হন, যা মক্কা ও উসফানের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত ছিল, ঐ প্রতারকেরা মুসলমানদের সাথে চুক্তিভঙ্গ করে এবং বনী লিহয়ানকে ইঙ্গিত দেয়। বনী লিহয়ান একশত তীরন্দাজসহ মোট দু'শত লোক নিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হয়। তারা যখন নিকটবর্তী হলো, হযরত আসিম (রা) আপন সঙ্গীদের নিয়ে একটি টিলায় আরোহণ করেন।

বনী লিহয়ান মুসলমানগণকে বলল, তোমরা নিচে নেমে এসো, আমরা তোমাদেরকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিচ্ছি। হযরত আসিম (রা) বললেন, আমি কাফিরদের আশ্রয়ে কখনো নিচে অবতরণ করব না। আর তিনি এ দু'আ করলেন : اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا رَسُوْلَكَ "আয় আল্লাহ্! তোমার পয়গাম্বরকে আমাদের অবস্থা অবহিত কর।"

এ বর্ণনা বুখারীর। আবূ দাঊদ তায়ালিসীর বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আসিম (রা)-এর দু'আ কবূল করেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি ওহীর মাধ্যমে নবী করীম (সা)-কে এ সংবাদ দেন এবং নবী (সা) সাথে সাথে তা সাহাবীগণকে অবহিত করেন।

হযরত আসিম (রা) এ সময় আর একটি দু'আ করেছিলেন যে, اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَحْمِيْ لَكَ الْيَوْمَ دِيْنَكَ فَاَحْمِ لِيْ لَحْمِي "আয় আল্লাহ, আজ আমি তোমার দীনের হিফাযত করছি, তুমি আমার মাংস অর্থাৎ দেহকে কাফিরদের থেকে হিফাযত কর।"

এরপর হযরত আসিম (রা) সাতজন সঙ্গীসহ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান।[২] হযরত আবদুল্লাহ ইবন তারিক (রা), হযরত যায়দ ইবন দাসিনা (রা)

---

১. তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৩৯।

২ যুদ্ধকালে হযরত আসিম (রা) মুখে বলছিলেন :

الموت حق والحياة باطل × وكل ماحم الا له نازل

بالمرء والمرء اليه آيا × ان لم اقاتلكم فامى هابل

ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৬১।

এবং হযরত খুবায়ব ইবন আদী (রা) এ তিনজন মুশরিকদের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা দানের ওয়াদা ও শপথের ভিত্তিতে টিলা থেকে নিচে নেমে আসেন। মুশরিকেরা তাঁদের মশকগুলো বাঁধতে শুরু করল। হযরত আবদুল্লাহ ইবন তারিক (রা) বললেন, এটা প্রথম বিশ্বাস ঘাতকতা। প্রথমেই বিশ্বাস ঘাতকতা করছ, না জানি এর পরে কি করবে, এ বলে তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করেন। মুশরিকেরা তাঁকে টেনে নিয়ে শহীদ করে ফেলল এবং হযরত খুবায়ব ও হযরত যায়দ (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে চলল। মক্কায় পৌঁছে তারা এ দু'জনকেই বিক্রি করে দিল।

সাফওয়ান ইবন উমায়্যা (যার পিতা উমায়্যা ইবন খালফ বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল) তার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হযরত যায়দ (রা)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিনে নিল। হারিস ইবন আমির বদর যুদ্ধে হযরত খুবায়ব (রা)-এর হাতে নিহত হয়েছিল। এ জন্যে হযরত খুবায়ব (রা)-কে হারিসের পুত্ররা ক্রয় করল। (বুখারী শরীফ, ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৯৩)।

সাফওয়ান তো তার বন্দীকে হত্যায় বিলম্ব করা সমীচীন মনে করল না এবং হযরত যায়দ (রা)-কে হত্যা করার জন্য স্বীয় গোলাম নিসতাসের সাথে মক্কার বাইরে তানঈমে পাঠিয়ে দিল। আর হত্যা করার তামাশা দেখার জন্য একদল কুরায়শ তানঈমে সমবেত হলো, যার মধ্যে আবূ সুফিয়ান ইবন হারবও ছিল।

হযরত যায়দ (রা)-কে যখন হত্যা করার জন্য সামনে আনা হলো, তখন আবূ সুফিয়ান বলল, ওহে যায়দ, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে যদি তোমার বদলে মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করা হয় এবং তুমি আপন গৃহে আরামে বাস করবে, এটা কি তুমি পসন্দ করবে ?

হযরত যায়দ (রা) দৃঢ়তার সাথে বললেন, আল্লাহর কসম, আমার কাছে এটাও অসহ্য যে, মুহাম্মদ (সা)-এর পায়ে কোন কাঁটা ফুটবে আর আমি আমার ঘরে বসে থাকবো।

আবূ সুফিয়ান বললেন, আল্লাহর কসম, আমি কারো প্রতি কারো এমন ভালবাসা, নিষ্ঠা, বন্ধুত্ব ও প্রাণোৎসর্গকারী দেখিনি, যেমনটি মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য তার সঙ্গীরা ভালবাসা ও আত্মত্যাগ ও উৎসর্গ করে থাকে। এরপর নিসতাস হযরত যায়দ (রা)-কে শহীদ করে।[১] পরবর্তী পর্যায়ে নিসতাস ইসলাম গ্রহণ করেন।[২]

হযরত খুবায়ব (রা) নিষিদ্ধ মাস হওয়ার কারণে তাদের বন্দিত্বে থাকেন। যখন লোকজন তাঁকে হত্যার ইচ্ছা করল, তিনি তখন হারিসের কন্যা যয়নবের কাছে (যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন) পবিত্রতা অর্জন ও পরিস্কার হওয়ার জন্য একটি ক্ষুর চাইলেন। যয়নব তাকে ক্ষুর দিয়ে নিজের কাজে মনোনিবেশ করলেন। যয়নব বলেন,

১. ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৩১।

২ ইসাবা, ৩খ. পৃ. ৫৫৩; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৭৩।

কিছুক্ষণ পর আমি দেখলাম, আমার শিশুটি তার কোলে বসে আছে আর তার হাতে ক্ষুর। এ দৃশ্য দেখে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। হযরত খুবায়ব (রা) আমাকে দেখে বললেন, তোমার কি এ সন্দেহ হয় যে, আমি এ শিশুটিকে হত্যা করব ? কক্ষণই নয়, আমার দ্বারা ইনশা আল্লাহ্ এমন কাজ কক্ষণও হবে না। আমরা প্রতারণা করি না। এ কথা যয়নব বহুবার বলেছেন :

مَا رَأَيْتُ اَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْعَةِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَانَّه لَمُوْثَقٌ فِى الْحَدِيْدِ وَمَا كَانَ الاَرْزَقُ رَزَقَه اللّٰهُ ·

"আমি খুবায়ব থেকে উত্তম কোন বন্দী দেখিনি, অবশ্যই আমি তাকে আঙুরের থোকা থেকে খেতে দেখেছি, অথচ তখন মক্কার কোথাও এ ফলের নাম-নিশানাও ছিল না। আর সে ছিল লোহার বেড়িতে বাঁধা, ফলে কোথাও গিয়ে তা আনাও সম্ভব ছিল না। তার নিকট এ রিযক কেবল আল্লাহর নিকট থেকেই আসত।"

যখন হত্যা করার জন্য তাঁকে হরম শরীফের বাইরে তানঈমে নিয়ে যাওয়া হল, তখন তিনি বললেন, আমাকে এতটুকু সময় দাও যে, দু'রাকাত নামায পড়ব। লোকেরা অনুমতি দিলে তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি এ ধারণার বশবর্তী হয়ে নামায বেশি দীর্ঘ করিনি যে, তোমরা ভাবতে পার, আমি বোধ হয় মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে এমনটি করছি। এরপর হাত তুলে এ দু'আ করলেন : اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَتُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدًا "আয় আল্লাহ্! ওদেরকে তুমি এক এক করে হত্যা করো আর কাউকে অবশিষ্ট রেখো না।" এবং এ কবিতা আবৃত্তি করলেন :

وَلَسْتُ مَا اَنَا اُبَالِىْ حِيْنَ اَقْتُلُ مُسْلِمًا * عَلَى اَىِّ شَقٍّ كَانَ اللّٰهُ مَصْرَعِى

وَذٰلِكَ فِى ذَاتِ الاِلٰه وَاِنْ يَّشَأْ * يُبَارِكَ عَلَى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ ·

"আমি মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করলে আমার কোন পরোয়া নেই, যে পার্শ্বেই আমি মৃত্যুবরণ করি না কেন, যখন খালেস আল্লাহর জন্যই কেবল আমার এ মৃত্যু হয়। ইচ্ছা করলে তিনি আমার ছিন্ন ভিন্ন দেহের জোড়ায় বরকত দিতে পারেন।"

এরপর হযরত খুবায়ব (রা)-কে শূলীতে চড়ানো হয় এবং তিনি শহীদ হয়ে যান। তিনি এ সুন্নত চালু করে যান যে, যাকে হত্যা করা হবে, সে দু'রাকাত নামায আদায় করবে।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-ও অনুরূপ ঘটনার সম্মুখীন হন। হযরত যায়দ (রা) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে একটি খচ্চর ভাড়ায় গ্রহণ করেন। খচ্চরের মালিকও সাথে আসছিল। পথিমধ্যে সে একটি নির্জন

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৬৮।

স্থানে খচ্চরকে দাঁড় করায়, যেখানে অনেক নিহত ব্যক্তির লাশ পড়েছিল, এবং সে তাঁকেও হত্যা করার ইচ্ছা করে। হযরত যায়দ (রা) বললেন, আমাকে দু'রাকাত নামায পড়ার অবকাশ দাও। লোকটি ঠাট্টাচ্ছলে বলল, হ্যাঁ, তুমিও দু'রাকাত নামায পড়ে নাও; তোমার পূর্বে এরাও নামায পড়েছিল, কিন্তু নামায তাদের কোনই উপকারে আসেনি। হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) যখন দু'রাকাত নামায আদায় করে নিলেন, তখন লোকটি তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। তাকে অগ্রসর হতে দেখে হযরত যায়দ (রা) বলেন, ইয়া আরহামার রাহিমীন (হে সর্বাধিক অনুগ্রহকারী), এদিকে হযরত যায়দের মুখে এ ইসমে আযম উচ্চারিত হলো, অন্যদিকে অদৃশ্য থেকে লোকটি এক আওয়ায শুনতে পেল, ওকে হত্যা করো না। লোকটি অদৃশ্যের এ আওয়াযে হতচকিত ও ভীত হয়ে এদিকে সেদিকে তাকাল, কিন্তু যখন কাউকে দেখতে পেল না, তখন পুনরায় সেই অসৎ উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো। হযরত যায়দ (রা) পুনরায় ইয়া আরহামার রাহিমীন বললেন। লোকটি আবার সেই অদৃশ্য আওয়ায শুনতে পেল এবং পেছনে সরে গেল। তারপর আবার সামনে অগ্রসর হলো। তিনি আবার ইয়া আরহামার রাহিমীন বললেন। তৃতীয়বার ইয়া আরহামার রাহিমীন বলার অপেক্ষামাত্র ছিল, দেখলেন বর্শা হাতে একজন অশ্বারোহী, যার বর্শার অগ্রভাগ থেকে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ বের হচ্ছে, সেই বর্শা দ্বারা লোকটিকে আঘাত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেল ও লোকটি মৃত অবস্থায় তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে গেল।

এরপর সেই অশ্বারোহী বললেন, যখন তুমি প্রথমবার ইয়া আরহামার রাহিমীন বললে, তখন আমি সপ্তম আসমানে ছিলাম, দ্বিতীয়বার বলার সময় আমি ছিলাম পৃথিবীর আসমানে এবং যখন তৃতীয়বার বললে, তখন আমি তোমার কাছে এসে উপস্থিত হলাম।

এ বর্ণনাটি আল্লামা সুহায়লী নিজ সনদে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় ঘটেছিল।[১]

মুস্তাদরাকে হাকিমে হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফিরিশতা নির্দিষ্ট করা আছে, যে কেউ তিনবার ইয়া আরহামার রাহিমীন বলবে, ঐ ফেরেশতা বলেন, অনুগ্রহ তোমার প্রতি ফিরে এসেছে, কাজেই আরো প্রার্থনা কর, আরো চাও।

একই ধরনের ঘটনা হযরত আবূ মুয়াল্লাক আনসারী (রা)-এর জীবনেও ঘটেছিল। যেমন হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) এবং হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবূ মুয়াল্লাক আনসারী (রা) ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবান ইবাদতকারী, মুত্তাকী ও পরহেযগার। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা উপলক্ষে ভ্রমণ করতেন। একবার ভ্রমণকালে তিনি

১. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১৭১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ার ফুটনোট, ৪খ. পৃ. ৬৫।

একটি চোরের কবলে পড়েন, যে ছিল তীর-তরবারি ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সে বলল, তোমার মাল-সামান এখানে রেখে দাও, আমি তোমাকে হত্যা করব।

হযরত আবূ মুয়াল্লাক আনসারী (রা) বললেন, তোমার তো ধন-সম্পদের প্রয়োজন, যা এখানে মজুদ আছে, আমার জীবনের কি প্রয়োজন ? চোর বলল, না, তোমার জীবনটাই আমার প্রয়োজন। তিনি বললেন, আচ্ছা, আমাকে এতটুকু অবকাশ দাও যে, আমি নামায আদায় করে নিই। চোর বলল, হ্যাঁ, যতটা ইচ্ছা, নামায পড়ে নাও। হযরত আবূ মুয়াল্লাক (রা) উযূ করে নামায আদায় করলেন এবং নামায শেষে তিনি এ প্রার্থনা করলেন :

يَاوَدُوْدَ يَاذَ الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ يَا فَعَّالَ لِمَا تُرِيْدُ اَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ الَّتِى لاَ تُرَامُ وَمُلْكِكَ الَّذِىْ لاَيُضَاءُ وَبِنُوْرِكَ الَّذِىْ مَلاَءُ اَرْكَانَ عَرْشِكَ اَنْ تَكْفِيَنِىْ شَر هذَا الدَّصُّ يَامُغَيْثَ اَغِثْنِىْ .

তিনবার এ দু'আ পাঠ করলেন। তিনি দেখলেন, এক অশ্বারোহী বর্শা হাতে চোরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বর্শার আঘাতে চোরের দফারফা করে ফেললেন। এরপর তাঁর দিকে ফিরে বললেন, তুমি কে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার ফরিয়াদ পূরণ এবং সাহায্য করার জন্য প্রেরণ করেছেন। আমি চতুর্থ আসমানের ফেরেশতা, যখন তুমি প্রথমবার এ দু'আ পাঠ কর, তখন আমি আসমানের দরজার কড়া নাড়ার শব্দ পাই। তোমার দ্বিতীয়বারের প্রার্থনায় আমি আসমানবাসীদের চিৎকার এবং ডাকাডাকি শুনতে পাই। যখন তুমি তৃতীয়বার প্রার্থনা করলে, তখন বলা হলো, এটা কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তির ফরিয়াদ। তখন আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন করি, আমাকে ঐ যালিমকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হোক। এরপর তিনি বললেন, তোমার জন্য সুসংবাদ, এটা মনে রাখবে, যে ব্যক্তি উযূ করে চার রাকাত নামায আদায় করবে এবং এ দু'আ করবে, তার দু'আ কবূল করা হবে, চাই সে যতই কষ্টে কিংবা অস্থিরতায় নিপতিত হোক। (ইসাবা, ৪খ. পৃ. ১৮২, আল-কিনা অধ্যায়, হযরত আবূ মুয়াল্লাক আনসারী রা-এর জীবন চরিত)।

উহুদ যুদ্ধে হযরত আসিম (রা) সালাফা বিনতে সাঈদের দু'পুত্রকে হত্যা করেছিলেন, এ জন্যে সালাফা মান্নত করেছিল যে, আসিমের মাথার খুলিতে করে অবশ্যই মদপান করব। ফলে হুযায়ল গোত্রের কিছু লোক হযরত আসিমের মাথা নেয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো, যাতে তা সালাফার কাছে বিক্রি করে মোটা অংকের অর্থ উপার্জন করা যায়।

ইমাম তাবারী বলেন, সালাফা ঘোষণা করেছিল, যে ব্যক্তি আসিমের মাথা নিয়ে আসবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে।

হযরত আসিম (রা) তাঁর লাশের সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পূর্বেই প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মর্যাদা ও হিফাযতের ব্যবস্থা এভাবে করলেন যে, তিনি ভীমরুলের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন, যেগুলো তাঁর লাশকে ঘিরে রাখল, কোন কাফির এর নিকটেও আসতে পারল না। তখন তারা এ বলে চলে গেল যে, সন্ধ্যাবেলায় যখন এগুলো চলে যাবে, তখন মাথা কেটে নেয়া হবে। কিন্তু যখন রাত হলো তখন একটি বন্যা এলো, যা তাঁর লাশকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এবং ওরা নিরুৎসাহিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আসিম (রা) আল্লাহ তা'আলার সাথে এ ওয়াদা করেছিলেন যে, আমি কোন মুশরিককে কখনো স্পর্শ করব না এবং আমাকেও যেন কোন মুশরিক স্পর্শ না করে। হযরত উমর (রা)-এর সামনে যখন হযরত আসিম (রা)-এর কথা স্মরণ করা হতো, তখন তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা কোন কোন সময় তাঁর বিশিষ্ট বান্দাকে মৃত্যুর পরেও হিফাযত করেন যেমন জীবিতাবস্থায় তার হিফাযত করতেন।[১]

মক্কার কাফিরগণ হযরত খুবায়ব (রা)-এর লাশ শূলীতে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যুবায়র (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা)-কে তাঁর লাশ নিয়ে আসার জন্য মদীনা থেকে মক্কায় প্রেরণ করেন। যখন তারা তানঈমে পৌঁছলেন, তখন দেখতে পেলেন লাশটি পাহারা দেয়ার জন্য চল্লিশ ব্যক্তি শূলীর চারপাশে অবস্থান করছে। হযরত যুবায়র (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা) তাদেরকে অলস অবস্থায় (তন্দ্রাচ্ছন্ন) দেখে শূলী থেকে লাশ নামিয়ে ঘোড়ায় রাখলেন। লাশ তখনো তরতাজা ছিল, এতে কোনই পরিবর্তন হয়নি, অথচ শূলীতে ঝুলানোর চল্লিশ দিন গত হয়ে গিয়েছিল। মুশরিকগণ চোখ মেলে যখন দেখতে পেল যে, লাশ উধাও হয়ে গেছে, তখন তারা এর অনুসন্ধানে চারদিকে ছুটল। অবশেষে তারা হযরত যুবায়র (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা)-কে ধরে ফেলল। তারা হযরত যুবায়র (রা) লাশটি নামিয়ে মাটিতে রাখলেন, তৎক্ষণাৎ মাটি ফাঁক হয়ে লাশটি গিলে ফেলল। এ কারণে হযরত খুবায়ব (রা) بليع الارض নামে প্রসিদ্ধ।[২]

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, কাফিরগণ যখন হযরত খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করে, তখন তাঁর মুখমণ্ডল কিবলামুখী ছিল। ওরা তাঁর ঘাড় ঘুরিয়ে দিল, কিন্তু পুনরায় তা কিবলামুখী হয়ে গেল। বারবার তারা এমন করতে থাকল। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ছেড়ে দিল।

দ্রষ্টব্য : ১. নিহত হওয়ার সময় নামায আদায় করা সুন্নত, যাতে জীবনের সমাপ্তি সর্বোত্তম এবং সবচে' ভাল কাজের ওপর ঘটে। যেমন একটি হাদীসে এসেছে : اذا قمت فى صلاتك فصل صلاة مودع "যখন তুমি নামাযে দণ্ডায়মান হবে, তখন

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৭৩।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৬৭; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৯৫।

পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণকারীর মত নামায আদায় কর।" [হযরত আবূ আয়্যুব (রা) সূত্রে আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]।[১]

২. হযরত আসিম (রা)-এর লাশকে অলৌকিকভাবে হিফাযত করা, লোকজনের হযরত খুবায়ব (রা)-কে কোন মাধ্যম ছাড়াই আঙ্গুর খেতে দেখা এবং হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) ও হযরত আবূ মুয়াল্লাক আনসারী (রা)-এর ঘটনা, এ সবই এর প্রমাণ যে, আল্লাহর ওলীগণের কারামত সত্য। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ এতে একমত। বিস্তারিতের জন্য কালামশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ এবং বিশেষ করে তাবাকাতুশ-শাফিয়াতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৫৯-৭৮ দেখুন।

৩. হযরত খুবায়ব (রা)-এর এ কারামত হযরত মরিয়ম (আ)-এর কারামতের অনুরূপ, যা আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানে উল্লেখ করেছেন :

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"যখনই যাকারিয়্যা তাঁর সাথে কক্ষে সাক্ষাত করতে যেতেন, তখনই তাঁর কাছে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন, হে মরিয়ম! এ সব তুমি কোথায় পেলে? মরিয়ম বলতেন, এটা আল্লাহর নিকট থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।" (সূরা আলে ইমরান : ৩৭)

৪. যার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী, তার জন্য চুল এবং নখ পরিস্কার করা মুস্তাহাব এবং উত্তম, যেমন হযরত খুবায়ব (রা) শাহাদতের পূর্বে ক্ষুর চেয়ে নেন। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থিতির পূর্বে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া জরুরী ও আবশ্যিক।

৫. যদি মুসলমান কাফিরের বন্দী হিসেবে থাকে এবং তারা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, তা হলে মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সুযোগ পেয়ে কাফিরদের শিশুদের হত্যা করা; বরং তাদের সাথে সহানুভূতি ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করবে। যেমন হযরত খুবায়ব (রা) হারিসের পৌত্রকে স্নেহভরে নিজ কোলে বসিয়ে নিয়েছিলেন।

কুররা অভিযান অর্থাৎ বীরে মাউনার ঘটনা

ঐ সফর মাসেই আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল যে, আমির ইবন মালিক আবূ বারা নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে হাদিয়া পেশ করে, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি এবং আবূ বারাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। কিন্তু আবূ বারা ইসলামও গ্রহণ করল না এবং তা অস্বীকারও করল না, বরং বলল, যদি আপনি আপনার কিছু সাহাবীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য নজদবাসীদের প্রতি প্রেরণ করেন, তা হলে আমি আশা রাখি যে, তারা দাওয়াত কবূল করবে। তিনি বললেন, নজদবাসীদের

১. মিশকাত শরীফ, কিতাবুর রিকাক, তৃতীয় অধ্যায়।

ব্যাপারে আমি সন্দেহ ও ভীতি পোষণ করি। আবূ বারা বলল, আমি যামিন থাকছি। রাসূলুল্লাহ (সা) সত্তরজন সাহাবীকে, যাঁদেরকে কারী (বিশুদ্ধ কুরআন পাঠকারী) বলা হতো, তার সাথে প্রেরণ করেন এবং হযরত মুনযির ইবন আমির সাঈদী (রা)-কে তাদের নেতা নিযুক্ত করেন।

এ দলের সবাই ছিলেন অত্যন্ত পাক-পবিত্র। তাঁরা দিনে লাকড়ি সংগ্রহ করে সন্ধ্যায় তা বিক্রি করে সুফফাবাসীদের জন্য খাবার আনতেন। আর রাতের কিছু অংশ কুরআন মজীদের দরসে ও কিছু অংশ তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযে কাটিয়ে দিতেন।

এঁরা এখান থেকে যাত্রা করে বীরে মাউনায় গিয়ে যাত্রা বিরতি করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আমির ইবন তুফায়লের নামে (যে বনী আমির গোত্রের সর্দার ও আবূ বারার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল) একটি পত্র লিখিয়ে হযরত আনাস (রা)-এর মামা হযরত হারাম ইবন মিলহান (রা)-এর হাতে দেন।

দলটি বীরে মাউনায়[১] থাকতেই নবী (সা) হযরত হারাম ইবন মিলহান (রা)-কে পত্রসহ আমির ইবন তুফায়লের নিকট প্রেরণ করেন। আমির ইবন তুফায়ল পত্র দেখার পূর্বেই তাঁকে হত্যা করার জন্য এক ব্যক্তিকে ইশারা করে। সে লোকটি পিছন থেকে বর্শার আঘাতে তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। হযরত হারাম ইবন মিলহান (রা)-এর মুখে তখন এ কথা উচ্চারিত হচ্ছিল : اكبر فزت ورب الكعبة। "আল্লাহু আকবর, কা'বার রবের কসম, আমি সফল হয়েছি।"

সে অবশিষ্ট সাহাবীগণকে হত্যা করার জন্য বনী আমিরকে উস্কানি দেয়। কিন্তু আমিরের চাচা আবূ বারা আশ্রয় দেয়ার কারণে বনী আমির তাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

আমির ইবন তুফায়ল যখন তাদের থেকে নিরাশ হলো, তখন বনী সুলায়মের সাহায্যপ্রার্থী হলো। উসাইয়্যা, রাআল এবং যাকওয়ান গোত্র তার সাহায্যে প্রস্তুত হলো এবং সবাই মিলে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বিনা অপরাধে হত্যা করল। শুধু হযরত কা'ব ইবন যায়দ আনসারী (রা) বেঁচে যান। তাঁর মধ্যে জীবনের কিছুটা স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। ফলে ওরা তাঁকে মৃত মনে করে পরিত্যাগ করে। এরপর তিনি সংজ্ঞা ফিরে পান এবং দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। অবশেষে তিনি খন্দকের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তিনি ছাড়া আরো দু'ব্যক্তি বেঁচে যান। তাঁদের একজনের নাম ছিল হযরত মুনযির ইবন মুহাম্মদ (রা) এবং অপরজনের নাম হযরত আমর ইবন উমায়্যা দামিরী (রা)। তাঁরা দু'জন পশু চরাতে জংগলে গিয়েছিলেন, ইত্যবসরে আসমানে অনেক পাখি উড়তে দেখে ভীত-বিহ্বল হয়ে যান এবং বলেন, নিশ্চয়ই কোন ঘটনা ঘটে গেছে। যখন নিকটবর্তী হলেন, তখন দেখতে পেলেন সমস্ত সঙ্গী রক্তে গোসল

১. বীরে মাউনা একটি স্থানের নাম যা মক্কা এবং উসফানের মধ্যে অবস্থিত। হুযায়ল, বনী সুলায়ম এবং বনী আমির এর আশপাশে বসবাস করত। যারকানী, ২খ. পৃ. ৭৪।

করে শাহাদতের শয্যায় শায়িত। দেখে উভয়ে পরস্পরে পরামর্শ করলেন, এখন কি করা যায়। হযরত আমর ইবন উমায়্যা (রা) বললেন, মদীনায় ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সংবাদ দেয়া হোক। হযরত মুনযির (রা) বললেন, সংবাদ তো হয়েই যাবে, শাহাদতের সৌভাগ্য কেন ছেড়ে দেব। মোটকথা উভয়ে অগ্রসর হলেন। হযরত মুনযির (রা) তো যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন এবং হযরত আমর ইবন উমায়্যা (রা)-কে ওরা বন্দী করল এবং আমির ইবন তুফায়লের নিকটে উপস্থিত করল। আমির তাঁর মাথার চুল কেটে দিয়ে এ বলে ছেড়ে দিল যে, আমার মা একটি দাস মুক্ত করার মান্নত করেছিলেন, কাজেই ঐ মান্নত পূরণার্থে তোমাকে মুক্তি দিলাম। (যারকানী, ২খ. পৃ. ৭৭)।

এ যুদ্ধে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মুক্তদাস হযরত আমির ইবন ফুহায়রা (রা) শহীদ হন এবং তাঁর জানাযা আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। যেমন আমির ইবন তুফায়ল লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে :

من الرجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء والارض حتى رأيت السماء من دونه ·

"মুসলমানদের মধ্যে ঐ মৃত ব্যক্তিটি কে, যে নিহত হলে আমি দেখলাম, তাকে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে উঠানো হচ্ছে, এমনকি শেষে আসমান নিচে রয়ে গেল !"

লোকজন বলল, ঐ ব্যক্তি ছিলেন আমির ইবন ফুহায়রা (রা)।[১]

আর বুখারীর বর্ণনায় আছে, আমির ইবন তুফায়ল বলল :

لقد رأيته بعد ما قتل رفع الى السماء حتى انى لانظر الى السماء بينه وبين الارض ثم وضع ·

"ঐ ব্যক্তিকে নিহত হওয়ার পর আমি নিজেই ভালভাবে দেখলাম যে, তার লাশ আসমানের দিকে উঠানো হয় এবং এমনকি তা আসমান এবং যমীনের মধ্যে ঝুলে থাকে, এরপর পুনরায় যমীনে রাখা হয়।"

হযরত আমির ইবন ফুহায়রা (রা)-এর হত্যাকারী জব্বার ইবন সুলামী বলে, যখন আমি আমির ইবন ফুহায়রাকে বর্শাদ্বারা আঘাত করি, তখন তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল, فزت والله "আল্লাহর কসম আমি সফল হয়েছি।" এটা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, এ সাফল্যের অর্থ কি ! আমি এসে ব্যাপারটি হযরত যাহহাক ইবন সুফিয়ান (রা)-কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন, এ সাফল্যের অর্থ হলো, আমি জান্নাত লাভ করেছি। এ কথা শুনে আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

১. তাবারী, ৩খ. পৃ. ৩৫।

ودعا انى ذلك ما رأيت من عمر بن فهيرة من دفعه الى السماء علوا

"আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হলো, আমি আমির ইবন ফুহায়রাকে দেখলাম, তাঁকে আসমানের দিকে উঠানো হচ্ছে।" (আবদুল্লাহ ইবন মুবারক কর্তৃক বর্ণিত)

হযরত যাহহাক (রা) এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে লিখে পাঠান। তিনি (সা) ইরশাদ করলেন : ان الملائكة وارت جثته فى عليين "ফেরেশতাগণ তার লাশ ইল্লিয়্যীনে লুকিয়ে রেখেছেন।"[১]

আর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ফিরিশতাগণ তাঁর লাশ লুকিয়ে রাখেন, ফলে মুশরিকরা দেখতে পায়নি তা কোথায় গেল। এ বর্ণনায় ثم وضع শব্দটির উল্লেখ নেই যেমনটি বুখারীর বর্ণনায় ছিল। ইমাম বলেন, উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই, সম্ভবত তাঁর লাশ প্রথমে আসমানে উঠানো হয়েছিল এবং এরপর যমীনে রাখা হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, ثم وضع শব্দটি কয়েকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, অধিকাংশ বর্ণনা ও সনদে এটাই এসেছে যে, তাঁর লাশ আসমানে লুকিয়ে ফেলা হয়। হযরত মূসা ইবন উকবা (রা) বলেন, হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) বলতেন, হযরত আমির ইবন ফুহায়রা (রা)-এর লাশ কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না, লোকদের ধারণা, তাঁর লাশ ফিরিশতাগণ আসমানে লুকিয়ে ফেলেছেন।[২]

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এ সম্পর্কে অবহিত হলেন, তখন অত্যন্ত ব্যথিত হলেন যে, সারা জীবনে যেন তিনি এমন ব্যথা পাননি এবং এক মাস পর্যন্ত তিনি ফজরের নামাযে দু'আ কুনূত (কুনূতে নাযেলা) পাঠ করে তাদের জন্য বদদু'আ করেন। আর তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে এ দুর্ঘটনার সংবাদ দেন যে, তোমাদের সাথীরা শহীদ হয়ে গেছে এবং তারা আল্লাহর কাছে এ আরয পেশ করেছে যে, আমাদের ভাইদেরকে এ সংবাদ পৌঁছে দিন, আমরা আমাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

বনী নাযীরের যুদ্ধ (চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস)

হযরত আমর ইবন উমায়্যা দামিরী (রা) বীরে মাউনা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে বনী আমিরের দুই মুশরিকের সাথে সাক্ষাত হয়। তারা কানাত নামক স্থানের একটি বাগানে যাত্রা বিরতি করে। যখন এ দু'ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়ল, তখন হযরত আমর ইবন উমায়্যা (রা) ভাবলেন, এদের গোত্রের সর্দার আমির ইবন তুফায়ল সত্তরজন মুসলমানকে শহীদ করেছে, সবার প্রতিশোধ গ্রহণ করা তো এ সময়ে অসম্ভব, তবে কিছুটা প্রতিশোধ তো নিয়ে নিই। এ ভেবে তিন ঐ দু'ব্যক্তিকে হত্যা করেন, অথচ তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল যা হযরত আমর

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২২৩।

২ প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ২২৪।

ইবন উমায়্যা জানতেন না। মদীনায় পৌঁছে তিনি এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, ওদের সাথে তো আমাদের সন্ধিচুক্তি ছিল, কাজেই তাদের রক্তপণ দেয়া আবশ্যক। সুতরাং তিনি ঐ দু'ব্যক্তির রক্তপণ পাঠিয়ে দিলেন।[1]

বনী নাযীর যেহেতু বনী আমিরের মিত্র গোত্র ছিল, কাজেই চুক্তির শর্ত অনুসারে রক্তপণের কিছু অংশ বনী নাযীরের প্রদান করা কর্তব্য ছিল। এ ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ (সা) রক্তপণের তাদের পক্ষের চাঁদার অংশ আদায়ের জন্য নিজেই বনী নাযীরের নিকটে গেলেন। হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত যুবায়র, হযরত তালহা, হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ, হযরত সা'দ ইবন মু'আয, হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র, হযরত সা'দ ইবন উবাদা প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। নবী (সা) গিয়ে একটি দেয়ালের ছায়ায় বসে পড়েন।

বনী নাযীর দৃশ্যত অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথাবার্তা বলে এবং রক্তপণের অংশ প্রদানের অঙ্গীকার করে। কিন্তু গোপনে গোপনে তারা এ মতলব আঁটে যে, এক ব্যক্তিকে ছাদে পাঠিয়ে দেয়া হোক এবং সে উপর থেকে একটি ভারী পাথর গড়িয়ে দিক, যাতে এ দুশমনেরা পাথর চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করে। সাল্লাম ইবন মিশকাম বলল, لا تفعلوا والله ليخبره ربه وانه لنقض العهد الذى بيننا وبينه "কখনো এমনটি করবে না, আল্লাহর কসম, তাঁর রব তাঁকে এ খবর দেবেন। এছাড়া এটাতো সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘন।"

সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে অবতরণ করেন এবং ওদের সলা-পরামর্শ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি সেখান থেকে দ্রুত উঠে মদীনায় চলে আসেন। আর তিনি সেখান থেকে এভাবে উঠে পড়েন যেভাবে মানুষ প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য উঠে থাকে এবং সাহাবিগণ সেখানেই বসে থাকেন। ইয়াহূদীরা যখন তাঁর চলে যাওয়ার সংবাদ অবগত হলো, তখন খুবই লজ্জিত হলো। ইয়াহূদী কিনানা ইবন হুবায়রা বলল, তোমরা কি জানো না যে, মুহাম্মদ (সা) কেন এখান থেকে উঠে চলে গেছেন ? আল্লাহর কসম, তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে তিনি জেনে ফেলেছেন,[2] তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।

যখন তাঁর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব ঘটতে লাগল, তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর সন্ধানে মদীনায় ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করেন এবং বনী নাযীরকে আক্রমণের নির্দেশ দেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা)-কে মদীনার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রেখে তিনি বনী

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৫৪।

২ ইবন উকবা বলেন, এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয় : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ উয়ূনুল আসার, ২খ. পৃ. ৪৮।

নাযীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং গিয়েই তাদেরকে ঘেরাও করেন। বনী নাযীর দূর্গে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। তাদের মযবুত দূর্গগুলো সম্পর্কে তাদের কিছুটা আস্থা ছিল, অধিকন্তু আবদুল্লাহ ইবন উবাই এবং অপরাপর মুনাফিকেরা তাদেরকে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়ায় তাদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবুও মুসলমানদের সম্মুখীন হওয়ার সাহস তাদের ছিল না। এছাড়া বনী নাযীর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ইতোপূর্বে আরো বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এ বলে যে, আপনার পক্ষ থেকে তিন ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন, আমরাও আমাদের তিনজন আলিমকে পাঠাচ্ছি, আলাপ-আলোচনার ফলে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে আমরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করব। অপরদিকে তাদের আলিমদেরকে এ পরামর্শ দিয়েছিল যে, কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছুরি নিয়ে যাবে এবং আলোচনার মাঝে সুযোগ বুঝে তাদের হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু কোন একটি মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্রের কথা অনুষ্ঠানের পূর্বেই ফাঁস হয়ে যায়। (ইবন মারদুবিয়্যা কর্তৃক সহীহ সনদে বর্ণিত)। মোট কথা এই যে, বনী নাযীরের বারংবার বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি তাদের উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। পনেরদিন পর্যন্ত তাদেরকে ঘিরে রাখেন এবং তাদের বাগান ও বৃক্ষগুলো কেটে ফেলার এবং জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। অবশেষে তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে নিরাপত্তার আবেদন করে।

তিনি বললেন, দশদিন অবকাশ দেয়া হলো, মদীনা খালি করে দাও, স্ত্রী-পরিজন, সন্তান-সন্তুতি যেখানে খুশি, চলে যাও। যুদ্ধ সরঞ্জাম ছাড়া যে পরিমাণ সম্পদ উট ও অন্যান্য সওয়ারীতে বহন করতে সক্ষম তা নিয়ে যেতে পার, এ অনুমতি দেয়া হলো।

ধন-সম্পদের লোভ-লালসায় ইয়াহূদীরা ঘরের দরজা এবং চৌকাঠও উটের পিঠে বহন করে নিয়ে যায় এবং মদীনা ত্যাগ করে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ তো খায়বরে গিয়ে অবস্থান নেয় আর কিছু লোক সিরিয়ায় চলে যায়। তবে তাদের নেতা হুয়াই ইবন আখতাব, কিনানা ইবন রবী এবং সাল্লাম ইবন আবুল হুকায়ক তাদের সে সব লোকজনের সাথেই ছিল, যারা খায়বরেই অবস্থান গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের পরিত্যাক্ত ধন-সম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করেন, যাতে আনসারগণের ওপর থেকে তাদের বোঝা হালকা হয়। যদিও আনসারগণ নিজেদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দরুন এটাকে বোঝা মনে করতেন না, বরং চোখের প্রশান্তি ও অন্তর স্বস্তিদায়ক মনে করতেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারগণকে একত্র করে ভাষণ দেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনার পর আনসারগণ মুহাজিরগণের সাথে যে সমস্ত সদাচরণ ও অনুগ্রহ করেছেন, তা বর্ণনা দেন এবং এরপর বলেন, যদি তোমরা চাও, তা হলে আমি বনী নযীরের পরিত্যাক্ত সম্পদ আনসার এবং মুহাজিরগণের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দিই, আর তারা পূর্ববৎ তোমাদের সাথে অংশীদার থাকবে। আর যদি চাও তা হলে এ সম্পদ কেবল মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করি এবং তারা তোমাদের ঘর খালি করে দিক।

আনসারগণের সর্দার হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) এবং হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি সচ্ছন্দচিত্তে এ সম্পদ শুধু মুহাজিরগণের মধ্যেই বন্টন করুন এবং পূর্বের নিয়মানুসারে মুহাজিরগণ আমাদের আমাদের ঘরেই অবস্থান করুক এবং আমাদের সাথে পানাহারে শরীক হোক।

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, আনসারগণ আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ সম্পদ আপনি স্রেফ মুহাজিরগণের মধ্যেই বন্টন করুন এবং আমাদের মাল-সম্পদের মধ্যেও যতটা ইচ্ছা মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করুন, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে এতে সন্তুষ্ট আছি।

এ জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দিত হন এবং তাদের জন্য এ দু'আ করেন : اللهم ارحم الانصار وابناء لانصار "আয় আল্লাহ, আপনি আনসারদের প্রতি এবং তাদের সন্তান-সন্তুতির প্রতি অনুগ্রহ করুন।"

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন : جزاكم الله خيرا يا معشر الانصار فوالله ما مثلنا ومثلكم الا كما قال الغنوى "ওহে আনসার সপ্রদায়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম, আমাদের ও তোমাদের উদাহরণ এমন, যেমনটি কবি গানাবী বলেছেন :

جزى الله عنا جعفرا حسين از لقت * بنا نعلنا فى الواطئين فزلت

ابرا ان يملون ولو ان امنا * تلاقى الذى يلقون ضالملت

"আল্লাহ্ তা'আলা জা'ফরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, যখন আমাদের পা দৃঢ় হলো এবং তার পদস্খলন ঘটল। তুমি আমাদের সহযোগিতা ও দেখাশোনা করতে অতিষ্ঠ হতে না, সম্ভবত আমাদের মাতারও যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হতো, তা হলে তিনিও অতিষ্ঠ হয়ে পড়তেন।"

তিনি সমুদয় সম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করে দেন। আনসারগণের মধ্যে কেবল হযরত আবূ দুজানা (রা) ও হযরত সাহল ইবন হুনায়ফ (রা)-কে তাঁদের অভাবের কারণে এর অংশ দান করেন।

এ যুদ্ধে বনী নাযীরের মাত্র দু'ব্যক্তি মুসলমান হন। তাঁরা হলেন হযরত ইয়ামীন ইবন উমায়র (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ ইবন ওহাব (রা)। তাঁদের মাল-সম্পদের কিছুই গ্রহণ করা হয় নি; বরং তাঁদের মালামাল তাঁদের অধিকারেই রাখা হলো। আর এ যুদ্ধকালেই সূরা হাশর অবতীর্ণ হয়, এ জন্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এ সূরাকে বলতেন সূরায়ে বনী নযীর। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা পরিত্যক্ত সম্পদের বিধান এবং তা ব্যয়ের নির্দেশনা দান করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। এতদসমুদয় বর্ণনা বিস্তারিতভাবে যারকানী, পৃ. ৮০-৮৬; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৫৪-২৫৫ এবং আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৭৪-৮০-তে উল্লিখিত হয়েছে।

শারাব নিষিদ্ধ হওয়া

ইবন ইসহাক লিখেন, শারাব নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশ এ যুদ্ধের সময়ই অবতীর্ণ হয়।[১]

যাতুর-রিকা' যুদ্ধ (চতুর্থ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাস)

বনু নাযীরের যুদ্ধের পর রবীউল আউয়াল মাস থেকে শুরু করে জমাদিউল আউয়াল মাসের প্রথমভাগ পর্যন্ত রাসূল (সা) মদীনায়ই অবস্থান করেন। জমাদিউল আউয়াল মাসের প্রথমভাগে সংবাদ পাওয়া যায় যে, বনু মুহারিব[২] এবং বনু সা'লাবা নবী (সা)-এর মুকাবিলা করার জন্য সেনা সংগ্রহ করছে। তিনি (সা) চারশ'[৩] সাহাবার একটি দল সাথে নিয়ে নজদ-এর দিকে যাত্রা করলেন। তিনি নজদে পৌঁছার পর বনু গাতফানের কিছু লোক তাঁর সাথে মিলিত হয় কিন্তু যুদ্ধের সুযোগ আসেনি। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকজনকে সালাতুল খওফ পড়ান।[৪]

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, এ যুদ্ধকে যাতুর-রিকা' এ জন্যে বলা হয় যে, রিকা' অর্থ কাপড়ের পট্টি বা তালি। এ যুদ্ধে চলতে চলতে আমাদের পা ফেটে গিয়েছিল। ফলে আমরা পায়ে কাপড় জড়িয়ে নিয়েছিলাম। এ জন্যে এ যুদ্ধকে যাতুর রিকা' বা পট্টিওয়ালা বলা হতো। অর্থাৎ পট্টিওয়ালা যুদ্ধ (বুখারী)।

ইবন সা'দ বলেন, যাতুর রিকা একটি পাহাড়ের নাম, যেখান থেকে তিনি এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, আর এতে কালো, সাদা এবং লাল চিহ্ন ছিল।[৫]

প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ছায়াদার বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং তাঁর তরবারিটি বৃক্ষের ডালে ঝুলানো ছিল। ইত্যবসরে এক মুশরিক এসে তরবারিটি হস্তগত করে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করে, বল, এবারে আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে ? তিনি অত্যন্ত নিরুদ্বেগের সাথে বললেন : আল্লাহ্।

এটা বুখারীর বর্ণনা। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, হযরত জিবরাঈল (আ) এসে তার বুকে জোরে ঘুষি মারেন। ফলে তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে যায় এবং নবী (সা) সেটি উঠিয়ে নিয়ে বললেন, বল, এবারে আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে ? সে বলল, কেউ নেই। তিনি বললেন, আচ্ছা, যাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম।

---

১. ইবন ইসহাক।

২. বনী মুহারিব এবং বনী সালাবা গাতফান সম্প্রদায়ের দু'টি শাখা। যারকানী, পৃ. ১২।

৩. এক বর্ণনায় সাতশ' এবং অপর এক বর্ণনায় আটশ' বলা হয়েছে। যারকানী, পৃ. ১৩।

৪. ইবনসা'দ বলেন, এটাই ছিল প্রথম সালাতুল খাওফ আদায়। উয়ূনুল আসার,২খ. পৃ. ৫২।

৫. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৪৩।

ওয়াকিদী বলেন, এ ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যান এবং নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন। ফলে অনেক লোক তাঁর দাওয়াতে মুসলমান হয়ে যান।

সহীহ্ বুখারীতে আছে, এ ব্যক্তির নাম ছিল গাওস ইবন হারিস।

সতর্ক বাণী : একই ধরনের ঘটনা তৃতীয় হিজরীতে গাতফানের যুদ্ধের বর্ণনায়ও অতিক্রান্ত হয়েছে। কেউ বলেন, এ দু'টি একই ঘটনা, আবার কেউ বলেন, দু'টি পৃথক পৃথক ঘটনা। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।[১]

এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি একটি ঘাঁটিতে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির এবং হযরত আব্বাদ ইবন বিশর (রা)-কে ঘাঁটির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তাঁরা দু'জনে পরস্পরে এ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রাত্রির প্রথমার্ধে হযরত আব্বাদ এবং শেষার্ধে হযরত আম্মার (রা) জেগে থাকবেন। সে মর্মে হযরত আম্মারইবন ইয়সির (রা) তো ঘুমিয়ে পড়লেন এবং হযরত আব্বাদ ইবন বিশর (রা) ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নামাযের নিয়্যত বাঁধলেন।

এক কাফির তাঁকে দেখে ভাবল যে, ইনিই মুসলমানদের পথ প্রদর্শক এবং একটি তীর নিক্ষেপ করল যা লক্ষ্যে পৌঁছে গেল। কিন্তু হযরত আব্বাদ ইবন বিশর (রা), যাঁর প্রতিটি রগরেশা প্রকৃত প্রভুর আনুগত্য ও দাসত্বে পরিপূর্ণ করে নিয়েছিলেন, যাঁর আপাদ মস্তক প্রকৃত রবের ভালবাসায় ছিল নিমগ্ন এবং ঈমান ও ইহসানের মাধুর্য যাঁর অন্তরকে করেছিল আপ্লুত, পূর্বের মতই নামাযে মশগুল থাকেন এবং তীর খুলে দূরে নিক্ষেপ করেন। কাফিরটি দ্বিতীয় তীর নিক্ষেপ করে। সেটিও তিনি খুলে নিক্ষেপ করেন এবং নামাযে মগ্ন থাকেন। কাফিরটি তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করে। এবারে তাঁর সন্দেহ হলো যে, পাছে দুশমন কোন গুপ্ত স্থান থেকে হামলা না করে বসে এবং যে উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিযুক্ত করেছেন, সে উদ্দেশ্য না ব্যাহত হয়ে যায়! ফলে তিনি নামায সমাপ্ত করেন এবং নামায সমাপ্তির পর নিজ সঙ্গীকে জাগিয়ে দিলেন যে, উঠো, আমি আহ্ত হয়েছি। আর শত্রুটি তাঁকে জাগাতে দেখে পলায়ন করে। হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) জেগে উঠলেন এবং তাঁর শরীর থেকে রক্তপাত হতে দেখে বললেন, সুবহান আল্লাহ, তুমি কেন আমাকে ডাকোনি, কেন জাগাওনি আমাকে ? বললেন, আমি একটি সূরা পাঠ করছিলাম, এর মধ্যে বিরতি দেয়াটা পসন্দ করিনি। যখন একের পর এক তীর আসতে থাকল, তখন আমি নামায সমাপ্ত করলাম এবং তোমাকে জাগালাম। আল্লাহর কসম, যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ স্মরণে না আসত, তাহলে নামায সমাপ্তির পূর্বে আমার জানেরই সমাপ্তি ঘটত।

এ যুদ্ধ সংঘটনের তারিখ নিয়ে খুবই মতভেদ আছে। ইবন ইসহাক বলেন, যাতুর রিকা যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়, ইবন সা'দ বলেন,

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৯১।

পঞ্চম হিজরীর মুহররম মাসে সংঘটিত হয়। আর ইমাম বুখারী (র) বলেন, এ যুদ্ধ খায়বর যুদ্ধের পর সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত হয়। এ জন্যে সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এ যুদ্ধে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর অংশগ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। আর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) সর্বসম্মতিক্রমে খায়বর যুদ্ধের পর সপ্তম হিজরীতে আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। অধিকন্তু আবূ দাউদ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মারওয়ান ইবন হাকাম হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে প্রশ্ন করেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়েছেন ? তিনি বলেন, আমি নাজদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়েছি। এ রিওয়ায়াত বুখারীতে তা'লীক হিসেবে উল্লেখিত আছে এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-ও সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের পর নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন।[১]

প্রতিশ্রুত বদর যুদ্ধ (শা'বান, চতুর্থ হিজরী)

যাতুর রিকা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর রজব মাসের শেষ পর্যন্ত তিনি মদীনাতে অবস্থান করেন। উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে যেহেতু আবূ সুফিয়ানের সাথে ওয়াদা হয়েছিল যে, আগামী বছর বদর প্রান্তরে যুদ্ধ হবে, এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) পনেরশ' সাহাবী সঙ্গে নিয়ে শাবান মাসে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বদর পৌঁছে আটদিন পর্যন্ত আবূ সুফিয়ানের অপেক্ষা করেন। আবূ সুফিয়ানও মক্কাবাসীদের সাথে নিয়ে মাওরাউ যাহরান পর্যন্ত পৌঁছে কিন্তু মুকাবিলা করার সাহস হয়নি এবং এ কথা বলে ফিরে যায় যে, এ বছর অকাল ও দুর্ভিক্ষের বছর, যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) আটদিন অপেক্ষা করার পর যখন যুদ্ধ সম্বন্ধে নিরাশ হলেন, তখন কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মদীনায় ফিরে আসেন।[২]

আবূ সুফিয়ান যদিও উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বলেছিল যে, আগামী বছর আবার বদরে লড়াই হবে, কিন্তু অন্তর থেকে আবূ সুফিয়ান ভীত হয়ে পড়েছিল, মনে মনে চাচ্ছিল যে, নবী (সা)-ও যদি বদরে না আসতেন, যাতে আমাকে লজ্জিত ও অপদস্থ না হতে হয় এবং অপবাদটা মুসলমানদেরকেই দেয়া যায়! নাঈম ইবন মাসঊদ নামে এক ব্যক্তি মদীনায় যাচ্ছিল। তাকে কিছু টাকা-কড়ি এ জন্যে দেয়া হয়েছিল, সে মদীনায় মুসলমানদের মাঝে গিয়ে এ কথা ছড়িয়ে দেবে যে, মক্কাবাসী মুসলমানদের সমুচিত জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করছে, কাজেই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, তোমরা কুরায়শের মুকাবিলায় বেরিয়ে পড়ো না। আবূ সুফিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল যে, যখন এ ধরনের সংবাদ প্রচারিত হবে তখন মুসলমানগণ ভীত হয়ে

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৩৫।

২ ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৩৬।

যুদ্ধের জন্য বের হবে না (আজকালের ভাষায় যাকে প্রোপাগাণ্ডা বলে)। কিন্তু এ সংবাদ শোনামাত্রই মুসলমানদের ঈমানের জোশ আরো বৃদ্ধি পেল। حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ। "আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।" পাঠ করতে করতে তারা বদরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং ওয়াদামাফিক বদরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি বড় বাজার বসত, (মুসলমানগণ) তিনদিন সেখানে অবস্থান করে ব্যবসা করলেন এবং প্রচুর লাভবান হয়ে কল্যাণ ও বরকতের সাথে মদীনায় ফিরে এলেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় :

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۚ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۔ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۚ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔

"যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে। এদেরকে লোকে বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর কিন্তু এটা তাদের ঈমানকে দৃঢ়তর করে তুলেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে রাযী তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। এরাই শয়তান, তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো।" (সূরা আলে ইমরান : ১৭২-১৭৫)

উপকারিতা : এ আয়াতে মিথ্যা সংবাদ রটনাকারীকে আল্লাহ তা'আলা শয়তান বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী : اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهٗ-তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রোপাগাণ্ডার প্রতিষেধক এবং প্রত্যুত্তরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সাধ্যমত জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। আল্লাহ ক্ষমা করুন, এটা কখনই করণীয় নয় যে, তোমরাও তোমাদের দুশমনদের মত মিথ্যে সংবাদ প্রচার করা শুরু করো। মিথ্যের জবাব সত্য দ্বারা দাও। আল্লাহ মাফ করুন, তোমরাও যদি মিথ্যের

জবাবে মিথ্যেই বল, তা হলে লাভটা কি ? ইসলাম আপন শত্রুদের বেলায়ও মিথ্যে বলার অনুমতি দেয় না।

চতুর্থ হিজরীর বিভিন্ন ঘটনা

১. এ বছরের শা'বান মাসে হযরত ইমাম হুসাইন (রা) জন্মগ্রহণ করেন।[১]

২. এ বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে হযরত উসমান ইবন আফফান (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ ছয় বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।[২]

৩. এ বছরের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)-কে বিয়ে করেন।[৩]

৪. এ বছরের রমযান মাসে নবী (সা) উম্মুল মাসাকীন হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা (রা)-কে বিয়ে করেন।[৪]

৫. এ বছরেই নবী (সা) হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা)-কে ইয়াহূদীদের ভাষা পড়া ও লিখা শেখার নির্দেশ দেন এবং বলেন, ওদের পাঠে আমি স্বস্তি পাই না।[৫]

৬. প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে পর্দার হুকুমও এ সালেই নাযিল হয়। অবশ্য কেউ বলেছেন, তৃতীয় হিজরীতে এবং কেউ বলেছেন পঞ্চম হিজরীতে এ হুকুম নাযিল হয়েছে।[৬]

পর্দার মাসআলা ইনশা আল্লাহ পবিত্র সহধর্মিণিগণের আলোচনায় বিশ্লেষণ করা হবে। চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী এখানেই শেষ হলো। এক্ষণে পঞ্চম হিজরীর আলোচনা শুরু হচ্ছে।

দুমাতুল জন্দলের[৭] যুদ্ধ (রবিউল আউয়াল, ৫ হিজরী)

রবিউল আউয়াল মাসে নবী (সা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল যে, দুমাতুল জন্দল থেকে লোকজন মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি এক হাজার সাহাবী সঙ্গে নিয়ে ২৫ রবিউল আউয়াল পঞ্চম হিজরী সনে দুমাতুল জন্দল অভিমুখে যাত্রা করেন। ওরা এ সংবাদ পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কাজেই কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই তিনি ২০ রবিউস সানী মদীনায় ফিরে আসেন (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৪৪; যারকানী, ২খ. পৃ. ৯৫)।

১. তাবারী, ৩খ. পৃ. ৩৯।

২ প্রাগুক্ত।

মুরাইসি[১] বা বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ (পঞ্চম হিজরীর ২০ শাবান, সোমবার)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, বনী মুস্তালিকের সর্দার হারিস ইবন আবূ যিরার অনেক সৈন্য-সামন্ত যোগাড় করে মুসলমানদের প্রতি আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংবাদ পেয়ে তিনি হযরত বারীদা ইবন হুসাইব সুলামী (রা)-কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রেরণ করেন। বারীদা (রা) ফিরে এসে খবর দেন যে, ঘটনা সত্য। তখন নবী (সা) সাহাবীগণকে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন।

সাহাবিগণ দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং ত্রিশটি ঘোড়া সঙ্গে নেন যার দশটি ছিল মুহাজিরগণের এবং বিশটি ছিল আনসার সাহাবীর। এ যুদ্ধে গনীমতের সম্পদের লোভে মুনাফিকদের একটি বিরাট অংশ শামিল হয়, যারা ইতোপূর্বে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহন করেনি। নবী (সা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন এবং পবিত্র সহধর্মিণিগণের মধ্য থেকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত সালমা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে ২রা শাবান সোমবার মুরাইসির পথে যাত্রা করেন।

দ্রুত অগ্রসর হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ তাদেরকে আক্রমণ করেন। ওরা তখন গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুকে[২] পানি পান করাচ্ছিল। আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম

১. মুরাইসি একটি পুষ্করিণী অথবা ঝর্ণার নাম, যেখানে বনী মুস্তালিকের সাথে মুকাবিলা হয়। বনী মুস্তালিক বনী শুজা সপ্রদায়ের একটি শাখা। এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইবন ইসহাক বলেন ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে, কেউ বলেন চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। কাতাদা, উরওয়া ইবন যুবায়র, ইবন শিহাব যুহরী বলেন, পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছে। মূসা ইবন উকবা, ইবন সা'দ, বায়হাকী ও হাকিম এ মতকেই গ্রহণ করেছেন। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী বলেন, এ বক্তব্যই সঠিক। কেননা হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে এবং বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত ও উল্লেখযোগ্য হাদীসসমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের পর বনী কুরায়যার যুদ্ধকালে ইনতিকাল করেন যা ছিল পঞ্চম হিজরীর ঘটনা। যদি মুরাইসির যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে এবং বনী কুরায়যার যুদ্ধের এক বছর পর ধরে নেয়া হয়, তা হলে এতে হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর অংশগ্রহণ কিভাবে প্রমাণিত হয়? বিস্তারিতের জন্য দেখুন, ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩২; যারকানী, ২খ. পৃ. ৯৬।

২ এ রিওয়ায়াতটি সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইতাক, ১খ. পৃ. ৩২৫-এ নাফি থেকে বর্ণিত। আর নাফি বলেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর এ হাদীস শুনিয়েছেন যিনি ঐ যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং নিঃসন্দেহে এ হাদীস মরফূ ও মুত্তাসিল। আর যদি ধরেই নেয়া হয় যে, হাদীসটির সনদ নাফে পর্যন্ত পৌঁছে সমাপ্ত হয়েছে, তা হলেও মুহাদ্দিসগণের রায় অনুযায়ী হাদীসটি মুরসাল হিসেবে গণ্য হবে, যা পূর্ববর্তী জমহূর উলামার নিকট দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য, মুনকাতি' কখনই নয়। আল্লামা শিবলী তাঁর সীরাতুন-নবী ১খ. পৃ. ৩৮২-তে অহেতুক কেন এ উল্লেখযোগ্য হাদীসটিকে মুনকাতি' চিহিঞত করে অগ্রহণযোগ্য বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, তা বোধগম্য নয়। সীরাতের রিওয়ায়াত এবং সহীহ বুখারীর রিওয়ায়াতের মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই, কেননা সীরাত গ্রন্থে শুধু এটুকু অতিরিক্ত জানা যায় যে, বনী মুস্তালিক তাঁর প্রস্তুতির সংবাদ অবহিত হয়েছিল, কিন্তু এটা জানতে পারেনি যে, তিনি অকস্মাৎ এসে এভাবে আক্রমণ করে বসবেন, যেমনটি সহীহ বুখারীর বর্ণনাদ্বারা জানা যায় যে, যখন তিনি আক্রমণ করেছিলেন তখন ওরা বেখবর ও গাফিল ছিল।

হলো না, ওদের দশ ব্যক্তি নিহত হলো, অবশিষ্ট পুরুষ-স্ত্রীলোক, শিশু-বৃদ্ধ সবাই বন্দী হলো। মাল-সম্পদ সবই কব্জা করা হলো। দু'হাজার উট, পাঁচ হাজার বকরি হস্তগত হলো, দু'শ ব্যক্তি বন্দী হলো। বন্দীদের মধ্যে বনী মুস্তালিকের সর্দার হারিস ইবন যিরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। গনীমতের মাল বন্টনকালে জুয়ায়রিয়া হযরত সাবিত ইবন কায়স (রা)-এর ভাগে পড়ে। হযরত সাবিত তাকে মুকাতাবা হিসেবে ঘোষণা দেন। অর্থাৎ এত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা শর্তে সে মুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি অবগত আছেন যে, আমি জুয়ায়রিয়া, বনী মুস্তালিক অধিপতি হারিস ইবন যিরারের কন্য। আমার বন্দীত্বের কথাও আপনার অগোচরে নেই। বন্টনকালে আমি সাবিত ইবন কায়সের ভাগে পড়ি এবং তিনি আমাকে মুকাতাবা ঘোষণা করেন। মুক্তিপণের ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্য-সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছি।

রাসূল (সা) ইরশাদ করলেন, আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পরামর্শ দিচ্ছি, যদি তুমি তা পসন্দ কর। তা হলো, তোমার পক্ষ থেকে পরিশোধযোগ্য মুক্তিপণ আমি আদায় করে দিচ্ছি এবং তুমি মুক্ত হওয়ার পর তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করব। হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) বললেন, আমি সম্মত আছি (আবূ দাঊদ, কিতাবুল ইতাক)।

হযরত জুয়ায়রিয়া তো প্রথম থেকেই ইচ্ছা করছিলেন যে, তিনি মুক্ত হবেন। ঘটনাক্রমে তার পিতা হারিসও নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমি বনী মুস্তালিক গোত্রের সর্দার, আমার কন্যা দাসী হয়ে থাকতে পারে না। আপনি তাকে মুক্ত করে দিন। নবী (সা) বললেন, এটা উত্তম হবে না যে, আমি এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জুয়ায়রিয়ার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিই ? হারিস ফিরে গিয়ে জুয়ায়রিয়াকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার মুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) বললেন, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে গ্রহণ করছি (ইবন মান্দা বর্ণিত এ হাদীসটির সনদ সহীহ)।[১]

আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত জুয়ায়রিয়ার পিতা হারিস ইবন আবূ যিরার অনেকগুলো উট নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় রওয়ানা হন যাতে মুক্তিপণ দিয়ে নিজ কন্যাকে মুক্ত করে আনতে পারেন। এগুলোর মধ্যে দু'টি উট উত্তম ও দর্শনীয় ছিল, পথিমধ্যে সে দু'টিকে কোন এক ঘাঁটিতে লুকিয়ে রাখে যে, ফিরে আসার সময় নিয়ে যাবে। মদীনা পৌঁছে নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হয়ে উটগুলো পেশ করে এবং বলে, ওহে মুহাম্মদ, আপনি আমার মেয়েকে গ্রেফতার করেছেন, এগুলো তার মুক্তিপণ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : ঐ উট দু'টি কোথায় যা

১. ইসাবা, ৪খ. পৃ. ২৬৫।

তুমি অমুক ঘাঁটিতে লুকিয়ে রেখে এসেছ ? হারিস বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সত্যই আপনি আল্লাহর রাসূল। কেননা ঐ উট দু'টির কথা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না; আল্লাহই আপনাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন [ইসাবা, হযরত হারিস ইবন যিরার (রা)-এর জীবন চরিত]।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-কে মুক্ত করে নিজ স্ত্রীত্বে বরণ করে নেন। সাহাবায়ে কিরাম যখন এটা জানতে পেলেন, তখন বনী মুস্তালিকের সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন এজন্যে যে, এরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্বশুর কুলের আত্মীয়-স্বজন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক[1] (রা) বলেন, আমি জুয়ায়রিয়া অপেক্ষা আর কেন মহিলাকে আপন সম্প্রদায়ের জন্য উপকারী দেখিনি। যার বদৌলতে একদিনেই একশ' ঘর লোক মুক্ত হয়েছিল (আবূ দাঊদ, কিতাবুল ইতাক, ২খ. পৃ. ১৯২)।

এ সফরে যেহেতু মুনাফিকদের একটি দল শরীক হয়েছিল, সবক্ষেত্রেই তারা নিজেদের ফিতনা-ফাসাদ এবং অপকর্ম অব্যাহত রাখল। যেমন একটি ঝর্ণার পাশে এক মুহাজির ও এক আনসারের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। মুহাজির ব্যক্তিটি আনসারী ব্যক্তিকে একটা লাথি মেরে বসল। তখন মুহাজির 'হে মুহাজির সপ্রদায়' এবং আনসারী 'ওহে আনসার সপ্রদায়' বলে সাহায্যের জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ সপ্রদায়কে আহ্বান জানাল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কানে যখন এ আওয়াজ পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, জাহিলী যুগের মত কে ডাকাডাকি করছে ? লোকজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ এ মুহাজির এক আনসারকে লাথি মেরেছে। শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : دَعُوهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ "এসব বাদ দাও, অবশ্যই এগুলো ঘৃণ্য এবং দুর্গন্ধযুক্ত কথাবার্তা।"

মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলূলের কথা বলার সুযোগ জুটে গেল। আর বলল, কী, এরা (মুহাজিরগণ) আমাদের উপর শাসক বনে বসেছে ! আল্লাহর কসম, মদীনায় পৌঁছে সম্ভ্রান্তরা ইতরদেরকে বহিষ্কার করবে।[2] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল, তখন হযরত উমর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঐ মুনাফিকের গর্দান কেটে ফেলার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। তিনি ইরশাদ করলেন : ছেড়ে দাও, লোকজন তো প্রকৃত অবস্থা বুঝবে না, সন্দেহ করে বসবে যে, মুহাম্মদ (সা) আপন সঙ্গীদেরও হত্যা করেন।

আবদুল্লাহ ইবন উবাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ছিল না; বরং কট্টর দুশমনদের মধ্যে ছিল। কিন্তু বাহ্যিক চেহারা-সূরতে তাঁর সাহাবাগণের অনুরূপ ছিল। মুখে সে তাঁর সাহাবী হওয়ার দাবিদার ছিল, এজন্যে তিনি তাকে হত্যা করার অনুমতি

১. স্বীয় পবিত্রতা ও পরিপূর্ণ সততার, সৎ অন্তঃকরণ, সৎ জিহ্বার প্রশংসা করা এটা সিদ্দীকী মর্যাদার দাবি। এজন্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর উল্লেখে সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক বলাটাই আমরা উপযুক্ত মনে করেছি।

২ সূরা মুনাফিকূন এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছে।

দেননি। নিষ্ঠাবান সাহাবিগণের অনুরূপ বেশ ধারণ করায় তার জীবন রক্ষা পেল। নেককারগণের বাহ্যিক অনুকরণ[১] যদিও মুনাফিকী, তবুও তা বাতিল ও অহেতুক হয় না।

তাৎপর্যপূর্ণ ফায়দা

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : دَعُوْهَا فَانَّهَا مُنْتِنَةٌ "এসব বাদ দাও, অবশ্যই এগুলো ঘৃণ্য এবং দুর্গন্ধযুক্ত কথাবার্তা।" এর দ্বারা বুঝা যায়, উত্তম কথাবার্তা পবিত্র ও সুগন্ধিযুক্ত হয়ে থাকে এবং খারাপ কথা কদর্য ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, যার সুগন্ধি ও দুর্গন্ধ প্রকাশ্য অনুভূতি দিয়ে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের ওয়ারিসগণ অনুভব করতে পারেন।

وعن جابر رضى الله عنه قال كنا مع النبى ﷺ فارتقت ريح منتنة فقال رسول الله ﷺ اتدرون ما هذه الريح - هذه الريح الذين يغتابون المؤمنين ·

"হযরত জাবির (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমরা কি বুঝতে পারছ এটা কিসের দুর্গন্ধ ? এ দুর্গন্ধ ঐ সমস্ত মানুষের মুখ থেকে ছড়াচ্ছে, যারা মুসলমানদের নিন্দা করছে।" হাদীসটি ইমাম আহমদ এবং ইবন আবূ দুনিয়া রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদের সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ. পৃ. ৩০০, মিসরে মুদ্রিত)।

এ হাদীস দ্বারা প্রকাশ পেল যে, গীবতের দুর্গন্ধ নবী (সা) এবং যারা তাঁর পাশে ছিলেন, সবাই অনুভব করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ঘটনা এই ছিল যে, এটা কিসের দুর্গন্ধ তা তিনি বলে দেয়ার পর সবাই বুঝতে পেরেছিলেন।

হাফিয সুয়ূতী খাসাইসুল কুবরা গ্রন্থে باب ما وقع فى غزوة بنى مصطلق من الايات। শিরোনামের অধীনে[২] আবূ নুয়াইম সূত্রে নিম্নরূপ বাক্যযোগে উদ্ধৃত করেন :

عن جابر رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله ﷺ فى سفر فهاجت ريح منتنه فقال النبى ﷺ ان ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المؤمنين فلذلك هاجت هذه الريح ·

---

১. এ ব্যাপারে মাসআলা অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা, পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী জনাব কারী মুহাম্মদ তায়্যেব প্রণীত التشبية فى الاسلام পুস্তকটি পর্যালোচনা করুন। এ বিষয়ে এ পুস্তকটি অতুলনীয়।

২ অর্থাৎ এ অধ্যায়টি হলো বনী মুস্তালিক যুদ্ধে কি কি মু'জিযা সংঘটিত হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে। খাসাইসুল কুবরা, পৃ. ২৩৬।

"হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা এক সফরে নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ করে একটা তীব্র দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। সম্ভবত এরূপ দুর্গন্ধ কেউ কখনো অনুভবও করেনি, শোনেওনি। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : তোমরা এহেন অনভিপ্রেত গন্ধে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। এ সময় কতিপয় মুনাফিক মুসলমানদের গীবত করছে, কাজেই এ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।" অর্থাৎ এটা ঈমানদারদের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচারণা, কাজেই তা অধিক দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

এবং একই ধরনের একটি ঘটনা মদীনার সন্নিকটে পৌঁছার পর সংঘটিত হয়। যেমনটি সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন আমরা এ সফর (অর্থাৎ বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ) থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনার সন্নিকটে পৌঁছলাম, তখন হঠাৎ করেই তীব্র একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। নবী (সা) বললেন : এ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে কোন মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে। যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম, তখন জানতে পেলাম, একটি দুষ্ট মুনাফিক মৃত্যুবরণ করেছে (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২৩৬)।

খুব সম্ভব ঐ মুনাফিকের দুষ্ট ও পাপিষ্ঠ রূহ-এর কারণে ময়দানময় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল, যা নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা) অনুভব করেছিলেন।

মানুষের জন্য এটা আবশ্যিক যে, যে সম্মানিত বুযর্গগণকে আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকের পরিচিতি উন্মোচিত করে দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং উত্তমরূপে বুঝে নেয় যে, যে সমস্ত অনুভূতিহীন ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত ব্যক্তি গোলাপ এবং পেশাবের সুগন্ধি ও দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারে না, তাদের অনুভূতির সুস্থতার সপক্ষে তা প্রমাণ হতে পারে না। তারা পবিত্র কালেমার খুশবু এবং অপবিত্র কালেমার দুর্গন্ধ কি করে অনুভব করবে? অতএব বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, বুঝে নিন।

জামে তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ماجاء به "যখন বান্দা মিথ্যে বলে, তখন ফেরেশতাগণ মিথ্যে কথার দুর্গন্ধে এক মাইল দূরে চলে যান।" (জামে তিরমিযী, ৪খ. পৃ. ১৯)।

মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, সুনানে আবূ দাঊদ, নাসাঈ এবং মুস্তাদরাকে হাকিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন : "যে ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে আল্লাহর স্মরণ ছাড়াই (প্রস্থানের উদ্দেশ্যে) দাঁড়িয়ে গেল, সে যেন মৃত গর্দভের পাশ থেকে উঠে গেল।" ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ। হাকিম বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত একটি হাদীসে কুদসীতে এসেছে : "বান্দা যখন কোন নেককাজের ইচ্ছা করে, তখন ফেরেশতা তার আমল করার পূর্বেই কেবল ইচ্ছা করার কারণেই একটি নেকী লিখে নেন। আর আমলটি করলে এর জন্য দশগুণ থেকে

সাতশ' গুণ পর্যন্ত লিখে নেন। আর বান্দা যখন বদকাজ করার ইচ্ছা করে, তখন কাজটি না করা পর্যন্ত কোন গুনাহ লিখেন না।" হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্মানিত লিখক ফেরেশতাগণ মানুষের অন্তরের ইচ্ছা এবং মনের আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধেও কিছু কিছু খবর রাখেন। অন্যথায় তারা যদি নাই জানতেন, তাহলে শুধু নেককাজের ইচ্ছে করলেই নেকী কিভাবে লিখতেন ? আবূ ইমরান জূফী বলেন, ঐ সময় ফেরেশতাকে আহ্বান করে বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তির আমলনামায় এ নেকী লিখে নাও। ফেরেশতা আরয করেন, আয় পরোয়ারদিগার ! সে তো এখনো এ আমলটি করেই নি। জবাবে বলা হয়, যদিও সে নেককাজটি করেনি, কিন্তু করার ইচ্ছে তো করেছে।

সুফিয়ান ইবন উবায়েদ (র) বলেন, যখন কোন বান্দা কোন নেককাজের ইচ্ছে করে, তখন তার অন্তর থেকে একটি পবিত্র সুগন্ধি ছড়াতে থাকে। ফলে ফেরেশতা বুঝতে পারেন যে, এ ব্যক্তি নেককাজের ইচ্ছে করেছে। আর যখন খারাপ কাজের ইচ্ছে করে, তখন তার মধ্য থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। ফেরেশতা বুঝতে পারেন যে, এ ব্যক্তি পাপকাজের ইচ্ছে করেছে। হাফিয আসকালানী বলেন, এ বক্তব্যই তাবারী আবূ মি'শার মাদানী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর আমি হাফিয মুগালতাই কৃত শরাহ-এ এ মর্মে একটি মরফূ হাদীসও দেখেছি (ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ২৭৮, রিকাক অধ্যায়, পরিচ্ছেদ 'মান হুম বে হাসানাতিন আও বে সায়্যিআতিন')।

যেভাবে প্রতিটি আতরের পৃথক পৃথক সুগন্ধি হয়ে থাকে, আশ্চর্যের কিছু নেই যে, অনুরূপভাবে প্রতিটি নেককাজের পৃথক পৃথক সুগন্ধি হয়ে থাকে। আর আতর বিক্রেতা যেমন গন্ধ শুঁকেই চিনে ফেলে যে, এটা অমুক আতরের খুশবু, সম্ভবত ফেরেশতাগণও খুশবু শুঁকেই বুঝতে পারেন যে, এটা অমুক সৎকর্মের সুগন্ধি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভাল জানেন, তাঁর জ্ঞানই পরিপূর্ণ ও সুবিবেচনা প্রসূত।

আরিফে রব্বানী শায়খ আবদুল ওহাব শা'রানী বলেন :

كان وهب بن منبهة رحمة الله تعالى يقول لايموت عبد حتى يرى الملكين الكاتبين فان كان صحبهما بخير قالا له جزاك الله من صاحب خيرا فنعم الصاحب كنت فكم احضرتنا فى مجالس الخير ولم سممنا منك الروائح الطيبة حال طاعتك الخالصة - وان كان قد صحبهما بسؤ قالا له لا جزاك الله عنا من صاحب خيرانكم احضرتنا معك حال معاصيك وكم سممنا منك رائحة تتبيه المغترين ٠

"ওহাব ইবন মুনাব্বিহ (র) বলতেন যে, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না যতক্ষণ না সে মৃত্যুর পূর্বেই লিখক ফেরেশতাদ্বয়কে দেখে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি যদি কিরামান কাতিবীনের সাথে সৎকাজের সাথে জীবন যাপন করে থাকে, তখন ফেরেশতা তাকে বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিফল দিন, আল্লাহ তোমার মঙ্গল

করুন। তুমি বড়ই উত্তম সাথী ছিলে, তোমার কতই না মর্যাদা, তুমি কল্যাণকর মজলিসসমূহে আমাদেরকে সাথে রাখতে, কতবার তোমার একনিষ্ঠ ইবাদতের সুঘ্রাণ আমরা উপভোগ করেছি!' আর যদি ঐ ব্যক্তি 'কিরামান কাতিবীনে'র সাথে মন্দ জীবন যাপন করে থাকে, তা হলে ফেরেশতা তাকে ঐ সময় বলেন, 'আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিফল থেকে বঞ্চিত করুন, কতবার তোমার কারণে পাপের মজলিসসমূহে তোমার সাথে শরীক হতে হয়েছে, আর কতবার তোমার পাপের দুর্গন্ধ আমাদেরকে শুঁকতে হয়েছে !"

মুহাম্মদ ইবন ওয়াসে (র) আপন সঙ্গীদের বলতেন :

وكان محمد بن واسع رحمة الله تعالى يقول لاصحابه قد غرقنا فى الذنوب ولو احذا منكم يجد منى ريح الذنوب لما استطاع ان يجلس الى ·

"আমি আপাদমস্তক পাপে নিমজ্জিত আছি। তোমদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তি যদি পাপের দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারত, তা হলে ঐ দুর্গন্ধের কারণে আমার কাছে কখনই বসত না।"

این سخن رانیست هرگز اختتام * بس سخن کوتاه بائد والسلام ·

"এ সুখী জীবনই কখনো এভাবেই সমাপ্ত হবে না, এ সুখ শান্তিধাম থেকে অনেক দূরে।"

আশ্চর্যের বিষয় যে, আবদুল্লাহ ইবন উবাই তো ইসলামের দুশমন ও মুনাফিকের সর্দার ছিল, অথচ তার পুত্র যাঁর নামও আবদুল্লাহই ছিল, তিনি ছিলেন ইসলামের অনুগত ও আত্মোৎসর্গকারী, প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা, আর তার পিতা তো ছিল স্রেফ নামে আবদুল্লাহ। হযরত আবদুল্লাহ (রা) যখন তার পিতাকে এ কথা বলতে শুনলেন যে, মদীনা পৌঁছে আমরা সম্মানিতরা মিলে অসম্মানিতদেরকে বের করে দেব, তখন তিনি আপন পিতাকে ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ঐ পর্যন্ত কখনই মদীনায় যেতে দেব না, যে পর্যন্ত না তুমি স্বীকার করছ যে, তুমিই নিকৃষ্ট এবং রাসূলুলল্লাহ (সা) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সুতরাং পিতা যখন এ ঘোষণা দিল, তখন পুত্র তাকে ছেড়ে দিলেন। হাফিয আসকালানী বলেন, এ ঘটনাটি ইবন ইসহাক এবং তাবারী উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল বারী, সূরা মুনাফিকূন)।

মদীনা পৌঁছে হযরত আবদুল্লাহ (রা) পবিত্র খিদমতে হাযির হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দান করতে পারেন। যদি অনুমতি হয় তা হলে আমি তাকে হত্যা করে আপনার খিদমতে উপস্থিত করি। পক্ষান্তরে যদি আপনি অপর কাউকে হত্যার আদেশ দেন আর আমি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধে হন্তাকে বধ

করি, তাহলে তো একজন মুসলমানকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হব। তিনি (সা) তাঁকে তাঁর পিতাকে হত্যা করতে নিষেধ করেন এবং তার সাধে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেন।

ইফকের ঘটনা

ইফকের ঘটনা অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ এ সফর থেকে ফেরার পথেই ঘটেছিল, যা বিস্তারিতভাবে সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখিত আছে; তা নিম্নরূপ :

এ সফরে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) নবী (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। যেহেতু পর্দার হুকুম নাযিল হয়েছিল, এজন্যে হাওদার মধ্যে সওয়ার করানো হতো, যখন অবতরণ করানো হতো, তখনো হাওদাসহ অবতরণ করানো হতো এবং হাওদায় পর্দা লটকানো থাকত। ফিরতি পথে মদীনার সন্নিকটে একস্থানে অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছিল। বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার উদ্দেশ্যে বাহিনী থেকে দূরে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে হারটি ছিঁড়ে যায়—যা অত্যন্ত মূল্যবান পাথরের তৈরি ছিল। পাথরগুলো একত্র করতে গিয়ে বিলম্ব হয়ে গেল। কাফেলা যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল। হাওদার মুখেও পর্দা দেয়া ছিল। লোকেরা মনে করল যে, উম্মুল মু'মিনীন হাওদার মধ্যেই আছেন। কাজেই তারা হাওদা উটের পিঠে উঠিয়ে দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করল। সে সময় মহিলারা সাধারণত হালকা পাতলা হতেন, আর বিশেষত হযরত আয়েশা (রা) অল্পবয়স্কা হওয়ার ফলে আরো বেশি হালকা ছিলেন। কাজেই হাওদা উঠানোর সময় এর ওজন সম্বন্ধে লোকের মনে কোনরূপ সন্দেহ দেখা দেয়নি। কাফেলা রওয়ানা হওয়ার পর হার পেলেন। যখন হার পেলেন তখন সেনা কাফেলার যাত্রা বিরতির স্থলে ফিরে এলেন কিন্তু তখন সেখানে কেউ ছিল না, সবাই চলে গিয়েছিল। তখন তিনি এ চিন্তা করলেন যে, সামনের বিরতিস্থলে যখন আমাকে পাওয় যাবে না, তখন তো আমাকে খুঁজতে এখানেই লোক পাঠানো হবে। তাই সেখানেই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন।

হযরত সাফওয়ান ইবন মুআত্তাল সুলামী (রা), যিনি কাফেলার কোন জিনিস ফেলে যাওয়া হলে এর তত্ত্ব-তালাশের উদ্দেশ্যে পেছনে থাকতেন, তিনি এসে পড়লেন এবং দেখামাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে চিনে ফেললেন। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি হযরত আয়েশাকে দেখেছিলেন। দেখামাত্র তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করলেন। তাঁর আওয়াজে আয়েশা সিদ্দীকার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে তিনি চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : والله ما كلمنى كلمه ولا سمعت والله ما منه كلمة غير استرجاعه "আল্লাহর কসম, সাফওয়ান আমার সাথে কোন কথাই বলেন নি এবং না তার মুখ থেকে ইন্না লিল্লাহ ছাড়া আর কোন বাক্য শুনেছি।"

[খুব সম্ভব হযরত সাফওয়ান (রা)-এর উচ্চস্বরে ইন্না লিল্লাহ পাঠ এজন্যে ছিল যে, যাতে উম্মুল মু'মিনীন জাগ্রত হন এবং সম্বোধন কিংবা বাক্যালাপের কোন সুযোগ না ঘটে; কাজেই তা ঘটেওনি]।

হযরত সাফওয়ান (রা) নিজের উট উম্মুল মু'মিনীনের কাছে বসিয়ে দেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, সাফওয়ান (রা) উট সামনে এগিয়ে দিয়ে নিজে পিছনে সরে যান। উম্মুল মু'মিনীন আরোহণ করলে হযরত সাফওয়ান (রা) উটের লাগাম ধরে চলতে থাকেন। অবশেষে সেনাদলের সাথে মিলিত হন। সময়টা ছিল ভর দুপুর। আবদুল্লাহ ইবন উবাই এবং মুনাফিকের দল দেখামাত্র ধ্বংস ও বরবাদ ইত্যাদি আবোল তাবোল বকতে শুরু করে দিল। মূলত যাদের ধ্বংস ও বরবাদ হওয়ার কথা ছিল, তারা ধ্বংস ও বরবাদ হলো।

মদীনা পৌঁছে হযরত আয়েশা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একমাস অসুস্থাবস্থায় কেটে গেল আর সুযোগ সন্ধানীরা এ সময় সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিল। তারা কুৎসা গাইতে থাকল কিন্তু হযরত আয়েশা এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাঁর প্রতি আগ্রহ ও অনুগ্রহে ঘাটতির কারণে তাঁর মনে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দেখা দিণ। যেমন আগে অসুস্থ হয়ে পড়লে যেরূপ আবেগ উৎকণ্ঠা দেখা দিত, তা যেন কমে গেছে ! ব্যাপার কি যে, তিনি ঘরে আসতেন এবং অপরকে আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ফিরে যেতেন ! আমাকে জিজ্ঞেস করতেন না। তাঁর এ উদাসীনতা আমার কষ্টকে আরো বাড়িয়ে দিল। এক রাতে আমি এবং উম্মে মিসতাহ[1] প্রাকৃতিক প্রয়োজনে জঙ্গলের দিকে গমন করি। সে সময় আরবে এটা নিয়ম ছিল যে, দুর্গন্ধের কারণে কারো বাড়িতে পায়খানা বানানো হতো না। পথিমধ্যে উম্মে মিসতাহ তার পুত্র মিসতাহকে গালমন্দ করল। হযরত আয়েশা বললেন, এমন ব্যক্তিকে কেন খারাপ বলছ, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন ? উম্মে মিসতাহ বলল, ওহে সহজ সরল, তোমার তো ঘটনা সম্পর্কে খবর নেই। আয়েশা সিদ্দীকা বললেন, কি ঘটনা? উম্মে মিসতাহ সমুদয় ঘটনা খুলে বললেন। শোনামাত্র রোগ যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পেল। সাঈদ ইবন মানসূর বর্ণিত একটি মুরসাল রিওয়ায়াতে আছে যে, শোনামাত্র কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে গেল। মুজামে তাবারানীতে বিশুদ্ধ সনদে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আমি এ ঘটনা শুনলাম, তখন আমার এমন দুঃখ হলো যে, অজ্ঞাতসারে মনে ইচ্ছে হলো যে, নিজেকে কূপে বিসর্জন দেই (আবূ ইয়ালাও এটি বর্ণনা করেছেন)।

১. হযরত উম্মে মিসতাহ (রা)-এর মাতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খালা ছিলেন এবং উম্মে মিসতাহ ছিলেন খালাতো বোন আর হযরত মিসতাহ (রা) ছিলেন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ভাগ্নে।

প্রয়োজন পূরণ না করেই[১] আমি পথ থেকেই ফিরে এলাম। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আগমন করলেন, তখন আমি তাঁর নিকট আমার মা-বাবার কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রর্থনা করলাম, যাতে মা-বাবার মাধ্যমে ঘটনাটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে পারি। তিনি অনুমতিদান করলে আমি আমার মা-বাবার গৃহে আসি এবং আমার মাকে বললাম, মা, তোমার কি জানা আছে যে, লোকজন আমাকে নিয়ে কি বলাবলি করছে? মা বললেন, বাছা, তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো না;[২] প্রচলিত নিয়ম এটাই যে, যে মহিলা খুব সুন্দরী ও উত্তম চরিত্রের এবং নিজ স্বামীর কাছে উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়, তখন ঝগড়াটে মহিলারা তার ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ, মানুষের মধ্যে এমনটিও ঘটে! হিশামের বর্ণনায় আছে, আমি বললাম, আমার আব্বাও কি এ ব্যাপারটি জানেন? মা বললেন, হ্যাঁ। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, আমি বললাম, মা, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, মানুষে এমনটা বলাবলি করছে আর তুমি আমাকে খবরটিও দাওনি। এ কথা বলতে আমার চোখভরে পানি এলো এবং গলার স্বর উচ্চ হলো।[৩] হযরত আবূ বকর (রা) দোতলায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন, আমার চিৎকার শুনে নিচে এসে আমার মাকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মা বললেন, ঐ অপবাদ সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এ কথা শুনে আবূ বকর (রা)-এর চোখও অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল।

আর আমার শরীরে এমন কাঁপুনি শুরু হলো যে, আমার মা উম্মে রুমান ঘরের সমস্ত কাপড় নিয়ে এসে আমার গায়ে চাপিয়ে দিলেন। সারা রাত কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পানি বন্ধ হলো না। এভাবেই প্রভাত হয়ে গেল। ওহী নাযিলে যখন বিলম্ব হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা) এবং

---

১. এটা হিশাম ইবন উরওয়ার রিওয়ায়াত এবং সহীহ, যেমনটি অপরাপর সহীহ রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়। আর কতিপয় বর্ণনায় এ ধারণা হয় যে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ শেষে ফেরার পথে তিনি এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন, কিন্তু এটা সহীহ নয়; প্রথমটাই সহীহ। বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৩৫৪ দেখুন।

২ সহীহ বুখারীর বাক্যাবলী এরূপ : قالت يا بنيت هو فى عليك فوالله لقلما كانت امرأة قطه وضئة عند رجل يحبها ولها ضرائر الاكثرن عليها শব্দটি একবচনে হয় ضرة যার অর্থ সতীন কিন্তু প্রকৃত আভিধানিক অর্থে ঐ স্ত্রীলোককে বলা হয় যে কোন স্ত্রীলোকের ক্ষতি ও লোকসানের কারণে পরিণত হয়। যেহেতু হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক (রা)-এর কোন সতীন অর্থাৎ নবী (সা)-এর অপরাপর সহধর্মিণিগণ হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে ইশারা ইঙ্গিতেও কোন কথা বলেননি; যা শীঘ্রই আসছে, সেহেতু আমরা শব্দটির এ অর্থ করেছি, যে মহিলারা হিংসার বশবর্তী হয়ে অন্যের ক্ষতির কারণে পরিণত হয়, যেন সে সব স্ত্রীলোক হিংসার কারণে সতীনের মতই কাজ করল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

৩. হযরত আয়েশা (রা) বলেন : যখন আমি এ অপবাদ সম্পর্কে অবহিত হলাম, তখন ইচ্ছা হলো যে, কুয়োয় পড়ে মরে যাই। তাবারানী এটি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। মাজমাউয যাওয়াইদ, ৯খ. পৃ. ২৪০।

হযরত উসামা (রা)-এর সাথে পরামর্শ করলেন। يا رسول الله هم اهلك "হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো আপনারই পরিবার, যা আপনার নবূওয়াতের মর্যাদা এবং রিসালাতের ইযযতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাঁর পবিত্রতা ও সতীত্ব সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ নেই। আপনার সহধর্মিণিগণের পবিত্রতা তো সূর্য অপেক্ষা দেদীপ্যমান, এ ব্যাপারে ফয়সালা ও পরামর্শের কি প্রয়োজন ? আর যদি রাসূল আমাদের ধারণা সম্পর্কে জানতে চান, তা হলে বলব, وما نعلم الا خيرا "আমরা তাঁর সম্পর্কে যতদূর জানি, উত্তম বৈ কিছু জানি না।" আপনার পরিবার ও পবিত্র সহধর্মিণিগণের মধ্যে আমরা কখনো ভাল এবং উত্তম, নেকী এবং কল্যাণ ছাড়া কিছুই দেখিনি।

হযরত আলী (ক) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুঃখ, চিন্তা, শোক ও ব্যথায় ম্রিয়মান দেখে বললেন :

يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وان تسال الجارية تصدقك ۔

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ আপনাকে কোন সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ করেননি, তিনি ছাড়া আরো অনেক স্ত্রীলোক আছেন, আপনি যদি আপনার গৃহের দাসীকে জিজ্ঞেস করেন, তবে সে সত্য কথা বলে দেবে।"[১]

অর্থাৎ আপনি নিরুপায় নন, তালাক দেয়ার অধিকার আপনার হাতে, কিন্তু প্রথমে ঘরের দাসীর কাছে অনুসন্ধান করুন। সে আপনার কাছে সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলবে (এ জন্যে যে, দাসী-বাঁদীরা পুরুষ অপেক্ষা পরিবারের অভ্যন্তরের খবর সম্পর্কে বেশি অবহিত থাকে)।

কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা এ সন্দেহ হয় যে, হযরত আয়েশা (রা) এ পরামর্শের দরুন হযরত আলী (ক)-এর প্রতি বিষন্ন ছিলেন। কাজেই যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এ বিষন্নতা ও অভিযোগও তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ মহব্বত ও পূর্ণ সুসম্পর্কের প্রমাণ। মনোমালিণ্য ও অভিযোগ আপনজনের মধ্যেই হয়ে থাকে, অপরের সাথে নয়। অধিকন্তু হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এ সময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর মাথায় ছিল পর্বত প্রমাণ দুঃখ-বেদনা, এ অবস্থায় মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এ অবস্থায় তুচ্ছ কোন কথাও বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত আলী (ক)

১. আল্লাহ মাফ করুন, হযরত আলী (ক)-এর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর পবিত্রতা এবং অমলিনতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহও ছিল না, এ কথাগুলো কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্ত্বনাদানের জন্যই বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, চিন্তা ও বেদনার দরুন যাতে দ্রুত বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে না বসেন; বরং প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখেন এবং প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখার পূর্বে কোন ধারণা আস্থার সাথে গ্রহণ না করেন। আর তাঁকে বারীদা দাসীর নিকট অবস্থা জিজ্ঞেস করার পরামর্শ এজন্যে দেন যে, তার ব্যাপারে হযরত আলীর এ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি উম্মুল মু'মিনীনের পবিত্রতা ও নিষ্পতার ব্যাপারে তাঁর থেকে বেশি অবহিত। ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ২৮৭।

রাসূল (সা)-এর দুর্ভাবনা দেখে তাঁকে সান্ত্বনাদানের উদ্দেশ্যে এ কথাগুলো বলেছিলেন। প্রকাশ্যত তিনি নবীজীকে অগ্রাধিকার দেন এবং সুপ্তভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর পবিত্রতা ও নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারটা এভাবে বলেন যাতে রাসূল (সা) তাঁর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন না হন। শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে পড়বে এবং আপাতত বারীদাকে জিজ্ঞেস করে নিন। তিনি বারীদাকে ডাকান। মিকসামের বর্ণনা অনুযায়ী বারীদাকে ডেকে নিয়ে তিনি বলেন :

اتشهدين انى رسول الله قالت نعم قال فانى سألك عن شىء فلا تكتمينه قال نعم قال هل رأيت من عائشة ما تكر هينه قالت لا ·

"তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল ? বারীদা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, কিছু লুকোবে না কিন্তু (অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা ওহীর দ্বারা আমাকে জানিয়ে দেবেন)। বারীদা বললেন, হ্যাঁ, গোপন করব না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আয়েশার মধ্যে অপসন্দনীয় কিছু দেখেছ ? বারীদা বললেন, না।

বুখারীতে আছে, তিনি বারীদাকে বললেন : اى بريره هل رأيت من شىء يريبك "ওহে বারীদা, যদি তুমি বিন্দুমাত্রও এমন কিছু দেখে থাক যা তোমাকে সন্দেহ ও সংশয়ে ফেলেছে, তা হলে আমাকে বল।"

বারীদা বললেন :

لا والذى بعثك بالحق ان رأيت عليها امرا اغمصه عليها سوى انها جارية حديثة السمن تنام عن عجين اهلها فتاتى الداجن فتاكله ·

"ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আয়েশার মধ্যে কোন দোষ কিংবা ধর্তব্য কোন অপরাধ কখনো দেখিনি, এটা ছাড়া যে, তিনি এক স্বল্পবয়স্কা বালিকা, আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন আর বকরির বাচ্চা এসে তা খেয়ে যায়।"

অর্থাৎ তিনি এতটাই উদাসীন ও অসতর্ক যে, আটা এবং ডালের খবরও তাঁর নেই, তিনি পৃথিবীর এ চাতুর্যের খবর কিভাবে জানবেন (ইবনুল মুনীর, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর চেহারা নূরান্বিত করুন, উপরোক্ত বাক্যের এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন)।

রাসূলুল্লাহ (সা) বারীদার এ জবাব শুনে মসজিদে যান এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেন। প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করেন। এর পর আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের উল্লেখ করে বলেন :

يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى اذ الا فى اهل بيتى فوالله ما عامت على اهلى الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الاخيرا ·

"হে মুসলিম সম্প্রদায়, কে আছো যে আমাকে ঐ ব্যক্তির মুকাবিলায় সাহায্য করবে, যে আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে দুঃখ দেয়। আল্লাহ কসম, আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে নেকী এবং পবিত্রতা ছাড়া কিছুই দেখিনি। আর এ ব্যাপারে যে ব্যক্তির নাম বলা হচ্ছে, তার মধ্যেও আমি কল্যাণ ও উত্তম ছাড়া কিছু দেখিনি।"

এ কথা শুনে আওস গোত্রের সর্দার হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য উপস্থিত। ঐ ব্যক্তি যদি আমাদের আওস গোত্রের হয়, তাহলে আমি নিজেই তার মাথা কেটে ফেলব। আর যদি খাযরাজ গোত্রের হয়, তবে আপনি আদেশ করুন, আমরা পালন করব।

খাযরাজ সর্দার হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর এ ধারণা হলো যে, সা'দ ইবন মু'আয ইফকের ঘটনায় খাযরাজ গোত্রের প্রতি এ মর্মে ইঙ্গিত করছেন যে, ঐ ব্যক্তি খাযরাজ গোত্রভুক্ত, এতে তার উত্তেজনা এসে যায় (যেমন ইবন ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী তার বক্তব্য ছিল) :

হযরত সা'দ ইবন মু'আযকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহর শপথ, তুমি তাকে কখনই হত্যা করতে পারবে না (অর্থাৎ যদি আমাদের সম্প্রদায়ের হয়, তবে আমরা নিজেরাই তাকে হত্যা করার সৌভাগ্য অর্জন করব)।

সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর চাচাতো ভাই হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) দাঁড়ান এবং সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি ভুল বলছ, রাসূল (সা) যখন আমাদেরকে হত্যা করার আদেশ করবেন তখন আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব, যদিও সে ব্যক্তি খাযরাজ গোত্রের কিংবা অপর কোন গোত্রের হোক, কেউ আমাদেরকে আটকাতে পারবে না। আর তুমি কি মুনাফিক, যে মুনাফিকের পক্ষ নিয়ে বাদানুবাদ করছ ? এভাবে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হতে থাকল, এমনকি উভয় সম্প্রদায় পরস্পরে লড়াই বাঁধিয়ে দেয়ার উপক্রম হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন এবং লোকজনকে চুপ করালেন। হযরত আয়েশা বলেন, এদিনও পুরোটাই আমার কাঁদতে কাঁদতে কেটে গেল, এক মুহূর্তের জন্য অশ্রু বন্ধ হয়নি। রাতটাও এভাবেই কাটল। আমার অবস্থা দেখে আমার পিতামাতার ধারণা ছিল যে, এখনি তার কলিজা ফেটে যাবে। যখন প্রভাত হলো, তাঁরা দু'জনই আমার কাছে এসে বসলেন আর আমি কেঁদেই চলছিলাম। ইত্যবসরে এক আনসারী মহিলা এলো এবং সেও আমার সাথে কাঁদতে শুরু করল। এ মুহূর্তে রাসূল (সা) আগমন করলেন এবং সালাম করে আমার পাশে বসে পড়লেন। ঐ ঘটনার পর আর কোন সময়ই তিনি আমার পাশে এসে বসেন নি। ওহীর অপেক্ষায় একমাস কেটে গিয়েছিল। বসে তিনি প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলেন এর পর বললেন :

اما بعد يا عائشة فان بلغنى عنك كذا وكذا فان كنت بريئة فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه ٠

"হে আয়েশা, আমার কাছে তোমার ব্যাপারে এমন এমন সংবাদ পৌছেছে। যদি তুমি নির্দোষ হও, তাহলে আল্লাহ অনতিবিলম্বে তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন আর যদি তুমি কোন গুনাগ করে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার কর। কেননা বান্দা যখন গুনাহকে স্বীকার করে এবং আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করে, তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।"

হযরত আয়েশা বলেন, যখন তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন, তৎক্ষণাৎ আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল, এমনকি একফোঁটাও রইল না। আমি আমার পিতাকে বললাম, আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথার জবাব দিন। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি না যে, কি জবাব দেব। এরপর আমি আমার মাকে বললাম। তিনিও একই জবাব দিলেন। এরপর আমি নিজেই জবাব দিলাম, আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, কিন্তু এ কথা তোমাদের অন্তরে এ কারণে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, যদি আমি বলি, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ ভাল করেই জানেন যে, আমি নির্দোষ, তা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করবে না, আর যদি আমি স্বীকার করি, যদিও আল্লাহ জানেন আমি নির্দোষ, তাহলে তোমরা বিশ্বাস করবে। এরপর কেঁদে ফেলে বললাম, والله لا اتوب مما ذكروا ابدا "আল্লাহর কসম, যে বিষয়ে এরা আমাকে সম্পৃক্ত করছে, সে ব্যাপারে আমি কখনো তাওবা করব না। কাজেই আমি সে কথাই বলি, যা ইউসুফ (আ)-এর পিতা[১] বলেছিলেন صَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ আর এ কথা বলেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর ঐ সময় আমার অন্তরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন, কিন্তু এ বিশ্বাস ও ধারণা ছিল না যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করবেন যা সব সময় তিলাওয়াত ও পাঠ করা হবে।

এক রিওয়ায়াতে আছে, আমার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হবে, যা মসজিদে এবং নামাযে পাঠ করা হবে। তবে হ্যাঁ, এ আশা ছিল যে, আল্লাহ স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমার নির্দোষ থাকার কথা বলে দেবেন এবং এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অপবাদ থেকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন।

পাক-পবিত্রতায় উম্মতে মুহাম্মদীর মরিয়ম (আ) নবী (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণী, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর নির্দোষিতার

১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ঐ সময় তাঁর হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নামও স্মরণে আসেনি।

ব্যাপারে পবিত্র আয়াতের অবতরণ; তাঁর পিতা, তাঁর মাতা এবং যারা তাঁর নির্দোষ ও পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন তাঁদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন, আর তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ যারা তাঁর নিষ্পাপ ও পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে,[১] আমীন, সুম্মা আমীন।

রাসূলুল্লাহ (সা) এখনো তাঁর জায়গা থেকে উঠেনও নি, ইত্যবসরে আল্লাহর ওহী নাযিলের চিহ্ন দেখা গেল। ফলে প্রচন্ড শীতের মধ্যেও পবিত্র কপাল থেকে মুক্তাদানার মত ঘাম ঝরতে শুরু করল। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে :

فاما انافو الله ما نزعت قد عرفت انى بريئة وان الله غير ظالمى وما ابواى غما سرى عن رسول الله ﷺ حتى ظننت لتخرجن انفسهما فرقا من ان يأتى من الله تحقيق ما يقول الناس ·

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যে সময় তাঁর প্রতি ওহী নাযিল শুরু হয়, আল্লাহর কসম, আমি মোটেও ঘাবড়াইনি। কেননা আমি জানতাম যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি যুলুম করবেন না। কিন্তু ভয়ে আমার মা-বাবার অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, আমার সন্দেহ হচ্ছিল, তাঁদের প্রাণ বেরিয়ে না যায়! তাঁদের সন্দেহ হচ্ছিল, পাছে লোকজন যা বলছে, সে মর্মে ওহী নাযিল না হয়ে যায়।

আবূ বকর (রা)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে তাকাচ্ছেন আর কখনো আমার দিকে। যখন রাসূলুল্লাহর দিকে তাকাচ্ছিলেন তখন এ সন্দেহ হচ্ছিল যে, না জানি আসমান থেকে কি হুকুম নাযিল হয়ে যায় যা কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তিত হবে না। আর যখন আমার দিকে দেখছিলেন, তখন আমার নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ভাব দেখে তাঁর মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হতো। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ছাড়া ঘরের আর সবাই আশা-নিরাশার দোলায় দুলছিল। এমতাবস্থায় ওহী নাযিল সমাপ্ত হলো এবং নবীজীর পবিত্র চেহারায় আনন্দ ও খুশির আভা ফুটে উঠল। তিনি মুচকি হাসছিলেন এবং কপাল থেকে ঘাম মুছে ফেলতে ফেলতে হযরত আয়েশার দিকে মনোনিবেশ করলেন। প্রথম যে বাক্য তাঁর পবিত্র মুখ থেকে বের হল, তা হল : ابشرى يا عائشة قد انزل الله براءتك "তোমার জন্য সুসংবাদ হে আয়েশা, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমার নির্দোষ হওয়ার বিষয় নাযিল করেছেন।"[২]

---

১. আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট আছেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি, তাঁর মাতার প্রতি, তাঁর পিতার প্রতি এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতি, যাঁরা তাঁর পবিত্রতা ও নির্দোষ হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। আর অভিশাপ ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতি, যারা তাঁর নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কিংবা ইতস্তত করে। আমীন।

২ এ বাক্যাবলী সহীহ বুখারীর পৃ. ৭০০-তে বর্ণিত আছে। আর বুখারীর অপর রিওয়ায়াতে বর্ণিত বাক্যাবলী হলো : يا عائشة اما الله عز وجل برأك

আমার মাতা বললেন, হে আয়েশা, উঠো এবং রাসূলুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, যে আল্লাহ্ আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করে ওহী নাযিল করেছেন, তিনি ছাড়া আমি আর কারো শুকরিয়া আদায় করব না।

দ্রষ্টব্য : হযরত আয়েশা সিদ্দীকার দুঃখ-বেদনার কারণে এ অবস্থা ছিল, যেমন সিদ্দীকা হযরত মরিয়ম (আ)-এর ছিল يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا (হায়, এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম ! লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম!) এহেন নৈরাশ্যের অবস্থায় যখন কুরআন মজীদের দশটি আয়াত تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ উহা পরিপূর্ণ দশ) হযরত আয়েশার পূর্ণ নির্দোষ হওয়া ও পবিত্রতার বর্ণনায় অবতীর্ণ হলো, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার অন্তরে এমন উদ্বেল নিয়ন্ত্রণহীনতার সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছু তাঁর দৃষ্টি বহির্ভূত হয়ে পড়ল। অন্যথায় এ কল্যাণকর পুরস্কার এবং আসমানী ওহী সব কিছুই মহানবী (সা)-এর সহধর্মিণী হওয়ার ওসীলা এবং মর্যাদার কারণেই হয়েছিল, আর ওসীলা ও মাধ্যমের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। হযরত আয়েশার ঐ উদ্বেলিত অন্তরে নবীর শোকর করতে অস্বীকৃতি ছিল তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসার অবস্থা। আর সর্বোচ্চ ভালবাসার অবস্থা এই হয়ে থাকে যে, অন্তর যার সাথে একাকার হয়ে মিশে যায়, মুখ তার বিপরীতটাই প্রকাশ করে। বাহ্যিকভাবে বিরূপ ও বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পায় কিন্তু অন্তর ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে থাকে। বাইরে এক অবস্থা থাকে আর অন্তরে শত-সহস্র ভালবাসা নিহিত ছিল।

এরপর নবী করীম (সা) ইরশাদ করলেন যে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاۤءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْكُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - لَوْلاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ - لَوْلاَ جَاۤءُوْا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاۤءِ فَاُولٰۤئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ - وَلَوْ لاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ - وَلَوْ لاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ - يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ

الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ - وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۔

"যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে ওদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং ওদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি।[১] যখন তারা এটা শুনল, তখন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করল না এবং বলল না, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ? তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তজ্জন্য মহাশাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত, যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ জ্ঞান[২] করছিলে, যদিও আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর বিষয়। এবং তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়? আল্লাহ পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" (সূরা নূর : ১১-২০)

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নির্দোষিতার আয়াত তিলাওয়াত সমাপ্ত করলেন এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) তাঁর কম্পিত অন্তরে পবিত্রতা-নিষ্কলুষতা, নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্য শুনলেন, তখন উঠলেন এবং আপন নিষ্পাপ নিরপরাধ কন্যার কপালে চুম্বন করলেন। কন্যা বাবাকে বললেন, الا عذرتنى "বাবা, কেন তুমি প্রথম থেকেই আমাকে নির্দোষ ও নিরপরাধ মনে করোনি?"

১. অর্থাৎ হে আবূ বকরের পরিবার, তোমরা নিজেদেরকে মন্দ বলো না, কেননা এটা দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের জন্য উত্তম, কিয়ামতের দিনে তোমাদের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের ব্যাপারে আল্লাহর অনুগ্রহ থাকবে।

২ কোন ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে কারো মুখ থেকে এরূপ বাক্য বের হওয়া যা সত্য নয়, এটা খুবই গুনাহর ব্যাপার। বিশেষত নবীয়ে উম্মী খাতিমুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীনের সহধর্মিণী এবং মুসলমানদের রূহানী মাতার ব্যাপারে এ ধরনের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা কঠিনতম গুনাহ। আল্লাহ তা'আলার শান তাঁর প্রিয় নবীর সহধর্মিণীর ব্যাপারে এ অপবাদ কেন সহ্য করবেন? তাফসীরে ইবন কাসীর।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) (সত্যবাদিতা ও সরলতা যাঁর রগ-রেশার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যিনি সত্য ও সারল্যের বিশাল পাহাড় সদৃশ, বড় থেকে বড় ঘটনা এবং কঠিন থেকে কঠিনতম দুঃখ-বেদনা যাঁকে চুল পরিমাণও সত্য থেকে সরাতে সক্ষম ছিল না) এ সময় কন্যাকে এ জবাব দিয়েছিলেন যা অন্তরের ফলকে উৎকীর্ণ করে রাখার মত। তা ছিল : أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي إِذَا قُلْتُ مَا لَمْ أَعْلَمُ "কোন আসমান আমাকে ছায়াদান করবে আর কোন যমীন আমাকে উঠাবে এবং স্থির রাখবে যখন আমি মুখ দিয়ে ঐ কথা বলব, যে বিষয়ে আমি জানি না।" হাফিয আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৩৬৬-তে এ আসার তাবারী ও আবূ আওয়ানার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং আল্লামা আলূসী বলেন, বাযযার সহীহ সনদে এ আসারটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।—রূহুল মা'আনী, ১৮খ. পৃ. ১০৯, নতুন সংস্করণ।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর গৃহ থেকে মসজিদে গেলেন এবং সাধারণ জনতার উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন ও হযরত আয়েশা (রা)-এর নির্দোষিতার ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াত সবার সামনে তিলাওয়াত করলেন।

এ ফিতনার উদ্ভাবক তো ছিল প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকগণ, আল্লাহর প্রশংসা, কোন মুসলমান এতে শরীক ছিলেন না; মাত্র দু'তিনজন মুসলমান সরল বিশ্বাসী ও আত্মভোলা হওয়ার কারণে মুনাফিকদের এ ধোঁকায় পড়ে যান, যাদের নাম নিম্নরূপ:

মিসতাহ ইবন উসাসা, হাসসান ইবন সাবিত, হামনা বিনতে জাহাশ (রা), তাঁদের প্রতি মিথা অপবাদ আরোপের শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ করা হয়; প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়। আর তাঁরা নিজেদের ভুলের দরুন তাওবা করে নেন। আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বক্তব্য এই যে, তাকে শাস্তি দেয়া হয়নি, এজন্যে যে, সে ছিল মুনাফিক। আর কোন কোন রিওয়ায়াতে জানা যায়, তাকে শরীয়তী শাস্তি দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

মিসতাহ ছিলেন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খালাত ভাই, দারিদ্র্য ও অনটনের কারণে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) তাঁকে অর্থ সাহায্য করতেন। এ ঘটনায় মিসতাহের অংশগ্রহণের দরুন আবূ বকর (রা) কসম করেন যে, আমি আর কখনোই মিসতাহকে সাহায্য করব না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۰

"তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের

দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নূর : ২২)

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এ আয়াত হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে শোনালেন, তখন তিনি বলতে লাগলেন : بلى والله انى لاحب ان يغفر الله لى "কেন নয়, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই চাই যে, আল্লাহ্ আমার ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দিন।" অতঃপর তিনি মিসতাহকে নিয়মমাফিক খরচ দেয়া শুরু করলেন। আর শপথ করলেন, মিসতাহকে অর্থ সাহায্য দান কখনো বন্ধ করবেন না। মু'জামে তাবারানীতে আছে, পূর্বে যা দিতেন এক্ষণে তার দ্বিগুণ দেয়া শুরু করলেন।

এতদসমুদয় বিস্তারিতভাবে সহীহ বুখারী এবং ফাতহুল বারী-তে সূরা নূরে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস সহীহ বুখারীর বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে। হাফিয আসকালানী কিতাবুত-তাফসীরে এ হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। ইফকের ঘটনার শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যত ঘটনা লিখা হয়েছে, এর সবটুকুই সহীহ বুখারী এবং ফাতহুল বারী থেকে নেয়া হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : এ আয়াত অর্থাৎ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ ... ... নাযিলের উদ্দেশ্য ছিল হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে সতর্ক করা, এজন্যে যে, সিদ্দীকের অবস্থান এবং পূর্ণতার বৃত্ত থেকে যেন তাঁর কদম বাইরে না পড়ে। ভুল ও অপরাধের কারণে যদিও হযরত মিসতাহের ভাতা বন্ধ করা বৈধ ছিল, কিন্তু সিদ্দীকিয়তের চাহিদা তো এটাই যে, মন্দের প্রতিদান ভালোর দ্বারা দেয়া হোক। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এ ইঙ্গিত বুঝে ফেলেছিলেন, কাজেই মিসতাহের ভাতা পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ করে দেন। মিসতাহর দ্বারা যদিও ভ্রান্তি ও পদস্খলন ঘটেছিল, যে কেবল শোনা কথায় বিশ্বাস করে বসেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি বদরী সাহাবীদের একজন ছিলেন, যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিল : اَعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "তোমরা যা ইচ্ছা হয়, কর, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।" এজন্যে আল্লাহ তা'আলা বদরী সাহাবী হওয়ার কারণে তার জন্য সুপারিশ করেছিলেন যে, ওহে আবূ বকর, তুমি তো কল্যাণ লাভকারীদের মধ্যে আছো আর মিসতাহ বদরী সাহাবিগণের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই তুমি তার ভাতা কমিয়ে দিও না এবং মিসতাহ যে ভুল করেছে, তুমি তা ক্ষমা করে দিও, আল্লাহ তা'আলা তোমার ভুলগুলো ক্ষমা করে দেবেন।

ফায়দা : এ আয়াত হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মর্যাদার প্রকাশ্য দলীল। এর চেয়ে বেশি আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁকে মর্যাদাবান (أُولُوا الْفَضْلِ) বলেছেন।

এ আয়াত তো হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) প্রসঙ্গে ছিল, এরপর আবার কয়েকটি আয়াত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর নির্দোষ প্রমাণ প্রসঙ্গে এসেছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ - اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ اُولٰئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۔

"যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। যে দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র; এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।" সূরা নূর : ২৩-২৬

অন্যান্য ফায়দাসমূহ

১. এ আয়াত দ্বারা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ফযীলত ও মর্যাদা সুপ্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দোষ ও পবিত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর জন্য ক্ষমা ও পবিত্র জীবিকা প্রদানের ওয়াদা করেছেন, যদ্বারা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ক্ষমা ঘোষণা অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলো। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমার ধারণা ছিল যে, আমার নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি নবী (সা)-কে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখানো হবে, কিন্তু এ ধারণা ও কল্পনা ছিল না যে, আমার নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে কুরআনুল করীমের আয়াত নাযিল হবে- যা সব সময় তিলাওয়াত করা হতে থাকবে। অর্থাৎ এ ধারণা ও কল্পনা ছিল না যে, কিয়ামত পর্যন্ত আমার সতীত্ব ও পবিত্রতার বিষয়টি মসজিদসমূহে, মিহরাবসমূহে, মিম্বরসমূহে এবং নির্জন গৃহসমূহে ঘোষিত হতে থাকবে। দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে আমার নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে, আর দশ সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যা تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা (আ)-এর ন্যায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রতা অতুলনীয় এবং পূর্ণতায় পৌঁছেছে এবং এ পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রতার ঘোষণাও পরিপূর্ণরূপে হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কারণ এটাই যে, যখন মিসতাহ-এর মাতা মিসতাহকে ভালমন্দ বলছিলেন, তখন আয়েশা সিদ্দীখা মিসতাহর মাতাকে বলেছিলেন, মিসতাহকে মন্দ বলো না, কেননা মিসতাহ প্রথম সারির মুহাজির এবং বদরী সাহাবিগণের অন্তর্ভুক্ত।

২. ... ... وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ ... ... আয়াতটি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ফযীলতের পরিস্কার ও উজ্জ্বল প্রমাণ। আল্লাহ্ যাঁকে সাহিবে ফযল (মর্যাদাবান) বলেছেন, তাঁর মর্যাদা ও পূর্ণতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? আল্লামা রাযী (কু. সি.) তাফসীরে কাবীরে চৌদ্দটি পদ্ধতিতে এ আয়াতের মাধ্যমে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মর্যাদা প্রমাণ করেছেন। সম্মানিত ইলম অন্বেষণকারীগণ তাফসীরে কাবীর দেখে নিন।

৩. ইফকের ঘটনা দ্বারা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর পরিপূর্ণ সংযম, চূড়ান্ত পর্যায়ের পরহেযগারীর খবর পাওয়া যায়। এ ঘটনা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলছিল, কিন্তু এ সময়ে তিনি মেয়ের সহায়তা দানের মত একটি কথাও তাঁর মুখ ফুটে বেরোয়নি; দুঃখ ও বেদনায় কেবল একবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মুখ থেকে এ কথা বেরিয়েছিল :

والله ما قبل لنا فى الجاهلية فكيف بعد ما اعزنا الله بالاسلام ·

"আল্লাহর কসম, আমাদের ব্যাপারে এ ধরনের কথা তো জাহিলী যুগেও বলা হয়নি; অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইসলাম দ্বারা আমাদেরকে ইযযত দান করলেন, তার পরেও এটা কি করে সম্ভব ?" হযরত ইবন উমর (রা) সূত্রে তাবারানী এটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৩৬৯)

হাফিয ইবন কায়্যিম (র) বলেন, এ ঘটনা আল্লাহর পক্ষ থেকে বালা ও পরীক্ষা ছিল। উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, যাতে করে মু'মিন ও নিষ্ঠাবানের ঈমান ও সত্যনিষ্ঠা এবং মুনাফিকের নিফাক সুস্পষ্ট ও উন্মোচিত হয়ে যায়। ফলে মু'মিন ও সত্যবাদীর ঈমান ও অবিচলতা এবং মুনাফিকের নিফাক ও অপকর্মে সংযোজন ও বৃদ্ধি ঘটবে। অধিকন্তু যাতে এ ব্যাপারটি প্রকাশ ও উণ্ডোচিত যায় যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং আহলে বায়তের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে আর কে কুধারণা পোষণ করে। নবী (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণিগণের শানে কুধারণা পোষণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে কুধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সম্মানিত, সৃষ্টির সেরা, পৃথিবীর জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ব্যভিচারী ও অসৎ স্ত্রী দিয়েছেন। এ থেকে আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান।

আর যাতে আল্লাহ্ সম্মানিত রাসূল এবং তাঁর রাসূলের পবিত্র স্ত্রীগণের মর্যাদা মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেন। এজন্যে তাঁর সহধর্মিণীগণের সচ্চরিত্রতা ও পবিত্রতার সাক্ষ্য তাঁর মুখে প্রকাশ করান নি; বরং মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রের অভিভাবক ও যিম্মাদার হয়েছেন এবং নিজের পবিত্র কালামের মাধ্যমে তাঁর নিষ্কলুষতার সনদ অবতীর্ণ করেছেন–যা কিয়ামত পর্যন্ত মাহফিলসমূহে, মজলিসসমূহে, মসজিদসমূহে, খুতবা এবং নামাযে পঠিত হতে থাকবে।

মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুপম সম্ভ্রমবোধ এটা সমর্থন করতে পারেনি যে, তাঁর প্রেরিত পূত পবিত্র নবী ও রাসূলের পবিত্র সহধর্মিণিগণের শানে কোন মুনাফিক এবং পাপীষ্ঠ কোন অপবিত্র কথা মুখ থেকে বের করে, এজন্যে প্রায় কুড়িটি আয়াত নাযিল করে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও পবিত্র সহধর্মিণিগণের নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষতা, পূত-পবিত্রতার উপর কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য সিলমোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁদের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতায় সন্দেহ পোষণকারীদের উপর এ ধরনের ধিক্কার ও লাঞ্ছনা আরোপ করেছেন যা মূর্তিপূজকদের প্রতিও করেননি। এ জন্যে আল্লাহ-প্রেমিক আলিমগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি পবিত্র নবী-সহধর্মিণিগণের ব্যাপারে একটি বাক্যও মুখে উচ্চারণ করবে, সে মুনাফিক।

আর ওহী নাযিলে যে একমাস বিলম্ব হয়েছে, এতে এ কৌশল অবলম্বিত হয়েছে যে, যাতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ইবাদতের স্তর পূর্ণতালাভ করে, এভাবে যে, যখন অত্যাচারিতের কান্নাকাটি, অসহায়ের হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের দরবারে দরিদ্র সুলভ আহাজারি, নিঃস্ব সুলভ ফরিয়াদ ও আত্মনিবেদন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কোন প্রকার আশা অবশিষ্ট না থাকে, আর আল্লাহ তাঁর রাসূলের সম্পর্কে সুধারণা পোষণকারীদের আত্মা আল্লাহর ওহী নাযিলের অপেক্ষায় ডাঙ্গায় উঠানো মাছের মত তড়পাতে থাকে, সে সময় আল্লাহ তা'আলা ওহীরূপ বারি বর্ষণ দ্বারা মহব্বতকারী, নিষ্ঠাবান বান্দাদের মুর্দা দিলে প্রাণের সঞ্চার করেন এবং সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক (রা)-কে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার মূল্যবান উপঢৌকন দানে ধন্য করেন।

হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী-তে ইফকের হাদীসের উপকারিতা, এর অন্তর্নিহিত শিক্ষা এবং সে সব মাসআলা ও হুকুম ব্যাখ্যাসহ সবিস্তারে লিখেছেন, যা এ হাদীস থেকে উদ্ভাবন করা যায়, এখানে তা উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই। কাজেই সম্মানিত ইলম অন্বেষণকারীগণ ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৩৬৭ থেকে ৩৭১ পর্যন্ত দেখে নিন।

৪. এ আয়াত ও রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অদৃশ্যের সংবাদ আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। এ জন্যেই নবী (সা) এক মাসব্যাপী পূর্ণ সন্দেহে ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবহিত না করা পর্যন্ত প্রকৃত অবস্থা জানেন নি।

৫. এ হাদীস দ্বারা এও জানা গেল যে, উৎসাহ এবং ক্রোধের সময় সত্যের মুকাবিলায় গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাহায্য ও পক্ষপাতিত্ব করা জায়েয নেই; যেমন হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা) হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কে বলেছিলেন, তুমি মুনাফিক যে, মুনাফিকের পক্ষপাতিত্ব করছ।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এবং অপরাপর পবিত্র নবী-সহধর্মিণিগণের প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের ব্যাপারে বিধান

কুরআন মজীদের ঐ আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক নবীশ্রেষ্ঠ (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণী مبرأة من السماء

এর[1] প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, উম্মতের সর্বসম্মত রায়ে সে কাফির ও মুরতাদ। কেননা সে কুরআনুল করীমের প্রতি সরাসরি মিথ্যারোপকারী ও এর অস্বীকারকারী। যেভাবে হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা বিনতে ইমরান (আ)-এর পবিত্রতা ও নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা কুফরী, অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে উম্মে রুমান (রা)-এর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করাও কুফরী এবং যেভাবে ইয়াহূদী-অইয়াহূদী হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের দরুন অভিশপ্ত ও আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয়েছে, অনুরূপভাবে রাফিযীরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে অভিশপ্ত ও আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয়েছে। হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীরা ঈসা (আ)-এর উম্মতের মধ্যে ইয়াহূদী ছিল আর আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীরা উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যকার ইয়াহূদী।

কোন আহলে বায়তের ইমামের সামনে জনৈক রাফিযী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে কটাক্ষ করলে তৎক্ষণাৎ ইমাম তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন এবং গোলামকে ডেকে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর বলেন :

هذا رجل طعن على النبى ﷺ قال الله تعالى اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ أُولٰئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ - فان كانت عائشة خبيشة فالنبى ﷺ خبيث وكهو كافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه وانا حاضر - (رواه الالكائ)

"এ ব্যক্তি যখন আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করল, তখন সে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করল, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র; এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। কাজেই আল্লাহ্ মাফ করুন, আয়েশা সিদ্দীকা দুশ্চরিত্রা হলে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও দুশ্চরিত্র হওয়া আবশ্যিক হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ)। আর যে খবীস রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খবীস বলে, সে নিঃসন্দেহে কাফির এবং হত্যাযোগ্য।" এ কথা বলার পর ঐ রাফিযীকে হত্যা করা হয়। (বর্ণনাকারী বলেন) ঐ রাফিযীকে হত্যা করার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম।

---

১. হযরত মাসরূক (র)-এর এ অভ্যেস ছিল যে, যখন হযরত আয়েশা (রা) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন এরূপ বলতেন : صديقة بنت صديق حبيبة رسول الله ﷺ مبراة من السماء ‐

অনুরূপভাবে হযরত হাসান ইবন যায়দ (র)-এর সামনে ইরাকের জনৈক ব্যক্তি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার শানে আপত্তিকর কথা বলল। সঙ্গে সঙ্গে হযরত হাসান ইবন যায়দ উঠে একটি লাঠি দিয়ে তার মাথায় এত জোরে আঘাত করলেন যে, তার মগজ বেরিয়ে গেল এবং সে মারা গেল। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে হাফিয ইবন তাইমিয়া (র) প্রণীত الصارم المسلول على شاتم الرسول কিতাবে।

আর একইভাবে নবী-সহধর্মিণিগণের অন্য কারো ব্যাপারে কুধারণাকারীও কাফির এবং হত্যাযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক মিম্বরে প্রদত্ত খুতবায় বলা হয়েছে :

يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى اذاه فى اهل بيتى ·

"হে মুসলিম সম্প্রদায়! কে আছো যে আমাকে ঐ ব্যক্তির মুকাবিলায় সাহায্য করবে, যে আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে দুঃখ দেয়।"

এর দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি আহলে বায়তের যে কোন সদস্যের ব্যাপারে, চাই তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হোন বা অপর কোন নবী-সহধর্মিণী হোন, এ ধরনের কোন নাপাক কথা মুখ থেকে বের করে, সে নবী (সা)-কে দুঃখ দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর যে ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে দুঃখ দেয়, সে নিঃসন্দেহে কাফির। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا - وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا - يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا - مَّلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ·

"যারা আল্লাহ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে পীড়া দেয় এমন কোন অপরাধের জন্য, যা তারা করেনি, তারা অপবাদের ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারিগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মুনাফিকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে

আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রবল করব; এর পর এ নগরীতে ওরা স্বল্প সময়ই থাকবে অভিশপ্ত হয়ে; ওদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।" (সূরা আহযাব : ৫৭-৬১)। বিস্তারিতের জন্য الصارم المسلول على شاتم الرسول কিতাবের ৪১ থেকে ৫০ পৃষ্ঠা দেখুন।

যেমন তাঁর এ কথা, "কে আছো যে আমাকে ঐ ব্যক্তির মুকাবিলায় সাহায্য করবে, যে আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে দুঃখ দেয়।" বলার সাথে সাথে হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা) দাঁড়িয়ে যান যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাকে হত্যা করার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে উপস্থিত আছি।

এ কারণে সম্মানিত আলিম সমাজের সম্মিলিত রায় হল, যে ব্যক্তি সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, সে ফাসিক ও ফাজির, আর যে খবীস নিজ খবীসীর দরুন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণিগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, সে নিঃসন্দেহে মুরতাদ ও কাফির।

অধিকন্তু কুরআনে করীমে মহান আল্লাহ্ তা'আলা পয়গাম্বর (আ)-এর স্ত্রীগণকে সমস্ত মু'মিনের মা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লা্ বলেন : اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ "নবী মু'মিনদের নিকট তাদের জানের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী এবং তাদের স্ত্রীগণ মু'মিনদের মা।"

আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, মহান পবিত্র আল্লাহ তা'আলা কি কোন ব্যভিচারী ও অধার্মিকা নারীকে এহেন বিরাট উপাধি দ্বারা ভূষিত করতে পারেন ? আফসোস, শত আফসোস। হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বাণী হলো : مابغت امرأة نبى قط "কোন নবীর স্ত্রী কখনই ব্যভিচার করেন নি।" (তাফসীরে ইবন কাসীর)

অধিকন্তু যে পয়গাম্বর আল্লাহর পক্ষ থেকে এজন্যে প্রেরিত হয়েছেন যে, প্রকাশ্য এবং গোপনীয় অশ্লীলতা (বেহায়াপনা) দূরীভূত করবেন, যেমন তিনি পৃথিবীতে এসে একটা পূর্ণ জাতি এবং দেশের অন্যায় এবং অশ্লীলতাকে ন্যায় ও সভ্যতা এবং তাদের অপকর্মকে সৎগুণ ও সূচিতায় পরিবর্তিত করে দেন; এহেন পবিত্র, পূণ্যবান, পূত চরিত্রের অধিকারী রাসূলের প্রসঙ্গে এ অপবাদ কি সম্ভব, (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন) যে, তাঁর স্ত্রী এখনো পর্যন্ত পবিত্র হননি ? হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমার, এ এক বিরাট অপবাদ; আল্লাহর শপথ, এ এক প্রকাশ্য অপবাদ।

অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে নবূওয়াত ও রিসালত, ভালবাসা ও উপঢৌকন প্রাপ্তির বিশাল মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং যাকে স্বীয় মুস্তাফা ও মুজতবা, মুকাদ্দাস ও মুরতাজা পসন্দনীয় এবং নির্বাচিত বান্দায় পরিণত করেছেন, নিষ্পাপ ও পবিত্রতায় পবিত্রতম ফেরেশতা জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ)-কে তাঁর অনুগামী এবং অধীন বানিয়েছেন, এটা তাঁর মর্যাদা এবং পবিত্রতা বিরোধী যে, তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বের

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের স্ত্রী এবং সঙ্গী হিসেবে কোন বদকার ও ব্যভিচারীণিকে মনোনীত করবেন। এ জন্যে তিনি ইরশাদ করেন :

وَلَوْلاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنَ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ـ

"এবং তোমরা যখন এটা শুনলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয় ? আল্লাহ্ পবিত্র, মহান; এ তো এক গুরুতর অপবাদ।" সূরা নূর : ১৬

এ স্থানে 'সুবহানাকা' শব্দটি আনয়ন করা এদিকে ইঙ্গিতবাহী যে, আল্লাহ তা থেকে পাক ও পবিত্র যে, তাঁর পাক-পবিত্র নির্বাচিত রাসূলের স্ত্রী বদকার হবে। এজন্যে তা শোনামাত্র "আল্লাহ্ পবিত্র, মহান; এ তো এক গুরুতর অপবাদ" বলে দেয়া ফরয এবং আবশ্যিক ছিল। যেমন হযরত সা'দ ইবন মুআয, হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী এবং হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) যখন এ খবর শোনেন, তখন তৎক্ষণাৎ তাঁদের মুখ থেকে এ বাক্যই উচ্চারিত হয়েছিল যে, سُبْحٰنَكَ هذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ (আল্লাহ্ পবিত্র, মহান; এ তো এক গুরুতর অপবাদ)।[১]

ফাতহুল বারী-তে হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী এবং হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) ছাড়া হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর পরিবর্তে হযরত উসামা (রা)-এর নাম উল্লেখ আছে। মোট কথা এই যে, পয়গাম্বর (আ)-গণের স্ত্রীদের শানে যে ব্যক্তি এরূপ অশোভনীয় কথাবার্তা বলবে, তার প্রতি তাকানোই নাজায়েয। কারো স্ত্রীকে পাপী ও দুশ্চরিত্রা বলার অর্থ হলো, সেই স্ত্রীলোকের স্বামীও দায়ূস। যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে কলঙ্কিতা মনে করে, তা হলে বুঝে নিন যে, সে ব্যক্তি রাসূলে পাক (সা)-কে প্রচ্ছন্নভাবে কি বলছে; যা কল্পনা করতেও অন্তর প্রকম্পিত হয়।

তায়াম্মুমের বিধান অবতরণ

কতিপয় বর্ণনায় এটা জানা যায় যে, এ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পুনরায় হযরত আয়েশা (রা)-এর হারটি হারিয়ে যায় এবং হার অনুসন্ধান করতে গিয়ে কাফেলার প্রভাত হয়ে যায় কিন্তু সেখানে পানি ছিল না। ঐ সময় তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সাহাবিগণ তায়াম্মুম করে ফজরের নামায আদায় করেন।

সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা) এতে অত্যন্ত খুশি হন। হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠেন, ওহে আবূ বকরের বংশধর! তায়াম্মুমের এ হুকুম নাযিল হওয়া তোমাদের প্রথম বরকত নয়; বরং তোমাদের বরকতে আরো অনেক সহজ ও সরল বিধান নাযিল হয়েছে।

---

১. দুররে মানসূর, ৫খ. পৃ. ৩৪।

আর অপরাপর বিদগ্ধ আলিমের বক্তব্য হলো, তায়াম্মুমের আয়াত বনী মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়নি, বরং এ যুদ্ধের পর অপর কোন সফর সামনে এসেছে, সেই সফরে তায়াম্মুমের হুকুম নাযিল হয়। যেমনটি মু'জামে তাবারানীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ সময় আমার হার হারিয়ে গেল। এতে অপবাদ আরোপকারীরা যা বলার তা বলেছে। এর পর দ্বিতীয় সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে গেলাম এবং আমার হার হারিয়ে গেল; তা খোঁজার জন্য থামতে হলো, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে বলেন, আয় মেয়ে, তুমি প্রতিটি সফরেই মানুষের জন্য কষ্ট ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াও। এ সময় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন যে, পানি না পাওয়ার অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় কর। তায়াম্মুমের অবকাশ এবং সহজ ব্যবস্থা অবতীর্ণ হওয়ায় হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তিনবার বলেন : অর্থাৎ হে মেয়ে, তুমি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী।

এ রিওয়ায়াত দ্বারা পরিস্কার প্রকাশ পেল যে, তায়াম্মুমের আয়াত বনী মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়নি; বরং এর পরে অপর কোন যুদ্ধ এবং সফরে দ্বিতীয়বার এমনই স্থানে হার হারিয়ে যায়, যেখানে পানি ছিল না এবং ফজর নামাযের সময় এসে পড়েছিল। সে সময় তায়াম্মুমের এ আয়াত নাযিল হয়।

খন্দক ও আহযাবের যুদ্ধ (শাওয়াল পঞ্চম হিজরী)

এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সন ও মাসের ব্যাপারে মতভেদ আছে। মূসা ইবন উকবা বলেন, এ যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে হয়েছে। সমস্ত যুদ্ধ বিষয়ক আলিম ও সকল সীরাত বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত। হাফিয যাহাবী ও হাফিয ইবন কায়্যিম বলেন, এ বক্তব্যই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। ইবন সা'দ এবং ওয়কিদী বলেন, পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে এ যুদ্ধ হয়েছিল।[১]

ইমাম বুখারী (র) মূসা ইবন উকবার বক্তব্যের সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর এ কথার উদ্ধৃতি দেন যে, তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে আনীত হলাম। এ সময় আমি ছিলাম চৌদ্দ বছর বয়সী। রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ যুদ্ধে আমাকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। খন্দক যুদ্ধের সময় আনীত হলাম, তখন আমি ছিলাম পনের বছর বয়সী। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন আমাকে অনুমতি দেন। (বুখারী)

এরদ্বারা পরিস্কাররূপে প্রকাশ পায় যে, উহুদ যুদ্ধ ও খন্দক যুদ্ধের মধ্যে মাত্র এক বছরের ব্যবধান ছিল। আর এটা সমর্থিত যে, উহুদ যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল; কাজেই খন্দকের যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়।

---

১. যারকানী, ২০খ. পৃ. ১০৩।

প্রসিদ্ধ মাগাযী বিষয়ক ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এ যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীতে হয়েছে। এ জন্যে ইমাম বায়হাকী বলেন, এটা আশ্চর্য নয় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) উহুদ যুদ্ধের সময় পূর্ণ চৌদ্দ বছর বয়স্ক ছিলেন না, বরং চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করেছিলেন মাত্র এবং খন্দক যুদ্ধের সময় পূর্ণ পনের বছরে পরিণত হন। এ হিসেবে উহুদ ও খন্দক যুদ্ধের ব্যাবধান দু'বছর হওয়া সম্ভব।

অধিকন্তু উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আবূ সুফিয়ান এ কথা বলেছিল যে, আগামী বছর বদর প্রান্তরে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মুকাবিলা হবে। এ ওয়াদা করে সে মক্কায় ফিরে যায়। যখন পরবর্তী বছর ওয়াদাকৃত সময় এসে পড়ে, তখন আবূ সুফিয়ান এ কথা বলে রাস্তা থেকে ফিরে যায় যে, এটা দুর্ভিক্ষের বছর, যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত নয়। এর এক বছর পর সে দশ হাজার লোকের বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে; যাকে আহযাবের যুদ্ধ বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়।

যদ্বারা বুঝা যায় যে, উহুদ যুদ্ধ ও আহযাব যুদ্ধের মধ্যে দু'বছরের ব্যাবধান ছিল, যা প্রসিদ্ধ সীরাত বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্যের সমর্থক। (ফাতহুল বারী, অধ্যায়, খন্দক যুদ্ধ)।

এ যুদ্ধের পটভূমি ও কারণ ছিল এই যে, বনী নাযীরকে দেশ থেকে বহিস্কারের পর হুয়াই[১] ইবন আখতাব মক্কায় আগমন করে এবং কুরায়শগণকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মুকাবিলা এবং যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। আর কিনানা ইবন রবী' গিয়ে নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য বনী গাতফানকে প্রস্তুত করে এবং তাদেরকে এ প্রলোভন দেখায় যে, খায়বারের খেজুর বাগানসমূহে প্রতি বছর যে খেজুর উৎপন্ন হবে, তার অর্ধেক তোমাদেরকে দেয়া হবে। এ কথা শুনে উবায়দ ইবন হাসান ফাযারী প্রস্তুত হয়ে গেল। কুরায়শ তো প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিল।

এভাবে আবূ সুফিয়ান দশ হাজার লোকের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মুসলমানদেরকে বিপর্যস্ত এবং ধ্বংস করে দেয়ার মানসে মদীনার দিকে রওয়ানা হয়। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩০১, খন্দক যুদ্ধ অধ্যায়)।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যখন তাদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) খন্দক খোঁড়ার পরামর্শ দিলেন, যাতে খন্দকের বেষ্টনীর মধ্যে নিরাপদে থেকে

১. এক রিওয়ায়াতে আছে, হুয়াই ইবন আখতাব, ইবন আবিল হুকায়েক, কিনানা ইবনুর রবী', হাওযা ইবন কায়স এবং আবুল আম্মার ওয়ায়লী একদিন মক্কায় যায় এবং কুরায়শগণকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর চড়াও হও, আমরা তোমাদেরকে পূর্ণ সহায়তা করব, যাতে তিনি শেষ হয়ে যান। এরপর তারা গাতফান গোত্রে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে কুরায়শ এবং গাতফানী মিলে দশ হাজার লোকের এক বিশাল বাহিনী আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। উয়ূনুল আসার, ২খ. পৃ. ৫৫।

তাদের প্রতিহত করা যায়। প্রথমেই ময়দানে গিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া যুক্তিযুক্ত নয়। সবাই এ সিদ্ধান্ত পসন্দ করলেন।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং এর সীমারেখা চিহ্নিত করে দিলেন, চিহ্ন এঁকে প্রতি দশজনকে দশগজ জমি বন্টন করে দিলেন।[২]

খন্দক এতই গভীর করে খোঁড়া হল যে, ভেজা মাটি বেরিয়ে পড়ল।[৩]

ইবন সা'দ বলেন, ছয়দিনেই খন্দক খোঁড়া সমাপ্ত হয়। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৪৮)।

মূসা ইবন উকবা বলেন, অনেক দিনে খোঁড়ার কাজ শেষ হয়। আল্লামা সামহুদী বলেন, এটাই সত্য যে, খন্দক খননের কাজ ছয় দিনেই শেষ হয়, আর অনেক দিন প্রকৃতপক্ষে ঘেরাও করে রাখার সময় ছিল। (বিস্তারিতের জন্য যারকানী, ২খ. পৃ. ১১০, পাঠ করে দেখুন)।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও খন্দক খননকাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রথমে তিনিই নিজ হাতে জমিতে কোদালের কোপ দেন, তাঁর মুখে তখন উচ্চারিত ছিল এ বাক্য :

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّهِ بَدِيْنَا وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرِهِ شَقِيْنَا حَبَّذَا رَبًّا وَحَبَّذَا دِيْنَا ·

"আল্লাহর নামে শুরু করছি প্রথমেই, আর আমরা যদি তাঁকে ছাড়া অপর কারো ইবাদত করি, তবে আমরা বড়ই বদনসীব হয়ে যাব। তিনি কতই না উত্তম প্রভু, আর তাঁর দীন কতই না উত্তম দীন !" (রাউযুল উনুফ, ৩খ. পৃ. ১৮৯; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩০৪)।

শীতের মওসুম ছিল, হিমেল বাতাস বইছিল, কয়েকদিন পর্যন্ত অনাহার চলছিল; তবুও মুহাজির ও আনসার (রা)-গণ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে খন্দক খননে মগ্ন ছিলেন। মাটি উঠিয়ে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন :

نحن الذين بيعوا محمدا * على الجهاد ما بقينا ابدا

"আমরাই তারা যারা নিজেদেরকে মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে বায়য়াত করেছিল এবং তাঁর জন্য নিজেদের জীবনকে আল্লাহর নিকট বিক্রি করে দিয়েছি, ধড়ে যতক্ষণ প্রাণ আছে, কাফিরের সাথে জিহাদ করতেই থাকব।"

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যুত্তরে বলছিলেন :

اللهم لاعيش الاخره * فاغفر للانصار والمهاجره

"আয় আল্লাহ্, জীবন তো প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের জীবনই, কাজেই আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর।"

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৪৭।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩০৫।

৩. তারীখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ৪৫।

আবার কখনো বলছিলেন :

اللهم انه الاخير الاخير الاخره * فبارك فى الانصار والمهاجره

"আয় আল্লাহ্, প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গল তো আখিরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল, কাজেই আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি বরকত দিন।"

হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) স্বতস্ফূর্তভাবেই মাটি বহন করে নিচ্ছিলেন। এমনকি তাঁর পবিত্র পেট ধূলি মলিন হয়ে পড়ে। আর তিনি বলছিলেন :

والله لو لا الله ما اهتدينا * ولاتصدقنا ولاصلينا

"আল্লাহর কসম, আল্লাহ যদি তাওফীক না দিতেন তা হলে আমরা কখনো হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না, সদকা দিতাম না ও নামায পড়তাম না;

فانزلن سكينة علينا * وثبت الاقدام ان لا قينا

"আয় আল্লাহ্, আমাদের প্রতি শান্তি ও স্বস্তি নাযিল করুন এবং যুদ্ধের ময়দানে আমাদেরকে অবিচল রাখুন।

ان الالى قد بغوا علينا * اذا ارادوا افتنة ابينا

"এ লোকগুলো আমাদের উপর গুরুতর যুলম করেছে, এরা যখনই আমাদেরকে কোন ফিতনায় জড়াতে চেয়েছে, আমরা তা অস্বীকার করেছি।"

তিনি ابينا ابينا। (আমরা তা অস্বীকার করেছি) উচ্চস্বরে এবং বারবার বলতে থাকেন।

হযরত জাবির (রা) বলেন, খনন করতে করতে একটি শক্ত পাথরের খণ্ড এসে গেল। আমরা (অপসারণে অপারগ হয়ে) তাঁর কাছে আরয করলাম। তিনি বললেন, দাঁড়াও, আমি সরিয়ে দিচ্ছি। অথচ ক্ষুধার কারণে তখন তিনি পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন, আর আমরাও তিনদিন যাবত কোন বস্তুই খাইনি। তিনি পবিত্র হাতে কোদাল নিলেন এবং ঐ পাথরখণ্ডে আঘাত করলেন। ফলে তা বালির স্তূপে পরিণত হয়ে গেল।

এ হাদীস সহীহ বুখারীতে রয়েছে। মুসনাদে আহমদ এবং নাসাঈতে এটুকু অতিরিক্ত আছে যে, তিনি যখন বিসমিল্লাহ বলে প্রথমবার কোদাল চালালেন, তখন এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবর, আমাকে সিরিয়ার চাবিসমূহ প্রদত্ত হলো। আল্লাহর শপথ, সিরিয়ার লোহিত বর্ণের প্রাসাদগুলো আমি এ মুহূর্তে সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার কোদাল চালালেন, এবারে আরো এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে পড়ে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবর, পারস্যের চাবিসমূহ আমাকে দেয়া হলো; আল্লাহর শপথ, মাদাইনের শ্বেত প্রাসাদসমূহ এক্ষণে আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তৃতীয়বার তিনি বিসমিল্লাহ বলে কোদাল চালালেন, তখন পাথরের অবশিষ্ট অংশও ভেঙে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবর, ইয়েমেনের

চাবিসমূহও আমাকে দান করা হলো। আল্লাহর কসম, সানআর দরজাসমূহ আমি এক্ষণে এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি।

হাফিয আসকালানী বলেন, এ বর্ণনার সনদ হাসান। অপর এক বর্ণনায় আছে, প্রথমবার কোদাল চালানোয় বিদ্যুৎ চমকিত হয়, যাতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে উঠে। তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলেন এবং ফেরেশতাগণও তাকবীর বলেন। আর তিনি ইরশাদ করেন, জিবরাঈল আমীন (আ) আমাকে সংবাদ দিলেন যে, এ শহরগুলো এ উম্মত জয় করবে।[১]

তাৎপর্যপূর্ণ ফায়দা

খন্দক খনন করা আরবের প্রথা ছিল না, বরং এ প্রথা ছিল পারস্যের। পারস্য সম্রাটগণের মধ্যে মনুচেহর ইবন আবীরাজ ইবন আফরীদূন প্রথম খন্দক খনন করে যুদ্ধ করার প্রথা চালু করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এতে জানা গেল যে, জিহাদে কাফিরদের অবলম্বিত যুদ্ধ পদ্ধতি অনুকরণ করা বৈধ এবং এর ওপর কিয়াস করে কাফিরদের ব্যবহৃত মানের কিংবা তার চাইতে শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্রসমূহ ব্যবহার করা বৈধ। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফ যুদ্ধে 'মিনজানিক' (দূর থেকে পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র) ব্যবহার করেছেন। হযরত উমর (রা) তুসতার অবরোধকালে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে মিনজানিক স্থাপনের নির্দেশ দেন এবং হযরত আমর ইবন আস (রা) যখন ইস্কান্দারিয়া অবরোধ করেন, তখন মিনজানিক ব্যবহার করেন। এর উপর ভিত্তি করে বিষ মাখানো তীর অথবা তরবারি ব্যবহার করাও দুরস্ত আছে। কিন্তু 'তাদখীন'[২] ব্যবহার কেবল ঐ সময় বৈধ হবে যখন শত্রু সেনাকে প্রতিহত করার আর কোন উপায় অবশিষ্ট না থাকে। চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রয়োজন এবং নিরুপায় না হওয়া পর্যন্ত তাদখীন ব্যবহার বৈধ নয়।

বিস্তারিতভাবে এ মাসআলা সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হলে শারহে সিয়ারুল কাবীর قطع الماء عن اهل العرب وتحريق حصونهم ونصب المجانيق عليها অধ্যায় দেখুন।

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ .

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩০৪-৩০৫।

২ অর্থাৎ বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে দেয়া, যাতে লোকজন মৃত্যুবরণ করে, যেমন আজকাল বিষাক্ত গ্যাস উদ্ভাবন করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেন : "তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এরদ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রুকে সন্ত্রস্ত রাখবে, তোমাদের শত্রুকে..." (সূরা আনফাল : ৬০)

ফলে জানা গেল যে, ঐ সমস্ত বিষয় শেখা জরুরী, যদ্বারা আল্লাহর শত্রু বাহিনী ভীত হয় এবং আল্লাহর দীনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

জরুরী সতর্ক বাণী : কিতাব, সুন্নাহ্ এবং শরীয়ত কোন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে উন্নতি করাকে নিষিদ্ধ করে না, বরং এ ধরনের প্রতিটি আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, যদ্বারা দেশের উন্নতি হয়, তাকে ফরযে কিফায়া ঘোষণা করেছে; সকল সম্মানিত ফকীহ্ এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। অবশ্য ইসলামী শরীয়াত ইউরোপীয় বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, কামোদ্দীপক ও প্রবৃত্তি তাড়িত সংস্কৃতির কঠোর বিরোধী। এ জন্যে যে, কামোদ্দীপক ও স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা স্বাধীনতা, চরিত্র এবং পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়, যা সাম্রাজ্য পতনের কারণ।

মুসলমানগণ খন্দক খনন সমাপ্ত করেছেন এমন সময় কুরায়শ দশ হাজার লোকের বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং উহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে ছাউনী ফেলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিন হাজার মুসলমানের একটি বাহিনী নিয়ে সিলা পাহাড়ের নিকটে অবস্থান গ্রহণ করেন। উভয় বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে খন্দক ছিল প্রতিবন্ধক। নারী ও শিশুদের তিনি একটি দুর্গে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেন।

বনী কুরায়যার ইয়াহূদীরা তখন পর্যন্ত পৃথক ছিল। কিন্তু বনী নযীরের সর্দার হুয়াই ইবন আখতাব তাদের নিজেদের সাথে একীভূত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এমনকি সে নিজেই বনী নাযীরের সর্দার কা'ব ইবন আসাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে, যে প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। হুয়াই ডাক দিল যে, দরজা খোল। কা'ব বলল :

ويحك يا حيي انك امرء مستوم واني قد عاهدت محمدا فلست بنا قض ما بيني وبينه فاني لم ارا منه الا صدقا ووفاءه ·

"আফসোস, ওহে হুয়াই, তুমি একজন হতভাগা; আমি মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে চুক্তি করেছি, এখন সে চুক্তি ভঙ্গ করব না; কেননা আমি মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে সত্যবাদিতা ও চুক্তি রক্ষাকরণ ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।"

হুয়াই বলল, আমি তোমাদের জন্য স্থায়ী সম্মানের মালামাল বয়ে এনেছি, কুরায়শ এবং গাতফান সেনাদল নিয়ে আমি এখানে অবতরণ করেছি। আমরা সবাই শপথ করেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহম্মদ (সা)-এর পরিসমাপ্তি এবং হিসাব চুকিয়ে না ফেলছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে অবশ্যই স্থানচ্যুত হবো না।

কা'ব বলল, আল্লাহর কসম, তুমি সব সময়ের জন্য অপমান ও যিল্লতি নিয়ে এসেছ, আমি মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে কখনই চুক্তি ভঙ্গ করব না। আমি তাঁর মধ্যে

সত্যবাদিতা এবং চুক্তিরক্ষার প্রত্যয় ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। হুয়াই বারবার জেদ করতে থাকল, এমনকি শেষ পর্যন্ত কা'ব চুক্তিভঙ্গে বাধ্য হলো।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন এর সত্যতা নিরূপণের জন্য হযরত সা'দ ইবন মু'আয, হযরত সা'দ ইবন উবাদা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন যে, যদি এ সংবাদ সত্য হয় তাহলে ফিরে এসে এমন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় সংবাদ দেবে যাতে লোকজন বুঝতে না পারে; আর যদি খবর মিথ্যে হয়, তা হলে খোলাখুলি বর্ণনা করতে কোন বাধা নেই।

এঁরা কা'ব ইবন আসাদের কাছে গেলেন এবং তাকে চুক্তির ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিলেন। কা'ব বলল, কেমন চুক্তি আর কে মুহাম্মদ? তার সাথে তো আমার কোন চুক্তি নেই। তাঁরা যখন ফিরে এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরয করলেন, 'আযল ওয়া কারা', অর্থাৎ যেমনিভাবে আযল ও কারা নামক গোত্রদ্বয় সাহাবী হযরত খুবায়ব (রা)-এর সাথে গাদ্দারী করেছিল, সেভাবে এরাও গাদ্দারী করেছে। (সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৪০; যারকানী, ১২খ. পৃ. ১১১)।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের গাদ্দারী ও ওয়াদা ভঙ্গের দরুন ব্যথিত হলেন। কাফিরেরা চারদিক থেকেই মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলেছে। বাইরের শত্রুরা অগণিত সংখ্যায় এগিয়ে আসছিল, অভ্যন্তরীন দুশমন বনী কুরায়যাও তাদের সাথে মিলিত হয়েছে। মোট কথা মুসলমানদের জন্য এ ছিল অত্যন্ত পেরেশানীর সময়। শীতের রাত ছিল এবং তাঁরা ছিলেন কয়েকদিনের অনাহারী ।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহযাবে এ যুদ্ধের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন :

اِذْ جَاءُوكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا - هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْداً ۔

"যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল, তোমাদের উপরের দিক ও নিচের দিক থেকে, ভয়ে তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে; তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।" (সূরা আহযাব : ১০-১১)

এ সময়টা ছিল মুসীবত ও পরীক্ষার। মুসীবতের কষ্টিপাথরে ফেলে মুনাফিক ও নিষ্ঠাবান মু'মিনকে পৃথক করা হচ্ছিল। এ কষ্টিপাথর খাঁটি ও মেকী পৃথক করে দেখায়। সুতরাং মুনাফিকেরা অজুহাত দেখাতে শুরু করে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের গৃহ সীমানা প্রাচীরের পেছনে থাকার কারণে অরক্ষিত, সন্তান এবং স্ত্রীলোকদের নিরাপত্তা রক্ষা করা প্রয়োজন বিধায় (গৃহে প্রত্যাবর্তনের) অনুমতি চাচ্ছি।

يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلاَّ فِرَاراً ۔

"(একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে) বলছিল, আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত; অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না; আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য।" (সূরা আহ্যাব : ১৩)

আর মুসলমানগণ, যাদের অন্তর একনিষ্ঠতা ও বিশ্বাসে ভরপূর ছিল, তাদের অবস্থা এরূপ ছিল, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۔

"মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, ওরা বলে উঠল, এ তো তাই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।" (সূরা আহ্যাব : ২২)

মোটকথা এই যে, ইয়াহূদী ও মুনাফিক সবাই এ যুদ্ধে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে আর মুসলমানগণ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু দ্বারা ঘেরাও ও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ঘেরাওয়ের কঠোরতা ও প্রচণ্ডতায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ খেয়াল হলো যে, মানবীয় প্রবৃত্তির কারণে পাছে মুসলমানগণ ঘাবড়িয়ে না যায়, এ জন্যে তিনি এ কার্যক্রম গ্রহণ করলেন, বনী গাতফান গোত্রের দু'সর্দার উয়ায়না ইবন হাসান এবং হারিস ইবন আউফকে মদীনার বাগানসমূহের এক-তৃতীয়ংশ খেজুর দানের বিনিময়ে সন্ধি করলেন, যাতে তারা আবূ সুফিয়ানকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে এবং মুসলমানগণ এ ঘেরাও থেকে মুক্ত হতে পারেন। সুতরাং তিনি হযরত সা'দ ইবন মুআয এবং হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর কাছে তাঁর এ খেয়াল ব্যক্ত করলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ কি আপনাকে এমন নির্দেশ দিয়েছেন ? যদি এমনটি হয়, তা হলে আমরা তা তামিল করার জন্য প্রস্তুত। অথবা এটা আমাদের অন্তরে স্বস্তি ও সান্ত্বনাদানের জন্য আপনি নিজে এমনটি ইচ্ছে করেছেন ? তিনি বললেন, আল্লাহর কোন নির্দেশ নয়; বরং কেবল তোমাদের জন্য আমি এমনটি ইচ্ছে করেছি। এ কারণে যে, আরবের সবাই একজোট হয়ে একই তূণীর থেকে তোমাদের প্রতি তীর বর্ষণ করছে, কাজেই এ উপায়ে আমি তাদের শৌর্য ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে ভাঙ্গন ধরাতে চাই।

হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন এরা এবং আমরা সবাই কাফির এবং মুশরিক ছিলাম, মূর্তির পূজা করতাম, আল্লাহ তা'আলাকে চিনতামই না, তখনও ওদের এ শক্তি ছিল না যে, আমাদের কাছ থেকে একটি খুরমাও আদায় করে, তবে মেহমান হিসেবে অথবা ক্রয় করে নেয়া ছাড়া, আর এখন, যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিদায়াতের অফুরান ও অতুলনীয় নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন এবং ইসলামের দ্বারা আমাদের সম্মান দান করেছেন, তখন আমরা

আমাদের সম্পদ ওদের হাতে দিয়ে দেব, এটা অসম্ভব। আল্লাহর কসম, আমাদের সম্পদ ওদেরকে দেয়ার আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম, আমাদের পক্ষে ওদেরকে দেবার মত তরবারির আঘাত ছাড়া আর কিছুই নেই। এতে ওদের দ্বারা যা হওয়ার আশঙ্কা, তারা যেন তা করে।

আর এ ব্যাপারে সন্ধির যে মুসাবিদা করা হয়েছিল, হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তা নবী করীম (সা)-এর হাত থেকে নিয়ে এর সমুদয় অক্ষর মুছে দেন।[১]

দু'সপ্তাহ এভাবেই কেটে গেল, কিন্তু হাতাহাতি বা মুখোমুখি লড়াইয়ের সুযোগ এলো না; কেবল উভয় পক্ষ থেকে তীর নিক্ষেপ চলছিল। অবশেষে কুরায়শের কয়েকজন ঘোড় সওয়ার, আমর ইবন আবদুদ, ইকরামা ইবন আবূ জাহল, বাহীরা ইবন আবূ ওহাব, যিরার ইবন খাত্তাব, নওফল ইবন আবদুল্লাহ মুসলমানদের মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এলো। যখন তারা খন্দকে উপস্থিত হলো, তখন বলল, আল্লাহর কসম, এ ধরনের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী পূর্বে আরবে ছিল না। একদিকে খন্দকের পরিধি কম ছিল, সেদিক দিয়ে লাফ দিয়ে পার হয়ে এসে তারা মুসলমানদেরকে লড়াইয়ের আহ্বান জানাল। আমর ইবন আবদুদ, যে বদর যুদ্ধে আহত হয়ে পড়ে গিয়েছিল, আপাদমস্তক লৌহবর্মে আবৃত হয়ে মুকাবিলার জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানাল। শেরে খোদা হযরত আলী (রা) তার মুকাবিলায় অগ্রসর হলেন এবং বললেন, ওহে আমর, আমি তোমাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আহ্বান করছি; ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। আমর বলল, এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। হযরত আলী (রা) বললেন, আচ্ছা আমি তোমাকে লড়াই এবং মুকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছি। আমর বলল, তুমি তো অল্পবয়স্ক,[২] তোমার চেয়ে বড় কাউকে আমার মুকাবিলার জন্য পাঠিয়ে দাও, আমি তোমাকে হত্যা করা পসন্দ করি না। হযরত আলী (রা) বললেন, আমি তো তোমাকে হত্যা করতে পসন্দ করি। এ কথা শুনে আমরের জিদ চেপে গেল এবং ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে হযরত আলীর প্রতি তরবারি চালিয়ে দিল যা হযরত আলী (রা) ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন কিন্তু কপালে আঘাত পেলেন। এরপর হযরত আলী (রা) তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন এবং এক আঘাতেই তার দফা রফা হয়ে গেল।

হযরত আলী (রা) 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিলেন, যাতে করে মুসলমানগণ বুঝতে পেলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জয়ী করেছেন।

নওফল ইবন আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হলো। সে ছিল ঘোড় সওয়ার এবং খন্দকের ফাঁদ সম্বন্ধে কিছুই জানত না, হঠাৎ করে সে খন্দকে পড়ে গেল এবং তার ঘাড় ভেঙে গেল। তাতে সে মৃত্যুবরণ করল।

১. ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৪১।

২. আমর ইবন আবদুদ-এর বয়স তখন নব্বই বছর পেরিয়ে গিয়েছিল। যারকানী।

মুশরিকেরা নবী (সা)-এর খিদমতে দশ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে তার লাশ ফেরত চাইল। তিনি (সা) ইরশাদ করলেন, সেও খবীস ও অপবিত্র ছিল আর তার মুক্তিপণও খবীস ও নাপাক। তার প্রতিও আল্লাহর অভিশাপ হোক এবং তার মুক্তিপণের প্রতিও। আমাদের না দশ হাজার দিরহামের প্রয়োজন, আর না তার লাশের। আর কোন বিনিময় ছাড়াই তিনি তার লাশ কাফিরদের দিয়ে দিলেন।[১]

হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর শাহরগে একটি তীর এসে বিদ্ধ হয়। তখন হযরত সা'দ (রা) এ দু'আ করেন : আয় আল্লাহ্! যদি তুমি কুরায়শের জন্য যুদ্ধ বাকী রেখে থাক, তা হলে আমাকেও জীবিত রাখ। কেননা এর থেকে কোন বস্তুই আমার কাছে প্রিয় নয় যে, আমি সেই সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করব যারা তোমার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁকে মিথ্যা বলেছে, তাঁকে নিরাপদ হেরেম থেকে বের করে দিয়েছে। আর আয় আল্লাহ্! তুমি যদি আমাদের এবং ওদের মধ্যকার লড়াই শেষ করে থাক তা হলে এ যখমকে আমার শাহাদতের উপলক্ষে পরিণত কর এবং ঐ সময় পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু দিও না যে পর্যন্ত বনী কুরায়যার অপমান-অপদস্থতা আমার নিজ চোখে দেখে চক্ষু শীতল না করছি।[২]

আক্রমণের এ দিনটি ছিল খুবই কঠিন, সমস্ত দিন তীর ছোঁড়া এবং পাথর ছোঁড়া চলতে থাকে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) নারী ও শিশুদেরকে একটি দুর্গে নিরাপদে রেখেছিলেন। ইয়াহূদীদের বসতি ছিল এর নিকটে। রাসূল (সা)-এর ফুফু হযরত সাফিয়া (রা)-ও ঐ দুর্গে ছিলেন এবং দুর্গের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য হযরত হাসসান (রা) আদিষ্ট ছিলেন। হযরত সাফিয়া (রা) দেখলেন, এক ইয়াহূদী দুর্গের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। সে গুপ্তচর কিনা, এ সন্দেহে হযরত সাফিয়া (রা) হযযরত হাসসান (রা)-কে বললেন, একে হত্যা কর, যেন এমনটি না হয় যে, সে শত্রুকে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করে। হযরত হাসসান (রা) বললেন, তোমার কি জানা নেই যে, আমি এ কাজের যোগ্য নই ? হযরত সাফিয়া উঠলেন এবং তাঁবুর মধ্য থেকে একটি কাঠের টুকরা এনে ঐ ইয়াহূদীর মাথায় এত জোরে আঘাত করলেন যে, তার মাথা ফেটে গেল এবং বললেন, এ তো পুরুষ মানুষ আর আমি স্ত্রীলোক, এজন্যে আমি তাকে স্পর্শ করব না, তুমি তার শরীর থেকে অস্ত্রশস্ত্র খুলে নাও। হযরত হাসসান (রা) বললেন, তার অস্ত্র এবং মালপত্রে আমার কোন প্রয়োজন নেই। (ইবন হিশাম)।

ঘেরাও থাকাকালে গাতফান গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাঈম ইবন মাসউদ আষযাঈ নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আমার সম্প্রদায় আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানে না।

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ১১৪।

২ ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৪৩।

যদি অনুমতি দেন, তো আমি একটু চেষ্টা করি, যাতে এ ঘেরাওয়ের অবসান ঘটে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যদি এমন কোন চেষ্টা সম্ভব হয়, তা হলে করে দেখ। এজন্যে যে, فان الحرب خدعة 'যুদ্ধের অপর নাম ভ্রান্ত ধারণা প্রদান।'

কাজেই হযরত নাঈম (রা) এমন চাল চালেন যে, কুরায়শ এবং বনী কুরায়যার ঐক্যে ফাটল ধরে এবং বনী কুরায়যা কুরায়শকে সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। (বিস্তারিত ঘটনা ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ.৩০৯; যারকানী, ২খ. পৃ. ১১৬ এবং তারীখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ৫০-এ বর্ণিত আছে)।

আমর ইবন আবদুদ এবং নওফল নিহত হওয়ার পর কুরায়শের অবশিষ্ট ঘোড় সওয়ারগণ পরাজিত হয়ে ফিরে যায়।

'মুসনাদে আহমদে' হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা বেষ্টনীর কঠিন ও প্রচণ্ড অবস্থার উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দু'আ করার আবেদন করি। তিনি বললেন, এ দু'আ কর : اللهم استر عوراتنا وامن روعتنا "আয় আল্লাহ! আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলো গোপন কর এবং আমাদের ভীতি দূর করে দাও।"

আর সহীহ বুখারীতে আছে, তিনি এ দু'আ করেন[১] : اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, لا تمنو القاء العدد অধ্যায়)।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবূল করেন এবং কুরায়শ ও গাতফানের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত করেন, যার ফলে তাদের তাঁবুগুলো উপড়ে যায়, রশি এবং টানাসমূহ ছিঁড়ে যায়, হাঁড়ি-পাতিল উল্টে যায়, ধুলিবালি উড়ে উড়ে চোখ ভরে যায়; ফলে কাফিরদের সমুদয় সেনা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاۤءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۔

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা তোমাদের আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি ওদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু আর এক বাহিনী, যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরা আহযাব : ৯)

১. মুসনাদে আহমদ ও ইবন সা'দ-এর বর্ণনায় আছে, নবী (সা) আহযাব মসজিদে হাত উঠিয়ে এবং দাঁড়িয়ে এ দু'আ করেন। আর আবূ নুআঈমের বর্ণনায় আছে, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর। যারকানী, ২খ. পৃ. ১৪০।

جُنُوْداً لَّمْ تَرَوْهَا দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। যারা কাফিরদের অন্তরকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দেন এবং মুসলমানদের অন্তরকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করেন। এভাবে কাফিরদের দশ হাজার সৈন্য ভীত-বিহ্বল হয়ে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْراً وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزاً .

"আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (সূরা আহযাব : ২৫; যারকানী, ২খ. পৃ. ১২২)।

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, গিয়ে দুশমনদের সংবাদ আন। আমি আরয করলাম, পাছে আমি ধরা পড়ে না যাই? তিনি বললেন : انك لن تؤسر "অবশ্যই তুমি ধরা পড়বে না।" আর এর পর তিনি আমার জন্য এ দু'আ করলেন :

اللهم احفظ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته .

"হে আল্লাহ্, একে সম্মুখ থেকে, পিছন থেকে, ডান থেকে, বাম থেকে, উপর থেকে এবং নীচ থেকে হিফাযত কর।"

তাঁর দু'আয় আমার সমস্ত ভয় দূর হয়ে যায় এবং অত্যন্ত শান্ত ও প্রফুল্ল মনে রওয়ানা হই। যাত্রাকালে তিনি বললেন, হুযায়ফা, নতুন কিছুর সৃষ্টি করো না। আমি তাদের সেনাদলের মধ্যে পৌঁছি, সেখানে বাতাস এতই প্রবল ছিল যে, কোন বস্তুই স্থির থাকতে পারছিল না এবং এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, কোন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ইত্যবসরে হযরত হুযায়ফা (রা) আবূ সুফিয়ানকে বলতে শুনলেন, ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়, এটা অবস্থানের জায়গা নয়, আমাদের পশুগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, বনী কুরায়যা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে, আর এ বাতাস আমাদেরকে অন্ধ-বধির ও বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। চলাফেরা ও বসা দুরূহ হয়ে পড়েছে। উত্তম এই যে, দ্রুত ফিরে চল। আর এ কথা বলে আবূ সুফিয়ান উটের পিঠে আরোহণ করল।

হযরত হুযায়ফা বলেন, এ সময় আমার ইচ্ছা হলো যে, তাকে তীর দিয়ে হত্যা করি, কিন্তু তাঁর কথা স্মরণ হলো যে, 'হুযায়ফা, নতুন কিছুর সৃষ্টি করো না', ফলে আমি ফিরে আসি (যারকানী, ২খ. পৃ.১১৮)।

যখন কুরায়শ ফিরে গেল, তখন তিনি এ কবিতা পাঠ করলেন : الان نغزوهم ولايغزوننا نحن نير اليهم "এবারে আমরা ওদের উপর আক্রমণ চালাব, আর কাফির

আমাদের উপর হামলা করতে সক্ষম হবে না, আমরা ওদের উপর আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হবো।" (বুখারী)

অর্থাৎ কাফির এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, ইসলামের মুকাবিলায় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং ইসলামকে ধ্বংস করার কোনো শক্তিই তাদের ছিল না। কারণ এখন ইসলাম এতই শক্তিশালী হলো যে, কাফিরের মুকাবিলায় প্রথমে আক্রমণ করতে এবং অতর্কিত আক্রমণ করতে সক্ষম।

সতর্ক বাণী : যারা ইসলামের প্রথমে আক্রমণ (জিহাদ) করার বিরোধী, তারা বুখারীর রিওয়ায়াতের এ বাক্যাবলী অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করুন।

আর যখন প্রভাত হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল :

لاَ اِلٰهَ الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ .

(বুখারী, পৃ. ৫৯০)।

ইবন সা'দ ও বালাযুরী বলেন, এ ঘেরাও ছিল পনের দিন, ওয়াকিদী বলেন, এ বক্তব্যই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; হযরত সা'দ ইবন মুসায়্যিব (রা) বলেন, তা ছিল চব্বিশ দিন। এ যুদ্ধে মুশরিকদের তিন ব্যক্তি, নওফল ইবন আবদুল্লাহ, আমর ইবন আবদুদ এবং মনিয়া ইবন উবায়দ নিহত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে ছয় ব্যক্তি শাহাদতবরণ করেন। (তাঁরা ছিলেন) :

১. হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা),
২. হযরত আনাস ইবন আবিস (রা),
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সাহল (রা),
৪. হযরত তুফায়ল ইবন নুমান (রা),
৫. হযরত সা'লাবা ইবন গানামা (রা),
৬. হযরত কা'ব ইবন যায়দ (রা)।

হাফিয দিময়াতী আরো দু'টি নাম অতিরিক্ত যোগ করেছেন ঃ

৭. হযরত কায়স ইবন যায়দ (রা) এবং
৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ খালিদ (রা)।

বনী কুরায়যার যুদ্ধ (পঞ্চম হিজরীর যিলকদ[১] মাস, বুধবার)

খন্দক যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামাযের পর প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি এবং সমস্ত মুসলমান অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলেন। যখন যোহরের ওয়াক্ত হলো, হযরত

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ১২৬।

জিবরাঈল আমীন (আ) (যে পরিচয় রাসূলের মাধ্যমে পরে জানা গেছে) একটি খচ্চরে আরোহণ করে পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হলেন।[১] অতঃপর নবী করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি কি অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরাঈল (আ) বললেন, দুশমনেরা তো এখনো অসজ্জিত অবস্থায়। তারা এখন পর্যন্ত গৃহে ফিরে যায়নি। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বনী কুরায়যার দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি নিজেও বনী কুরায়যার অবস্থানের দিকে যাচ্ছি এবং গিয়ে ওদেরকে দোদুল্যমান করি।[২]

হযরত আনাস (রা) বলেন, বনী কুরায়যা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি পূর্বে থেকেই বিদ্যমান ছিল। যখন কুরায়শ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসে, তখন বনী কুরায়যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে কুরায়শের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা যখন এ বাহিনীকে পরাজিত করলেন, তখন বনী কুরায়যা দুর্গসমূহে গিয়ে আত্মগোপন করে। হযরত জিবরাঈল (আ) ফেরেশতাদের এক বিশাল বাহিনী সঙ্গে নিয়ে হযরতের খিদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্রুত বনী কুরায়যার দিকে অগ্রসর হোন। তিনি বললেন, আমার সঙ্গীগণ এখনো ক্লান্ত। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি এসবে ভ্রূক্ষেপ না করে রওয়ানা হয়ে যান। আমি এক্ষুণি গিয়ে ওদের অন্তর কাঁপিয়ে দিচ্ছি। এ কথা বলে জিবরাঈল (আ) ফেরেশতা বাহিনী সহকারে বনী কুরায়যার দিকে যাত্রা করলেন। তখন বনী গানামের পল্লী সম্পূর্ণ ধুলিময় হয়ে গেল।

হযরত আনাস (রা) বলেন, ঐ ধুলি, যা হযরত জিবরাঈল (আ) বাহিনীর দ্বারা বনী গানামের পল্লীতে ছড়িয়ে পড়েছিল তা এখন পর্যন্তও আমার দু'চোখে ভাসছে। মনে হয় ধূলি ধূসরিত সেই দৃশ্য আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি (বুখারী)।

জিবরাঈল (আ) তো চলে গেলেন। আর নবী করীম (সা) হুকুম দিলেন, কোন ব্যক্তিই যেন বনী কুরায়যার অবস্থানে যাওয়া ছাড়া অন্য কোথাও আসরের নামায না পড়ে। পথিমধ্যে যখন আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল, তখন মতভেদ দেখা দিল। কেউ কেউ বললেন, আমরা তো বনী কুরায়যায় পৌঁছে আসরের নামায পড়ব। কেউ বললেন, আমরা নামায পড়ে নিচ্ছি; রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তো এ উদ্দেশ্য ছিল না (যে, নামায কাযা করা হোক), বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যাতে দ্রুত সেখানে পৌঁছা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে যখন এ কথা বলা হলো, তখন তিনি কারো প্রতিই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না (বুখারী)। এজন্যে যে, প্রত্যেকের নিয়্যতই ছিল কল্যাণকর।

---

১. ইবন সা'দের বর্ণনায় আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) জানাযার স্থানের (অর্থাৎ ঐ জায়গা, যা তিনি মসজিদ থেকে পৃথক কেবল জানাযার নামায আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন) সন্নিকটে এসে দাঁড়ান (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৫৩), এতে জানা গেল যে, জানাযার নামায মসজিদে না পড়া উচিত; অন্যথায় জানাযার জন্য মসজিদ থেকে পৃথক জায়গা নির্দিষ্ট করার কি প্রয়োজন ছিল ?

২. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১১৬; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৪৫।

ফায়দা : হাফিয ইবন কায়্যিম বলেন, যারা হাদীসের বাহ্যিক শব্দের ওপর আমল করেছেন, তারাও প্রতিদান পেয়েছেন আর যারা চিন্তা-গবেষণা করেছেন, তারাও প্রতিদান পেয়েছেন। কিন্তু যারা বাহ্যিক শব্দের ওপর আমল করে বনী কুরায়যায় না পৌঁছে আসরের নামায আদায় করেন নি, এমনকি আসরের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তারা কেবল একটি কল্যাণ লাভ করেছেন অর্থাৎ নবী (সা)-এর আদেশ পালনের প্রতিদান লাভ করেছেন। আর যারা চিন্তা-গবেষণা দ্বারা কাজ করেছেন এবং ভেবেছেন যে, নবী (সা)-এর আদেশের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, আসরের নামায কাযা করা হোক; বরং উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত পৌঁছানোর, এজন্যে আসরের নামায পথেই পড়ে নেন, তারা চিন্তা-গবেষণার বদৌলতে দু'টি কল্যাণ লাভ করেছেন। একটি কল্যাণ নবী (সা)-এর আদেশ পালনের জন্য, আর দ্বিতীয় কল্যাণ 'সালাতুল ওয়াস্তা' (আসরের নামায)-এর হিফাযতের জন্য; যা প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য কল্যাণের একীভূত রূপ এবং যার হিফাযতের নির্দেশ কুরআনুল কারীমে এসেছে : حَافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوت وَالصَّلاَةِ الْوُسْطٰى (তোমরা নামায এবং মধ্যবর্তী নামাযের হিফাযত কর)। এছাড়া হাদীসে এসেছে, যার আসরের নামায ছুটে গেল, তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেল; ইত্যাদি ইত্যাদি। বাহ্যিক শব্দের উপর আমলকারীদের প্রতি যদিও তিনি এজন্যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি যে, তাদের নিয়্যত ছিল ভাল, কিন্তু যারা চিন্তা-গবেষণার দ্বারা কাজ করেছেন, তাদের মর্যাদায় তারা উন্নীত হতে পারবেন না। (ফাতহুল বারী,৭খ. পৃ. ৩১৬)।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ইসলামের ঝান্ডাসহ রওয়ানা করলেন। হযরত আলী (রা) যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা)-কে প্রকাশ্যে এমনভাবে গালি দেয় (যা ক্ষমার অযোগ্য একটি পৃথক অপরাধ)।

অতঃপর রাসূল (সা) সশরীরে সেখানে রওয়ানা হলেন এবং পৌঁছেই বনী কুরায়যাকে অবরোধ করলেন। পঁচিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকল। ইত্যবসরে তাদের সর্দার কা'ব ইবন আসাদ তাদেরকে একত্রিত করে বলল, আমি তিনটি প্রস্তাব তোমাদের সামনে রাখছি, এর মধ্যে যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ করতে পার যাতে এ বিপদ থেকে তোমরা মুক্তি পেতে পার।

১. প্রথমটি এই যে, আমরা ঐ ব্যক্তির [অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূল (সা)-এর] প্রতি ঈমান আনয়ন করি এবং তাঁর অনুগত ও অনুসারী হয়ে যাই।

فو الله لقد نبين لكم انه لنبى مرسل وانه للذى تجدونه فى كتابكم فتأمنون على مائكم واموالكم وابناءكم ونساءكم ·

"কেননা আল্লাহর কসম, তোমাদের কাছে এ কথা প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে তিনি মহান আল্লাহর নবী ও রাসূল এবং অবশ্যই তিনি সেই নবী যাঁর উল্লেখ তোমরা তাওরাতে দেখ; যদি ঈমান আনয়ন কর তবে তোমাদের জীবন, সম্পদ, শিশু ও নারী সবই নিরাপত্তা লাভ করবে।"

বনী কুরায়যা বলল, এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করব না।

২. কা'ব ইবন আসাদ বলল, আচ্ছা, যদি এটা গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, নিজেদের সন্তান ও স্ত্রীলোকদেরকে হত্যা করে চিন্তামুক্ত হয়ে যাও এবং তরবারি ধারণ করে পূর্ণ শক্তি ও সাহসের সাথে মুহাম্মদ (সা)-এর মুকাবিলা কর। এতে অকৃতকার্য হলে স্ত্রী ও সন্তানদের কোন চিন্তা থাকবে না। আর যদি জয়লাভ কর, তা হলে স্ত্রীলোক অনেক আছে এবং তাদের দ্বারা সন্তানও পাবে। বনী কুরায়যা বলল, অকারণে স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করা হলে বেঁচে থাকার আনন্দ কোথায় ?

৩. কা'ব বলল, আচ্ছা, এটাও যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তা হলে তৃতীয় প্রস্তাব এই যে, আজ সপ্তাহের (রোববারের) পূর্ব রাত্রি, এটা আশ্চর্য নয় যে, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সঙ্গিগণ অসচেতন অবস্থায় আছেন এবং আমাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, এ দিন ইয়াহূদীদের নিকট পবিত্র, তাই তারা এ দিনে হামলা করবে না। সুতরাং তোমরা এ সুযোগে আজ রাতেই তাদেরকে রক্তে রঞ্জিত করে লাভবান হতে পারো। বনী কুরায়যা বলল, ওহে কা'ব, তোমার তো জানা আছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের এ দিনেরই অমর্যাদা করার কারণে বানর এবং শূকরে পরিণত করা হয়েছে; এরপরও তুমি এ কাজেরই নির্দেশ দিচ্ছ ? মোট কথা, বনী কুরায়যা কা'ব-এর একটি কথাও মানল না।

হযরত আবূ লুবাবা ইবন আবদুল মুনযির (রা)-এর সাথে বনী কুরায়যার মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। এ কারণে তাদের মনে এ আশার সঞ্চার হলো যে, সম্ভবত তিনি এ সঙ্কটময় মুহূর্তে আমাদের কোন সাহায্য করতে পারবেন। এ প্রেক্ষিতে বনী কুরায়যা রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে এ আরয করল যে, আবূ লুবাবাকে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন যাতে আমরা তার সাথে পরামর্শ করতে পারি। তিনি (সা) আবূ লুবাবা (রা)-কে অনুমতি দিলেন। তারা আবূ লুবাবাকে দেখে সবাই একত্রিত হলো। শিশু এবং মহিলারা তাঁকে দেখে কাঁদতে শুরু করে দিল। তা দেখে আবূ লুবাবা (রা)-এর অন্তর আবেগাপ্লুত হয়ে উঠল। বনী কুরায়যা যখন তাঁকে জানাল যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ মেনে নিতে এবং তাঁর সিদ্ধান্তে সম্মত হতে চাই, তখন আবূ লুবাবা বললেন, হ্যাঁ, উত্তম। তবে কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করে বললেন, যবেহ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে হত্যা করা। হযরত আবূ লুবাবা তখনো সেখান থেকে উঠেন নি, অকস্মাৎ তাঁর বোধোদয় ঘটলো যে, আমি তো আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আমানত খিয়ানত করেছি! তিনি সোজা মসজিদে নববীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং নিজেকে একটি থামের সাথে বেঁধে নিয়ে শপথ করলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা আমার তাওবা কবূল করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করব না। তিনি আল্লা্ তা'আলার সাথে এ ওয়াদা করলেন যে, কখনো আর বনী কুরায়যায় পা দেব না এবং যে শহরে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আমানতের খিয়ানত করেছি, সে স্থান কখনো দেখব না। রাসূলুল্লাহ

(সা) যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন ইরশাদ করলেন, যদি সে সোজাসুজি আমার কাছে চলে আসত, তা হলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম, কিন্তু যখন সে এমনটি করেছে, তখন আমি নিজ হাতে তাকে মুক্ত করব না, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবূল না করেছেন।[১]

অবশেষে বাধ্য হয়ে বনী কুরায়যা এতে সম্মত হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যে আদেশ দেন, তাতে আমরা সম্মত আছি।

খাযরাজ ও বনী নাযীর গোত্রের মধ্যে যেরূপ মিত্রতার সম্পর্ক ছিল, অনুরূপভাবে আওস ও বনী কুরায়যার মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক ছিল। এ জন্যে আওস সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আবেদন জানাল যে, খাযরাজের সুপারিশে হুযূর (সা) বনী নাযীরের সাথে যে আচরণ করেছিলেন, আমাদের সুপারিশে বনী কুরায়যার সাথে অনুরূপ আচরণ করা হোক। তিনি (সা) বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমাদের বিচার-ফয়সালা তোমাদেরই এক ব্যক্তি করে দিক ? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সা'দ ইবন মু'আয যে ফয়সালা করবেন, তাতে আমরা সম্মত আছি।

হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) যখন খন্দক যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য মসজিদে নববীর সাথে একটি তাঁবু তৈরি করে দিয়েছিলেন যাতে নিকটে থেকে তার দেখাশোনা করতে পারেন। তাঁকে ডাকার জন্য তিনি লোক প্রেরণ করলেন। সা'দ গাধার পিঠে আরোহণ করে এলেন এবং যখন নিকটে পৌঁছলেন, তখন নবী (সা) সবাইকে বললেন, قوموا الى سيدكم "তোমাদের সর্দারের সম্মানার্থে দাঁড়াও।"[২]

যখন অবতরণ করলেন এবং তাঁকে বসানো হলো, তখন নবীজি বললেন, এরা তাদের ফয়সালার ভার তোমার উপর অর্পণ করেছে। হযরত সা'দ (রা) বললেন, আমি তাদের ব্যাপারে এ ফয়সালা করছি যে, তাদের মধ্যকার যুদ্ধে সক্ষম অর্থাৎ পুরুষদের হত্যা করা হোক, আর নারী ও শিশুদের বন্দী করে নিয়ে দাস-দাসীতে পরিণত করা হোক। আর তাদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। নবী (সা) বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি আল্লাহর নির্দেশমত ফয়সালা করেছ। এর পর সা'দ (রা) এ দু'আ করলেন :

'আয় আল্লাহ্! তুমি ভাল করেই জানো, আমার কাছে তা অপেক্ষা বেশি কোন বস্তু প্রিয় ছিল না যে, আমি এ সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করব, যে সম্প্রদায় তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং হেরেম শরীফ থেকে বের করে দিয়েছে। আয় আল্লাহ, আমার ধারণা যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যকার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছ। কাজেই কুরায়শের সাথে যদি আরো যুদ্ধ অবশিষ্ট থেকে থাকে, তা হলে

---

১. ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৪৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১১৯।

২ অথবা এ অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে যে, তোমাদের সর্দারকে বাহন থেকে নামানোর জন্য দাঁড়াও, কেননা তিনি অসুস্থ ছিলেন।

আমাকে জীবিত রাখ, যাতে তোমার পথে আমি তাদের সাথে জিহাদ করতে পারি। আর যদি প্রকৃতই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়ে থাক, তা হলে আমার যখমকে বৃদ্ধি করে দাও এবং একে আমার শাহাদত লাভের মাধ্যম বানিয়ে দাও।'

দু'আ করার অপেক্ষা মাত্র, যখম বৃদ্ধি পেল এবং এতেই তিনি ইনতিকাল করলেন। انا لله وانا اليه راجعون

হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, সা'দ ইবন মু'আযের মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠেছে– এ বর্ণনা বুখারীর। অপর এক বর্ণনায় আছে, আসমানের সমস্ত দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে এবং তার রূহের ঊর্ধ্বারোহণে আসমানের ফেরেশতাগণ খুশি হয়েছেন– এ বর্ণনা হাকিমের। [ফাতহুল বারী, হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর প্রশংসা] এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন, যারা এর পূর্বে কখনো আসমান থেকে অবতরণ করেন নি। (ইবন আয়েয বর্ণিত) বাযযার এটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।[১]

সুতরাং আনসারগণের মধ্যে কেউ তাঁর স্মরণে এ কবিতা পাঠ করেন :

وما اهتز عرش الله من موت هالك * سمعنا به الا لسعد ابى عمر

[ইবন আবদুল বার মুকৃত আল-ইস্তিয়াব, ২খ. পৃ. ৩২, হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর জীবন চরিত]।

হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) ছাড়া আমরা আর কোন মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে এ কথা শুনিনি যে, আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে, আর তাঁর কবর থেকে মিশকের খুশবু আসছিল। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন। (রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১৯৩)

বনী কুরায়যার বাহিনীর সবাইকে বন্দী করে মদীনায় আনা হলো এবং এক আনসারী মহিলার বাড়িতে তাদেরকে আটক করে রাখা হলো। 'বাযারে' তাদের জন্য গর্ত খনন করা হলো এবং দু'-দু', চার-চারজন করে তাদেরকে নেয়া হতো এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে ঐ গর্তে পুঁতে ফেলা হতো। হুয়াই ইবন আখতাব এবং বনী কুরায়যার সর্দার কা'ব ইবন আসাদকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। হুয়াই ইবন আখতাবকে [যার বলায় বনী কুরায়যার সর্দার কা'ব ইবন আসাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ওয়াদা খেলাফ করেছিল এবং চুক্তি ভঙ্গ করেছিল] যখন হযরতের সামনে আনা হলো, তখন হুয়াই তাঁর প্রতি তাকিয়ে বলল, আল্লাহর কসম, আমি আমার প্রবৃত্তিকে আপনার দুশমনির দরুন ধিক্কার দিচ্ছি না কিন্তু সত্য কথা হলো, আল্লাহ্ যাকে সাহায্য না করেন, তার কোন সাহায্যকারী নেই। আবার লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, ওহে লোক সকল, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, বনী ইসরাঈলের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত ছিল এবং যে বিপদ তাদের জন্য লিখা হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়েছে। এ কথা বলে হুয়াই বসে পড়ল। অতঃপর তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। মহিলাদের মধ্যে কেবল

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১২৮।

একজন ছাড়া অপর কাউকে হত্যা করা হয়নি, যার অপরাধ ছিল, সে ছাদের উপর থেকে যাঁতার একটি অংশ নিচে ফেলে দিয়ে হযরত খাল্লাদ ইবন সুয়ায়দ (রা)-কে শহীদ করেছিল (ইবন হিশাম), তার নাম ছিল বুনানা এবং সে হাকাম কুরাযীর স্ত্রী ছিল (উয়ূনুল আসার, পৃ. ৮৭)।

তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন হিব্বানে হযরত জাবির (রা) থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এদের সংখ্যা ছিল চারশত। বনী কুরায়যার বন্দীদেরকে বিক্রির জন্য নজদ ও সিরিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিল এবং বিক্রি মূল্য দিয়ে ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়েছিল। যে সমস্ত গনীমতের মাল বনী কুরায়যা থেকে পাওয়া গিয়েছিল, তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

বনী কুরায়যার ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا - وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًالَّمْ تَطَئُوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ۰

"কিতাবীদের মধ্যে যারা ওদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ থেকে অবতরণ করালেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ আর কতককে করছ বন্দী। তিনি তোমাদেরকে ওদের ভূমির অধিকারী করলেন, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির, যাতে তোমরা এখনো পদার্পণ করোনি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"(সূরা আহযাব : ২৬-২৭)

সতর্ক বাণী : বনী কুরায়যার ব্যাপারে হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর ফয়সালা তাওরাতের বিধান অনুযায়ী হয়েছিল, যার প্রতি তাদের ঈমান ছিল। সুতরাং তাওরাতের সফর ইস্তিসনা, বিংশতম অধ্যায়ের দশম আয়াতে আছে ঃ

"যখন তুমি যুদ্ধের জন্য কোন শহরের নিকটবর্তী হও, প্রথমে তাদেরকে সন্ধির প্রস্তাব দাও; তারা যদি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং তোমাদের জন্য ফটক খুলে দেয়, তা হলে ঐ জনপদে যত নাগরিক পাওয়া যাবে, সবাই তোমাদেরকে খাজনা দেবে এবং তোমাদের সেবা করবে। আর যদি তারা তোমাদের সাথে সন্ধি না করে বরং যুদ্ধ করে, তবে তাদেরকে তোমরা অবরোধ কর, আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা তা তোমাদের করতল দেন, তবে সেখানকার সমস্ত পুরুষকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান কর কিন্তু স্ত্রীলোকদেরকে, বালকদেরকে[১] এবং জীবজন্তুসহ যা কিছু ঐ শহরে আছে, সব কিছু তোমাদের জন্য নিয়ে যাও। তোমাদের প্রভুই সেগুলো ভোগের জন্য তোমাদের দিয়েছেন, (সুতরাং) ভোগ কর।"[২]

১. এদের সবাইকে নিজেদের দাস-দাসী বানাও।

২ যেমন আল্লাহর বাণী : ... ... فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ

আর হযরত আবূ লুবাবা (রা) মসজিদের খুঁটির সাথে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন, কেবল নামায এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় খুলে দেয়া হতো। খেতেনও না, পানও করতেন না। বলতেন, আমি এ অবস্থাতেই থাকব, এমনকি হয় মারা যাব অথবা আল্লাহ্ তা'আলা আমার তাওবা কবূল করবেন। ছয়দিন পর শেষরাতে তাঁর তাওবা অবতীর্ণ হলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর ঘরে ছিলেন। হযরত উম্মে সালমা (রা) নবীজির অনুমতি নিয়ে তাকে সুসংবাদ শোনালেন এবং মুবারকবাদ দিলেন। মুসলমানগণ দৌড়ে এলেন তার বাঁধন খুলে দিতে। আবূ লুবাবা (রা) বললেন, আমি শপথ করেছি যে, যখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) এসে নিজ হাতে আমার বাঁধন না খুলছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁধন খুলব না। কাজেই তিনি যখন ফজরের নামাযের জন্য এলেন, তখন আপন পবিত্র হাতে বাঁধন খুলে দিলেন।

দ্রষ্টব্য : হযরত আবূ লুবাবা (রা)-এর মধ্যে অনুশোচনা এসে গিয়েছিল যে, নিজকে নিজেই মসজিদের থামের সাথে বাঁধেন এবং শপথ করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার তাওবা কবূল না হবে এবং রাসূল (সা) এসে স্বহস্তে আমার বাঁধন না খুলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ থামের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকব, এতে যদিও আমার মৃত্যু এসে যায়।–এটা ছিল একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ অবস্থা, যা কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ প্রেমাস্পদ ও একনিষ্ঠ বান্দাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। পারিভাষিক অর্থে একে 'হাল' বলা হয়, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পসন্দ করেন। হযরত আবূ লুবাবা (রা) প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۰

"হে ঈমানদারগণ, জেনে শুনে আল্লাহ তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না" (শেষ আয়াত পর্যন্ত)। (সূরা আনফাল : ২৭)

আর তাঁর তাওবা কবূলের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয় :

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۰

"এবং অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, ওরা এক সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে, আল্লাহ হয়ত ওদের অপরাধ ক্ষমা করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবা : ১০২)

হযরত আবূ লুবাবা (রা) বিশদিন পর্যন্ত মসজিদের থামের সাথে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। যখন আয়াত নাযিল হলো, তখন নবী করীম (সা) স্বয়ং মসজিদে আসেন এবং আবূ লুবাবাকে সুসংবাদ শোনান ও নিজ হাতে তার বাঁধন খুলে দেন।

এরদ্বারা জানা গেল যে, উৎসাহ ও ভালবাসার দরুন এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট উত্তম ও প্রিয়, একে অস্বীকার করা উচিত নয়; এ হাল সৃষ্টি হওয়া জ্ঞানত ভালবাসা ও প্রণয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল। যে সমস্ত ব্যক্তি সম্মানিত সূফিগণের 'হাল' ও 'উজদ'-কে অস্বীকার করেন, মনে হয় যে, তাদের অন্তঃকরণ ভালবাসার উন্মাদনা থেকে শূন্য। যখন মানুষের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তখন তার হুঁশ থাকে না; পাত্রের নিচে যখন আগুন বেশি হবে, তখন পাত্রস্থিত বস্তু উথলিয়ে পড়তে বাধ্য। মোট কথা, উজদ ও হাল-কে অস্বীকার করা অসম্ভব ও দুরূহ।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর নির্দোষের ব্যাপারে যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে বললেন, ওহে মেয়ে, উঠো এবং রাসূলুল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বললেন : انا لا اشكر الا ربى "আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো শুকরিয়া আদায় করব না।"

এটাও কৃতজ্ঞতা ও উজদের একটা অবস্থা ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত এ অতুলনীয় উপহার দেখে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে এ পর্যায়ের নেশাগ্রস্থ বানিয়ে দেয়া হয় যে, নবী করীম (সা)-এর শোকর আদায় করাকেও তিনি অস্বীকার করে বসলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। এতে জানা গেল যে, হাল অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপারগ, অন্যথায় এ সব কিছুই তো প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হওয়ারই বরকত ছিল। (এ ছাড়া একে খুশিজনিত অভিমানও বলা যায় বৈ কি)। পবিত্রতা বিষয়ক এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) একটা বড় ধরনের অপবাদ থেকে মুক্ত হয়ে মর্যাদার উত্তুঙ্গ চূড়ায় সমাসীন হয়েছিলেন, এ অবস্থায় এমন বাক্য তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) তাঁর মাদারিজুন-নবূওয়াতে এমন ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

হযরত যয়নব (রা)-এর সাথে মহানবী (সা)-এর বিবাহ

এ বছরেই অর্থাৎ হিজরী পঞ্চম বর্ষে মহানবী (সা) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-কে বিবাহ করেন।

قال قتادة والواقدى وبعض اهل المدينة بزوجها عليه السلام ينة خمسو زاد بعضهم فى ذى القعدة قال الحافظ البيهقى تزوجها جد بنى قريضة وقال خليفة بن خياط وابو عبيدة ومعمر بن المثنى وابن مندة تزوجها سنة ثلاث والاول اشهر وهو الذى سلكه ابن جرير وغير واحد من اهل التاريخ ·

"কাতাদা, ওয়াকিদী এবং মদীনার কতিপয় আলিমের মতানুযায়ী মহানবী (সা) পাঁচ হিজরী সনে হযরত যয়নব (রা)-কে বিয়ে করেন এবং কেউ কেউ এর সাথে

অতিরিক্ত বৃদ্ধি করেছেন যে, যিলকদ মাসে করেছেন। আর ইমাম বায়হাকী বলেন, হযরত যয়নব (রা)-কে তিনি বনী কুরাইযা যুদ্ধের পর বিয়ে করেছেন। খলীফা ইবন খায়্যাত, আবূ উবায়দা, মা'মার এবং ইবন মান্দাহ বলেন, তৃতীয় হিজরীতে এ বিবাহ হয়েছিল। তবে প্রথম বক্তব্য অর্থাৎ পঞ্চম হিজরীতে বিবাহ হওয়াই বেশি প্রসিদ্ধ এবং এটাকেই ইবন জারীর ও অপরাপর ইতিহাসবিদ গ্রহণ করেছেন।" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৪৫)।

হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র সহধর্মিণিগণের বর্ণনায় আসবে ইনশা আল্লাহ্।

পর্দার বিধান অবতরণ

হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহের ওলীমার সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ সূরা আহযাবের এ আয়াত :

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ٠

"তোমরা তার পত্নীদের নিকট থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।" সূরা আহযাব : ৫৩

এ আয়াতকে 'আয়াতে হিজাব' বলে যে, স্ত্রীলোকগণ এমন পুরুষের সামনে আসবে না, যার সাথে তার বিবাহ বৈধ। আর সূরা নূরে যে আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে :

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ... ... لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٠

"মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে..যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা নূর : ৩১)

এ আয়াতে দ্বিতীয় দফা সতর সম্পর্কীয় বিধান নাযিল হয়। একে 'আয়াতে সতর' বলা হয়। অর্থাৎ শরীরের কতটুকু অংশ সব সময় ঢেকে রাখা জরুরী এবং শরীরের কতটা অংশ খোলা রাখা জায়েয; যেমন গৃহে মুখমণ্ডল এবং হাতের অগ্রভাগ ঢাকা ওয়াজিব নয়, এ অঙ্গকে যদি গৃহেও সব সময় ঢেকে রাখা ওয়াজিব ও ফরয হতো, তা হলে তা কঠিন হয়ে যেত; তবে তার অর্থ এ নয় যে, যার সামনে ইচ্ছা, খুলে দাও! যদি সবার সামনে মুখমণ্ডল খুলে রাখার অনুমতি থাকত, তা হলে হিজাব ও পর্দার আদেশ অবতরণে কি লাভ হলো। এর বিস্তারিত বিবরণও ইনশা আল্লাহ্ হযরত যয়নব (রা)-এর ঘটনায় আসবে।

ষষ্ঠ হিজরী

হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-এর কুরতা[১] অভিযান (১০ মুহররম, ষষ্ঠ হিজরী)

ষষ্ঠ হিজরীর দশই মুহররম রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাম্মদ ইবন মাসলামা আনসারী (রা)-এর নেতৃত্বে ঊনিশজন অশ্বারোহীকে কুরতার দিকে প্রেরণ করেন। তাঁরা গিয়ে সেখানে দুশমনদের ওপর আক্রমণ করেন। এতে দশজন নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করে। গনীমত হিসেবে দেড়শত উট ও তিন হাজার বকরি হস্তগত হয়। সব কিছু নিয়ে তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হন। ঊনিশ দিন পর ঊনত্রিশে মুহররম তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এক-পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে অবশিষ্ট গনীমতের মাল যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা হয়। বন্টনকালে একটি উটকে দশটি বকরির বিনিময় নির্ধারণ করা হয়।[২]

সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ বাহিনী বনী হানীফা গোত্রের সর্দার সুমামা ইবন উসালকে গ্রেফতার করে নবী (সা)-এর খিদমতে আনয়ন করে। তিনি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন (যাতে করে মুসলমানদের নামায ও ইবাদত তার দৃষ্টিগোচর হয়, যা দেখে আল্লাহকে স্মরণ এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়, এর নূরের বরকতে তার অন্তরের অন্ধকার দূরীভূত হয়)।

রাসূলুল্লাহ (সা) তার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সুমামা, আমার ব্যাপারে তোমার ধারণা কি ? সুমামা বললেন, আপনার ব্যাপারে আমার ধারণা উত্তম।

ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم على شاكر وان كنت تريد المال فسل منه ماشئت .

“যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে এক খুনীকে হত্যা করবেন, যে হত্যার যোগ্য; আর যদি পুরস্কৃত ও অনুগৃহীত করেন, তবে এক কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে পুরস্কৃত ও অনুগৃহীত করবেন; আর যদি ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য হয়, তা হলে যে পরিমাণ চাইবেন, উপস্থিত করব।”

রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা শুনে নীরবে প্রস্থান করলেন। দ্বিতীয় দিন আবার তিনি ঐদিক দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং সুমামাকে জিজ্ঞেস করলেন, সুমামা, আমার ব্যাপারে তোমার ধারণা কি ? সুমামা তাঁর দয়ার্দ্র চিত্তের বিষয় উপলব্ধি করতে পেরে

---

১. কুরতা বনী বকর গোত্রের একটি শাখা, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে সাত দিনের দূরত্বে যারবা নামক স্থানে তারা বাস করতো। যারকানী, ২খ. পৃ. ১৪৪।

২ তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৫৬।

প্রথম ও তৃতীয় বাক্য বিলুপ্ত করে দিলেন এবং শুধু বললেন, ان تنعم على شاكر "যদি (আমার প্রতি) অনুগ্রহ করেন, তবে এক কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করবেন।"

এ কথা শুনে তিনি নীরবে চলে গেলেন। তৃতীয় দিন আবার ঐ পথে গেলেন এবং একই প্রশ্ন করলেন। সুমামা বললেন, আমার ধারণা তাই, যা আমি কাল বলেছি।

আজ সুমামা ان تنعم على شاكر 'যদি (আমার প্রতি) অনুগ্রহ করেন, তবে এক কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করবেন' কথাটিও লুপ্ত করে দিলেন। তার বিষয়টি সুন্দর সৃষ্টি ও দয়ার্দ্র ও ক্ষমাশীল নবীর প্রতি ছেড়ে দিলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সুমামাকে ছেড়ে দাও। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, তিনি খোদ সুমামাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : قد عفوت عنك يا ثمامة واعتقتك "ওহে সুমামা, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম ও মুক্তি দিলাম।"

সুমামা মুক্ত হওয়া মাত্রই মসজিদের নিকটে অবস্থিত একটি বাগানে গিয়ে গোসল করলেন; অতঃপর পুনরায় মসজিদে ফিরে এসে বললেন : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।"

আর নবীজীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে মুহাম্মদ (সা)! আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আপনার চেহারা অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কোন চেহারা আমাকে এত অধিক ক্রোধান্বিত করত না, আর আজ আমার কাছে পৃথিবীর বুকে আপনার চেহারা অপেক্ষা প্রিয় আর কোন চেহারা নেই। এর পূর্বে আপনার ধর্ম অপেক্ষা অপর কোন ধর্ম আমাকে এতটা রাগান্বিত করে নি। আজ আপনার ধর্মই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আর আপনার শহর অপেক্ষা কোন শহর আমার নিকট অপ্রিয় ছিল না; আজ আপনার শহর অপেক্ষা আমার কাছে আর কোন প্রিয় শহর নেই। আমি উমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় আপনার অশ্বারোহী বাহিনী আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। এবারে যা আজ্ঞা হয়।" তিনি তাকে উমরা করার অনুমতি দিলেন এবং সুসংবাদ দিলেন (অর্থাৎ তুমি নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন থাকবে, কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না)।

হযরত সুমামা (রা) যখন মক্কায় এলেন, তখন জনৈক কাফির বলল, সুমামা, তুমি বেদীন হয়ে গিয়েছ। সুমামা বললেন, কখনই নয়, আমি তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মুসলমান হয়ে গিয়েছি। অর্থাৎ আমি তো বেদীন হইনি, এ জন্যে যে, কুফর ও শিরক তো কোন দীন নয়, বরং অনর্থক ও ফালতু ধারণা, আমি তো আল্লাহর অনুগত ও আজ্ঞাবহ বান্দায় পরিণত হয়েছি এবং নিজেকে তাঁরই হাওলায় সোপর্দ করেছি। আল্লাহর কসম, আমি কখনই আর তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করব না। এ কথা ভাল করে জেনে নাও যে, সুমামার মাধ্যমে যে খাদ্যশস্য তোমাদের কাছে আসত, রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমতি না দিলে তার একটি দানাও আর আসবে না। হযরত সুমামা (রা)

ইয়ামামা পৌঁছে খাদ্যশস্য আসা বন্ধ করে দিলেন। কুরায়শরা বাধ্য হয়ে নবী (সা)-এর দরবারে আরযী লিখে পাঠাল যে, আপনি তো আত্মীয়তার হক আদায়ের নির্দেশ দেন, আর আমরা তো আপনারই আত্মীয়-স্বজন। আপনি সুমামাকে লিখে দিন যে, খাদ্যশস্য প্রেরণ পূর্বের ন্যায় বহাল রাখা হোক। তিনি পত্র লিখিয়ে হযরত সুমামা (রা)-এর কাছে প্রেরণ করলেন যে, খাদ্যশস্য বন্ধ করো না। (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৬৮, অধ্যায় : বনী হানীফ প্রতিনিধি)।

মাসআলা : যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব (যেমনটি ফাতহুল কাদীরে বর্ণিত হয়েছে)। হযরত সুমামা ইবন উসাল (রা) বিশিষ্ট সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর যখন ইয়ামামার অধিবাসীরা মুরতাদ এবং মুসায়লামা কাযযাবের অনুসারী হলো, তখন হযরত সুমামা (রা) জনগণের সামনে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حٰـمٓ - تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ - غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ·

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। হা-মীম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট থেকে– যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবূল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট।" (সূরা মু'মিন : ১–৩)

অতঃপর বললেন, ইনসাফের দৃষ্টিতে বিবেচনা করে দেখ, এ পবিত্র কালামের সাথে মুসায়লামা কাযযাবের কি সম্পর্ক ?

হযরত সুমামা (রা)-এর এ সত্যধর্মী ও একনিষ্ঠতায় ভরপুর কথার প্রভাব হলো; তিন হাজার মানুষ মুসায়লামা কাযযাবের সঙ্গ ত্যাগ করে ইসলামে দাখিল হলো। (যারকানী, ২খ. পৃ. ১৪৪)।

ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, যখন ইয়ামামাবাসী মুরতাদ হয়ে যায়, তখন হযরত সুমামা (রা) লোকজনকে মুসায়লামা কাযযাবের অনুসরণ থেকে বিরত রাখেন এবং বলেন :

اياكم وامرا مظلما لانور فيه وانه لشقاء كتبه الله عز وجل على من اخذ به منكم وبلاء على من لم ياخذ منكم يابنى حنيفة ·

"ওহে লোক সকল ! তোমরা নিজেদেরকে এ অন্ধকারাচ্ছন্ন কাজ থেকে রক্ষা কর যেখানে আলোর লেশমাত্র নেই। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এটা বদনসীবি, যা আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকের নসীবে লিখে দিয়েছেন যারা তা গ্রহণ করেছে। আর এটা তাদের জন্য মুসীবত ও পরীক্ষা, যারা তা গ্রহণ করেনি। হে বনী হানীফ, এ উপদেশ ভাল করে বুঝে নাও।"

কিন্তু হযরত সুমামা (রা) যখন দেখলেন যে, উপদেশে কাজ হচ্ছে না এবং মানুষ বেশি বেশি তার অনুসারী হয়ে যাচ্ছে, তখন যে সমস্ত মুসলমান তার সাথে ছিলেন, তাদেরকে বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এ শহরে অবশ্যই থাকব না; আমি দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ফিতনায় জড়িয়েছেন। যে আমার সাথে যেতে ইচ্ছুক, সে যেতে পারে। সুমামা (রা) মুসলমানদের একটি দল সাথে নিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হলেন এবং হযরত আলা ইবন হাযরামী (রা)-এর সাথে মিলিত হলেন। এ ব্যাপারে হযরত সুমামা (রা) কিছু কবিতার পংক্তি আওড়ালেন :

دعانا الى ترك الديانة والهدى * مسيلمة الكذاب اذجاء يسجع

"মুসায়লামা কাযযাব আমাদেরকে দীন ও হিদায়াত ছেড়ে দিতে আহ্বান করে, যে সময় সে গণকের মত কিছু ছন্দোবদ্ধ কথা বলে,

فيا عجبا من معشر قد تنابعوا * له فى سبيل الغى والفى اشنع

"আশ্চর্যজনক ঐ লোকদের আচরণ যারা তার অনুসরণের মাধ্যমে ভ্রষ্ট পথের অনুসারী হলো, অথচ গুমরাহী খুবই বড় জিনিস।" [যেমনটি ইবন আবদুল বার কৃত আল-ইস্তিয়াব-এ হযরত সুমামা (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে]।

বনী লিহয়ানের যুদ্ধ (রবীউল আউয়াল, ষষ্ঠ হিজরী)

ষষ্ঠ হিজরীর পয়লা রবিউল আউয়াল নবী করীম (সা) নিজেই হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা), হযরত খুবায়ব ইবন আদী (রা) এবং অপরাপর শহীদ সাহাবীগণের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দু'শো সঙ্গী সহ রওয়ানা দেন। বনী লিহয়ান তাঁর আগমন সংবাদ পাওয়ামাত্রই পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। দু'-একদিন এখানে অবস্থানের পর তিনি বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে চারপাশে প্রেরণ করেন। যাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কেও দশজন যোদ্ধাসহ প্রেরণ করেন। এখান থেকে তিনি কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মদীনা ফিরে আসেন। তাঁর পবিত্র মুখে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল : انبون تائبون عابدون ربنا حامدون اعوذ بالله من وعشاء السفر وكابه المنقلب وسوء المنظر فى الاهل والمال (তাবাকাতে ববিন সা'দ, ২খ. পৃ. ৫৬; যারকানী, ২খ. পৃ. ১৪৭)।

যী-কারাদের যুদ্ধ (রবীউল আউয়াল, ষষ্ঠ হিজরী[১])

যী-কারাদ একটি ঝর্ণার নাম, যা ছিল গাতফান বসতির সন্নিকটে। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উটের চারণভূমি। উয়ায়না ইবন হাসান ফাযারী চল্লিশজন

১. এ যুদ্ধের তারিখের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইবন সা'দ বলেন, এ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়, ইমাম বুখারী (র) বলেন, সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে সংঘটিত হয় কিন্তু সমস্ত আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, এ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫২ দেখুন।

অশ্বারোহীর একটি বাহিনীসহ ঐ চারণ ভূমিতে হামলা করে উট ও বকরিগুলো নিয়ে যায়। এরা ঐ চারণ ভূমিতে উট-বকরিগুলোর তত্ত্বাবধায়ক হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর পুত্রকে হত্যা করে এবং হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যায়।

খবর পাওয়ামাত্র হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) তাদের প্রতিহত করার জন্য রওয়ানা দেন এবং একটি টিলায় উঠে দাঁড়িয়ে "ইয়া সাবাহাহ" বলে তিনবার আওয়াজ দেন, যা মদীনার অলি-গলিতে প্রতিধ্বনিত হয়। হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) ভাল তীরন্দাজ ছিলেন। দৌড়ে গিয়ে তিনি একটি ঝর্ণার কাছে ওদের ধরে ফেললেন। তিনি ওদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলেন এবং মুখে এ কবিতা আওড়াতে থাকলেন : انا ابن الاكوع واليوم ليوم الرضع

"আমি আকওয়ার পুত্র, আজকের দিনে বুঝা যাবে যে, কে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের দুধপান করেছে, আর কে নীচ বংশের।"

এমনকি তিনি সমস্ত উট তাদের থেকে ছিনিয়ে নেন এবং ওদের ত্রিশটি ইয়েমেনী চাদরও ছিনিয়ে নেন। তার যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) পাঁচশ' অথবা সাতশ' লোক নিয়ে রওয়ানা হন এবং দ্রুতবেগে চলে সেখানে পৌঁছেন। তবে তিনি রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই কয়েকজন অশ্বারোহীকে প্রেরণ করেছিলেন। তারা পূর্বেই পৌঁছে ওদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মুশরিকদের দু'ব্যক্তি নিহত হয়, একজন মুসআদা ইবন হাকামা, যাকে হযরত আবূ কাতাদা (রা) হত্যা করেন এবং অপরজন আবান ইবন উমর, যাকে হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা) হত্যা করেন। মুসলমানদের মধ্যে হযরত মুহরিয ইবন নাযলা (রা) যাঁর উপাধি ছিল আখরাম,[১] আবদুর রহমান ইবন উয়ায়নার হাতে শহীদ হন।

হযরত সালমা ইবন আকওয়া (রা) নবীজির খিদমতে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ওদেরকে অমুক জায়গায় তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রেখে এসেছি। যদি আমাকে একশ' লোক দেয়া হয় তা হলে আমি ওদের সবাইকে গ্রেফতার করে আনতে পারি। রাসূল (সা) বললেন : يا ابن الاكـوع ملكت فـاسـجع "ওহে ইবন

১. হযরত সালমা ইবন আকওয়া (রা) বলেন, আখরাম (রা) ছিলেন সবার অগ্রভাগে এবং তাঁর পেছনে ছিলেন আবূ কাতাদা (রা), আমি আখরামের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললাম, এত জোরে যেও না, পাছে ওরা তোমাকে মেরে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সঙ্গীগণের অপেক্ষা কর। আখরাম (রা) বললেন, ওহে সালমা, যদি তুমি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস রেখে থাক এবং জান্নাত ও জাহান্নামের অধিকার সম্বন্ধে জেনে থাক, তা হলে আমার এবং আমার শাহাদতের মাঝখানে অন্তরায় হবে না। হযরত সালমা (রা) ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দেন এবং হযরত আখরাম (রা) সামনে অগ্রসর হন ও সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তিনি আবদুর রহমান ইবন উয়ায়নার হাতে শাহাদত লাভ করেন। এর পর হযরত আবূ কাতাদা (রা) অগ্রসর হন এবং আবদুর রহমানকে বর্শা মারেন। এক আঘাতে সেও নিহত হয়। ইসাবা, ৩খ. পৃ. ৩৬৮, হযরত মুহরিয ইবন নাযলা (রা)-এর জীবন চরিত; তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৬০।

আকওয়া, যখন তুমি কাউকে বেকায়দা অবস্থায় পাও, তখন তার সাথে নরম ব্যবহার কর।"[১]

মুশরিকগণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করল আর রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে এক দিবারাত্র অবস্থান করেন এবং সালাতুল খাওফ পড়েন। পাঁচদিন পর তাঁরা মদীনায় ফিরে আসেন (যারকানী, ২খ. পৃ. ১৫৩)।

গামরে[২] হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা)-এর অভিযান

এ রবিউল আউয়াল মাসেই রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা)-এর নেতৃত্বে চল্লিশজনের একটি বাহিনী গামর অভিমুখে প্রেরণ করেন। কিন্তু সংবাদ পেয়েই শত্রুরা পালিয়ে যায়। যখন সেখানে কাউকে পাওয়া গেল না, তখন শুজা ইবন আকওয়া (রা)-কে তাদের সন্ধানে আশেপাশে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তাদের পশুগুলোর সংবাদ পাওয়া গেল না। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার হাতে ধরা পড়ে যায়। তাকে সন্ধান জিজ্ঞেস করে সেখানে গিয়ে আক্রমণ করে দু'শো উট গনীমত হিসেবে পাওয়া যায় (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৬১)।

যিল-কাসসা[৩] অভিমুখে হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-এর অভিযান ও একশ' লোকের শাহাদত

ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস-সানী মাসে মহানবী (সা) মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-এর নেতৃত্বে দশজনের একটি বাহিনী বনী সা'লাবা এবং বনী উয়ালের মুকাবিলা করার জন্য যিল-কাসসা অভিমুখে প্রেরণ করেন। তারা রাতে সেখানে পৌছেন এবং পৌছে ঘুমিয়ে পড়েন। শত্রুরা পাহাড়ে লুকিয়ে ছিল। যখন মুসলিম মুজাহিদগণ ঘুমিয়ে পড়েন, তখন রাতের আঁধারে তাদের একশ' ব্যক্তি এসে আক্রমণ চালিয়ে সবাইকে শহীদ করে। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) আহত হন এবং ওরা তাঁকে মৃত ভেবে ছেড়ে যায়। জনৈক মুসলমান ঐ দিক দিয়ে অতিক্রম করাকালে মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-কে উঠিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন।

যিল-কাসসা অভিমুখে হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর অভিযান

রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর নেতৃত্বে চল্লিশজনের একটি বাহিনী যিল-কাসসা অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী পৌছেই সেখানে আক্রমণ চালান। শত্রুরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। হযরত আবূ উবায়দা (রা) তাদের পশুপাল নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এ অভিযানকে দ্বিতীয় যিল-কাসসা অভিযান বলা হয়।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫৩।

২ গামর একটি জলাশয়ের নাম।

৩. যিল-কাসসা একটি স্থানের নাম, যা মদীনা থেকে বিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যারকানী

জমূম অভিযান

ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস-সানী মাসেই রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে বনী সালিমের মুকাবিলা করার জন্য মদীনা থেকে চার মাইল দূরে জমূম নামক স্থানে প্রেরণ করেন। সেখানে পৌঁছে একজন মহিলা পাওয়া যায়, যে তাদের সন্ধান বলে দেয়। কিছু বন্দী, কিছু উট এবং কিছু বকরি নিয়ে তিনি দু'দিন পর মদীনায় ফিরে আসেন।[১]

ঈস অভিযান (ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাস)

রাসূলুল্লাহ (সা) জানতে পারেন যে, কুরায়শের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছে। এ সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর নেতৃত্বে একশ' সত্তরজন অশ্বারোহীর একটি বাহিনী ঈস-এর দিকে প্রেরণ করেন।

স্থানটি মদীনা থেকে চার দিনের দূরত্বে সমুদ্রোপকূলের নিকটে অবস্থিত। এদিক দিয়ে কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা অতিক্রম করে।

মুসলমানগণ সেখানে পৌঁছে কাফেলার সবাইকে গ্রেফতার করে এবং পণ্য সামগ্রী হস্তগত করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। বন্দীদের মধ্যে নবী (সা)-এর জামাতা আবুল আস ইবন রবী'ও ছিলেন। নবী দুহিতা হযরত যয়নব (রা) তাকে আশ্রয় দেন ও তিনিও তাকে আশ্রয় দেন এবং তার মালপত্র ফিরিয়ে দেন।[২]

হযরত আবুল আস (রা)-এর প্রত্যাবর্তন ও তার ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত ঘটনা বদর যুদ্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

তারিফ অভিযান (জমাদিউস-সানী, ষষ্ঠ হিজরী)

তারিফ একটি জলাশয়ের নাম, যা মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। নবী (সা) বনী সা'লাবাকে দমন করার জন্য হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর নেতৃত্বোব পনেরজনের একটি দল ঐ জলাশয়ের দিকে প্রেরণ করেন। শত্রুরা পলায়ন করে এবং হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) কিছু উট ও বকরি নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

হাসমা[৩] অভিযান (জমাদিউস-সানী, ষষ্ঠ হিজরী)

হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা) নবী (সা)-এর পত্র নিয়ে রোম সম্রাট কায়সারের নিকট গিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসছিলেন, কায়সারের দেয়া উপহার-

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৬২; যারকানী, ২খ. পৃ. ১৫৫।

২ তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৬৩।

৩. হাসমা ওয়াদিউল কুরার নিকটবর্তী একটি জনপদ, যেখানে জুযাম গোত্র বাস করত। ইবন সা'দ ও ইবন সায়্যিদুন-নাস বলেন, এ অভিযান ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে চালানো হয়েছিল আর হাফিয ইবন কায়্যিম বলেন, এ ঘটনা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই রোম সম্রাট কায়সারের নিকট পত্র সহ হযরত দাহিয়া কালবী (রা)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। যারকানী, ২খ. পৃ. ১৫৮।

উপঢৌকনও তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনি যখন হাসমার নিকটে পৌঁছলেন, তখন হুনায়দ জুযামী তার গোত্রের কয়েক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে এবং মাত্র একটি পুরাতন ও ছেঁড়া চাদর ছাড়া সমস্ত কাপড়-চোপড় এবং মালপত্র ছিনিয়ে নেয়। হযরত রিফাআ ইবন যায়দ জুযামী (রা) (যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) এ সংবাদ পাওয়ামাত্র কয়েকজন মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং হুনায়দের নিকট থেকে ছিনতাইকৃত সকল মালপত্র উদ্ধার করে হযরত দাহিয়া (রা)-কে ফিরিয়ে দিলেন। দাহিয়া (রা) মদীনা পৌঁছলেন এবং নবী (সা)-কে এ ঘটনার ব্যাপারে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর নেতৃত্বে পাঁচশত সাহাবীকে হাসমা অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী রাতে পথ চলতো আর দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতো। অতঃপর সেখানে পৌঁছেই তাদের উপর আক্রমণ চালালে এ হামলায় হুনায়দ জুযামী এবং তার পুত্র নিহত হয়। এ অভিযানে একশ' মহিলা ও শিশু বন্দী হয়, এক হাজার উট এবং পাঁচ হাজার বকরি হস্তগত হয়। মুসলিম বাহিনীর সাথে যেহেতু হযরত রিফাআ ইবন যায়দ জুযামী (রা)-এর মুসলিম সঙ্গীরাও থাকতেন, ভুলক্রমে তাদের কিছু সংখ্যক নারী-শিশুও বন্দী হয়। রিফাআ ইবন যায়দ (রা) নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি হযরত আলী (রা)-কে তাঁর সাথে দেন এবং বলে দেন, তিনি যেন সকল বন্দীকে মুক্তি দিতে এবং তাদের সকল মাল-সামান, এমনকি বিছানা-হাওদা পর্যন্ত ফেরত দেয়ার জন্য যায়দ (রা)-কে নির্দেশ দেন।[১]

ওয়াদিউল কুরা[২] অভিযান (রজব মাস, ষষ্ঠ হিজরী)

ষষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে নবী (সা) বনী ফাযারাকে পরাভূত করার জন্য হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে ওয়াদিউল কুরা অভিমুখে প্রেরণ করেন। এতে কয়েকজন মুসলমান শহীদ হন এবং যায়দ ইবন হারিসা (রা) আহত হন।

দুমাতুল জন্দল অভিযান (ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাস)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে অবস্থানরত, হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ, হযরত মুআয ইবন জাবাল, হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য সকল সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর সামনে উপস্থিত। ইতোমধ্যে এক যুবক আনসারী সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। অতঃপর আরয করলেন, يا رسول الله اى المؤمنين افضل "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম মুসলিম কে?" রাসূল (সা) বললেন, احسنهم اخلاقا "যার আখলাক (চরিত্র) সর্বোত্তম।" কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞেস

১. ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৬৩; যারকানী, ২খ. পৃ. ১৫৮।

২ ওয়াদিউল কুরা সিরিয়ার পথে মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। যারকানী

করলেন, فای المؤمنین اکیس "কোন মুসলমান সবচে' অধিক বুদ্ধিমান ও সতর্ক?" তিনি বললেন, اكثرهم للموت ذكرا واكثرهم استعداد له قبل ينزل به اولئك هم الاكياس "যে ব্যক্তি মৃত্যুকে সবচে' বেশি স্মরণ করে ও তার আলোচনা করে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, এরূপ ব্যক্তিই সবচে' অধিক বুদ্ধিমান ও সতর্ক।"

এ কথা শুনে আনসারী যুবকটি তো চুপ রইলেন, আর হযরত (সা) উপস্থিত সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন : "পাঁচটি বস্তু সবচে' অধিক ভয়ঙ্কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এগুলো থেকে হিফাযত করুন এবং সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিদান থেকেও রক্ষা করুন।

১. যে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করে, সে সম্প্রদায়ে মহামারী ও এমন ব্যাধির বিস্তার ঘটবে, যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

২. যে সম্প্রদায় ওজন ও মাপে কম দেয়, তারা দুর্ভিক্ষ ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হবে এবং তাদের উপর অত্যাচারী যালিম শাসক চেপে বসবে।

৩. যে সম্প্রদায় মালের যাকাত আদায় করে না, তাদের প্রতি বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হয়; পশুপাখি না থাকলে তাদের জন্য বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হতো।

৪. যে সম্প্রদায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে, তাদের ওপর আল্লাহ্ অজ্ঞাত দুশমন চাপিয়ে দেন এবং ভিন সম্প্রদায়ের লোক তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের সকল সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।

৫. সমাজের নেতা ও বিচারকগণ যখন আল্লাহর বিধান গ্রন্থের বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে এবং অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও অনৈক্য সৃষ্টি করে দেন।"

পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-কে আদেশ করলেন যে, তুমি প্রস্তুত হও, আমি আজ অথবা কাল তোমাকে একটি কাজে প্রেরণ করব। পরের দিন তিনি নামায শেষ করলেন এবং হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-কে ডেকে এনে নিজের সামনে বসালেন। হযরত (সা) একটি কালো রঙের পাগড়ি তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়ে পেছনে চার আঙ্গুল পরিমাণ ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, ওহে ইবন আউফ! এভাবে পাগড়ি বাঁধবে, এটা উত্তম। এর পর তিনি একটি ঝান্ডা এনে আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-কে দেয়ার জন্য বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন। তারপর হযরত (সা) মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন ও দরূদ পাঠ করে আবদুর রহমান ইবন আউফকে উদ্দেশ করে বললেন, এ ঝান্ডা নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে যাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে, তার সাথে যুদ্ধ করবে, প্রতারণা ও ফাসাদ করবে না, কারো নাক-কান কাটবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না। এটা আল্লাহর অঙ্গিকার এবং তাঁর নবীর সুন্নাত।

সাতশ' লোক সহ তাঁকে দুমাতুল জন্দলে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং ইরশাদ করলেন, যদি তারা তোমাদের দাওয়াত কবূল করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে তাদের সর্দারের কন্যাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইতস্তত করবে না।

হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) রওয়ানা হলেন এবং সেখানে পৌঁছে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিন দিন পর্যন্ত একাদিক্রমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। তৃতীয় দিন দুমাতুল জন্দলের প্রধান আসবাগ ইবন উমর ইসলাম গ্রহণ করলেন, যিনি ধর্মের দিক থেকে খ্রিস্টান ছিলেন। আর তার সাথে আরো অনেক লোক ইসলাম কবূল করলেন। আর নবী (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর বিবাহ সেখানকার প্রধান আসবাগের কন্যা তুমাযিরের সাথে সম্পন্ন হয়। আবদুর রহমান (রা) তাকে সাথে নিয়ে মদীনায় আসেন এবং বিশিষ্ট তাবিঈ ও বিখ্যাত হাফিয আবূ সালমা ইবন আবদুর রহমান তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

ফিদক অভিযান (ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাস)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সংবাদ আসে যে, সা'দ ইবন বকর খায়বারের ইয়াহূদীদের সাহায্যার্থে ফিদকের সন্নিকটে সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে। তিনি হযরত আলী (রা)-এর নেতৃত্বে একশত ব্যক্তিকে ফিদক অভিমুখে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে তারা এক ব্যক্তির সাক্ষাত পান। তাকে ভয় দেখিয়ে এবং ধমক দিয়ে জানা যায়, সে ঐ বনী সা'দের গুপ্তচর। তাকে নিরাপত্তা দিয়ে শত্রুর ঠিকানা জিজ্ঞেস করা হলে সে সঠিক ঠিকানা বলে দেয়। তদনুযায়ী পৌঁছে মুসলমানগণ শত্রু দলের উপর হামলা চালায়। বনী সা'দ পালিয়ে যায় এবং মুসলিম বাহিনী মালে গনীমত হিসেবে পাঁচশত উট ও দু'হাজার বকরি নিয়ে ফিরে আসেন।

উম্মে কিরাফা অভিযান (ষষ্ঠ হিজরীর রমযান মাস)

উম্মে কিরাফা ছিল জনৈকা মহিলার উপনাম, যার নাম ছিল ফাতিমা বিনতে রবীয়া। এ মহিলা বনী ফাযারার সর্দার ছিল। একবার হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে এ পথে সিরিয়া যাচ্ছিলেন। বনী ফাযারার লোকজন তাঁকে মারপিট করে আহত করে এবং তার অর্থ-সম্পদ, মালামাল ছিনিয়ে নেয়। হযরত যায়দ (রা) মদীনায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের দমনের উদ্দেশ্যে হযরত যায়দের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, যারা সাফল্যের সাথে প্রত্যাবর্তন করে।[২]

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৬৩; তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৫।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ১৬২।

আবূ রাফে' ইবন হুকায়ক ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উতায়ক (রা)-এর অভিযান

আবূ রাফে ইয়াহূদীকে মৃত্যুদণ্ড দানের বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় হিজরীর ঘটনাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এটুকু বলা যে, কোন কোন আলিমের মতে আবূ রাফে'র ঘটনা তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত হয় এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরীতে আর কারো মতে ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য যারকানী দেখুন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর অভিযান (ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাস)

আবূ রাফের মৃত্যুদণ্ডের পর ইয়াহূদিগণ উসায়ের ইবন রিযামকে নিজেদের নেতা ও সর্দার মনোনীত করে। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং গাতফান গোত্র ও অপরাপর গোত্রসমূহকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। রাসূল (সা) এটা জানতে পেরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে তিন ব্যক্তিসহ বাস্তব পরিস্থিতি জানার জন্য প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) ফিরে এসে খবর দেন যে, ঘটনা সত্য। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর নেতৃত্বে এ নিয়ে আলোচনার জন্য তাকে ডেকে আনতে ত্রিশ ব্যক্তি প্রেরণ করেন।

উসায়ের ইবন রিযামও ত্রিশ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে রওয়ানা করে। প্রত্যেক উটে দু'জন করে মানুষ ছিল, একজন ইয়াহূদী ও একজন মুসলমান। পথে এসে তাদের উদ্দেশ্য পাল্টে যায়। উসায়ের ইবন রিযাম ও হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়েস (রা) এক উটের উপর ছিলেন। উসায়ের দু'বার হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়েস (রা)-এর উপর তরবারি চালাতে চেষ্টা করে কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রা) সতর্ক হয়ে যান। দু'বার তো কাটিয়ে দেন, উসায়ের যখন তৃতীয়বার এ প্রচেষ্টা চালায়, তখন দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে সকল ইয়াহূদী নিহত হয়। তাদের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তি বেঁচে যায়, যে পালিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলমানদের মধ্যে কেউ নিহত হননি, কেবল হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা) আহত হন। অতঃপর তারা যখন মদীনায় ফিরে আসেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, قد نجاكم الله من القوم الظالمين "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যালিমদের হাত থেকে নাজাত দিয়েছেন।" আর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়সের আঘাতের স্থানে থু থু লাগিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে আঘাত সেরে যায় এবং তিনি তার বুকে হাত বুলিয়ে দু'আ করেন।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

উরায়না গোত্রের লোকদের প্রতি হযরত কুরয ইবন জাবির ফিহরী (রা)-এর অভিযান (ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাস)

উকল এবং উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে। কিছুদিন পর তারা নবী (সা) সমীপে এসে আরয করে যে, আমরা পশুপালক সম্প্রদায়ের লোক, দুধই আমাদের খাদ্য, অন্য খাদ্যশস্যে আমরা অভ্যস্ত নই। মদীনার আবহাওয়াও আমাদের অনুকূল নয়, এ জন্যে আমাদেরকে যদি শহরের বাইরে উটের চারণভূমিতে অবস্থান এবং উটের দুধপানের অনুমতি দেন, তা হলে ভাল হতো।

নবী (সা) তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং শহরের বাইরে চারণভূমিতে যাকাতের উট থাকত। সেখানে তাদের থাকার ও উটের দুধপানের অনুমতি দেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাদের শরীর সবল, সুঠাম ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। আসলে তারা ছিল দুকৃতকারী। একদা তারা হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়। তারা নবী (সা)-এর রাখালকে হত্যা করে, তার হাত-পা ও নাক-কান কেটে দেয়, চোখ ফুঁড়ে দেয় এবং যাকাতের উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে[১] হযরত কুরয ইবন জাবির ফিহরী (রা)-এর নেতৃত্বে প্রায় বিশজনের একটি দলসহ তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা সবাইকে খুঁজে এনে বন্দী করেন। নবী (সা) এ বিশ্বাসঘাতকদের থেকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নির্দেশ দেন। ফলে যেভাবে তারা ঐ রাখালকে হত্যা করে, সেভাবেই তাদেরকে হত্যা করা হয়। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, কোন অপরাধী, সে যত কঠিন অপরাধেই অপরাধী হোক না কেন, কখনই কাউকে এ ধরনের শাস্তি দেয়া যাবে না। ইসলামে প্রথম থেকেই কঠিন থেকে কঠিনতম অপরাধীরও নাক-কান কর্তন সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কাজেই কোন কাফির যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করে অঙ্গচ্ছেদনও করে, তবে এর বদলায় কেবল ঐ কাফিরকে হত্যা করা যাবে, অঙ্গচ্ছেদন করা যাবে না।[২]

হযরত আমর ইবন উমায়্যা যামরী (রা)-এর অভিযান

আবূ সুফিয়ান ইবন হারব একদিন কুরায়শের পূর্ণ সমাবেশে বলল, এমন কোন ব্যক্তি নেই কি, যে গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করে আসতে পারে ? সেখানে তো তার কোন প্রহরী নেই, মুহাম্মদ তো বাজারেও ঘোরাফিরা করেন। জনৈক বেদুঈন বলল, আমি এ কাজে খুবই দক্ষ। আমাকে সাহায্য করলে আমি এ কাজ করে আসতে

১. এটা ওয়াকিদী, ইবন সা'দ ও ইবন হিব্বানের বক্তব্য, ইমাম বুখারী (র)-এর মতে এ ঘটনা হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এবং খায়বার যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যারকানী, ২খ. পৃ. ১৭২ দেখুন।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ১৭৬।

পারি। আবূ সুফিয়ান তাকে একটি উটনী ও পথ খরচা দিয়ে দিল এবং সাহায্য করার ওয়াদা করল। ঐ বেদুঈন আপন খঞ্জর নিয়ে মদীনায় রওয়ানা হলো। রাসূল (সা) সে সময় বনী আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে গিয়েছিলেন, তিনি ঐ বেদুঈনকে সামনে থেকে আসতে দেখে বললেন, লোকটি কোন বদ-নিয়্যতে আসছে। হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) ঐ বেদুঈনকে ধরে ফেললেন। ফলে হত্যার মতলবে যে খঞ্জর তার কাপড়ের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, তা হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল। নবী (সা) তাকে বললেন, সত্য করে বল, কোন্ উদ্দেশ্যে তুমি এসেছিলে ? বেদুঈন বলল, যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়, তা হলে বলব। তিনি বললেন, তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হলো। বেদুঈন সমুদয় ঘটনা খুলে বলল। হযরত (সা) তাকে ছেড়ে দিলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন। রাসূলের এ ব্যবহারে বেদুঈনটি মুসলমান হয়ে গেল এবং বলল :

يا محمد والله ما كنت ما افرق الرجال فماهو الا ان رأيتك فذهب عقلى ومنعقت نفسى قم اطلعت على ما هممت به ممالم يعلم احد فعرفت انك ممنوع وانك على الحق وان خزب ابى سفيان حزب الشيطان - فجعل رسول الله ﷺ ·

"ওহে মুহাম্মদ, আমি কোন কিছুতে ভীত হওয়ার মত ব্যক্তি নই, কিন্তু আপনাকে দেখামাত্র আমার এমন অবস্থা হলো যে, জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হলো, মন দুর্বল হয়ে গেল। অধিকন্তু মনে হলো যে, আপনি আমার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছেন, যা অন্য কারো জানা ছিল না। তাতে আমি বুঝে ফেললাম যে, আপনি নিরাপদ ও সুরক্ষিত। নিঃসন্দেহে আপনি সত্যের উপর রয়েছেন আর আবূ সুফিয়ানের দল শয়তানের দল।" নবী (সা) এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন।

পরে ঐ বেদুঈন নবীজির খিদমতে কয়েকদিন অবস্থান করে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে চলে যায়। এর পর তার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি যে, সে কোথায় গেল। কয়েকদিন পর রাসূল (সা) হযরত আমর ইবন উমায়্যা যামরী ও সালমা ইবন আসলাম আনসারী (রা)-কে এ উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রেরণ করলেন যে, সুযোগ পাওয়া গেলে যেন তারা আবূ সুফিয়ানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। তারা দু'জন মক্কায় উপস্থিত হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, প্রথমে বায়তুল্লাহয় তাওয়াফ করবেন। হেরেম শরীফে প্রবেশ করামাত্র আবূ সুফিয়ান তাদের দেখে ফেলল এবং উচ্চস্বরে বলল, দেখ, ঐ যে আমর ইবন উমায়্যা, নিশ্চয়ই সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। জাহিলী যুগে আমর ইবন উমায়্য 'শয়তান' নামে খ্যাত ছিলেন। পাছে আমাদের কোন ক্ষতি করে বসেন, এ ভয়ে মক্কাবাসী তার জন্য খেজুর ও পানীয় দ্রব্য উপস্থিত করল। আমর তার সঙ্গীকে বললেন, এ অবস্থায় তো আবূ সুফিয়ানকে হত্যা করা সম্ভব নয়, কাজেই নিজেদের জীবন নিয়ে বেরিয়ে যাওয়াই উত্তম। চলতি পথে তারা আবদুল্লাহ ইবন মালিক তাইমীকে হত্যা করলেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলেন, বনী দিয়ালের একচক্ষু অন্ধ এক ব্যক্তি শুয়ে শুয়ে এ কবিতা বলছে :

وَلَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دَمْتُ حَيًّا * وَلَسْتُ اَدِيْنُ الْمُسْلِمِيْنَا

"যখন পর্যন্ত আমি জীবিত আছি, কখনই মুসলমান হব না, আর কখনো মুসলমানদের দীনকে গ্রহণ করব না।"

আমর[১] (রা) আবূ সুফিয়ানের অনুসারী ঐ কবিতা পাঠকারীকে তরবারির আঘাতে খতম করে দিলেন। অতঃপর আরো অগ্রসর হয়ে কুরায়শের দু'গুপ্তচরকে দেখতে পেলেন, যাদেরকে কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এ অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করেছিল। মুসলিম বাহিনী তাদের একজনকে হত্যা করলেন এবং অপরজনকে বন্দী করে রাসূলের দরবারে উপস্থিত করলেন। সমুদয় ঘটনা তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি এসব শুনে হেসে ফেললেন এবং আমার জন্য দু'আ ও কল্যাণ কামনা করলেন (যারকানী, ২খ. পৃ. ১৭৭)।

হুদায়বিয়ার উমরা (পয়লা[২] যিলকদ, ষষ্ঠ হিজরী)

হুদায়বিয়া একটি কূপের নাম, যার সন্নিকটে এ নামেই একটা গ্রাম প্রসিদ্ধিলাভ করে। গ্রামটি মক্কা মুকাররমা থেকে নয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত। মুহিব তাবারী বলেন, গ্রামটির অধিকাংশ হেরেমের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট অংশ হেরেম বহির্ভূত।

রাসূলুল্লাহ (সা) এক স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং উমরা করেছেন। অতঃপর কিছু সাহাবী মাথা মুণ্ডন করেছেন এবং কিছু সাহাবী চুল ছেঁটেছেন (বায়হাকী কর্তৃক দালাইলে বর্ণিত)।

এ স্বপ্নবার্তা শোনামাত্রই মুসলমানদের মনে যে বায়তুল্লাহর মহব্বত ধিকি ধিকি জ্বলছিল, তা উস্কে উঠল এবং বায়তুল্লাহর যিয়ারতের আগ্রহ সবাইকে ব্যাকুল করে তুলল।

ষষ্ঠ হিজরীর পয়লা যিলকদ, সোমবার রাসূলুল্লাহ (সা) উমরার নিয়্যতে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুয়যযমা রওয়ানা হন। আনসার ও মুহাজির মিলে প্রায়[৩] পনেরশত সাহাবী তাঁর সহগামী ছিলেন। যুল হুলায়ফায় পৌঁছে তাঁরা কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরান এবং নিজেরা পরিচ্ছন্ন হয়ে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। রাসূল (সা) বুসর ইবন সুফিয়ান (রা)-কে কুরায়শের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য গোয়েন্দা

---

১. এক রিওয়ায়াতে আছে, আমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ? সে বলল, আমি বনী বকর গোত্রের। আমর বললেন, মারহাবা (স্বাগতম)। এরপর ঐ ব্যক্তি শুয়ে পড়ল এবং পুনরায় ঐ কবিতা পাঠ করতে শুরু করল। আমর প্রথমে তার দ্বিতীয় চোখটিতে তীর মারলেন যেটি ভাল ও সুস্থ ছিল, এরপর তরবারির কোপে তাকে হত্যা করেন।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৩৯; যারকানী, ২খ. পৃ. ১৭৯।

৩. এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, প্রসিদ্ধ বর্ণনায় চৌদ্দশত বলা হয়েছে, যেমনটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবার উক্ত সহীহদ্বয়ে হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত হাদীসে পনেরশত বলা হয়েছে। বিস্তারিতের জন্য যারকানী, ২খ. পৃ. ১৮০ দেখুন।

স্বরূপ আগে পাঠিয়ে দেন। যেহেতু যুদ্ধ-বিগ্রহ উদ্দেশ্য ছিল না, সেহেতু তারা যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সাথে নেননি। একজন মুসাফিরের জন্য যতটুকু আবশ্যক, কেবল ততটুকু অস্ত্র সাথে ছিল। আবার তাও ছিল কোষবদ্ধ অবস্থায় (ফাতহুল বারী,[১] কিতাবুশ শুরূত এবং তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৬৯)।

হযরত (সা) যখন তিনি 'গাদীরে আশতাত' পৌঁছলেন, তখন তাঁর গুপ্তচর তাঁকে এ মর্মে খবর দিলেন যে, হযরতের আগমনের খবর পাওয়ামাত্র কুরায়শগণ সেনা সমাবেশ করেছে এবং মুকাবিলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা শপথ নিয়েছে যে, তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

অধিকন্তু জানা গেল, অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে 'গানীম' নামক স্থানে দু'শ অশ্বারোহী এসে উপস্থিত হয়েছে। এ সংবাদ পাওয়ামাত্র রাসূলুল্লাহ (সা) সে পথ ত্যাগ করেন এবং অন্য পথে অগ্রসর হয়ে হুদায়বিয়ায় এসে উপস্থিত হন। এখান থেকে যখন তিনি তাঁর উটনী মক্কার দিকে চালিত করার ইচ্ছা করেন, তখন উটনী বসে পড়ে। লোকেরা উটনীটি উঠানোর জন্য 'হাল হাল' বলেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে উঠাতে পারেননি। কিন্তু উটনী বসেই রইল। লোকেরা বলল, خلات القصواء خلات القصواء 'কাসওয়া (উটনী) বসে পড়েছে, কাসওয়া বসে পড়েছে।' নবী (সা) বললেন, এটা এর অভ্যেস নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই একে থামিয়ে দিয়েছেন। পরে তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, কুরায়শগণ আমার কাছে এমন এক আবেদন জানাবে যদ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আমি অবশ্যই তাদের আবেদন মঞ্জুর করব। এ কথা বলে তিনি উটনীকে খোঁচা দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে উটনী উঠে দাঁড়াল। তিনি সেখান থেকে সরে হুদায়বিয়ায় এসে অবস্থান নিলেন। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল, পিপাসা ছিল তীব্র ও পানি ছিল অপ্রতুল। গর্তে যে অল্প-বিস্তর পানি ছিল, তা তুলে নেয়া হলো। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, পানি নেই। তিনি তাঁর তূণীর থেকে একটি তীর বের করে দিলেন যেন ঐ গর্তে নিয়ে গিয়ে পুঁতে দিয়ে আসে। তাই করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে তীব্রবেগে পানি প্রবাহিত হতে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাহিনীর পানির সমস্যা দূর হয়ে গেল।[২]

হুদায়বিয়ায় অবস্থান গ্রহণের পর তিনি হযরত খিরাশ ইবন উমায়্যা খুযাঈ (রা)-কে একটি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে মক্কাবাসীকে খবর দিতে পাঠালেন যে, আমরা কেবল বায়তুল্লাহর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি, যুদ্ধ করতে আসিনি। মক্কাবাসী খিরাশের উটকে যবেহ করে ফেলল এবং তাকেও হত্যা করতে উদ্যত হলো কিন্তু নিজেদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়ায় তিনি রক্ষা পেলেন। হযরত খিরাশ (রা) প্রাণে

১. এ হাদীস সহীহ বুখারীর বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তবে তা খণ্ড খণ্ড আকারে; বিস্তারিত হাদীস الشروط فى الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

২ ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ২৪২-২৪৫।

বেঁচে ফিরে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন তিনি হযরত উমর (রা)-কে এ প্রস্তাব সহ মক্কাবাসীর কাছে প্রেরণের ইচ্ছা করলেন। তিনি ওযর পেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো জানেন যে, মক্কাবাসী আমার প্রতি কিরূপ ক্ষেপে আছে, আর তারা আমার কোন্ পর্যায়ের শত্রু। মক্কায় আমার গোত্রের এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে আমাকে আশ্রয় দিতে পারে। কাজেই যদি আপনি হযরত উসমানকে প্রেরণ করেন, ভাল হয়। মক্কায় তাঁর অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে। রাসূল (সা) এ পরামর্শ পসন্দ করলেন। তিনি হযরত উসমান (রা)-কে ডেকে আদেশ দিলেন যে, আবূ সুফিয়ান এবং মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে এ প্রস্তাব পৌঁছিয়ে দাও আর যেসব মুসলমান মক্কায় নিজেদের দীনের কথা প্রকাশ ও প্রচার করতে পারছে না, তাদেরকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, ঘাবড়িও না, শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। তিনি তাঁর দীনকে প্রকাশ ও বিজয়ী করবেন। হযরত উসমান ইবন আফফান (রা) তাঁর এক প্রিয় ব্যক্তি আবান ইবন সাঈদের নিরাপত্তা হিফাযতে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং মক্কাবাসীর কাছে রাসূল্লাহর প্রস্তাব পৌঁছিয়ে দেন। আর দুর্বল মুসলমানগণকে উক্ত সুসংবাদের ব্যাপারে অবহিত করেন।

মক্কাবাসী সবাই একমত হয়ে জবাব দিল, এ বছর তো মুহাম্মদ মক্কায় প্রবেশ করতেই পারবেন না। তুমি চাইলে একাকী তাওয়াফ করতে পারো। হযরত উসমান বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়া আমি কখনও তাওয়াফ করব না। কুরায়শগণ এ কথা শুনে চুপ হয়ে গেল এবং হযরত উসমান (রা)-কে আটক করল।

হযরত উসমান (রা) সেখানে আটক হয়ে থাকলেন আর এদিকে প্রচার হয়ে গেল যে, উসমান গনী (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে।

বায়'আতুর রিদওয়ান

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি খুবই ব্যথিত হন এবং বলেন, যতক্ষণ প্রর্যন্ত আমি এ হত্যার প্রতিশোধ না নিচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করব না। আর সেখানেই বাবলা গাছের নিচে, যেখানে লোকজন বসা ছিল। এ শপথের ওপর বায়'আত গ্রহণ শুরু করেন যে, যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ থাকবে, কাফিরদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাব, মরে যাব, তবুও পলায়ন করব না।

সর্ব প্রথম হযরত আবূ সিনান আসাদী (রা) বায়'আত করেন। মু'জামে তাবারানীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) লোকজনকে বায়'আত করার জন্য আহ্বান করেন, তখন সর্ব প্রথম হযরত আবূ সিনান (রা) তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বায়'আতের জন্য হাত বাড়িয়ে দিন। বললেন, কোন্ বিষয়ের ওপর বায়'আত করতে চাইছ ? আবূ সিনান বললেন, ঐ বিষয়ের ওপর, যা আমার অন্তরে আছে। বললেন, তোমার অন্তরে কি আছে ? আবূ সিনান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অন্তরে আছে যে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তরবারি চালাতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আপনাকে

জয়যুক্ত না করেন কিংবা আমি মৃত্যুবরণ না করি। রাসূল (সা) তাকে বায়'আত করান এবং এ কথার ওপর সবাই বায়'আত হন।

সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) তিনবার বায়য়াত করেন, প্রথমে, মধ্যবর্তী সময়ে এবং শেষে। যখন বায়য়াত গ্রহণ শেষ হলো, তখন নবীজি তাঁর বাঁ হাতকে ডান হাতে ধারণ করে বললেন, এ বায়য়াত উসমানের পক্ষ থেকে। (বুখারী)

ডান হাত ছিল তাঁর পক্ষ এবং বাঁ হাত ছিল হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষ। হযরত উসমান (রা) এ ঘটনার উল্লেখ করে বলতেন, আমার পক্ষ থেকে রাসূল (সা)-এর বাঁ হাত আমার নিজের ডান হাত অপেক্ষা কতই না উত্তম![1]

এ বায়'আতকে 'বায়'আতুর রিদওয়ান' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফাতহে এর উল্লেখ করেছেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّأْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ·

"অবশ্যই আল্লাহ্ মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষতলে আপনার কাছে বায়'আাত গ্রহণ করল, তাদের অন্তরে যা ঠিল, তা তিনি অবগত ছিলেন, তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলভ্য সম্পদ, যা ওরা হস্তগত করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ফাতহ : ১৮-১৯)

কিন্তু পরে জানা গেল যে, হযরত উসমান (রা)-এর নিহত হওয়ার খবরটি ছিল গুজব। কুরায়শগণ যখন এ বায়'আত সম্পর্কে জানতে পারল, তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং সন্ধির জন্য দূতিয়ালী শুরু করে দিল (ফাতহুল বারী, ৭খ.পৃ. ৩৪৫)।

খুযা'আ গোত্র যদিও তখন পর্যন্ত মুসলমান হয়নি, কিন্তু সব সময় তাঁর সাহায্যকারী, কল্যাণকামী ও সুহৃদ ছিল। মক্কার মুশরিকগণ তাঁর বিরুদ্ধে যে সব ষড়যন্ত্র করত, এরা তা নবী (সা)-কে জানিয়ে দিত। এ গোত্রের সর্দার বুদাইল ইবন ওরাকা গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি সাথে নিয়ে নবীরি নিকট উপস্থিত হয়ে খবর দিল যে, কুরায়শগণ হুদায়বিয়ার আশেপাশে পানির বড় বড় উৎসগুলোতে আপনার মুকাবিলার জন্য বড় বড় সেনাদল মোতায়েন করেছে। তারা আপনাকে কোন অবস্থায়ই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তাদের সাথে দুগ্ধবতী উটনীও আছে (অর্থাৎ তারা দীর্ঘদিন অবস্থানের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে, যাতে যথেচ্ছ পানাহার করে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করতে পারে)।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আমরা কেবল উমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছি। যুদ্ধ কুরায়শদেরকে খুবই কাবু করে

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ২০৬-২০৮।

ফেলেছে, ওরা যদি চায়, তা হলে আমি একটা সময় পর্যন্ত তাদের সাথে শান্তি নির্দিষ্ট করে দিতে চাই। এ সময়ের মধ্যে একে অপরের উপর আক্রমণ করবে না। আর আমাকে ও আরবকে ছেড়ে দিক। আল্লাহর অনুগ্রহে যদি আমি বিজয়ী হই, তবে ওরা চাইলে ঐ দিন আমি প্রবেশ করব আর বর্তমানে কয়েকদিনের জন্য তোমাদের শান্তি জুটবে। আর যদি কোনভাবে আরব জয়লাভ করে, তা হলে তো তোমাদেরই আশা পূর্ণ হবে। তবে আমি তোমাদের বলছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্য অবশ্যই তাঁর এই দীনকে বিজয়ী করবেন। আল্লাহ্ যেই দীনের প্রকাশ ও বিজয় এবং সাহায্য-সহযোগিতার ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই তিনি পূর্ণ করবেন। ওরা যদি আমার এ কথা না মানে, তা হলে সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই ওদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে যাব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মস্তক ধড় থেকে পৃথক না হয়। বুদায়েল তাঁর নিকট থেকে উঠে কুরায়শদের কাছে গিয়ে বলল, আমি ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে একটি কথা শুনে এসেছি। তোমরা যদি তা শুনতে চাও তো বলি। যারা মূর্খ ও আহমক ছিল, তারা বলল, আমাদের প্রয়োজন নেই; আমরা তার কোন কথাই শুনতে চাই না। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা বিবেচক ও বুদ্ধিমান ছিল, তারা বলল, আচ্ছা, বল দেখি।

বুদায়ল বলল, তোমরা তাড়াহুড়া করো না, মুহাম্মদ (সা) যুদ্ধ করার জন্য আসেন নি, বরং উমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। তিনি তোমাদের সাথে সন্ধি করতে ইচ্ছুক। কুরায়শগণ বলল, নিঃসন্দেহে তিনি যুদ্ধ করতে আসেন নি, কিন্তু মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। উরওয়া ইবন মাসঊদ দাঁড়িয়ে বলল, ওহে স্বজাতিবৃন্দ, আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য এবং তোমরা আমার সন্তানতুল্য নও ? লোকজন বলল, নিশ্চয়ই, কেন নয় ? উরওয়া বলল, তোমরা কি আমার প্রতি কোনরূপ কুধারণা পোষণ কর ? লোকেরা বলল, কখনই নয়। অতঃপর উরওয়া বলল, ঐ ব্যক্তি [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)] তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও উত্তম কথাই বলেছে। আমার মতে তা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। যদি তোমরা আমাকে অনুমতি দাও তা হলে আমি এ ব্যাপারে মুহাম্মদের সাথে কথা বলে দেখতে পারি। লোকেরা বলল, ঠিক আছে, বলুন।

উরওয়া রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে তাই বললেন, যা তিনি বুদাইলকে বলেছিলেন। উরওয়া বলল, ওহে মুহাম্মদ, আপনিও তো শুনে থাকবেন যে, কেন ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়কে নিজেই ধ্বংস ও বরবাদ করেছে। এছাড়া যদি দ্বিতীয় অবস্থা এসে পড়ে (অর্থাৎ কুরায়শ বিজয়ী হয়) তবে আমি দেখতে পাচ্ছি বিশৃঙ্খলা, অর্থাৎ বিভিন্ন গোত্রের লোকজন আপনার সাথে আছে, তারা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে বসা ছিলেন। তিনি উরওয়াকে ধমক দিয়ে বললেন, কী, আমরা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব ? উরওয়া বলল, এ ব্যক্তি কে ? লোকেরা বলল, ইনি আবূ বকর। উরওয়া বলল, আল্লাহর কসম, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা না হতো, আজো যার বদলা আমি

দিতে পারিনি, তা হলে আমি অবশ্যই এর জবাব দিতাম। এ কথা বলে সে রাসূলুল্লাহ (সা-এর সাথে কথাবার্তা শুরু করল। যখনই সে কথা বলত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাঁড়িতে হাত দিত। হযরত মুগীরা ইবন শুবা (রা) (অর্থাৎ উরওয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র) খোলা তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, নবীর শানে আপন চাচার এ বেয়াদবী তার সহ্য হচ্ছিল না, তৎক্ষণাৎ আপন চাচাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার হাত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাঁড়ি থেকে সরান, একজন মুশরিকের জন্য এটা কখনই গ্রহণযোগ্য নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্পর্শ করবে। মুগীরা (রা) যেহেতু ভিন্ন পোশাকে সজ্জিত ছিলেন, এ জন্যে উরওয়া তাকে চিনতে পারে নি, তাই রাগান্বিত হয়ে নবীজিকে জিজ্ঞেস করল, এ আবার কে ? তিনি বললেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, মুগীরা ইবন শুবা। এক্ষণে উরওয়া মুগীরাকে চিনতে পেরে বলল, ওরে গাদ্দার, আমি কি তোর গাদ্দারী ও ফিতনাবাজীকে নিষ্পত্তি করিনি ?

হযরত মুগীরা (রা) মুসলমান হওয়ার পূর্বে কতিপয় বন্ধু-বান্ধবসহ মিসর সম্রাট মকৃকাসের দরবারে যান, সেখানে সম্রাট মুগীরা অপেক্ষা তার বন্ধুদের বেশি উপহার দেন। এতে মুগীরা খুবই ব্যথিত হন। ফিরে আসার পথে তারা এক স্থানে দাঁড়ায় এবং বেশি বেশি মদ্যপান করে আলস্যভরে নিদ্রা যায়। মুগীরা এ সুযোগে তাদের সবাইকে হত্যা করেন এবং তাদের মাল-সামান নিয়ে পালিয়ে নবী (সা) সকাশে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (সা) তাকে বললেন, ইসলাম তো গ্রহণ করলে, কিন্তু এ মালের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, কেননা তা অবৈধ পন্থায় অর্জিত। উরওয়া তখন নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ দিয়ে ঘটনার নিষ্পত্তি করে। সে কথারই খোঁটা দিচ্ছিল।

এরপর উরওয়া রাসলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাঁর সাহাবিগণের সুসম্পর্ক, নিষ্ঠা ও সততার অভাবনীয় দৃশ্য দেখে, যা সে পূর্বে কখনো দেখেনি। তা এমন ছিল যে, যখনই হযরত (সা) কোন নির্দেশ দিতেন, তখন সর্বাগ্রে কে তা পালন করবে, এ নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত; তাঁর মুখ থেকে যখন কফ-থুথু বের হতো, তা মাটিতে পড়ার অবকাশ পেত না। সাহাবিগণ হাতে হাতে তা নিয়ে নিতেন এবং নিজের মুখে মেখে নিতেন। তিনি যখন উযূ করতেন, তখন উযূর পানি নিয়েও এভাবে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যেত। মনে হতো তারা এজন্য পরস্পরে লড়াই করবেন। শরীরের কোন চুলেরও মাটিতে পড়ার সাধ্য ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ তা নিয়ে নিতেন। যখন তিনি কথা বলতেন, সবাই তা এমনভাবে শুনতেন, যেন তাদের গোটা শরীরই কানে পরিণত হয়েছে। রাসূল (সা)-এর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহসও কেউ পেতেন না।

সম্ভবত এটা উরওয়ার সে কথারই জবাব ছিল, যা সে এসে প্রথমেই তাঁর আত্মোৎসর্গকারী সাহাবিগণ সম্পর্কে প্রকাশ করেছিল যে, যদি কুরায়শগণ জয়লাভ করে, তা হলে এরা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এহেন একনিষ্ঠতা, সততা ও বিশ্বাস, ভালবাসা ও ভীতির অভাবনীয় দৃশ্য হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) সম্পর্কে

উরওয়ার কুধারণার উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত জবাব ছিল। যাদের শ্রদ্ধা ও শিষ্ঠাচার, ভালবাসা ও বিশ্বাসের অবস্থা এরূপ ছিল, তারা কি তাঁকে ছেড়ে কখনো পালাতে পারেন ?

উরওয়া যখন তাঁর নিকট থেকে ফিরে গেল, তখন কুরায়শদের গিয়ে বলল, "ওহে স্বজাতিবৃন্দ, আল্লাহ্ কসম, আমি তো কায়সার, কিসরা, নাজ্জাশী প্রমুখ বড় বড় বাদশাহর দরবার দেখেছি, কিন্তু আল্লাহর কসম, বিশ্বাস ও ভালবাসা, সম্মান ও প্রতিপত্তির এমন অভাবনীয় দৃশ্য কোথাও দেখিনি।" (বলা বাহুল্য, এ দৃশ্য না তাঁর পূর্বে দেখা গিয়েছে, আর না তাঁর পরে দেখা সম্ভব হবে, তিনি তো শেষ নবী ছিলেন, কাজেই বিশ্বাস ও ভালসবাসার অভাবনীয় দৃশ্য তাঁর মধ্যমেই শেষ হবে)।

এক রিওয়ায়াতে আছে, উরওয়া বলেছে, "ওহে স্বজাতিবৃন্দ, আমি অনেক বাদশাহকে দেখেছি কিন্তু মুহাম্মদের মত কাউকে দেখিনি; তাঁকে বাদশাহ মনে হয়নি" (ইবন আবূ শায়বা মুরসাল সূত্রে)।[১]

উরওয়া পরিস্কারভাবে এ কথা বলেনি যে, তিনি নবী। তবে ইঙ্গিতে এটা বলে দিয়েছে যে, এ মর্যাদা বাদশাহদের হয় না, বরং আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম্বরগণেরই হয়ে থাকে। উরওয়ার কথাবার্তা শুনে হাবশীদের সর্দার জুলায়স ইবন আলকামা বুনানী বলল, আমাকে অনুমতি দাও, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আসি।

রাসূলুল্লাহ (সা) দূর থেকে জুলায়সকে আসতে দেখে বললেন, কুরবানীর পশুগুলোকে দাঁড় করিয়ে দাও, এ ব্যক্তি তাদের মধ্যেকার সেসব লোকের একজন, যারা কুরবানীর পশুকে সম্মান করে। জুলায়স কুরবানীর উট দাঁড়ানো দেখে পথ থেকেই ফিরে গেল এবং গিয়ে কুরায়শদের বলল, কা'বাঘরের প্রভুর কসম, এরা তো কেবল উমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছে, এদেরকে আল্লাহর ঘর থেকে বাধা দেয়া যেতে পারে না।

কুরায়শগণ বলল, বসে পড়, তুই তো জংলী, কিছুই বুঝিস টুঝিস না। এতে জুলায়স রাগান্বিত হয়ে বলল, ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়, আল্লাহর কসম, আমরা তো তোমাদের সাথে এ চুক্তি করিনি যে, যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর ঘর যিয়ারত করতে আসলেও তাকে বাধা দেয়া হবে। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে জুলায়সের প্রাণ, যদি তোমরা মুহাম্মদকে বায়তুল্লাহ যিয়ারতে বাধা দাও, তা হলে আমি সমস্ত হাবশীকে নিয়ে তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাব। কুরায়শগণ বলল, আচ্ছা, এত চটো না, বসো, আমরা একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। একটু পর বৈঠক থেকে মিকরায ইবন হাফস দাঁড়িয়ে বলল, আমি তাঁর নিকট থেকে ঘুরে আসি। রাসূলুল্লাহ (সা) মিকরাযকে দেখে বললেন, এ তো হুদায়বিয়ার 'সেই লোক'। অর্থাৎ একবার মিকরায পঞ্চাশজন সহযোদ্ধা নিয়ে রাতের আঁধারে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। সাহাবাগণ তাদের বন্দী করে ছিলেন কিন্তু মিকরায পালিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) সেদিকেই ইঙ্গিত করলেন।

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ১৯২।

মিকরায হযরতের সাথে কথাবার্তা বলেই চলছিল, এমন সময় কুরায়শের পক্ষ থেকে সুহায়ল ইবন আমর সন্ধি করার জন্য এসে উপস্থিত হলো। রাসূল (সা) সুহায়লকে আসতে দেখে সাহাবীদের বললেন, قـد سـهـل لكم من امـركم 'নিশ্চয়ই তোমাদের কাজ কিছুটা সহজ[১] হয়ে গেল।'

আরও বললেন, কুরায়শগণ সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, এ ব্যক্তিকে তারা সন্ধির জন্য প্রেরণ করেছে। সুহায়ল তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলো এবং দীর্ঘক্ষণ যাবত সন্ধি ও সন্ধির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা চলতে থাকল। যখন শর্তাবলী সম্পর্কে ঐক্যমত্যে পৌঁছল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-কে চুক্তিপত্র লিখার নির্দেশ দিলেন। সর্ব প্রথম بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখার নির্দেশ দিলেন।

পূর্বে প্রচলিত নিয়ম ছিল, بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ পত্রারম্ভে লিখা হতো, এর ফলে সুহায়ল বলল, আমি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-কে জানি না, পূর্বের নিয়মানুসারে بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ লিখ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আচ্ছা, তাই লিখ। এরপর বললেন, লিখ, هذا مـا قضى عليـه محمـد رسول الله "এটি সেই চুক্তিপত্র, যদ্বারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) সন্ধি করছেন।"

সুহায়ল বলল, যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূলই মানতাম, তা হলে তো আপনাকে বায়তুল্লাহয় যেতে বাধা দিতাম না, আর আপনার সাথে লড়াইও করতাম না।

'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ'র পরিবর্তে 'মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ' লিখুন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল, যদিও তুমি তা মিথ্যা মনে কর। তিনি হযরত আলী (রা)-কে বললেন, বাক্যটি মুছে দিয়ে ওর ইচ্ছা অনুযায়ী শুধু আমার নাম লিখ। হযরত আলী (ক) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কখনো আপনার নাম মুছব না। তিনি বললেন, আচ্ছা, কোন জায়গায় তুমি রাসূলুল্লাহ লিখেছ, আমাকে দেখিয়ে দাও। হযরত আলী (রা) আঙ্গুল দিয়ে স্থানটি দেখিয়ে দিলে তিনি নিজ হাতে লিখাটি মুছে দেন এবং হযরত আলীকে 'মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ' লিখার[২] নির্দেশ দেন। সন্ধির শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ :

---

১. অর্থাৎ সম্পূর্ণ সহজ তো হয় নি, বরং কিছুটা সহজ হয়েছে এখানে قـد سـهـل لكم من امـركم من এর (আরবী) অর্থ ধরা হলে এ ব্যাখ্যা দাঁড়ায়। যারকানী, ২খ. পৃ. ১৯৪।

২ কোন কোন রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে লিখেন বলে উল্লেখ আছে, এটা রূপকার্থক, লিখেন অর্থ এখানে লিখার আদেশ করেন। যেমন বলা হয় তিনি কায়সার ও কিসরার কাছে পত্র লিখেন, এটাও রূপকার্থক; কেননা কুরআনের দলীল এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, হযরত (সা)-এর উম্মী হওয়া সুপ্রমাণিত। আর এ ঘটনায় হযরত আলী (রা) দ্বারা সন্ধিপত্র লিখানোর কথা সুপ্রসিদ্ধ। এরদ্বারা প্রমাণিত হয়, তাঁর লিখার কথাটি রূপকার্থক। যেমন কোন কবি বলেছেন ঃ برئت ممن شرء لی دنیا باخره * وقال ان رسول الله قد کتبا যারকানী, ২খ. পৃ. ১৯৭।

সন্ধির শর্তাবলী

১. দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।

২. কুরায়শের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার অভিভাবক ও মুরব্বীর অনুমতি ছাড়া মদীনায় আসবে, তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যদিও সে মুসলমান হয়।

৩. আর মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কায় আসবে, তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না।

৪. এ মধ্যবর্তী সময়ে কেউ কারো প্রতি তরবারি উঠাবে না এবং কেউ কারো প্রতি অবিশ্বস্ত হবে না।

৫. মুহাম্মদ এ বছর উমরা না করেই মদীনায় ফিরে যাবেন, মক্কায় প্রবেশ করবেন না; আগামী বছর থেকে কেবল তিনদিন মক্কায় অবস্থান করে উমরা সম্পন্ন করে ফিরে যাবেন; এ সময় তারা তরবারি ছাড়া আর কোন অস্ত্রশস্ত্র বহন করবেন না, আর তরবারিও থাকবে কোষবদ্ধ।

৬. অপরাপর গোত্রসমূহের এ অধিকার থাকবে যে, তারা যে পক্ষের সাথে ইচ্ছা চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে।

সুতরাং বনী খুযা'আ রাসূল (সা)-এর সাথে এবং বনী বকর কুরায়শের সাথে সন্ধিবদ্ধ হয়ে গেল। বনী খুযাআ নবী (সা)-এর সাথে মিত্রতা ও চুক্তির অধীন হয়ে গেল আর বনী বকর কুরায়শের মিত্র ও তাদের চুক্তির অধীনে গেল।

সন্ধির শর্তাবলী তখনো লিখা চলছিল, এমতাবস্থায় সুহায়লের পুত্র হযরত আবূ জন্দল (রা) শৃঙখলাবদ্ধ অবস্থায় বন্দীশালা থেকে পালিয়ে নবীজির খিদমতে উপস্থিত হলেন, যিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কার কাফিরগণ তার উপর নানা ধরনের অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। সুহায়ল বলল, এই প্রথম ব্যক্তি, যাকে চুক্তি অনুসারে ফিরিয়ে দেয়া আবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, চুক্তিনামা তো এখনো পুরোপুরি লিখাই হয়নি, অর্থাৎ পুরোপুরি লিখা এবং স্বাক্ষরের পর তো এর কার্যকারিতা বলবৎ হওয়া উচিত। তিনি বার বার সুহায়লকে বলছিলেন যে, আবূ জন্দলকে আমাদের হাতে দেয়া হোক কিন্তু সুহায়ল তা মানল না। শেষ পর্যন্ত তিনি হযরত আবূ জন্দল (রা)-কে সুহায়লের হাতে তুলে দিলেন।

মক্কার মুশরিকরা হযরত আবূ জন্দল (রা)-কে নানাভাবে নিপীড়ন করেছিল, তাই তিনি অত্যন্ত বেদনাভরা কণ্ঠে মুসলমানদের উদ্দেশ করে বললেন, ওহে ইসলাম অনুসারীদের দল, আফসোস, আমাকে কাফিরদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে !

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ জন্দলকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন :

يا ابا جندل اصبر واحتسب فان لانغرو ان الله جاعل لك فرجا ومخرجا .

"আয় আবূ জন্দল, সবর কর এবং আল্লাহর প্রতি আশা রাখ, আমরা চুক্তির বিপরীত কাজ পসন্দ করি না; এ বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের মুক্তির একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।"

কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে সাধারণ মুসলমানের কাছে তার প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যটি খুবই বেদনাদায়ক মনে হয়েছে। হযরত উমর (রা) ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কেন নই ? হযরত উমর বললেন, আমরা কি সত্যের ওপর এবং ওরা কি বাতিলের অনুসারী নয় ? তিনি বললেন, অবশ্যই। হযরত উমর বললেন, তা হলে এ অপদস্থতা কেন বরদাশ্ত করব ? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল এবং সত্য নবী, আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারি না; আর আল্লাহই আমার সুহৃদ ও সাহায্যকারী। হযরত উমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি না বলেছিলেন যে, আমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করব ? তিনি বললেন, আমি কবে বলেছি যে, এ বছরেই তাওয়াফ করব?

এর পর হযরত উমর (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের নিকট যান এবং গিয়ে তার সাথেও একই ধরনের বাক্যালাপ করেন। আবূ বকর সিদ্দীকও তাকে হুবহু একই জবাব দেন যেমনটি নবী (সা) তাঁকে বলেছিলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে হযরত উমর (রা) বলেন, এ ধরনের বেয়াদবী করায় আমি পরে খুবই লজ্জিত হয়ে পড়ি এবং এর কাফফারা হিসেবে অনেক নামায পড়ি, রোযা রাখি, সদকা দিই এবং দাস মুক্ত করি।

گفتگوء عاشقان در گر رب * جوشش عشقت نی ترك آدب

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবিগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এ শর্তসমূহে কিভাবে সন্ধি করা যায় যে, আমাদের যে লোক তাদের এলাকায় চলে যাবে, তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমাদের মধ্য থেকে যে ওদের দিকে চলে যাবে, তার আমাদের প্রয়োজন নেই, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করবেন। আর ওদের মধ্যকার যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে আমাদের দিকে আসবে, তাকে যদিও চুক্তির শর্তানুযায়ী ফিরে দেয়া হবে, কিন্তু নিরাশ হওয়ার কিছু নেই, শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উদ্ধারের জন্য কোন না কোন পন্থা অবশ্যই বের করে দেবেন। (উল্লেখ্য, আলহামদু লিল্লাহ্, এমন কোন অবস্থার সৃষ্টিই হয়নি যে, কোন মুসলমান পলায়ন করে মক্কায় এসেছে)।

মোটকথা, এ শর্তাবলীসহ সন্ধিপত্র চূড়ান্ত হয় এবং উভয় পক্ষ তাতে স্বাক্ষর দান করে।[১]

পরিপূর্ণ সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাগণকে কুরবানী করতে এবং মস্তক মুণ্ডন করার আদেশ দেন। সাহাবায়ে কিরাম সন্ধির শর্তাবলীর দরুন এতই বিমর্ষ ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার নির্দেশ দেয়ার পরও কেউ উঠলেন না।

এ অবস্থা দেখে তিনি হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং অভিযোগের সুরে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,এ সন্ধি মুসলমানদের জন্য খুবই দুঃখজনক মনে হয়েছে, যদ্দরুন তারা বিমর্ষ ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছেন, এ জন্যে আপনার আদেশ পালনে ইতস্তত করছেন। আপনি কাউকে কিছু বলবেন না, বরং বাইরে গিয়ে নিজের কুরবানী ও মাথা মুণ্ডনের কাজ সেরে ফেলুন; তারা আপনা আপনিই আপনার অনুসরণ করবেন। সুতরাং তাই হলো, নবী (সা) আপন কুরবানী করামাত্রই তারা নিজ নিজ কুরবানী করতে শুরু করলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)-কে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, যাঁর বিজ্ঞোচিত সমাধান দ্বারা এ সমস্যা দূর হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) দ্রুত এ সিদ্ধান্ত কাজে লাগালেন। যেমনিভাবে হযরত শুয়ায়ব (আ)-এর কন্যার পরামর্শ হযরত মূসা (আ)-এর জন্য বিজ্ঞোচিত ও খুবই সঠিক ছিল, তেমনিভাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর পরামর্শ বিজ্ঞোচিত এবং কল্যাণ ও বরকতময় ছিল।

[এতদ সমুদয় বর্ণনা আমরা বুখারী ও ফাতহুল বারী থেকে নিয়েছি যা আলহামদু লিল্লাহ্, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও উপযোগী। দীর্ঘ হওয়ার কারণে বরাত ও বর্ণনা বাদ দিয়ে দিয়েছি। যেহেতু এ সমুদয় ঘটনা একই অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে, এ জন্যে আমরা কেবল ফাতহুল বারী-র বরাতই যথেষ্ট মনে করেছি। বিস্তারিত ও বরাত যদি প্রয়োজন হয়, তা হলে ফাতহুল বারী, কিতাবুশ-শুরূত, ৫খ. পৃ. ২৪৫-২৫৬ দেখুন।

এ সমুদয় ঘটনা অতিরিক্ত বিষয় সহ যারকানী, শারহে মাওয়াহিবেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এর বিন্যাস ফাতহুল বারীর বিন্যাস থেকে আলাদা। আমরা এ বর্ণনায় ফাতহুল বারীর বিন্যাসকে অনুসরণ করেছি, এ জন্যে ফাতহুল বারীর বরাত ও সূত্র উল্লেখ করেছি]।

---

১. মুসলমানদের মধ্যে হযরত আবূ বকর ইবন আবূ কুহাফা, হযরত উমর ইবন খাত্তাব, হযরত উসমান ইবন আফফান, হযরত আলী (চুক্তিনামা লিখক), হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ, হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস, হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ এবং হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) স্বাক্ষর দান করেন; আর মুশরিকদের পক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি স্বাক্ষর দেয়, এদের মধ্যে হুয়ায়তিব ইবন আবদুল উযযা, মিকরায ইবন হাফস স্বাক্ষর দান করে। সন্ধিপত্রের একটি কপি রাসূল (সা)-এর নিকট এবং এক কপি সুহায়ল ইবন আমরের নিকট থাকে। তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৭১।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সুফল

প্রায় দু'সপ্তাহ অবস্থান করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। যখন মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেন, তখন সূরা ফাতহ নাযিল হয় : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا। "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়..." সূরার শেষ পর্যন্ত।

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে একত্র করে সূরা ফাতহ-এর শেষ পর্যন্ত শুনিয়ে দিলেন। সাহাবিগণ এ সন্ধিকে পরাজয় বলে মনে করেছিলেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে ঘোষণা করেন। তাই তাঁরা সূরাটি শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সত্যিই কি এটা বিজয় ? তিনি বললেন, কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিঃসন্দেহে এটা বিশাল বিজয়। (আহমদ, আবূ দাঊদ, হাকিম)।

ইমাম যুহরী বলেন, হুদায়বিয়ার বিজয় এমন বিশাল বিজয় ছিল যে, এর পূর্বে এত বড় বিজয় কখনই তকদীরে জোটেনি। পারস্পরিক যুদ্ধের কারণে একে অপরের সাথে মেলামেশা করতে পারেনি, সন্ধির কারণে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো; যারা নিজের ইসলাম গ্রহণকে প্রকাশ করতে পারছিলেন না, তারা নির্ভয়ে ইসলামী আহকাম পালন করতে শুরু করলেন, পারস্পরিক মতবিরোধ ও রেষারেষি বন্ধ হয়ে গেল, কথাবার্তা বলার ও মত বিনিময় করার সুযোগ হলো, ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে কথা বলার ও তর্ক করার সুযোগ হলো, কুরআনুল কারীম শোনানোর সুযোগ এলো, যার প্রভাব এমন হলো যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত এত অধিক সংখ্যক লোক মুসলমান হলো যে, শুরু থেকে ঐ পর্যন্ত তত সংখ্যক লোক মুসলমান হয়নি।[১]

ইসলাম তো হচ্ছে পরিপূর্ণ চরিত্র ও উত্তম কর্মের খনি কিংবা ঝর্ণাধারা স্বরূপ এবং সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণের সমষ্টি। আর সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও ছিলেন কল্যাণ, পরিপূর্ণতা, সদাচরণ ও সৎস্বভাবের মূর্তপ্রতীক। চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত গর্ব, বিভেদ, হিংসা ও শত্রুতার দৃষ্টি এসব উপলব্ধিতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

چشم بد اندیش که برکنده باد * عیب نماید هنریش در نظر

"এক্ষণে সন্ধির কারণে গর্ব অহংকার ও বিভেদের পর্দা যখন চোখের সামন থেকে সরে গেল, তখন ইসলামের চিত্তাকর্ষক দৃশ্য তাদেরকে নিজের দিকে টেনে নিল।"

مرد حقانی کی پیشانی کانور * کب چھپارهتا هی پیش ذی شعور

সন্ধির পূর্বে মক্কার কাফিরগণ ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল, "এ জন্যে ইসলাম ও মুসলমানের নূর তাদের থেকে ছিল লুক্কায়িত। সন্ধির কারণে যখন শত্রুতা ও

১. ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ২৫৬; যারকানী, ২খ. পৃ. ২১০।

বিভেদ উভয় পক্ষ থেকে দূর হয়ে গেল, তখন সুযোগ সৃষ্টি হলো এবং হাক্কানী বা আল্লাহপ্রেমিকগণের কপালের নূর তাদের চোখে পড়ল।"

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় এসে পৌঁছলেন, তখন মক্কা থেকে হযরত আবূ বাসির (রা) মুশরিকদের বন্দীখানা থেকে পালিয়ে মদীনায় আসেন। কুরায়শগণ তাড়াতাড়ি তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য দু'জন লোক পাঠায়। নবী (সা) চুক্তি মুতাবিক হযরত আবূ বাসির (রা)-কে তাদের হাতে সোপর্দ করেন এবং আবূ বাসিরকে বলেন, আমি চুক্তির বরখেলাফ করতে পারি না, ওদের সাথে চলে যাওয়াই তোমার জন্য উত্তম। হযরত আবূ বাসির (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে মুশরিকদের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন যারা আমাকে ধর্মচ্যুত করতে চায় এবং আমার উপর নানা ধরনের অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়? তিনি বললেন, সবর কর এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আশা রাখ, শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মুক্তির কোন ব্যবস্থা করে দেবেন। ঐ দু'ব্যক্তি হযরত আবূ বাসির (রা)-কে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলো। যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে তারা বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামল এবং যে খেজুর সাথে ছিল, তা খেতে শুরু করল। আবূ বাসির (রা) তাদের একজনকে বললেন, তোমার তরবারিটি তো খুব সুন্দর মনে হচ্ছে! সে তরবারিটি খাপ থেকে বের করে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, এটা খুবই উত্তম তরবারি, বহুবার আমি এটা পরীক্ষা করেছি। আবূ বাসির (রা) বললেন, আমাকে একটু দেখাও তো। সে তরবারিটি আবূ বাসির (রা)-এর হাতে দিয়ে দিল। আবূ বাসির (রা) সেটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ এক কোপ বসিয়ে দিলেন লোকটির উপর, ফলে সে খতম হয়ে গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি এটা দেখামাত্র দৌড়ে পালাল এবং সোজা মদীনায় পৌঁছে রাসূলের খিদমতে উপস্থিত হলো এবং আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সঙ্গী তো মারা গেছে, আমিও মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছেছি।

হযরত আবূ বাসির (রা) নবী দরবারে ফিরে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা তো আপনার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, আপনি তো আমাকে ওদের হাওয়ালা করে দিয়েছিলেন। এখন আল্লাহ্ আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি জানেন, যদি আমি মক্কায় ফিরে যাই, তাহলে ওরা আমাকে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করবে। যা কিছু আমি করেছি, কেবল এ জন্যই করেছি। আমার আর ওদের মধ্যে কোনই চুক্তি নেই। রাসূল (সা) বললেন, খুবই যুদ্ধ উস্কে দেয়ার কাজ করেছ। যদি এর কোন সাথী থাকত! হযরত আবূ বাসির (রা) বুঝে ফেললেন, আমি যদি এখানেই থাকি, তবে তিনি আমাকে আবার কাফিরদের হাতে সোপর্দ করবেন। এ জন্যে মদীনা থেকে বের হয়ে তিনি সমুদ্রোপকূলে গিয়ে অবস্থান নিলেন, যেখান দিয়ে কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে আসত। মক্কার অসহায় নির্যাতীত মুসলমানগণ যখন এটা জানতে পেলেন, তখন চুপে চুপে এসে হযরত আবূ বাসিরের সাথে মিলিত হতে শুরু করলেন। সুহায়ল ইবন আমরের পুত্র হযরত আবূ জন্দল

(রা)-ও এখানে এসে উপস্থিত হলেন। এভাবে সত্তর জনের[১] একটি দল সেখানে জমা হয়ে গেল। কুরায়শের যে বাণিজ্য কাফেলা সেদিক দিয়ে অতিক্রম করত, তারা তাতে হামলা চালাতেন। এভাবে গনীমতের মাল সংগ্রহ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকলেন। কুরায়শগণ বাধ্য হয়ে রাসূলের দরবারে লোক প্রেরণ করল যে, আমরা আপনাকে আল্লাহ এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আরয করছি, আপনি আবূ বাসির ও তার দলকে মদীনায় নিয়ে আসুন। অতঃপর আমাদের মধ্য থেকে কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে আমরা তার ব্যাপারে অভিযোগ করব না।

রাসূল (সা) আবূ বাসির (রা)-এর নামে একটি পত্র লিখে প্রেরণ করেন। পত্রটি যখন সেখানে পৌঁছল, হযরত আবূ বাসির (রা) ততক্ষণে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছিলেন। পত্রটি আবূ বাসিরকে দেয়া হলো। পত্র পাঠ করতে করতে তাঁর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এমতাবস্থায় তাঁর জীবন প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভে গেল। পত্রটি তাঁর বুকের উপরই ছিল। (যেমন সুহায়লী বর্ণনা করেছেন, ২খ. পৃ. ২৩৩)। অপর বর্ণনায় আছে, পত্রটি তাঁর হাতে ছিল। (ফাতহুল বারী)।

হযরত আবূ জান্দল ইবন সুহায়ল (রা) আবূ বাসির (রা)-কে সেখানেই কাফন দাফন করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর পর তিনি সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হন।

সুহায়ল ইবন আমর যখন ঐ ব্যক্তির নিহত হওয়ার সংবাদ পেল, যাকে আবূ বাসির (রা) হত্যা করেছিলেন, সে ব্যক্তি ছিল সুহায়লের গোত্রের; তাই তখন সে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ হত্যার রক্তপণ দাবি করার ইচ্ছা করল। কিন্তু আবূ সুফিয়ান বললেন, তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে রক্তপণ চাইতে পার না, কেননা তিনি তো ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আবূ বাসিরকে তোমার লোকদের হাতে সোপর্দ করেছেন। আর আবূ বাসিরও রাসূল (সা)-এর নির্দেশে এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি, বরং সে নিজেই হত্যা করেছে। আর এ রক্তপণ আবূ বাসিরের বংশ ও গোত্রের কাছেও দাবি করা যাবে না; কেননা আবূ বাসির তাদের ধর্মে নেই। (ফাতহুল বারী, কিতাবুশ-শুরূত)।

চুক্তি সম্পাদনের পর যে সমস্ত পুরুষ মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনা আসতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের চুক্তি অনুযায়ী মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। এর মাঝে কিছু মুসলমান মহিলা হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় এসে পৌঁছলেন। মক্কাবাসী চুক্তি অনুসারে তাদেরও ফেরত দেয়ার দাবি জানাল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাদের ফিরিয়ে দিতে নিষেধ করলেন এবং এটা প্রকাশ করে দিলেন যে, ফেরত দেয়ার শর্তটি ছিল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, স্ত্রীলোকগণ এ শর্তের অন্তর্ভুক্ত নন। সুতরাং কোন কোন রিওয়ায়াত অনুযায়ী শর্তটি ছিল, "আপনার কাছে কোন পুরুষ আসবে না যাকে আপনি ফেরত পাঠাবেন না"; আরো প্রকাশ থাকে যে, رجل শব্দটির

---

১. আল্লামা সুহায়লী বলেন, সেখানে তিনশত মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন, যেমনটি যুহরী এবং মূসা ইবন উকবা থেকে বর্ণিত হয়েছে। যারকানী, ২খ. পৃ. ২০৩।

অর্থ পুরুষ, এতে মহিলা কিভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ? এটা আল্লাহ্ তা'আলা অস্বীকার করলেন এবং বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল করলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهَاجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لاَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاٰتُوْهُمْ مَّا اَنْفَقُوْا وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْئَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ٠

"হে মুমিনগণ, তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে এলে তাদেরকে পরীক্ষা করো, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন, তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত দিও না। মুমিন নারিগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিও। এরপর তোমরা তাদেরকে মাহর দিয়ে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না, তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাইবে এবং কাফিররা ফেরত চাইবে তারা যা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে ফয়সালা প্রদান করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের মধ্যে থেকে যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে, তখন যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।" (সূরা মুমতাহিনা : ১০-১১)

এরপর কাফিররাও চুপ হয়ে গেল এবং মহিলাদের ফিরিয়ে দেয়ার দাবি করল না।

ফায়েদা, উদাহরণ এবং মাসআলা ও নির্দেশ

১. মুসলিম শাসক ও মতামত দানের অধিকারী মুসলমান কাফিরদের সাথে সন্ধি করা যদি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলজনক মনে করেন, তবে তা করা জায়েয। এরূপ সন্ধিও জিহাদের অনুরূপ। কেননা জিহাদের উদ্দেশ্য হলো কাফির ও কুফরী শক্তির মন্দকর্মকে নির্মূল করা, যা এ সন্ধি দ্বারাও অর্জিত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ "আর

যদি কাফির সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তা হলে তুমিও সন্ধির প্রতি ঝুঁকবে, আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখবে[1] (অর্থাৎ সন্ধির ভরসা করবে না)।"

২. সন্ধি দ্বারা যদি ইসলাম ও মুসলমানের উপকার না হয়, তবে এমন সন্ধি করা জায়েয নয়। কেননা এরূপ সন্ধি মুসলমানদের জন্য অপমান এবং জিহাদের ফরয আদায় বন্ধ হওয়ার কারণে পরিণত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَلَا تَهِنُوْا وتَدْعُوْا الى السَّلْمِ وانْتُمُ الاَعْلَوْنَ واللهُ معكُمْ ولَنْ يَترِكُمْ اَعْمَالكُمْ ·

"সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, তোমরাই প্রবল, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ণ করবেন না।" (সূরা মুহাম্মদ : ৩৫)

অর্থাৎ জিহাদ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাফিরের সাথে সন্ধি করা জায়েয নয়; আর সন্ধির অর্থ (স্থায়ীভাবে) যুদ্ধ বাদ দেয়া নয়; এ কারণে ফকীহগণ সন্ধির জন্য 'মাওয়াদিআত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর 'মাওয়াদিআত' শব্দের আভিধানিক অর্থ একে অপরকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেয়া।

৩. প্রয়োজনের সময় কাফিরদের সাথে কোন বিনিময় ছাড়া অথবা অর্থ দিয়ে কিংবা অর্থ নিয়ে, এ তিন ধরনের সন্ধিই জায়েয আছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরতের পর মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে কোন বিনিময় লেনদেন ছাড়াই চুক্তি করেছিলেন, আর এ সময় এ সন্ধি চুক্তি করলেন যা হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে প্রসিদ্ধ। আর নাজরানের খ্রিস্টানদের থেকে মাল গ্রহণ করে সন্ধি করেছেন এবং আহযাব যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) উয়ায়না ইবন হাসান ফাযারীকে মদীনায় উৎপাদিত খেজুরের অর্ধেক দিয়ে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন। বিস্তারিত ঘটনা আহযাব যুদ্ধের বর্ণনাকালে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, এ তিন ধরনের সন্ধিই জায়েয আছে।

৪. মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করার প্রয়োজন হবে, তখন তা লিখে নেয়া উচিত। এ জন্যে যে, যে লেনদেন ও সম্পর্ক একটা (দীর্ঘ) সময় পর্যন্ত চলবে, সতর্কতার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তা লিখে নিতে আদেশ দিয়েছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ·

"হে মুমিনগণ, তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন তা লিখে রেখো।" (সূরা বাকারা : ২৮২)

হ্যাঁ, তবে যে লেনদেন ও যে চুক্তি তাৎক্ষণিক বা সাময়িক, যা ভবিষ্যতের উপর নির্ভরশীল নয়, তা লিখে রাখা জরুরী নয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ;

১. সুবহান আল্লাহ, একেই বলে আল্লাহ তা'আলার কালাম, এখানে সন্ধির সাথে সাথে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের মাসআলাও বর্ণনা করা হয়েছে।

اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلاَّ تَكْتُبُوْهَا

"কিন্তু তোমরা পরস্পরে যে ব্যবসার নগদ আদান প্রদান কর, তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নেই।" (সূরা বাকারা : ২৮২)

জানা গেল, যে লেনদেন এমন তাৎক্ষণিক নয়, তা না লিখায় ক্ষতি আছে, তা লিখে নেয়া জরুরী ও আবশ্যিক। (শারহুস সিয়ারুল কাবীর, ৪খ. পৃ.৬)।

৫. চুক্তিনামার দু'টি কপি হওয়া উচিত, যাতে প্রত্যেক পক্ষের কাছে এক এক কপি সংরক্ষিত থাকে।

৬. আর প্রত্যেক কপিতে উভয় পক্ষের নেতাসহ কয়েক ব্যক্তির স্বাক্ষর নেয়া উচিত, যেমন হুদায়বিয়ায় যে চুক্তিনামা প্রস্তুত করা হয়, তাতে উভয় পক্ষের দস্তখত নেয়া হয় এবং এক কপি নবীজির কাছে এবং আরেক কপি সুহায়ল ইবন আমরের কাছে দেয়া হয়।

৭. সন্ধির শর্তাবলীর মধ্যে কোন শর্তের বিপরীত কাজ করা কুচুক্তি ও চুক্তি ভঙ্গের শামিল; এরই ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ জন্দল ও হযরত আবূ বাসির (রা)-কে এ কথা বলে ফিরিয়ে দেন যে, আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি, এর বিপরীত কাজ করব না।

৮. কোন এক এলাকার অধীন মুসলমান যদি কোন চুক্তি করে, তবে অপর এলাকার অধীন মুসলমানের জন্য এর অনুসরণ বাধ্যতামূলক হবে না, যে সমস্ত মুসলমান মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আসেন, রাসূলুল্লাহ (সা) চুক্তি অনুযায়ী তাদেরকে মক্কার মুশরিকদের হাতে তুলে দেন। তাঁর উপর কেবল এ সীমা পর্যন্ত বাধ্য-বাধকতা ছিল যে, দারুল ইসলাম অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারায় এমন ব্যক্তিকে থাকতে দেয়া হবে না।

হযরত আবূ বাসির ও হযরত আবূ জন্দল (রা) যেখানে গিয়ে অবস্থান নেন, তা মদীনা মুনাওয়ারার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল। হযরত আবূ বাসির (রা) ও তার দল যা কিছু ঘটনা করেছেন, তা মদীনার সীমারেখার বাইরে করেছেন। অধিকন্তু তা তারা নবী (সা)-এর নির্দেশ বা অনুমতিক্রমে করেন নি। (ফাতহুল বারী, যাদুল মাআদ)।

৯. হযরত আবূ বাসির (রা) আমির গোত্রের যে ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন, তা কেবল তার ঈমান, ধর্ম ও জীবন রক্ষার তাগিদে করেছেন। কেননা আবূ বাসির জানতেন যে, মক্কায় যাওয়ার পর তার প্রতি নানা ধরনের অত্যাচার করা হবে, এবং কুফরী ও শিরক করতে তাকে বাধ্য করা হবে। এ জন্যে তিনি ঐ আমির গোত্রের ব্যক্তিকে হত্যা করে নিজ ঈমান ও প্রাণ রক্ষা করেছেন। (রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ২৩৪)।

১০. যে সমস্ত মহিলা হিজরত করে দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে চলে আসেন, তাদের (পূর্ব) স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায় এবং অনুরূপভাবে যদি

কোন পুরুষ মুসলমান হয়ে দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে চলে আসেন, তা—হলে তার কাফির স্ত্রীর সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

১১. ولا تمسكوا بعصم الكوافر ,'কাফির স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বন্ধন ধরে রেখো না' অর্থাৎ তাদের ছেড়ে দাও আর তাদের সাথে স্ত্রীত্বের সম্পর্ক ছিন্ন কর। মুসলমানের জন্য এটা উচিত নয় যে, এক মুশরিক স্ত্রীলোককে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। সুতরাং হযরত উমর (রা) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কায় বসবাসরত নিজের দু'জন মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। যাদের একজনের নাম ছিল কারিয়া, যে পরে মুয়াবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ানের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, আর অপরজনের নাম ছিল উম্মে কুলসুম, যে পরে আবূ জুহমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।[১]

এ দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম (রা) এর ঈমান ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় যে, আল্লাহর আদেশের সামনে তারা কোন সম্পর্ক বা ভালবাসার বিন্দুমাত্র পরোয়াও করেন নি। আর হবেই না বা কেন, তাদের অন্তরে তো আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা এতটাই সুদৃঢ় ছিল যে, তাতে অপর কেউ অনুপ্রবেশের কোন সুযোগই ছিল না।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ "আল্লাহ তা'আলা কারো দেহাভ্যন্তরে দু'টি অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেন নি।"

১২. ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, لا يسقط من شعره الا اخذوه অর্থাৎ "নবী (সা)-এর পবিত্র দেহ থেকে যে চুল পড়ে যেত, সাহাবায়ে কিরাম (রা) তা পূর্ণ ভালবাসা, পূর্ণ পবিত্রতার সাথে হাতে হাতে নিয়ে বরকতের জন্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করতেন।" এরদ্বারা জানা গেল যে, পুণ্যবানদের স্মৃতিচিহ্ন বরকতের জন্য সংরক্ষণ করা জায়েয ও বৈধ। (ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ২৫০)।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔

"আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে সেই তাবূত আসবে যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে অবশ্যই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।" (সূরা বাকারা : ২৪৮)

বনী ইসরাঈলগণ যখন তাদের নবীর কাছে তালূতের বাদশাহ হওয়ার প্রমাণ চাইল, তখন তিনি এ আলামত বর্ণনা করলেন যে, তার সাথে একটি সিন্দুক থাকবে, যাতে হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আ)-এর বরকতময় স্মৃতিচিহ্ন থাকবে; অর্থাৎ হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আ)-এর লাঠি, কাপড়, জুতা এবং তাওরাতের কিছু

১. ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ৩৬১।

তখতি থাকবে। বরকতের জন্য এ সিন্দুক ফেরেশতাগণ বহন করবেন। যা দেখে তার বাদশাহ হওয়া সম্পর্কে ঈমানদারগণের প্রত্যয় জন্মাবে। আর প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি সম্মান ও ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য, তার নিদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন মূলত তাকেই শ্রদ্ধা করা। সাহাবায়ে কিরাম (রা) কর্তৃক মহানবী (সা)-এর বর্ম, তরবারি, পেয়ালা এবং আংটি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কথা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে। যার উপর ইমাম বুখারী পঞ্চম অধ্যায়ে باب ما ذكر من روع النبى ﷺ وعصاب وسيفه وقدحه وخاتمه ومن شعره ونعله নামে একটি পরিচ্ছেদ রেখেছেন, (১১খ. পৃ.৪৩০)। আর যদি নেককার ব্যক্তিগণের চিহ্ন থেকে বরকতের মাসয়ালা অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, তা হলে কাযী ইয়ায কৃত 'জিযবিল কুলূব' ও 'আশ-শিফা' এবং সায়্যিদ সামহুদীর কিতাব দেখুন।

১৩. হুদায়বিয়ার ঘটনায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফযীলত ও পরিপূর্ণতা দু'ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত, এভাবে যে, এ সন্ধির ফলে সমস্ত সাহাবা, এমনকি হযরত উমর ফারুক (রা) পর্যন্ত বিমর্ষ ও শোকাভিভূত হয়েছিলেন কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মতই নিশ্চিন্ত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, হযরত উমর (রা) তার অভিযোগ হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকটে পেশ করলেন। আবূ বকর (রা) প্রতিটি শব্দে ও প্রতিটি অক্ষরে হুবহু ঐ জবাব দিলেন যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে বেরিয়েছিল।[১]

১৪. ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, হুদায়বিয়ার কিছু অংশ ছিল হেরেমের অন্তর্ভুক্ত আর কিছু ছিল হেরেম বহির্ভূত এলাকা। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তো অবস্থান করছিলেন হেরেম বহির্ভূত এলাকায় কিন্তু নামাযাদি আদায় করেছেন হেরেমভুক্ত এলাকায়।

সুতরাং যে ব্যক্তির সামনে এমন অবস্থা আসবে যে, সে হেরেমের নিকটে অবস্থান করছে, তা হলে তার জন্য হেরেমের সীমার অভ্যন্তরে গিয়ে নামায আদায় করা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর আমল এরূপই ছিল।

অধিকন্তু এ ঘটনা দ্বারা জানা গেল যে, নামাযে একলক্ষ গুণ সওয়াব মসজিদুল হারামের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং হেরেমের সীমারেখার মধ্যে যেখানেই নামায আদায় করা হোক, একলক্ষ নামাযের সওয়াব পাওয়া যাবে।[২]

১৫. রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সাহাবিগণকে কুরবানী করতে ও মাথা মুণ্ডন করার আদেশ দেন, সাহাবিগণ এ আদেশ মানতে কিছুটা বিলম্ব করেন। তখন তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। এতে জানা গেল যে, স্ত্রীলোকের সাথে পরামর্শ করা জায়েয; তবে এ শর্তে যে, তার বুঝ, দৃষ্টিভঙ্গি, পরহেযগারী ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

১. যাদুল মাআদ, ২খ. পৃ. ১২৮।

২. যাদুল মাআদ, ২খ. পৃ. ১৪৮।

১৬. সুহায়ল ইবন আমরের জেদের ফলে তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ স্থলে بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ লিখা অনুমোদন করেন, যদিও بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখা উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন ছিল; কিন্তু যেহেতু بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ লিখাও সত্য এবং সঠিক, কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা) এখানে উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্নের জন্য অনমনীয় হননি।

১৭. বায়'আতের মাহাত্ম্য

বায়'আতের তাৎপর্য সম্বন্ধে আকাবার বায়'আতে বলা হয়েছে। যার সার-সংক্ষেপ এই যে, 'বায়'আত' 'বায়উন' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বিক্রয় করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় নিজের সত্তাকে জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার হাতে সোপর্দ করাকে বায়'আত বলে। এখানে নিজের সত্তা হলো পণ্য আর জান্নাত হলো এর মূল্য। মানুষ বিক্রেতা এবং আল্লাহ্ তা'আলা ক্রেতা। সমস্ত পণ্ডিতের নিকট এটা গ্রহণযোগ্য যে, বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর বিক্রয়কৃত মাল বিক্রেতার অধিকার থেকে ক্রেতার অধিকারে চলে যায়। ক্রেতাই এর সমস্ত ভোগের অধিকার লাভ করে। অনুরূপভাবে মু'মিন বায়'আত করার পর আপন আত্মার (নিজের) মালিক থাকে না। এ জন্যে মু'মিনের উচিত যে, নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজের জীবনের কোন কিছুই অপব্যয় না করা।

কিন্তু এ লেনদেন সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে হয় না, বরং নবী (আ)-গণ এবং তাঁদের ওয়ারিশগণের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন নবী করীম (সা)-এর হাতে বায়'আত হন, তখন প্রকৃত বায়'আত আল্লাহ্ তা'আলার সাথে হয়েছে; আর রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন উভয়ের মধ্যে উকিল ও মধ্যস্থতাকারী। যেমন আল্লাহ বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ٠

"যারা তোমার হাতে বায়'আত করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বায়'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর।" (সূরা ফাতহ : ১০)

সহীহ বুখারীতে হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : من يضمن لى ما بين لحييه ورجليه اضمن له الجنة "কে আছো, যে তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী ও দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের যিম্মাদার হবে, অর্থাৎ জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হিফাযতের যিম্মা নেবে, আমি হব তার জান্নাতের যিম্মাদার।"

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেকে মূল্য অর্থাৎ জান্নাতের যামিনদার আখ্যয়িত করেছেন যে, যদি ঈমানদারগণ ঐ সবের যামিন ও যিম্মাদারী নেয়, জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের কোন ব্যয় আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে না করে, যা আমাদের বিক্রয়কৃত পণ্য, তা হলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিনিময় অর্থাৎ মূল্য– জান্নাত নিয়ে দেয়ার তত্ত্বাবধায়ক ও যামিনদার হবেন।

এ হাদীসে يضمن এবং اضمن শব্দদ্বারা এ বিক্রির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এ জন্যে যে, যামিন এবং তত্ত্বাবধান তো বিক্রির ক্ষেত্রেই হয়; বিক্রিকৃত দ্রব্যে যদি কোন দোষ বের হয়, তা হলে এ দোষের কারণে ক্রেতা ঐ দ্রব্য ক্রয়ের চুক্তি বাতিল করার অধিকারী হয়ে যায়। কিন্তু ক্রেতা যদি বিক্রেয় দ্রব্যের দোষ দেখেও বলে, আমি ক্রয়ে সম্মত আছি, তখন তার বাতিল করার অধিকার নষ্ট হয়ে যায় এবং বিক্রি পূর্ণ হয়ে যায়; ক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রয় বাতিল করার সম্ভাবনা আর অবশিষ্ট থাকে না।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন বৃক্ষের নিচে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ... .

"আল্লাহ্ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের তলে তোমার কাছে বায়'আত গ্রহণ করল...।" (সূরা ফাতহ : ১৮)

এতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ক্রয় বাতিলের অধিকার নষ্ট করে দিলেন এবং এটা প্রকাশ করে দিলেন যে,এ মহাত্মাগণ আল্লাহর সাথে যে বিক্রির কারবার করেছেন, তা কখনো বাতিল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাঁর ক্রয় বাতিলের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিলেন কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও رضينا بالله (আমরাও আল্লাহতে সন্তুষ্ট) বলে নিজেদের ইচ্ছাকেও বাতিল করে দিলেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন : رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।"

যদিও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন দোষের সম্ভাবনা নেই, তবুও সাহাবায়ে কিরাম (রা) رضينا বলে বাতিলের ক্ষীণ সম্ভাবনাকেও দূর করে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, উভয় পক্ষ আপন আপন সন্তুষ্টি ও আগ্রহ প্রকাশ করে স্ব স্ব ইচ্ছাকে নাকচ করে দেন, ফলে বিক্রি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল, সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিজেদের আত্মাকে আল্লাহ্ তা'আলার হাওলায় সোপর্দ করে দেন। আল্লাহর ওয়াদার প্রেক্ষিতে তাঁদের আত্মার মূল্য (জান্নাত) আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদান আবশ্যিক হয়ে গেল।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) ছাড়া আর সবার লেনদেন বিপদের মধ্যে আছে। জানা নেই যে, কার কার বিক্রয়কৃত মালে দোষের ভিত্তিতে ক্রয় বাতিল করে দেয়া হয়। আর অনেক লোক তো পৃথিবীতেই আল্লাহ্ তা'আলা থেকে মাল ফেরত নিয়ে বসেছে। যেমন জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এসে বলল, اقلنى بيعتى। 'আমার বায়'আত ফিরিয়ে নিন।'

ফকীহগণের দৃষ্টিতে বিক্রয়ে অস্বীকৃতি (ক্রেতা-বিক্রেতা) উভয় পক্ষের জন্য চুক্তি বাতিল এবং তৃতীয়পক্ষের জন্য নতুন বিক্রি হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যখন কোন দুর্ভাগা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিক্রয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তখন তার ও

আল্লাহর মধ্যকার চুক্তি তো বাতিল হয়ে যায় এবং তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ শয়তানের জন্য তা নতুন বিক্রি হয়। ইমাম আযম আবূ হানীফা নু'মান (র)-এর সিদ্ধান্ত হলো, لاربوا بين المولى وعبده 'দাস এবং প্রভুর মধ্যে সুদ নেই।'

এজন্যে যে, দাসের নিকট যা কিছু আছে, এর সবকিছুই তো মালিকেরই অধিকারভুক্ত। আমরা যেহেতু দাসানুদাস, শেষ পর্যন্ত ঐ মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলারই দাস, আর এমনই দাস যে, কোনক্রমেই তাঁর থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভবই নয়, আর না আলহামদু লিল্লাহ, তাঁর দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাই; এ জন্যে মহামহিম আল্লাহ তা'আলা আমাদের একটা নেকীতে কমপক্ষে দু'গুণ লাভ দিয়ে থাকেন। يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ (আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন)।

সার-সংক্ষেপ

যে মহাত্মাগণ নবী করীম (সা)-এর হাতে বায়'আত করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হন এবং তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির ফল্গুধারা বইয়ে দেন, সন্নিকটবর্তী বিজয় ও প্রচুর গনীমত লাভের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٠

"আল্লাহ্ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের তলে তোমার কাছে বায়'আত গ্রহণ করল, তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি অবগত ছিলেন, তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদের পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা ওরা হস্তগত করবে' আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ফাতহ : ১৮)

আর সূরা তাওবায় এ বায়'আতকে মহাবিজয় বলে আখ্যায়িত করেন। আল্লাহ্ বলেন :

فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ٠

"তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই তো মহাসাফল্য।" (সূরা তাওবা : ১১১)

১৭. আর রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক কখনো ইসলামের উপর, কখনো হিজরতের উপর, কখনো জিহাদের উপর, কখনো নিষিদ্ধ কাজসমূহের ব্যাপারে যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার ও চুরি করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে মিথ্যা অপবাদ দেবে না, আল্লাহর নাফরমানী করবে

না; আবার কখনো এ কথার উপর যে, আল্লাহর ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকঠিকভাবে আদায় করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করবে, আপন নেতা ও শাসকের আনুগত্য করবে যতক্ষণ না সে আল্লাহর নাফরমানী করার আদেশ করবে, কারো কাছে হাত পাতবে না, পিতামাতার প্রতি অনুগ্রহ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি কাজের ব্যাপারে বায়‘আত গ্রহণ করা সহীহ্ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য। (বিস্তারিতের জন্য ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৬০-৬৪; কানযুল উম্মাল, ১খ. পৃ.২৫, পঞ্চম অধ্যায় ‘ফী আহকামিল বায়‘আহ’ দেখুন)।

এ সরাসরি আয়াতসমূহ এবং সহীহ হাদীসসমূহের প্রমাণের পর বায়‘আত সুন্নত, উত্তম এবং কল্যাণ ও বরকত লাভের মাধ্যম হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) যেমন কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষক এবং উম্মতের অন্তরের পবিত্রতাকারী ছিলেন, অনুরূপভাবে তিনি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর খলীফাও ছিলেন। যে বায়‘আত তিনি আল্লাহর খলীফা হিসেবে নিয়েছেন, তা খলীফাগণের জন্য সুন্নত হয়েছে এবং যে বায়‘আত তিনি কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষক এবং অন্তরের পবিত্রতাকারী হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা আল্লাহপ্রেমিক আলিম, আল্লাহর আহল আরিফগণের জন্য সুন্নত হয়েছে।

১৮. হযরত উসমান গনী (রা)-এর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক হাতে অপর হাত রেখে বায়‘আত করা এ ব্যাপারে দলীল যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে বায়‘আত গ্রহণ করাও বৈধ।

১৯. হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) কর্তৃক তিনবার বায়‘আত করা দ্বারা এ প্রমাণ পাওয়া গেল যে, বায়‘আতের নবায়ন ও পুনরাবৃত্তি উত্তম ও মুস্তাহাব।

২০. হুদায়বিয়ায় যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করেছেন, আল্লাহ্ তা‘আলা কোন বাধা এবং শর্ত ছাড়াই তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টি ও আনন্দ প্রকাশ করে বলেছেন : لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ (আল্লাহ্ তো মু’মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের তলে তোমার কাছে বায়‘আত গ্রহণ করল, তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি অবগত ছিলেন) বলে তাদের অন্তরের সত্যনিষ্ঠার বর্ণনা দিয়েছেন এবং فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ (তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি) বলে তাঁদের নির্ভরতা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার কথা ব্যক্ত করলেন যে, তাঁদের অন্তর সামগ্রিকভাবে প্রশান্ত, সংশয়ের কোন নাম-নিশানা নেই। প্রকাশ থাকে যে, যার প্রতি আল্লাহ্ তা‘আলা সন্তুষ্ট এবং যার অন্তরে তিনি প্রশান্তি ও নির্ভরতা নাযিল করেছেন, এমন ব্যক্তির পক্ষে বাস্তবে না মুনাফিক হওয়া সম্ভব, আর না মুরতাদ হওয়া সম্ভব। হাদীসসমূহে তাঁদের অনেক ফযীলতের কথা এসেছে। সুতরাং মুসনাদে আহমদে হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)

বলেছেন, যে সমস্ত লোক বৃক্ষের নিচে আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে কেউই দোযখে যাবে না।

আর لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ এ আয়াত দ্বারা তাঁদের একনিষ্ঠ মু'মিন হওয়া এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী ও পসন্দনীয় হওয়া পরিস্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সম্মানিত শী'আ বন্ধুগণ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করুন যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের অন্তরের নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন, যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর এ আমল কপটতার ভিত্তিতে ছিল না, বরং সৎ নিয়্যতের ভিত্তিতে ছিল। فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ এরপর কপটতার অবকাশ অবশিষ্ট থাকে না; যখন আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের অন্তরের নিষ্কলুষতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলেন, তখন তো মুনাফিকী ও কপটতার সন্দেহ খতম হয়ে গেছে এবং এ বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً যদ্বারা এ মহাত্মাগণের সাথে খায়বার বিজয়, وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً বা বিপুল পরিমাণে গনীমত লাভ ও মহাবিজয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। আর এ ওয়াদাও ছিল ঐ একনিষ্ঠগণের (সাহাবী) জন্য। এতে জানা গেল যে, যে মহাত্মাগণের মধ্যে এ গনীমত বন্টন করা হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ এবং তাঁর পসন্দনীয় বান্দা।

পৃথিবীর বিভিন্ন বাদশাহর নামে ইসলামের দাওয়াতী পত্র

আল্লাহ্ তা'আলা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় এবং স্বস্তি ও শান্তিদায়ক বলে অভিহিত করেছেন। নিঃসন্দেহে তা ছিল প্রকাশ্য বিজয় এবং স্বস্তি ও শান্তি-দায়ক। কারণ, 'ফাতহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন বন্ধ জিনিসকে খুলে দেয়া। আরববাসীর বিরোধিতার কারণে এ যাবত ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের দরজা বন্ধ ছিল। এ সন্ধি সে দরজা খুলে দিল। এবার সময় এলো মহামহিম আল্লাহর বাণী ও পয়গাম তাঁর সকল বান্দার নিকট পৌঁছে দেয়ার। ইসলামের বিশাল দস্তরখানে শরীক হওয়ার জন্য সকলকে দাওয়াত দেয়ার, যাতে এ দস্তরখানের উপাদেয় খাদ্য ও ফল-ফলারীর স্বাদ আস্বাদনে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দাওয়াত কবূল করল এবং ইসলামের দস্তরখানে এসে বসে পড়ল, সে কি দেখতে পেল? এক এক করে চরিত্রের সব দিকের পূর্ণতা, সমস্ত সুন্দর আদব-কায়দা, ফযীলত ও মর্যাদা, প্রশংসা এবং সৌষ্ঠবের কোন দিক এমন নেই, যা ঐ দস্তরখানে বিদ্যমান নেই। তা এতই পাক-সাফ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন দস্তরখান যে, এতে প্রকাশ্য কিংবা গুপ্তভাবে অশ্লীল কিংবা অনভিপ্রেত কোন বস্তুর তাতে একবিন্দু পরিমাণেরও কোথাও নাম-নিশানা নেই। নিছক পার্থিব আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর নামে খানা শুরু করে এক-দু' লোকমাতেই জিহ্বা দ্রুত

ইসলামের স্বাদ ও ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করে ফেলল। বুঝতে পেল যে, আত্মার খাদ্য তো এটাই, এ খাদ্য দ্বারাই রূহ বেঁচে থাকতে পারে। কুফর ও শিরকের অপবিত্র ও নোংরা বস্তু খেয়ে আত্মার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব এবং তা অবাস্তব।

মোটকথা, নবী করীম (সা) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে ষষ্ঠ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে বিভিন্ন বাদশাহর নামে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণের ইচ্ছা করলেন। সাহাবায়ে কিরামকে ডেকে খুতবা দিলেন :

"ওহে লোক সকল, আমি তো সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। এ পয়গাম বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দাও, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। তোমরা ঈসা (আ)-এর সঙ্গীদের মত কর না। তিনি যখন তাদের নিকটে যেতে বলতেন, তখন তারা সম্মত হতো আর যখন দূরে যেতে বলতেন, তখন মাল-সামান নিয়ে বসে পড়ত।

হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিজেদের আনুগত্য, আত্মোৎসর্গীকরণ, একনিষ্ঠতা ও কুরবানীর কঠিন থেকে কঠিনতম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার আল্লাহ্ প্রদত্ত সনদ এবং رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট)-এর 'স্বর্ণ পদক' লাভ করেছেন। কাজেই তাঁরা এ কাজে কেন পিছিয়ে পড়বেন ? জানপ্রাণ দিয়ে সবাই নির্দেশ পালনে প্রস্তুত হলেন এবং নবী দরবারে একটা উপযুক্ত প্রস্তাব পেশ করলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাজা-বাদশাহগণ তো সিলমোহর ছাড়া কোনো পত্র গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না, এমনকি সিলমোহর ছাড়া কোনো পত্র তারা পড়েনও না। তিনি সাহাবিগণের পরামর্শে এমন একটি আংটি বানালেন, যার রিং ও নাগিনা উভয়েই ছিল রৌপ্যের; কিন্তু নির্মাণ ছিল আবিসিনিয়ার স্টাইলে। এর নাগিনায় খোদিত ছিল 'মুহাম্মদ-রাসূল-আল্লাহ্'। সবচে' নিচে 'মুহাম্মদ' শব্দটি ছিল এবং সবচে' উপরে ছিল 'আল্লাহ্' শব্দটি আর 'রাসূল' শব্দটি ছিল মাঝখানে (তারিখে তাবারী, ৩খ. পৃ ৮৪; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৩৪)।

মহানবী (সা) শাসক এবং আমীরগণের নামে পত্র প্রেরণ করলেন। পত্রে তিনি তাদেরকে সত্যের প্রতি দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, প্রজাসাধারণের পথভ্রষ্টতার দায়-দায়িত্বও আপনাদের উপরই বর্তাবে।

ওয়াকিদী বলেন, বিভিন্ন শাসকের নামে প্রেরিত এ সমস্ত পত্র ষষ্ঠ হিজরীর শেষে যিলহজ্জ মাসে হুদায়বিয়ার ঘটনার পর প্রেরণ করা হয়। কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে সপ্তম হিজরীতে এ সব পত্র প্রেরণ করা হয়। সম্ভবত পৃথিবীর বিভিন্ন শাসকের নামে পত্র প্রেরণের ইচ্ছা তো নবী (সা) ষষ্ঠ হিজরীর শেষভাগেই করেছিলেন; তবে পত্র প্রেরণের কাজটি সপ্তম হিজরীতে করা হয়।[১]

---

১. মাদারিজুন নুবূওয়াত, ২খ. পৃ. ২৯৪।

ইমাম বায়হাকী বলেন, মুতা যুদ্ধের পর তিনি এসব পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে এসব পত্র প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ এর মধ্যবর্তী সময়ে পত্র প্রেরণের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

১. রোম সম্রাট কায়সারের নামে পবিত্র পত্র

بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمّد بن عبد الله الى هرقل عظيم الرّوم سلام على من اتّبع الهدى أمّا بعد فانّي أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرّتين فان تولّيت فانّما عليك اثم اليرسلين ويا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الاّ نعبد الاّ الله ولا نُشرك به شيئا ولا يتّخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ٠

محمّد
رسول
الله

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হেরাক্লিয়াসের প্রতি,

সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর, আমি আপনাকে ঐ কালেমার দাওয়াত দিচ্ছি, যা ইসলামের প্রতি আনয়ন করে (অর্থাৎ কালেমা তাইয়্যেবার)। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন (أُوْلَـٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ); আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তা হলে আপনার প্রজা সাধারণের পাপের বোঝাও আপনার উপরই বর্তাবে। ওহে আসমানী কিতাবের অধিকারিগণ, আসুন এমন বাক্যের প্রতি যা আপনাদের এবং আমাদের মাঝে অভিন্ন। (তা হলো,) এক আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না, আল্লাহ ছাড়া পরস্পর পরস্পরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। যদি আপনারা মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম (অর্থাৎ আমরা আল্লাহর আদেশের অনুগত)।"

এ পত্রসহ রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা)-কে রোম সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন। রোম সম্রাট তখন পারস্য বিজয়ের কৃতজ্ঞতা আদায়ের উদ্দেশ্যে হিমস থেকে পদব্রজে বায়তুল মুকাদ্দাসে আগমন করেছিলেন। হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা) সপ্তম হিজরীর মুহররম মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছেন এবং বসরার শাসনকর্তার মাধ্যমে রোম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয়ে পত্রটি হস্তান্তর করেন।[১] পত্র পেশ করার পূর্বে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন, যা নিম্নরূপ :

১. ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৩৫।

রোম সম্রাটের দরবারে হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা)-এর ভাষণ

হে রোম সম্রাট, যিনি আমাকে আপনার সমীপে দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন, তিনি আপনার চেয়ে কত উত্তম, আর যে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পয়গাম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ। কাজেই যা কিছু আরয করি, দয়া করে মন লাগিয়ে শুনুন এবং নিষ্ঠার সাথে এব জবাব দিন। যদি মনোযোগ দিয়ে না শোনেন, তা হলে এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন না। আর যদি সততার সাথে জবাব না দেন, তা হলে জবাব ইনসাফপূর্ণ ও সুবিবেচনাপ্রসূত হবে না।

হে রোম সম্রাট! বলুন, দাহিয়াতুল কালবী (রা) বললেন, আপনার কি জানা আছে যে, হযরত ঈসা (আ) নামায পড়তেন ?

রোম সম্রাট : হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি নামায পড়তেন।

দাহিয়াতুল কালবী : আমি আপনাকে ঐ পরম সত্তার দিকে আহ্বান করছি, যাঁর উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আ) নামায পড়তেন এবং যাঁর উদ্দেশ্যে কপাল মাটিতে লাগাতেন। যিনি ঈসা (আ)-কে তাঁর মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি এ সমস্ত আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আমি আপনাকে ঐ উম্মী নবীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, যাঁর সম্বন্ধে হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) সুসংবাদ দিয়ে গেছেন, যে ব্যাপারে রয়েছে আপনার পর্যাপ্ত জ্ঞান। আপনি যদি এ দাওয়াত কবূল করেন, তা হলে আপনার জন্য ইহ-পরকালে কল্যাণ রয়েছে। অন্যথায় আপনার আখিরাত তো বরবাদ হবেই, দুনিয়াতেও আপনার রাজত্বে অংশীদার সৃষ্টি হবে। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আপনার একজন প্রভু আছেন যিনি অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করেন এবং যাঁর নিয়ামতসমূহ পরিবর্তিত হতে থাকে।

রোম সম্রাট হযরত দাহিয়া (রা)-এর হাত থেকে নবীজির পত্রটি গ্রহণ করে তা চোখে ও মাথায় বুলালেন এবং চুমো খেলেন, খুলে পত্রটি পাঠ করলেন এবং বললেন, চিন্তা-ভাবনা করে আমি আগামীকাল এর জবাব দেব। (রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ৩৫৫)।

সম্রাট নিজ কর্মচারীদের বললেন, তাঁর কওমের যে সকল লোক আমার দেশে এসেছে, তাদেরকে উপস্থিত করো। তাদের কাছ থেকে যাতে এ ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা জেনে নিতে পারি। ঘটনাক্রমে আবূ সুফিয়ান ঐ সময় এক বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় এসেছিলেন এবং গাযযায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তখনও আবূ সুফিয়ান মুসলমান হননি। কায়সারের লোকজন গাযযায় গিয়ে তাকে নিয়ে আসে এবং দরবারে হাযির করে। বড়ই শান-শওকতের সাথে দরবার বসে। রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ভবিষ্যদ্বক্তাগণ এবং পাদ্রিগণ সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আরবীয় দলকে সম্বোধন করে সম্রাট প্রথম জানতে চাইলেন, তোমাদের মধ্যে কে ঐ নবূয়াতের দাবিদার ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা নিকটাত্মীয় ? আবূ সুফিয়ান বললেন, আমি। সম্রাট বললেন, তুমি আমার কাছে এসো। আর কুরায়শ দলের অপর ব্যক্তিদের তাঁর

পশ্চাতে বসার[১] আদেশ করলেন। তাদেরকে বললেন, আমি এ ব্যক্তিকে কিছু প্রশ্ন করব, সে যদি মিথ্যে বলে, তাহলে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবে। আবূ সুফিয়ান বললেন, যদি আমার এ সন্দেহ না হতো যে, লোকে আমাকে মিথ্যুক বলবে, তবে অবশ্যই আমি মিথ্যে বলতাম। এরপর নিম্নরূপ কথোপকথনের ধারাবাহিকতা শুরু হয় :

সম্রাট : তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা কিরূপ ?

আবূ সুফিয়ান : উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়,[২] তাঁর চেয়ে উচ্চ বংশীয় কেউ নেই।

সম্রাট : তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলেন ?

আবূ সুফিয়ান : না।

সম্রাট : তাঁর নবূয়াতের দাবি করার পূর্বে তোমরা কি তাঁকে মিথ্যে বলতে দেখেছ?

আবূ সুফিয়ান : না।

সম্রাট : তাঁর অনুসারী কারা হচ্ছে, আমীর এবং ধনবান ব্যক্তি, না কি দরিদ্র ও দুর্বল ব্যক্তি ?

আবূ সুফিয়ান : অধিকাংশ দরিদ্র ও দুর্বল ব্যক্তি।

সম্রাট : তাঁর অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে ?

আবূ সুফিয়ান : দিন দিন বেড়েই চলছে।

সম্রাট : তাঁর দীন গ্রহণের পর অসন্তুষ্টি ও অবজ্ঞাভরে কেউ কি তাঁর দীন ত্যাগ করেছে ?

আবূ সুফিয়ান : না।[৩]

---

১. কেননা সামনে বসে মুখ দেখতে পাওয়া ও চক্ষু লজ্জা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার অন্তরায়। ফাতহুল বারী।

২ এ বাক্য সহীহ বুখারীর আর দ্বিতীয় বাক্য মুসনাদে বাযযারের অনুবাদ قال هو فى حسب ما لا يفضل عليه احد ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ১৬২।

৩. ইসলামকে খারাপ ভেবে আজ পর্যন্ত কেউ ইসলাম ত্যাগ করেনি, হ্যাঁ, স্ত্রীলোক এবং অর্থের আকাঙ্ক্ষা করে কোন কোন লোভী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করেছে, যা ধর্তব্যের মত নয়। আলহামদু লিল্লাহ, ইসলাম এর থেকে পবিত্র যে, ইসলাম নারী ও অর্থের লোভ দেখিয়ে কাউকে দাওয়াত দেয় না। হায়দারাবাদে জনৈক খ্রিস্টান আমার প্রতিবেশী ছিল, আমার কাছে আসা-যাওয়া করত, তার বয়স ছিল পঁচাশি বছর। একদিন আমি তাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহকে হাযির নাযির জেনে সত্যি করে বল তো, তোমার জীবনে তুমি কি এমন কোন মুসলমান পেয়েছ, যে ইসলামকে খারাপ ভেবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে? সে জবাব দিল, আল্লাহর কসম, একজন মুসলমানকেও এমনটি দেখিনি। যে ব্যক্তি খ্রিস্টান হয়েছে, সেই নারী এবং অর্থের লোভেই খ্রিস্টান হয়েছে। আর তাও কেবল নামে মাত্র, বাদ বাকী আকীদা-বিশ্বাসে তার কোন পরিবর্তন আসেনি। কেবল অর্থ এবং স্ত্রীলোকের জন্য সে নিজকে খ্রিস্টান দাবি করে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তি কাফির ও মুরতাদ।

সম্রাট : তিনি কি কখনো চুক্তিভঙ্গ করেছেন ?

আবূ সুফিয়ান : না, আজ পর্যন্ত তিনি চুক্তিভঙ্গ করেন নি; তবে সম্প্রতি তাঁর সাথে আমাদের একটা মেয়াদের জন্য চুক্তি হয়েছে, জানি না, এতে তিনি কি করবেন। আবূ সুফিয়ান বলে, এ একটি ব্যাপার ছাড়া আমার আর কোন মন্তব্য করার সুযোগ ছিল না। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, فوالله ما التفت اليها منى আবূ সুফিয়ান বলে, "আল্লাহর কসম, আমার নিজের মতামত হিসেবে যা বলেছি, সম্রাট সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করলেন না।"

সম্রাট : তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে যুদ্ধও করেছ ?[১]

আবূ সুফিয়ান : হ্যাঁ।

সম্রাট : যুদ্ধে কি হয়েছে ?

আবূ সুফিয়ান : কখনো তিনি জয়লাভ করেছেন, আর কখনো আমরা।

সম্রাট : তিনি তোমাদেরকে কিসের প্রতি আহ্বান করেন ?

আবূ সুফিয়ান : তিনি বলেন, এক আল্লাহর ইবাদত কর, কাউকে তাঁর সাথে শরীক করো না; আর কুফর-শিরকের যা কিছু তোমাদের পিতা-পিতামহ করেছে, সেসব কিছু সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কর। এছাড়া তিনি নামায আদায়, যাকাত দান, সত্য বলা, পবিত্র থাকা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেন।

সম্রাট : তাঁর দোভাষীকে উদ্দেশ করে বললেন, তাকে বলে দাও যে, প্রথমে আমি তোমাকে তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তুমি বললে, তিনি উচ্চ বংশীয় এবং সম্ভ্রান্ত খান্দানের। নিশ্চয়ই নবিগণ এরূপ সম্ভ্রান্ত বংশেই প্রেরিত হয়ে থাকেন, যা সম্মান-মর্যাদায় উচ্চতর হয়ে থাকে। এরপর আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর বংশে কি কেউ বাদশাহ ছিলেন ? তুমি বললে, না। যদি তাঁর বংশে কেউ বাদশাহ থাকতেন, তা হলে আমি মনে করতাম এভাবে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের বাদশাহী ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি তাঁকে মিথ্যে বলতে শুনেছ? তুমি বললে, না। এতে আমি বুঝলাম, যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যে বলেন না, তাঁর পক্ষে আল্লাহ্ মাফ করুন, আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যে বলা কি করে সম্ভব? আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ধরনের লোক তাঁর অনুসরণ করে? তুমি বললে, গরীব ও দুর্বল লোকেরা। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবিগণের অনুসরণ দরিদ্র

১. এ অর্থ فهل قاتلتموه -এর সম্রাট যুদ্ধের সূচনা করার ব্যাপারে কুরায়শদের সম্পৃক্ত করেছেন এবং বলেন নি যে, فهل قاتلكم (তিনি কি কখনো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন ?) সম্রাট নবী (সা)-এর সম্মান ও মর্যাদাকে স্মরণ করে যুদ্ধের সূত্রপাতকারী হিসেবে কুরায়শদের প্রতি সম্পর্কিত করেছেন। অধিকন্তু আল্লাহর নবিগণ কোন জাতির সাথে কখনো প্রথমেই যুদ্ধের সূচনা করেন না; প্রথমে তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন, যখন তারা তা শোনে না এবং হঠকারিতার সাথে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়, তখন আল্লাহর নবিগণ তাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু করেন। ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ১৮৩।

ও দুর্বল[১] লোকেরাই করে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছ, না কমে যাচ্ছে ? তুমি বললে, বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিশ্চয়ই ঈমানের অবস্থা এই যে, এর অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়। আমি তোমাকে প্রশ্ন করলাম, তাঁর দীন গ্রহণের পর কোন ব্যক্তি কি এ দীনের প্রতি অসন্তুষ্ট, বেজার হয়ে তা পরিত্যাগ করেছে ? তুমি বললে, না। নিশ্চয়ই ঈমানের অবস্থা এরূপই হয়ে থাকে, যখন এর স্বাদ-মিষ্টতা, এর আনন্দ-খুশি কারো অন্তরে বসে যায়, কোনভাবেই তা বেরিয়ে যায় না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি ওয়াদা খেলাফ বা চুক্তিভঙ্গ করেন ? তুমি বললে, না। নিঃসন্দেহে পয়গাম্বরগণের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তাঁরা কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। আমি তোমাকে যুদ্ধের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বললে, কখনো তিনি জয়ী হয়েছেন, কখনো আমরা। নিশ্চয়ই নবী (আ)-গণের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক এমনটিই হয়ে থাকে যে, কখনো তাঁকে বিজয়ী করেন, আর কখনো করেন পরাজিত, যাতে তাঁর অনুসারীদের সততা ও নিষ্ঠার পরীক্ষা হতে থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত বিজয় তাঁদেরই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি কি বিষয়ে আদেশ করেন ? তুমি বললে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের আদেশ দেন, শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিষেধ করেন, নামায, যাকাত, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা ইত্যাদির আদেশ করেন। যা তুমি বর্ণনা করেছ, যদি তার সবকিছুই সত্য হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি নবী; শীঘ্রই তিনি এ জায়গারও অধিকারী হবেন, যেখানে আমি আমার এ দু'পা রয়েছে। আমার জানা ছিল যে, একজন নবী প্রকাশ হতে যাচ্ছেন, তবে এ ধারণা ছিল না যে, তিনি তোমাদের মধ্যেই প্রকাশ পাবেন। তাঁর সাথে সাক্ষাত করার আমার বড়ই আগ্রহ, যদি আমি তাঁর খিদমতে পৌঁছতে পারি, তবে তাঁর পা ধুয়ে দিতাম। এরপর তিনি পত্রটি উপস্থিত সবাইকে পাঠ করে শোনালেন।

পত্রের বক্তব্য কেবল শোনার অপেক্ষা ছিল, দরবারে প্রচণ্ড শোরগোল শুরু হয়ে গেল এবং চারদিক থেকে আওয়ায উচ্চতর হতে লাগল। আবূ সুফিয়ান বলেন, সে সময় আমাদেরকে বের করে দেয়া হল। বাইরে বেরিয়ে এসে আমি বললাম, আশ্চর্যের কথা, তাঁকে রোমের বাদশাহও ভয় করেন! ঐ দিন থেকে আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হল যে, তাঁর দীন অবশ্যই বিজয়ী হতে থাকবে, এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করলেন। (বুখারী, ফাতহুল বারী)।[২]

---

১. অর্থাৎ যারা আত্মগর্বী ও অহংকারী নয়, তারা ধন-দৌলতের নেশা থেকে নিরাপদ থাকে, তাদের অন্তর অহংকার,গর্ব ও আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত থাকে, কাজেই তারা সত্য কথা শুনতে ও গ্রহণ করতে পারেন।

২ এ হাদীসটি ইমাম বুখারী বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, হাফিয আসকালানী দু'টি অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন বাদাউল ওহী অধ্যায়ে, ১খ. পৃ. ৩০-৩৮ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি তাফসীর অধ্যায়ে সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে ৮খ. পৃ. ১০০-১৬৮।

ইমাম যুহরী বলেন, খলীফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের সময় ইবন নাতূর নামে খ্রিস্টানদের এক বড় আলিম[১] আমাকে বলেছেন, যিনি সম্রাট কায়সার-এর ঐ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট দরবারের পর যাগাতির রূমী নামক রোমের এক বিখ্যাত পণ্ডিত আলিমের কাছে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে পত্র লিখেন। এ ব্যক্তি আসমানী কিতাবসমূহের ব্যাপারে ছিলেন খুবই অভিজ্ঞ। সম্রাট পত্র প্রেরণের পর বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে হিমসের দিকে রওয়ানা হলেন। সম্রাট হিমসে অবস্থানকালে এর জবাব এলো যে, ইনি [মুহাম্মদ (সা)] সেই নবী, আমরা যাঁর অপেক্ষা করছিলাম এবং ঈসা (আ) যাঁর সুসংবাদ দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে সত্যায়ন করছি এবং তাঁর অনুসরণ করব। তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তুমিও অবশ্যই তাঁকে সত্য মনে করবে এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।

অতঃপর সম্রাট এক বিরাট দরবারের আয়োজন করলেন এবং রোমের গণ্যমান্য শীর্ষস্থানীয় নাগরিকদের সেখানে একত্র করলেন। দরবারের দরজাসমূহ বন্ধ করালেন এবং সম্রাট একটা বিশেষ আসনে বসলেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে বললেন :

يا معشر الروم انى قد جمعتكم لـخبر انه قد اتانى كتـاب هذا الرجل يدعنى الى دينه وانه والله لنبى الذى كنا ننتظره ونـجده فى كتبنا فهلم الـمنقبع ولنصدقه فتسلم لنا دينانا واخرتنا ٠

"ওহে রোমবাসী! আমি নিঃসন্দেহে একটা বিরাট সংবাদদানের জন্য তোমাদেরকে একত্রিত করেছি। তা হলো, আমার নিকট ঐ ব্যক্তির একটি পত্র এসেছে, তাতে তিনি আমাকে তাঁর দীন গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহর কসম, নিঃসন্দেহে তিনিই সেই নবী, আমরা যাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছি। যাঁর বর্ণনা আমরা (আসমানী) কিতাবসমূহে পাচ্ছি। অতএব এসো, আমরা সবাই মিলে তাঁরই অনুসরণ করি, তাঁকে সত্য বলে মেনে নিই, যাতে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই নিরাপদ থাকে।"

এ কথা শোনামাত্র রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চিৎকার দিয়ে উঠলো এবং পলায়নের উদ্দেশ্যে দরজার দিকে ধাবিত হলো, কিন্তু দরজা ছিল বন্ধ। রোম সম্রাট আবার আদেশ করেন, ওদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসো। এবার বললেন, আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলাম, তোমাদের দীনের প্রতি কঠিন বিশ্বাস, প্রত্যয় ও দৃঢ়তা দেখে আমি আনন্দিত। সম্রাটের এ বক্তব্যে সবাই খুশি হলো এবং তার প্রতি সকলে সিজদাবনত হল। অতঃপর সম্রাট হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা)-কে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম, আমি ভাল করেই জানি যে, তোমাদের সঙ্গী আল্লাহ্ প্রেরিত নবী, কিন্তু আমার যদি এ আশঙ্কা না হতো যে, রোমের অধিবাসীরা আমাকে

১. এ আলিমের নাম ছিল ইবন নাতূর, যেমন সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে।–ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৩৮।

হত্যা করে ফেলবে, তা হলে আমি অবশ্যই তার অনুসরণ করতাম। তুমি রোমের বড় পাদ্রী যাগাতির রূমীর কাছে যাও। তিনি অনেক বড় আলিম এবং আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। অধিকন্তু রোমবাসীদের উপর আমার চেয়ে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি, তুমি তার কাছে যাও এবং এ পয়গাম্বরের অবস্থা বর্ণনা কর। হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা) যাগাতিরের কাছে গেলেন এবং নবী (সা)-এর সমুদয় অবস্থা বর্ণনা করলেন। যাগাতির বললেন, আল্লাহর কসম, তিনি প্রেরিত নবী, আমরা তাঁর মর্যাদা ও গুণাবলীর বর্ণনা আসমানী কিতাবসমূহে লিখিত পেয়েছি। এ বলে তিনি হুজরায় প্রবেশ করলেন এবং নিজের পরিহিত কালো কাপড় পাল্টে সাদা কাপড় পরিধান করলেন। অতঃপর ছড়ি নিয়ে গীর্জায় এলেন ও সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন :

يا معشر الروم انه قد جاءنا كتاب من احمد يدعونا فيه الى الله عز وجل وانى اشهد ان لا اله الا الله وان احمد عبده ورسوله ·

"ওহে রোমবাসী! (আমাদের কিতাবে উল্লিখিত সেই) আহমদ মুস্তাফা (সা)-এর নিকট থেকে একটি পত্র এসেছে। তাতে তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আহমদ মুজতবা (সা) তাঁরই বান্দা ও রাসূল।"

এ কথা শোনামাত্র লোকজন তার উপর ভেঙ্গে পড়ল, এমনকি তাকে মারধর পর্যন্ত করল। হযরত দাহিয়া (রা) ফিরে এসে সমুদয় ঘটনা সম্রাটকে অবহিত করলেন। সম্রাট বললেন, আমারও তো ভয় এটাই যে, লোকজন আমার সাথেও এমন আচরণই করবে। (তারিখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ৮৭-৮৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২৬২-২৬৮; আল-জাওয়াবুস সাহীহ, ১খ. পৃ. ৯৪ এবং ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৪০)।[১]

মু'জামে তাবারানীতে আছে, রোম সম্রাট হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা)-কে বলেন, আমি ভাল করেই জানি যে, তিনি নবী, যেমন যাগাতির বলেছেন। কিন্তু যদি এমনটি করি, তাহলে আমার রাজত্ব খতম হয়ে যাবে এবং রোমবাসীরা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

কিন্তু রোম সম্রাট তো নবীজির এ বাণীর প্রতি দৃষ্টি দেননি যে, اسلم تسلم "ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকবে।" তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করতেন, তা হলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিই তার নিরাপদ থাকত।

পরিসমাপ্তি

রোম সম্রাট নবীজির চিঠিটি অত্যন্ত ইযযত ও সম্মানের সাথে তার স্বর্ণ নির্মিত কলমদানে রাখেন। সাইফুদ্দীন মানসূরের আমীর বলেন, একবার বাদশাহ মানসূর আমাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে আল-মাগরিবের বাদশাহর দরবারে প্রেরণ করেন। আল-

১. এতদসমুদয় ঘটনা বিস্তারিতভাবে তাফসীরে তাবারী এবং আল-জাওয়াবুস-সাহীহ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে কিন্তু এ ঘটনার খণ্ডিত অংশবিশেষ ফাতহুল বারীতেও বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যে বরাতে ফাতহুল বারীর নামও অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

মাগরিবের বাদশাহ একটি সুপারিশের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের বাদশাহর নিকট প্রেরণ করেন, যিনি রোম সম্রাটের বংশধরদের একজন ছিলেন। আমি ফ্রান্সের বাদশাহর নিকট থেকে যখন প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলাম, তখন তিনি আমাকে থাকার জন্য জোরাজুরি করলেন এবং বললেন, আপনি থেকে গেলে এক বিরাট দুষ্প্রাপ্য বস্তু আপনাকে দেখাব। আমি থেকে গেলাম। বাদশাহ একটি সিন্দুক চেয়ে আনালেন, সিন্দুকটিতে স্বর্ণের কারুকার্য খচিত ছিল। তার মধ্য থেকে তিনি একটি স্বর্ণের কলমদানী বের করে সেটি খুললেন। তার মধ্য থেকে তখন একটি পত্র বের হলো যা রেশমী কাপড়ে মোড়ানো ছিল। পত্রের অধিকাংশ অক্ষর মুছে গিয়েছিল। বাদশাহ বললেন, এটা আমার দাদা রোম সম্রাট কায়সারের নামে আপনাদের পয়গাম্বরের লিখা সেই পত্র, যা উত্তরাধিকার সূত্রে আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমাদের দাদা অসীয়ত করেছেন, যে পর্যন্ত এ পত্র তোমাদের কাছে সংরক্ষিত থাকবে, তাবত তোমাদের রাজত্ব অবশিষ্ট থাকবে। কাজেই নিজেদের রাজত্বের খাতিরেই আমরা এ পত্রকে সীমাহীন হিফাযত, সম্মান ও শ্রদ্ধা করি এবং খ্রিস্টানদের নিকট থেকে গোপন রাখি।[১]

ফায়েদা ও উদাহরণ

১. পত্রের শুরু আল্লাহ্ তা'আলার নাম দিয়ে হওয়া উচিত, যেমন হযরত সুলায়মান (আ) সাবার রাণীর নামে যখন পত্র লিখেছিলেন, তখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দ্বারা এর সূচনা করেছিলেন।

২. পত্র প্রেরক নিজের নাম প্রথমে লিখবেন এবং প্রাপকের নাম পরে, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে নিজের নাম লিখেন এবং পরে রোম সম্রাটের নাম। হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এরও নিয়ম এটাই ছিল যে, পত্র লিখতে হলে প্রথমে নিজের নাম লিখতেন। (যেমন ইমাম নববী কৃত শারহে বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, পৃ. ৮৬)।

তবে এটা জরুরী ও আবশ্যিক নয়; রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী এবং হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে কোন এক জায়গায় প্রেরণ করেন। তারা পৌঁছে উভয়ই রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে পত্র লিখেন। হযরত আলী (রা) তো নবী (সা)-এর পবিত্র নাম প্রথমে লিখে পরে নিজের নাম লিখেন, আর হযরত খালিদ (রা) প্রথমে নিজের নাম লিখেন। এতে জানা গেল যে, উভয় কাজই বৈধ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) যখন হযরত মুআবিয়া (রা) এবং আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের নামে পত্র লিখতেন, তখন প্রথমে হযরত মুআবিয়া এবং আবদুল মালিকের নাম লিখতেন। অনুরূপভাবে হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা) যখন হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নামে পত্র লিখতেন, তখন তিনিও হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নাম প্রথমে লিখতেন।[২]

---

১. যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৪২।

২ ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ১৬৮।

৩. তিনি নিজের নামের সাথে অতিরিক্ত 'আবদুল্লাহ' শব্দ যোগ করতেন, এতে হযরত ঈসা (আ)-এর ইলাহিত্ব সম্পর্কে খ্রিস্টানদের অবৈধ বিশ্বাস বাতিল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত থাকত যে, (আল্লাহ মাফ করুন) ঈসা (আ) আল্লাহ্ ছিলেন না; বরং আল্লাহর বান্দা ও তাঁর সম্মানিত রাসূল ছিলেন, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। অধিকন্তু এদিকেও ইঙ্গিত ছিল যে, যত পয়গাম্বর এসেছেন, সবাই এ ঘোষণা করেছেন যে, আমরা আল্লাহর বান্দা, (আল্লাহ মাফ করুন) খোদা নই।

৪. عظيم الروم এখানে الى هرقل عظيم الروم এর পরে শব্দ বাড়ানোতে এ ইঙ্গিত ছিল যে, যখন কাফিরদের সাথে পত্রালাপ বা প্রতিনিধি প্রেরণ করে কথা বলা হবে, তখন যেন তার পদমর্যাদা অনুসারে তাকে সম্বোধন করা হয়। (ইমাম নববী কৃত শারহে বুখারী)।

৫. سلام على من اتّبع الهدى (সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম) অর্থাৎ না তো না-ই, এ ঘটনা হযরত মূসা (আ)-এর বর্ণনায় উল্লেখিত আছে, উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, কাফিরকে কোন সময়ই سلام عليك লিখা যাবে না; বরং سلام على من اتّبع الهدى লিখা উচিত যে, তোমাদের প্রতি এ শর্তে সালাম যে, তোমরা হিদায়াতের পথ অনুসরণ করবে। এ জন্যে পবিত্র কুরআনে এর পরে উল্লিখিত হয়েছে : وَاَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى (আর শাস্তি তাদের জন্য, যারা মিথ্যা আরোপ করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে)। আর হাদীসে নববী (সা)-এ سلام على من اتّبع الهدى-এর পর যে فَاِنْ تَوَلَّيْتَ ... ... বাক্য এসেছে, তা আল্লাহর বাণী وَاَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى -এরই স্থলাভিষিক্ত।

৬. أسلم تسلم · يؤتك الله أجرك مرّتين (ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকবে, আল্লাহ্ তোমাকে দ্বিগুণ বিনিময় দান করবেন)। এক বিনিময় পূর্ববর্তী নবীর উপর ঈমান আনার দরুন। অপর বিনিময় শেষনবী (সা)-এর উপর ঈমান আনার কারণে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ (ওরা তো তারাই, যাদেরকে দু'বার বিনিময় প্রদান করা হবে)।

৭. فان توليت فان عليك اثم الاريسيين (যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তা হলে তোমার প্রজাকুলের গুনাহও তোমার উপর বর্তাবে)। কারণ, যে ব্যক্তি কারো গুমরাহ হওয়া কিংবা হিদায়াত থেকে বিরত থাকার নিমিত্তে পরিণত হয়, ওদের গুনাহও এ ব্যক্তির উপর বর্তাবে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন : وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ "ওরা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা।" (সূরা আনকাবূত : ১৩)

৮. হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা)-কে পত্রসহ একাকী প্রেরণ করা এর প্রমাণ যে, পত্রও প্রামাণ্য এবং গ্রহণযোগ্য; অধিকন্তু তা 'খবরে ওয়াহিদে'র পর্যায়ে পড়ে। কাজেই 'খবরে ওয়াহিদ' যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে কেবল হযরত দাহিয়া কালবী (রা)-কে প্রেরণে কি লাভ। (যেমন ইমাম নববী কৃত শারহে বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে)।

৯. অধিকন্তু এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মিথ্যে বলা কিংবা ভ্রান্তি সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত না পাওয়া যায়। এখানে হযরত দাহিয়া (রা) রোম সম্রাটের জন্য প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

১০. হিরাক্লিয়াস খুব ভাল করেই জানতেন যে, ইনিই সেই নবী যাঁর সম্বন্ধে হযরত ঈসা (আ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেন নি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জানা-চেনার নাম ঈমান নয়; বরং মেনে নেয়া এবং স্বীকার করার নাম ঈমান। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি তাঁকে নবী বলে জানে কিন্তু না মানে, তবে সে ব্যক্তি কখনই মুসলমান নয়। এ কারণে নির্ভরযোগ্য আলিমগণের বক্তব্য হল, বিশুদ্ধ বর্ণনা এটাই যে. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইসলাম গ্রহণ করেন নি। মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বলে আছে, হিরাক্লিয়াস তাবূক থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক পত্র লিখেন, যাতে লিখেছিলেন, আমি মুসলমান। রাসূল (সা) বলেন, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, এখন পর্যন্ত সে নিজ খ্রিস্টধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

২. কিসরা, ইরান সম্রাট খসরু পারভেযের নামে পত্র

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم – من محمّد رسول اللّه الى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتّبع الهدى وأمن باللّه ورسوله وأشهد ان لا اله الاّ اللّه وحده لا شريك له وان محمّدا عبده ورسوله ، أدعوك بدعاية اللّه عز وجل فانّي انا رسول اللّه الى النّاس كلهم لأنذر من كان حيّا ويحقّ القول على الكافرين ، أسلم تسلم ، فان أبيت فعليك اثم المجوس .

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরার প্রতি, সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম। আপনি আল্লাহর উপর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনুন এবং সাক্ষ্য দিন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে আহ্বান করছি। আর আমি সমগ্র মানব গোষ্ঠীর কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। যেন আমি (আল্লাহর অবাধ্যদের পরিণতি সম্পর্কে) সতর্ক করতে পারি এবং কাফিরদের প্রতি

---

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (বলুন, হে লোক সকল, আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত রাসূল)।

আল্লাহর দলীল পূর্ণ হয়। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন,[১] শান্তিতে থাকবেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তা হলে সমস্ত অগ্নিপূজকের পাপের বোঝাও আপনার ওপর বর্তাবে।"

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা সাহমী (রা)-কে এ পত্রসহ পারস্য তথা ইরান সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেন। কিসরা এ পত্র পেয়েই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। সে পত্রটি ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলল এবং বলল, এ ব্যক্তি আমাকে এ কথা লিখল (আমার প্রতি ঈমান আনুন), অথচ সে আমার দাস! হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা (রা) ফিরে এসে নবী (সা)-এর খিদমতে এ ঘটনা বলেন। (শুনে) তিনি বললেন, কিসরার দেশও টুকরা টুকরা, খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। অতঃপর কিসরা তার ইয়েমেনের গভর্নর বাযানকে লিখল, শীঘ্র দু'জন শক্তিশালী লোক হিজাযে পাঠিয়ে দাও, তাদের যে লোক আমাকে পত্র লিখেছে, তাকে যেন তারা গ্রেফতার করে আমার সামনে নিয়ে আসে।

ইয়েমেনের গভর্নর বাযান কিসরার আদেশ পালনার্থে তাড়াতাড়ি নবী (সা)-এর নামে একটি পত্রসহ দু'ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন। বাযানের পত্রসহ ঐ দু'ব্যক্তি যখন নবী (সা) দরবারে উপস্থিত হলো, তারা তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি দেখে ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল; তবুও সে অবস্থায়ই তারা বাযান প্রদত্ত পত্র হযরতের খিদমতে পেশ করল। পত্রের বক্তব্য শুনে আল্লাহর রাসূল মৃদু হাসলেন, এবং আগন্তুকদ্বয়কে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বললেন, আগামীকাল এসো। পরদিন ঐ দু'ব্যক্তি নবী (সা)-এর দরবারে এলে তিনি বললেন, গতরাতের অমুক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা কিসরার উপর তার পুত্র শাহরিয়ারের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং পুত্র শাহরিয়ার তার পিতা কিসরাকে হত্যা করেছে। রাতটি ছিল মঙ্গলবার রাত। সপ্তম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের মাত্র দশ রাত অতিক্রান্ত হয়েছিল। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা ফিরে যাও এবং (পারস্য সম্রাটের ইয়েমেনস্থ গভর্নর) বাযানকে এ সমস্ত অবস্থা গিয়ে খুলে বলো। তিনি আরো বললেন, আর বাযানকে এ কথাও বলে দিও যে, আমার দীন এবং আমার সালতানাত-খিলাফতও ততদূর পৌঁছবে, কিসরার সালতানাত যতদূর পৌঁছেছে। বাযান সব কথা শুনে বললেন, এ তো বাদশাহ সুলভ কথাবার্তা নয়, যদি এসব কথা সত্যিই হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি নবী। সুতরাং বাযান তাঁর কথা যাচাই করে দেখলেন, সত্য প্রমাণিত। তখন তিনি নিজ পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সহ একযোগে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং ইসলাম গ্রহণের খবর নবী (সা)-কে অবহিত করলেন।[২]

---

১. এ পত্রে তিনি يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْــرَكَ مَــرَّتَيْنِ লিখেন নি, এ জন্যে যে, কিসরা ছিলেন অগ্নি উপাসক, কোন আসমানী কিতাব কিংবা প্রকৃত পয়গাম্বরের নামেমাত্র অনুসারীও ছিলেন না। এ জন্যে তিনি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী ছিলেন না। যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৪১।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ.২৬৮-২৭২; যারকানী, ৩খ. ৩৪২।

৩. আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নামে পত্র

بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمّد بن عبد الله الى النجاشى ملك الحبشه ، سلام عليك اما بعد فانى احمد الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ، واشهد ان عيسى بن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة وحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته ، وان تَتبعنى وتؤمن بالذي جائنى فاني رسول الله واني ادعوك وجنودك الى الله تعالى ، فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى ·

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর, আমি প্রশংসা করছি সেই মহান আল্লাহর, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই প্রকৃত বাদশাহ, সকল দোষক্রটিমুক্ত। তিনিই নিরাপত্তা দানকারী, সবার প্রতি যত্নশীল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই ঈসা ইবন মরিয়ম (আ) আল্লাহর বিশেষ রূহ এবং তাঁর কালেমা, যা তিনি পবিত্র মরিয়ম (আ)-এর প্রতি নিক্ষেপ করেছেন, ফলে তাতে মরিয়ম (আ) গর্ভবতী হন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আপন খাস রূহ এবং ফুৎকারের মাধ্যমে ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন, যেমন সৃষ্টি করেছেন আদম (আ)-কে আপন কুদরতী হাত দিয়ে। আমি আপনাকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করছি, যিনি একক, অদ্বিতীয়, শরীকহীন। আমি আহ্বান জানাচ্ছি তাঁর আনুগত্য ও আদেশ পালন করার জন্য। আহ্বান জানাচ্ছি ঐ সত্যের দিকে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন মজীদ) আহ্বান জানাচ্ছি তার প্রতি ঈমান আনার জন্য। নিশ্চয়ই আমি তাঁর রাসূল। আমি আপনাকে এবং আপনার সমস্ত বাহিনীকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে আহ্বান করছি। আমি (আমার দায়িত্ব) আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিলাম এবং নসীহত করলাম। কাজেই আমার নসীহত কবূল করুন। সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম।"

হযরত আমর ইবন উমায়্যা দামিরী (রা)-কে পত্রসহ রওয়ানা করিয়ে দেন। আমর ইবন উমায়্যা (রা) তাঁর পত্র পৌঁছিয়ে দেন এবং বাদশাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আয় আসহাম,[১] আপনার সাথে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আশা করি আপনি মনোযোগ সহকারে তা শুনবেন। আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ভরসা ও সুধারণা রয়েছে। আমরা যখনই আপনার নিকট থেকে কোন কল্যাণ ও ভাল কিছু আশা করেছি, আপনার মাধ্যমে সে কল্যাণ অর্জিত হয়েছে। আপনার নিরাপত্তার ছায়ায় আমরা কখনো ভয়-ভীতির সম্মুখীন হইনি। ইঞ্জিল যার প্রমাণ, যা আপনার মুখে

১. এটা ছিল ঐ নাজ্জাশীর নাম।

জেনেছি, তা সম্ভবত আপনার ও আমাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী, যার সাক্ষ্য নাকচ করা যায় না। আর তা এমন এক কাযী ও বিচারক, যে নিজ ফয়সালার ব্যাপারে কাউকে তোয়াক্কা করে না। আপনি যদি এ দাওয়াত কবূল না করেন, তা হলে ঐ উম্মী নবীর কাছে এমন দোষী প্রমাণিত হবেন যেমন কোন ইয়াহূদী হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে দোষী হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দূত ও সংবাদ বাহক অন্যদের কাছেও প্রেরণ করেছেন, কিন্তু অন্যদের অপেক্ষা আপনার প্রতি তাঁর আশা অধিক।

নাজ্জাশীর জবাব

নাজ্জাশী বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং শপথ করে বলছি যে, তিনি সেই উম্মী নবী, আহলে কিতাব যাঁর অপেক্ষা করছিল। আর যেভাবে হযরত মূসা (আ) গর্দভ আরোহীর নিকট হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ) উষ্ট্রারোহীর কাছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁর নবূয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে আমার এতই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, চাক্ষুস দেখার পরও তাতে কোন বৃদ্ধি ঘটবে না। (যেমন কোন বুযর্গের প্রবচন, (আরবী) 'যদি পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয়, তবুও আমার বিশ্বাসে বৃদ্ধি ঘটবে না')।

হযরতের পত্রটি সম্রাট নাজ্জাশী তাঁর চোখের সাথে লাগান, সিংহাসন ছেড়ে নিচে বসে পড়েন, ইসলাম গ্রহণ করেন, হকের সাক্ষ্য দেন ও তাঁর পত্রের জবাব লিখেন।

নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে নবী (সা)-এর পত্রের জবাব

بسم الله الرّحمن الرّحيم - الى محمّد رسول الله من النجاشى الاصحم بن ابجز سلام عليك يا نبى الله ورحمة الله وبركاته - احمد الله الذى لا اله الا هو الذى هدانى للاسلام اما بعد فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فما ذكرت من امر عيس فورب السماء والارض ان عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثغوفا انه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به الينا وقد قرينا ابن عمك واصحابه فاشهد انك رسول الله صادق مصدقا وقه بايعتك وبايعت ابن عمك واسلمت على يديه لله رب العالمين - وقد بعثت اليك بانبى ارها ابن الاسهم بن الابجز فانى لا املك الا نفسى وان شت ان ايتك فعلت يا رسول فانى اشهد ان ماتقول حق السلام عليك يا رسول الله ·

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আসহাম ইবন আবজিয-এর পক্ষ থেকে। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমি এক আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ ও হিদায়াত লাভের তাওফীক দান করেছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পত্র পেয়েছি। ঈসা (আ) সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, আসমান ও যমীনের

স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শপথ, ঈসা (আ) তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র বেশি কিছু ছিলেন না, বরং তাঁর মর্যাদা ততটুকুই, যা আপনি উল্লেখ করেছেন। যে দীনসহ আপনি আমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, আমরা তা চিনে নিয়েছি এবং আমি আপনার চাচাত ভাই এবং তাঁর বন্ধু মেহমানদের সামনে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার সত্য এবং সত্যায়নকৃত রাসূল। আমি আপনার পক্ষে আপনার চাচাত ভাইয়ের হাতে বায়'আত হয়েছি এবং তার হাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ওয়াস্তে ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমার পুত্র আরহাম ইবন আসহামকে আপনার খিদমতে প্রেরণ করলাম। আমি কেবল আমার সত্তার অধিকারী, যদি ইঙ্গিত দেন তো আমি নিজে আপনার খিদমতে উপস্থিত হব। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি যা কিছু বলেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। আপনার প্রতি সালাম হে আল্লাহর রাসূল।"

নাজ্জাশী তার পুত্রের সাথে ষাটজন হাবশীকে একটি নৌকায় করে তাঁর খিদমতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু নৌকাটি পথিমধ্যে ডুবে যায়।[১]

ইনি ছিলেন সেই নাজ্জাশী, যার আমলে মুসলমানগণ পঞ্চম হিজরীতে হিজরত করে গিয়েছিলেন। তার নাম ছিল আসহামা, যিনি হযরত জাফর (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নবম হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর দিনেই রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেন এবং সাহাবিগণকে সাথে নিয়ে ঈদগাহ ময়দানে গিয়ে তার গায়েবানা জানাযা পড়েন।

তার পরে যে দ্বিতীয় নাজ্জাশী তার স্থলাভিষিক্ত হলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তার নামেও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন। যা ইমাম বায়হাকী ইবন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। পত্রটি নিম্নরূপ :

من النبى محمد ﷺ الى النجاشى الاصحم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبه ولا ولد واو ان محمدا عبده ورسوله وادعوك بدعاية الله فانى انا رسوله فاسلم تسلم يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولايتخذ بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون فان ابيت فعليك اثم النصارى من قومك ·

"নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে আবিসিনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নাজ্জাশীর প্রতি। সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, আর সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। না তাঁর স্ত্রী আছে আর না তিনি কারো জনক। আরো সাক্ষ্য দিয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা

১. যাদুল মাআদ, ৩খ. পৃ. ৬০; ইবনুল কায়্যিম কৃত হাদিয়াতুল হায়ারী, পৃ. ৪২; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৪৩-৪৫।

ও তাঁর রাসূল। আমি আপনাকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। ওহে কিতাবধারিগণ, এসো এমন শাশ্বত কথার প্রতি যা তোমাদের এবং আমাদের কাছে অভিন্ন (তা হলো,) এক আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না, আল্লাহ ছাড়া পরস্পর পরস্পরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তা হলে সাক্ষ্য থেকো যে, আমরা মুসলমান (অর্থাৎ আমরা আল্লাহর আদেশের অনুগত)। হে নাজ্জাশী! যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাহলে আপনার কওমের সমস্ত খ্রিস্টানের পাপের দায়ভার আপনার উপর বর্তাবে।"

আবিসিনিয়ার সম্রাট এ নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রমাণিত হয়নি এবং তার প্রকৃত নামও জানা যায়নি। হাফিয ইবন কাসীর বলেন, এ নাজ্জাশী পূর্ববর্তী নাজ্জাশী থেকে পৃথক, যিনি হযরত জাফর (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বাক্য বিভ্রান্তির দরুন কোন কোন লোক ভ্রমবশে উভয়কে একই ব্যক্তি মনে করেন। সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতে সরাসরি বুঝা যায় যে, নাজ্জাশী ছিলেন দু'জন। এর দ্বিতীয়জনের পত্রে নাজ্জাশীর সাথে যে আসহাম যুক্ত করা হয়েছে, তা বর্ণনাকারীর ধারণা; আসহাম ছিল প্রথম নাজ্জাশীর নাম। আর বর্ণনাকারী উভয়কে একই ব্যক্তি মনে করে এ পত্রেও আসহাম শব্দটি ভুলক্রমে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। (বিস্তারিত যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৪৬-তে দেখুন)।

৪. মকূকাস, মিসর সম্রাট ইসকান্দারিয়ার নামে পত্র

بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمّد بن عبد الله الى المقوقس عظيم القبط ، سلام على من اتّبع الهدى . امّا بعد ، فانّى أدعوك بدعاية الاسلام ، أسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرّتين . فان توليت فانّما عليك اثم القبط ويا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الاّ الله ولا نُشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضًا اربابا من دون الله فان تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে কিবতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি মকূকাসের প্রতি, সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর, আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তা হলে সমস্ত কিবতীর ইসলাম কবূল না করার পাপের বোঝাও আপনা উপর বর্তাবে। ওহে কিতাবধারীগণ, এসো এমন স্বীকৃত কথার প্রতি যা তোমাদের এবং আমাদের মাঝে একইরূপ। (তা হলো,) এক আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না, আল্লাহ ছাড়া পরস্পর পরস্পরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও,

তা হলে সাক্ষ্য থেকো যে, আমরা মুসলমান (অর্থাৎ আমরা আল্লাহর আদেশের অনুগত)।"

পত্রে সিলমোহর লাগিয়ে হযরত হাতিব ইবন আবূ বালতাআ (রা)-কে দিয়ে বললেন, মিসর সম্রাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হও। হাতিব (রা) পত্র নিয়ে রওয়ানা হলেন। প্রথমে মিসর পৌঁছে জানতে পেলেন সম্রাট ইসকান্দারিয়াতে আছেন। ইসকান্দারিয়ায় পৌঁছে দেখেন সম্রাট সমুদ্রোপরি এক মঞ্চে বসে আছেন। হাতিব (রা) নীচে থেকে ইঙ্গিতে পত্রের কথা জানালেন। সম্রাট তাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। হাতিব (রা) ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং সম্রাটের হাতে পত্র দিলেন। সম্রাট অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে তাঁর পত্র গ্রহণ করলেন এবং পাঠ করলেন। (যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৪০)।

হযরত হাতিব (রা) বর্ণনা করেন, এরপর আমাকে মেহমান হিসেবে একটি গৃহে রাখলেন। একদিন সকল আমীর-উমারা ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তিকে একত্র করে আমাকে ডাকলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই, বুঝে-শুনে জবাব দেবে। হাতিব (রা) বললেন, উত্তম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তির পত্র নিয়ে তুমি এসেছ, তিনি কি নবী নন ? হাতিব (রা) বললেন, কেন নয়, তিনি তো আল্লাহর রাসূল। মকূকাস বললেন, যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নবীই হবেন, তাহলে যখন তার সপ্রদায় তাকে মক্কা থেকে বের করে দিল তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ কেন করেন নি, যাতে তারা ধ্বংস হয়ে যেত ?

হযরত হাতিব (রা) বললেন, আপনি কি সাক্ষ্য দেন না যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর রাসূল ছিলেন ? মকূকাস বললেন, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন। হাতিব (রা) বললেন, যদি তিনি আল্লাহর রাসূলই ছিলেন তাহলে যখন শত্রুরা তাঁকে শূলে চড়ানোর ইচ্ছা করলো, তখন হযরত ঈসা (আ) কেন তাদেরকে বদ-দু'আ করেননি, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন ? এমনকি আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেন ? মকূকাস বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি বিজ্ঞ এবং একজন বিজ্ঞের কাছে এসেছ।[১]

মকূকাসের দরবারে হযরত হাতিব (রা)-এর ভাষণ

মকূকাস হযরত হাতিবের এ বিজ্ঞোচিত জবাব শুনে চুপ হয়ে যান। এরপর হযরত হাতিব (রা) সম্রাটকে উদ্দেশ করে এই ভাষণ দেন :

আপনার জানা আছে যে, এই মিসরেই এক ব্যক্তি অতীত হয়েছে, যে এ দাবি করতো যে, انا ربكم الاعلى। আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভু। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা পাকড়াও করে শাস্তি দিয়েছেন, ধ্বংস ও বরবাদ করেছেন। আপনাদের উচিত তার

১. খাসাইসুল কুবরা, ২খ. পৃ. ১২; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৪৮।

থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। তার অনুরূপ এমন যেন না হয় যে, একই কারণে আপনারাও নিজেদেরকে একই পরিণতির উপযোগী করে বসেন। একটি দীন আছে, যা আপনাদের দীন থেকে অনেক উন্নত। সে দীন হলো ইসলাম, যে সম্পর্কে সর্বশক্তিমান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "আমি সমস্ত দীনের উপর একে বিজয় দান করব।" সমস্ত দীন এ দীনের সামনে নিপ্রভ হয়ে পড়বে। এ নবী (সা) প্রেরিত হয়ে সকল মানুষকে এ দীনের দাওয়াত দেন। এর বিরোধিতায় কুরায়শ সবচে' কঠোর। ইয়াহূদী সবচে' বেশি শত্রু এবং খ্রিস্টান সবচে' নিকটবর্তী প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহর কসম, হযরত মূসা (আ) কর্তৃক হযরত ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ দেয়ার তুলনা এরূপ, যেমন হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুসংবাদ দেয়া। দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর আমাদের দ্বারা আপনাদেরকে কুরআনের প্রতি আহ্বান করা এমন, যেমন আপনারা তাওরাতধারীদেরকে ইনজীলের প্রতি আহ্বান করেন। যে সম্প্রদায় কোন নবীর যুগ পায়, সে সম্প্রদায় ঐ নবীর উম্মত। তাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে ঐ নবীর অনুসরণ করা। হে সম্রাট, আপনিও তাদের মধ্যে, যারা এ নবীর সময় পেয়েছে। আমি আপনাকে ঈসা (আ)-এর দীন থেকে বিরত রাখতে চাই না, বরং তাঁর অনুসরণ করুন।[১]

সম্রাটের জবাব

মকূকাস বললেন, আমি এ নবী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছি। এতে এই পেলাম যে, তিনি পসন্দনীয় বিষয়ে আদেশ করেন, আর অপসন্দনীয় বিষয় থেকে নিষেধ করেন। ঘৃণার যোগ্য বিষয়ে আদেশ করেন না, আর আগ্রহের বস্তু থেকে নিষেধ করেন না। তিনি যাদুকর ও পথভ্রষ্ট নন। ভবিষ্যদ্বক্তা ও মিথ্যাবাদী নন। তাঁর মধ্যে নবূয়াতের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি, যেমন অদৃশ্যের সংবাদ দেয়া; এ ব্যাপারে আমি পুনরায় চিন্তা করব। আর তিনি নবী (সা) প্রদত্ত পত্র হাতির দাঁতদ্বারা নির্মিত কৌটায় ভরে হিফাযতে রাখার জন্য খাজাঞ্চীকে দিলেন। পরে এক লিখক ডেকে আরবী ভাষায় এ পত্রের জবাব লিখতে নির্দেশ দিলেন। জবাবটি ছিল এরূপ :

بسم الله الرّحمن الرّحيم – من محمّد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط ، سلام عليك – اما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت فيه وما تدعو اليه وقد علمت ان نبيا قد بقى وكنت اظن ان يخرج من الشام وقد اكرمت رسولك وبعثت

১. কেননা হযরত মসীহ (আ) নিজেই শেষনবী (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاتِىْ مِنْ بَعْدِ اسْمُهٗ اَحْمَدُ (আমি সুসংবাদদাতা এক রাসূলের, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে আহমদ)। এবং তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দেন। কাজেই তাঁর আনুগত্য করা মূলত হযরত মসীহ (আ)-এর নির্দেশের আনুগত্য করা।

اليك بجاريتين لهما من القبط مكان عظيم وكسرة واهديت اليك بعلة لتركبها والسلام .

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহর প্রতি কিবতের সর্দার মকৃকাসের পত্র। আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর বক্তব্য এই যে, আমি আপনার পত্র পাঠ করেছি এবং তা বুঝেছি যা আপনি উল্লেখ করেছেন এবং যার প্রতি আহ্বান করেছেন। আমার বিশ্বাস ছিল একজন নবীর আগমন অবশিষ্ট রয়েছে। তবে আমার ধারণা ছিল, তিনি সিরিয়ায় আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার প্রেরিত দূতকে সম্মান করেছি এবং তার মাধ্যমে আপনার জন্য কিবতের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া দু'জন দাসী এবং আপনার বাহন হিসেবে একটি খচ্চর প্রেরণ করছি। আপনাকে সালাম।"

এক দাসীর নাম ছিল মারিয়া কিবতীয়া (রা), যিনি তাঁর পরিবারভুক্ত হয়ে যান, তারই গর্ভে নবীপুত্র হযরত ইবরাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। অপর দাসীর নাম ছিল শিরীন, যাকে তিনি হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা)-কে দিয়ে দেন। আর খচ্চরটির নাম ছিল দুলদুল।

মকৃকাস নবী (সা)-এর দূতকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন, তাঁর পত্রকে খুবই সম্মান করেন এবং শপথ করে বলেন, নিঃসন্দেহে ইনি সেই নবী, যাঁর সুসংবাদ পূর্ববর্তী নবী (আ)-গণ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ঈমান আনয়ন করেন নি, খ্রিস্টধর্মের উপর অবিচল থাকেন। হযরত হাতিব ইবন আবূ বালতাআ (রা) নবী সকাশে পৌঁছে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন তিনি ইরশাদ করেন, রাজত্ব ও বাদশাহীর কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি; তবে তার রাজত্ব ও বাদশাহী স্থায়ী হওয়ার নয়। সুতরাং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে মুসলমানগণ মিসর জয় করেন। (হাফিয ইবন তাইমিয়াকৃত আল-জাওয়াবুস সাহীহ, ১খ. পৃ. ৯৯-১০০;যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৪৮; রাউযুল উনুফ, ২খ. পৃ. ৩৫৫; হিদায়াতুল হিয়ারী, পৃ. ৩৩)।

ইসলামপূর্ব অবস্থায় মকৃকাসের সাথে মুগীরার সাক্ষাত

এর পূর্বে মকৃকাস হযরত মুগীরা ইবন শুবা (রা) থেকে নবী (সা) সম্পর্কে অবহিত হন। হযরত মুগীরা (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বনী মালিকের কতিপয় ব্যক্তিসহ মকৃকাসের নিকট গিয়েছিলেন। সে সময় তাদের কাছে মকৃকাস রাসূলুল্লাহ (সা)-এ অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মুগীরা (রা) বলেন, তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক ধর্ম নিয়ে এসেছেন, যা আমাদের পিতা-পিতামহের ধর্মের বিরোধী এবং সম্রাটের (মকৃকাসের) ধর্মেরও বিরোধী।

মকৃকাস : আচ্ছা, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর সাথে কী আচরণ করেছে?

মুগীরা : অধিকাংশ যুবক তাঁর অনুসরণ করেছে এবং বৃদ্ধরা বিরোধিতা করেছে। আর বিরোধীদের সাথে যুদ্ধের ঘটনাও ঘটেছে। কখনো তিনি জয়ী হয়েছেন এবং কখনো পরাজিত।

মক্কাস : তিনি কি বিষয়ের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান করেন ?

মুগীরা : সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে, আমাদের পিতা-পিতামহ যে সব মূর্তির পূজা করত, সেগুলো পরিত্যাগ করতে। তিনি মানুষকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেন।

মকূকাস : নামাযের জন্য কি কোন সময় এবং যাকাতের জন্য কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে কি ?

মুগীরা : দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন। বিশ মিসকাল স্বর্ণে অর্ধ মিসকাল অর্থাৎ সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দেন।

মকূকাস : যাকাত নিয়ে তিনি কি করেন ?

মুগীরা : ফকীর-মিসকীনের মধ্যে বন্টন করেন। এছাড়া তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং প্রতিশ্রুতি পালনের নির্দেশ দেন। ব্যভিচার, সুদ ও শারাবকে হারাম বলেন। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে যবেহ্কৃত জন্তু আহার করেন না।

মকূকাস : তিনি নিশ্চয়ই প্রেরিত নবী, সারা বিশ্বের জন্যেই তিনি প্রেরিত হয়েছেন; হযরত ঈসা (আ)-ও এ সব কাজের আদেশ দিতেন এবং তাঁর পূর্বে সমস্ত নবী (আ)-গণও এ সব কাজেরই শিক্ষা দিতেন। পরিশেষে তাঁরই জয় হবে, এমনকি কেউ তাঁর প্রতিবন্ধক থাকবে না, ভূভাগ ও জলভাগের শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁর দীন পৌঁছে যাবে।

মুগীরা : সারা দুনিয়া যদি তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তবুও আমরা তাঁর উপর ঈমান আনব না।

মকূকাস : তোমরা নির্বোধ ও বেআক্কেল, আচ্ছা, বল দেখি তাঁর বংশ মর্যাদা কেমন?

মুগীরা : সবার চেয়ে উত্তম।

মকূকাস : হযরত আম্বিয়া (আ) সব সময় সর্বোত্তম এবং সম্ভ্রান্ত বংশের হয়ে থাকেন। আচ্ছা, তাঁর সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কিছু বল।

মুগীরা : তাঁর সততা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য সারা আরব তাঁকে 'আমীন' বলে ডাকে।

মকূকাস : তোমরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা কর, এটা কি করে সম্ভব যে, তিনি বান্দাদেরকে সত্য বলেন অথচ আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলেন; এবারে বল দেখি কোন্ ধরনের লোক তাঁর অনুসরণ করে ?

মুগীরা : যুবক শ্রেণী।

মকূকাস : তাঁর পূর্বে যে সমস্ত নবী (আ) অতীত হয়েছেন, তাঁদের অনুসরণকারীদের মধ্যে অধিকাংশ যুবকই[১] ছিলেন। এর পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াসরিবের ইয়াহূদীরা তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করেছে, তারা তো তাওরাতের অনুসারী ?

মুগীরা : বিরোধিতা করেছে, তিনি তাদের মধ্যে কাউকে হত্যা করেছেন, কাউকে বন্দী করেছেন আর কাউকে দেশছাড়া করেছেন।

মকূকাস : ইয়াহূদীরা বিবাদকারী সম্প্রদায়, তারা তাঁর সাথে বিবাদ করেছে; অন্যথায় তারা আমাদের মতই তাঁকে ভালভাবে চিনেছে।

মুগীরা বলল, এ কথা শোনার পর আমরা প্রাসাদের বাইরে এলাম। মনে মনে বললাম, আজমের বাদশাহ্ পর্যন্ত তাঁকে সত্য বলেন, অথচ তিনি তাঁর থেকে অনেক দূরে। আর আমরা তো তাঁর আত্মীয় এবং প্রতিবেশী, আমরা এখন পর্যন্ত তাঁর দীনে প্রবেশ করলাম না অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের ঘরে এসে আহ্বান জানিয়েছেন। এ কথা আমার মনে প্রভাব ফেলল এবং আমি ইসকান্দারিয়াতেই রয়ে গেলাম। সেখানে এমন কোন গীর্জা ছিল না, যেখানে আমি যাইনি এবং যেখানকার পাদ্রীদেরকে শেষনবীর মর্যাদা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। এমনকি আমি তাদের 'উসকুফে আযম' (বড় পাদ্রী)-র সাথেও সাক্ষাত করেছি, যিনি বড়ই ইবাদতকারী ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। মানুষ রোগীদেরকে দু'আর জন্য বড় পাদ্রীর কাছে নিয়ে আসত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা কোন নবীর আগমন কি বাকী আছে ? তিনি জবাব দিলেন :

---

১. কেননা বৃদ্ধদের চরিত্র ও অভ্যেস মযবূত ও দৃঢ় হয়ে যায়। তাদের জন্য নিজের অভ্যাস ও চর্চা ত্যাগ করা বড়ই কঠিন হয়। ان الغصون اذا الانيتـها اعتدلك ولن يلين اذ الانيته خشب গাছের ডালপালা যতক্ষণ নরম থাকে, ততক্ষণ তাকে সোজা করা যায়, কিন্তু কাঠ (লাকড়ি) হয়ে যাওয়ার পর তাকে সোজা করা অসম্ভব। এটাই কারণ যে, মক্কার বেশির ভাগ যুবক নবূয়াতের প্রারম্ভে ইসলাম গ্রহণ করেন আর কুরায়শের নেতা ও সর্দারেরা মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) একবার আগমন করেন আর নবযুবাদের একটি দল উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁর চারপাশে বসে পড়ে। সে পথে অতিক্রমকারী জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে নব যুবকদের একত্র হওয়া দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনার চারপাশে এ নওজোয়ানদের সমাবেশ কিরূপ ? তিনি বললেন : هل الخير الا فى الشباب (যুবক ছাড়া আর কার মধ্যে কল্যাণ আছে), তারা উপদেশ গ্রহণ করে। একটু পর বললেন, তুমি কি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনেছ : قالوا سمعنا فانى يذكر هم يقال له ابراهيم انه فتية امنوا بربهم لفـتـاه اتنا غدا نا "আর আল্লাহ তা'আলা কোন নবীকে কখনই নবী করে প্রেরণ করেন নি, যতক্ষণ না তিনি যুবক হয়েছেন," (অর্থাৎ চল্লিশ বছরে উপনীত না হয়েছেন); যেমন আল্লাহর বাণী : اذا بلغ اشده اربعين سنة (যখন তার বয়স পূর্ণ হলো এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হলো)। যেমনটি ইমাম শা'রানীকৃত তানবীহুল মুফতারীন গ্রন্থে (পৃ. ৩০) রয়েছে।

نعم هو اخر الانبياء ليس بينه وبين عيسى بن مريم احد وهو نبى مرسل وقد امرنا عيسى باتبعه وهو النبى الامى العربى اسمه احمد ليس بالطويل ولابعض ولا بالادم يعض شعره ويليس ما غلظ من الثياب ويجتزئ بما لقى من الطعام سيفه على عاتقه ولايبالى بمن لاقى يباشر القتال بنفسه ومعه اصحابه يغدونه بانفسهم هم له اشد حبا من اولادهم يخرج من ارض حرم ويأتى الى حرم يهاجر الى ارض سباخ ونخل بدين ابراهيم عليه السلام ·

"হ্যাঁ, সর্বশেষ নবী, তাঁর এবং হযরত ঈসা (আ)-এর মাঝে আর কোন নবী নেই, তিনি প্রেরিত নবী। হযরত ঈসা (আ) আমাদেরকে তাঁর অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। তিনিই উম্মী নবী, আরাবী, নাম তাঁর আহমদ; তিনি অতি দীর্ঘও নন, বেঁটেও নন, বরং মধ্যম আকৃতির। চোখে তাঁর লালচে আভা, না পূর্ণ সাদা আর না পূরো হলদেটে। তাঁর কেশ হবে অধিক, তিনি মোটা কাপড় পরিধান করবেন। যতটুকু খাদ্য নসীবে জুটবে, তাতেই সবর ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। তাঁর কাঁধে তরবারি থাকবে। কারো মুকাবিলায় পরোয়া করবেন না। তিনি নিজেই যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ করবেন। সাহাবিগণ তাঁর সাথে থাকবেন, যাদের জান-প্রাণ থাকবে তাঁর প্রতি নিবেদিত। নিজেদের সন্তান অপেক্ষা তাঁকে ভালবাসবেন। ঐ নবী মক্কার হেরেমে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং খেজুর বাগান শোভিত অপর হেরেমে হিজরত করবেন। তিনি হবেন ইবরাহীম (আ)-এর দীনের অনুসারী।"

মুগীরা (রা) বললেন, আমি তাকে বললাম, তাঁর আরো কিছু গুণ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তিনি স্বাধীন বান্দা হবেন, নিজের চারপাশ এবং অঙ্গসমূহ ধৌত করবেন অর্থাৎ উযূ করবেন। তাঁর পূর্বে যত নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা কেবল আপন সপ্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, আর ইনি সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত হবেন, সমগ্র যমীন হবে তাঁর জন্য মসজিদ (নামাযের স্থান) ও পবিত্র। যেখানে নামাযের সময় হবে, পানি না পাওয়া অবস্থায় সেখানে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবেন। বনী ইসরাঈলের মত গীর্জামুখী হবেন না যে, গীর্জা ছাড়া কোথাও নামায শুদ্ধ হবে না।

মুগীরা (রা) বলেন, এ সমুদয় কথাই আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম ও মনে রাখলাম। ফিরে এসে হযরতের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামের গণ্ডিতে শামিল হলাম।[১]

---

১. ইবন তাইমিয়াকৃত আল-জাওয়াবুস সাহীহ, ১খ. পৃ. ১০১-১০৩; খাসাইসুল কুবরা, ২খ. পৃ. ১২।

৫. বাহরায়নের বাদশাহ মুনযির ইবন সাবীর প্রতি পত্র

রাসূল (সা) হযরত আলা ইবন হাযরামী (রা)-কে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র[১] সহ মুনযির ইবন সাবীর নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আলা ইবন হাযরামী (রা) বলেন, আমি যখন নবীজির পত্র নিয়ে মুনযিরের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তাকে বললাম, ওহে মুনযির, পৃথিবীতে তো আপনি খুবই জ্ঞানী ও চালাক ব্যক্তি, আখিরাতে কেন নির্বোধ ও লজ্জিত হবেন ? মজূসিয়ত (অগ্নিপূজা) খারাপ ধর্ম, না এতে আরবের মত মর্যাদা ও মাহাত্ম আছে, আর না আহলে কিতাবের মত জ্ঞান। এ ধর্মাবলম্বীরা ঐ স্ত্রীলোকদের বিবাহ করে, যাদের উল্লেখ করতেই লজ্জা হয়। তারা ঐ সব জিনিস খায়, যা সুস্থ মেজাজের মানুষ ঘৃণা করে। দুনিয়ায় তারা ঐ আগুনের পূজা করে আখিরাতে যা তাদেরকে জ্বালাবে। ওহে মুনযির, আপনি নির্বোধ ও নাদান নন, আপনি খুব চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন, যে সত্তা কখনো মিথ্যে বলেন না, তাঁকে সত্যায়ন করতে ও সত্য বলতে আপনার অসুবিধা কি? যে সত্তা কখনো অপচয় করেন নি, তাঁকে আমীন মানতে এবং যে সত্তা কখনো কথার খেলাফ করেননি, তাঁর প্রতি আস্থা পোষণ করতে ও ভরসা রাখতে ইতস্তত ও ভাবনা কেন? তাঁর বরকতময় সত্তা যদি এমনই হয়, আর নিঃসন্দেহে তা এমনই, তবে আপনি বুঝে নিন যে, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবী এবং তাঁর রাসূল (সা)। আর তিনি এমনই রাসূল, যে বিষয়ে তিনি আদেশ করেছেন, সে বিষয়ে এমন কোন বুদ্ধিমান ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তি এমন নেই, যে বলতে পারবে, আহ, যদি তিনি এ বিষয়ে নিষেধ করতেন! আর যে বিষয়ে তিনি নিষেধ করেছেন, সে বিষয়ে কোন বুদ্ধিমান ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তি এমন নেই, যে বলতে পারবে, আহ্, যদি তিনি এ বিষয়ে আদেশ করতেন! অথবা যে বিষয়ে তিনি যে সীমা পর্যন্ত ক্ষমা করেছেন, তার চেয়ে বেশি মাফ করতেন! অথবা যে অপরাধে তিনি যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, তাতে কিছুটা কম করতেন! বা এ জন্যে যে, হযরতের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ এবং বাণী প্রত্যেক জ্ঞানবান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির চূড়ান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষারই অনুরূপ।

মুনযিরের জবাব

মুনযির বললেন, আমি যে ধর্মে আছি, সে ধর্মের উপর চিন্তা করলাম, তখন এটাকে কেবল পার্থিব ধর্ম হিসেবে পেলাম, আখিরাতের জন্য নয়; আর তোমাদের ধর্ম নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলাম, তখন তা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্যই পেলাম। কাজেই আমার এ দীন গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা কি আছে যে, যা কবূল করলে দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুকালীন আরাম উভয়ই অর্জিত হয় ? এ যাবত আমি

---

১. রিওয়ায়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, তিনি মুনযির ইবন সাবীর নামে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র লিখেছেন, কিন্তু অনেক তত্ত্ব তালাশ করেও এ পত্রের বাক্যাবলী জানা যায়নি। যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৫১।

ঐ ব্যক্তির জন্য আশ্চর্য হয়েছি, যে দীন (ইসলাম) কবূল করেছে ; আর এখন আমি ঐ ব্যক্তির জন্য আশ্চর্যবোধ করি, যে এ সত্য ধর্মকে রদ করে দেয়।

মুনযির সাবীর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক প্রেরিত পত্রের জবাব

মুনযির মুসলমান হলেন এবং নবীজির পত্রের এ জবাব[১] লিখলেন :

اما بعد يا رسول الله فانى قرأيت كتابك على اهل البحرين فمنهم من احب الاسلام واعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وبارضى يهود ومجوس فاحدث الى فى ذلك امرك ۰

"ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমি আপনার পত্র বাহরায়নবাসীকে শুনিয়েছি। কেউ কেউ ইসলাম পসন্দ করেছে এবং তা গ্রহণ করেছে আর কেউ কেউ তা অপসন্দ করেছে। আমার দেশে ইয়াহূদী ও অগ্নিপূজক বাস করে, তাদের ব্যাপারে আপনার নির্দেশ জানাবেন।"

জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে এ পত্র লিখিয়ে পাঠালেন :

بسم الله الرّحمن الرّحيم – من محمّد بن عبد الله الى المنذر بن ساوى ، سلام عليك فانى احمد اليك الله لا اله الا هو واشهد ان محمدا رسول الله اما بعد فانى اذكرك الله عز وجل فانه من ينصح فانها ينصح لنفسه وانه من يطع رسلى ويتبع امرهم فقد اطاعنى ومن نصح لهم فقد نصلح لى موافق رسلى قد انثوا عليك خيرا وانى قذشفعتك فى قومك فاترك للمسلمين ما اسلموا عليك وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن نمز لك عن عهد لك ومن افام على يهوديته او مجوسيج فعليه الجزية ۰

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মুনযির ইবন সাবী-র প্রতি, আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনাকে ঐ আল্লাহ পাকের প্রশংসা পৌঁছাচ্ছি, যিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। অতঃপর আমি আপনাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ ও কল্যাণ কামনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজের প্রতিই সুধারণা পোষণ ও কল্যাণ কামনা করল। আর যে আমার দূতদের আনুগত্য করল এবং তার কথার অনুসরণ করল, প্রকৃতপক্ষে সে আমার আনুগত্য ও অনুসরণ করল। আমার দূত যদি আপনার সুনাম ও প্রশংসা করে, তা হলে আমি আপনাদের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আপনাদের সুপারিশ গ্রহণ করব। কাজেই, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের ব্যাপার তাদের উপরই ছেড়ে দিন, যার ভিত্তিতে তারা

১. আল-জওয়াবুস সাহীহ, ১খ. পৃ. ১১৩।

ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর অপরাধীদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছি তাদের নিকট থেকে ইসলাম অথবা তাওবা গ্রহণ করুন। যতদিন আপনি সঠিক পথে থাকবেন, আমি আপনাকে ইপনার পদ থেকে বরখাস্ত করব না। আর যারা ইয়াহূদী অথবা মজূসী ধর্মের অনুসারী, তাদের জন্য জিযয়া।"[১]

৬- আম্মানের বাদশাহর নামে পত্র

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم – من محمّد بن عبد اللّٰه ورسوله الى جيفر عبد ابنى الجلندى ، سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلما تسلما فانى رسول اللّٰه الى الناس كافة لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وانكما ان اقررتها بالاسلام وليتكما وان ابتما ان تقرا بالاسلام فان ملككما زائل عنكما وخيلى تحل باحتكم وتظهر بنوتى على ملككما ۰

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে জালান্দীর পুত্র জায়ফার ও আবদ-এর প্রতি। সত্যের অনুসারীদের প্রতি আমার সালাম। অতঃপর, আমি আপনাদের উভয়কে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। এ জন্যে যে, আমি সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল, যেন আমি জীবিতদের, আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করতে পারি,[২] আর কাফিরদের প্রতি আল্লাহর প্রমাণ দৃঢ় হয়। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে আপনাদের রাজত্ব অব্যাহত থাকবে। অন্যথায় ধরে নিন আপনাদের রাজত্ব অচিরেই হাতছাড়া হতে পারে এবং আমার বাহিনী আপনাদের গৃহের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। আমার দীন আপনাদের সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী থাকবে।"[৩]

অষ্টম হিজরীর যিলকদ মাসে মহানবী (সা) হযরত আমর ইবন আস (রা)-কে এ পত্রসহ জালান্দীর পুত্র আবদ এবং জায়ফারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। হযরত আমর ইবন আস (রা) বলেন, আমি হযরতের পত্র নিয়ে আম্মানে গিয়ে উপস্থিত হই। প্রথমে আবদ-এর সাথে সাক্ষাত হয়, যিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সহনশীল ও সৎকর্মশীল। তাকে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দূত, রাসূল (সা) আমাকে এ পত্র সহ আপনি এবং আপনার ভাই সমীপে পাঠিয়েছেন। আবদ বললেন, বড় নেতা ও বাদশাহ তো আমার বড় ভাই জায়ফার, আমি তোমাকে তার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেব। এ পত্র তাঁর সামনে পেশ করবে। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তোমরা আমাদেরকে কোন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছ?

---

১. যাদুল মা'আদ, ৩খ. পৃ. ৬১-৬২; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৫১।

২ অর্থাৎ যাদের অন্তরে জীবিত বা জীবিতের নমুনা অবশিষ্ট আছে; অন্যথায় যাদের অন্তর সম্পূর্ণ মরে গেছে, তাদেরকে সত্যের পথে ভীতি প্রদর্শন করা বা না করা উভয়ই সমান।

৩. যাদুল মা'আদ, ৩খ. পৃ. ৬১-৬২; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৫২।

আমর ইবন আস : এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দিতে।

আবদ : ওহে আমর ইবন আস, তুমি তো তোমাদের কওমের সর্দারের পুত্র, বল, তোমার পিতা কি করেছেন; আমরা তারই অনুসরণ করব।

আমর ইবন আস : আমার পিতা মারা গেছেন, নবীর প্রতি ঈমান আনেন নি। আমার আশা ছিল, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং তাঁকে সত্য রাসূল মানতেন, কতই না ভালো হতো। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলাম, কিন্তু তা হয়নি। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেই ইসলামের হিদায়াত ও সামর্থ্য দান করে ধন্য করেছেন।

আবদ : তুমি কখন মুসলমান হয়েছ ?

আমর ইবন আস : অল্প কিছুদিন হলো।

আবদ : কোথায় মুসলমান হয়েছ ?

ইমর ইবন আস : আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশীর হাতে[১]; আর নাজ্জাশীও মুসলমান হয়েছেন।

আবদ : নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণের পর তার প্রজারা তার সাথে কিরূপ আচরণ করেছে?

আমর ইবন আস : পূর্বের মতই তার শাসন অব্যাহত রাখে এবং তার অনুগত ও অনুসারীই থেকেছে।

আবদ : পাদ্রী ও খ্রিস্টান দরবেশেরা কি করেছে ?

আমর ইবন আস : সবাই তার আনুগত্য স্বীকার করেছে।

আবদ : ওহে আমর, চিন্তা-ভাবনা করে বলছ তো, ভাল করে মনে রেখো যে, মিথ্যে বলার চেয়ে বেশি খারাপ আর কোন অভ্যেস নেই এবং মিথ্যে অপেক্ষা মানুষকে অপদস্থকারী আর কোন বস্তু নেই।

আমর ইবন আস : অবাস্তব ও অসম্ভব, আমি মিথ্যে বলছি না, আর আমাদের ধর্মে মিথ্যে বলা অবৈধ।

আবদ : জানি না, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের খবর জানেন কি না।

আমর ইবন আস : নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের খবর হিরাক্লিয়াসের জানা আছে।

আবদ : তুমি জানলে কি করে ?

আমর ইবন আস : নাজ্জাশী রোম সম্রাটকে খাজনা দিতেন, মুসলমান হওয়ার পর খাজনা দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আল্লাহর কসম, রোম সম্রাট যদি

১. আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, একজন সাহাবী তাবিঈর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন ! এজন্যে যে, হযরত আমর ইবন আস সাহাবী ছিলেন আর নাজ্জাশী ছিলেন তাবিঈ। যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৫২।

আমার কাছে একটি দিরহামও চান, তবে তাও আমি দেব না। রোম সম্রাটের কাছে যখন নাজ্জাশীর এ বক্তব্য পৌঁছে, তখন তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান। রোম সম্রাটের নীরবতা দেখে তার ভাই নিয়াক রাগান্বিত হয়ে বললেন, আপনি কি আপনার ঐ দাস অর্থাৎ নাজ্জাশীকে এমনিতেই ছেড়ে দিচ্ছেন, যে খাজনাও দেবে না এবং আপনার ধর্ম ছেড়ে নতুন দীন গ্রহণ করেছে ? সম্রাট বললেন, নাজ্জাশীর এ অধিকার আছে যে, সে যে ধর্ম ইচ্ছা, গ্রহণ করতে পারে। সে ঐ ধর্ম পসন্দ করেছে। আল্লাহর কসম, আমার যদি নিজ রাজত্বের (হারানোর) ভয় না থাকত, তা হলে আমিও ঐ দীনটি গ্রহণ করতাম।

আবদ : অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে, ওহে আমর, কি বলছ ?

আমর ইবন আস : আল্লাহর কসম, আমি সম্পূর্ণ সত্য বলছি।

আবদ : আচ্ছা, বল তো, তোমাদের পয়গাম্বর কিসের কিসের আদেশ করেন এবং কোন কোন বিষয়ে নিষেধ করেন ?

আমর ইবন আস : সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে পাপাচার এবং নাফরমানী করতে নিষেধ করেন; সৎকাজ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেন, অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার এবং মদ্যপান, মূর্তিপূজা ও ক্রুশ পূজা থেকে নিষেধ করেন।

আবদ : কতই না উত্তম দাওয়াত এবং কতই না সুন্দর শিক্ষা, আহা, যদি আমার ভাই আমার সাথে একমত হতেন, এবং দু'ভাই একত্রে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতে পারতাম, তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ও তাঁকে সত্যায়ন করতে পারতাম ! কিন্তু সম্ভবত আমার ভাই তার রাজত্ব রক্ষার স্বার্থে এ ব্যাপারে ইতস্তত করবেন।

আমর ইবন আস : তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তা হলে রাসূল (সা) তার বাদশাহী যথারীতি বহাল রাখবেন এবং নির্দেশ দেবেন, আপন সপ্রদায়ের আমীর এবং ধনী ব্যক্তির নিকট থেকে সদকা আদায় করতে আর তা নিজ সপ্রদায়ের গরীব-মিসকীনদের মাঝে বন্টন করতে।

আবদ : এটা তো খুবই উত্তম কথা; এটা বল যে, সদকার পরিমাণ কত এবং কিভাবে তা আদায় করা হবে?

আমর ইবন আস (বলেন) : আমি বিস্তারিত বললাম, স্বর্ণ ও রৌপ্যে এত এত যাকাত নেয়া হয়, উট এবং বকরিতে এত। এর পর আবদ আমাকে তার ভাই জায়ফারের সামনে উপস্থিত করে। আমি নবী (সা)-এর পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে দিলাম। মোহর খুলে তিনি পত্রটি পাঠ করলেন। আমাকে বসতে আদেশ করলেন এবং কুরায়শদের ব্যাপারে কিছু কিছু প্রশ্ন করলেন। দু'একদিন ইতস্তত করার পর জায়ফরও ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দু'ভাই মিলে একদিন নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। অনেক লোক তাদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের প্রতি জিযয়া আরোপিত হলো। (যাদুল মা'আদ,[১] ৩খ. পৃ. ৬২; হাফিয ইবন কায়্যিমকৃত হিদায়াতুল হিয়ারী, পৃ. ৩৪)।

হাফিয আসকালানী বলেন, আম্মানের প্রকৃত বাদশাহ ছিলেন এদের পিতা জালান্দী। সম্ভবত তিনি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে পুত্রদের হাতে রাজত্ব সোপর্দ করেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) জালান্দীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য হযরত আমর ইবন আস (রা)-কে প্রেরণ করেন। সম্ভবত তিনি পিতা এবং পুত্রদ্বয়কে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যেই আমর ইবন আস (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন। (যেমনটি ইসাবায় বর্ণিত হয়েছে, ১খ. পৃ. ২৬২-২৬৪, জালান্দী ও জায়ফারের জীবন চরিত, তৃতীয় ভাগ)।

আল্লামা সুহায়লী লিখেছেন, হযরত আমর ইবন আস (রা) জালান্দীকে উদ্দেশ্য করে বলেন : ওহে জালান্দী, যদিও আপনি আমাদের থেকে অনেক দূরে কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ থেকে দূরে নন। যে পবিত্র সত্তা আপনাকে কোন অংশীদার ছাড়া একাই পয়দা করেছেন, আপনি একাকী তাঁর ইবাদত করুন। আর যে বস্তু আপনাকে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর অংশীদার নয়, তাকে আল্লাহর ইবাদতে শরীক করবেন না। আর বিশ্বাস রাখুন, যে আল্লাহ আপনাকে জীবিত করেছেন, তিনিই আপনাকে মৃত্যু দেবেন এবং যিনি আপনার জণ্ডের সূচনা করেছেন, তিনিই আপনাকে মৃত্যুর পর তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেবেন। সুতরাং ঐ নবী সম্পর্কে খুবই চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এবং হিদায়াত নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছেন। যদি তিনি আপনার কাছে কোন প্রকারের বিনিময় বা সম্মানী চাইতেন, তাহলে তা থেকে বিরত থাকুন। আর যদি তাঁর কোন কথা বা কাজে তাঁর প্রবৃত্তির চাহিদা বলে সন্দেহ হয়, তবে তা বাদ দিন। এরপর তাঁর আনীত দীনের ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, তাঁর দীন মানুষের স্বৈরাচারী শক্তির অনুরূপ কি-না। যদি তাঁর শরীয়াত ও তাঁর বাণী মানব রচিত দীনের অনুরূপ হয়, তা হলে বলুন, কার অনুরূপ ? আর যদি তা মানুষের তৈরি দীনের অনুরূপ না হয়, তা হলে জানুন যে, এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার দীন। অতএব তা গ্রহণ করুন, যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়, তা পালন করুন এবং যা থেকে বেঁচে থাকতে ভীতি প্রদর্শন করেন, তাকে ভয় করুন।

জালান্দী বললেন, আমি ঐ উম্মী নবী সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করেছি। নিঃসন্দেহে তিনি এমন কল্যাণকর ও ভাল কাজেরই নির্দেশ দেন, যা তিনি পালন করেন। আর কোন খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করেন না, যা প্রথমে নিজে ত্যাগ না করেছেন। তিনি যখন আপন দুশমনের বিরুদ্ধে জয়ী হন, তখন ঔদ্ধত হন না, আর যখন পরাজিত

১. এ ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৮-তেও বর্ণিত হয়েছে। যারকানী, ৩খ. পৃ. ২৫৩।

হন, তখন হতোদ্যম হন না। তিনি ওয়াদা পূর্ণ করেন, কথা রক্ষা করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর নবী।[১] অতঃপর তিনি এ কবিতা বলেন :

اتانی عمرو بالتی لیس بعدها * من الحق شیء والنصیح نصیح

فیا عمر وقد اسلمت للّٰه جهرة * ینادی بها فی الوراین فصیح

"আমার নিকট আমর এমন বিষয় নিয়ে এলো, যার উপর কোন উপদেশমূলক বস্তু হতে পারে না; ওহে আমর! আমি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম, যে ব্যাপারে একজন শুদ্ধভাষী পণ্ডিত আমায় আহ্বান জানিয়েছেন।"

৭. ইয়ামামা প্রধান হাওযা ইবন আলীর প্রতি পত্র

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحیم – من محمّد رسول اللّٰه الی هوذة بن علی سلام علی من اتبع الهدی واعلم ان ینی سیظهر الی منتهی والخف والحافر فاسلم تسلم واجمل لك ما تحت یدیك ٠

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে হাওযা ইবন আলীর প্রতি। সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম। জেনে রাখুন, আমার দীন ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে, যতদূর পর্যন্ত উট-ঘোড়া পৌঁছতে পারে। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন এবং আপনার অধীনস্থ ভূমির উপর আপনার দখল বজায় থাকবে।"

হযরত সালীত ইবন আমর (রা) এ পত্র নিয়ে রওয়ানা হন। হাওযা তাঁর পত্র পাঠ করেন এবং হযরত সালীত (রা)-কে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন। সালীত (রা) হাওযাকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

ওহে হাওযা! পুরাতন ও জিরজিরে হাড় আপনাকে সর্দার বানিয়ে দিয়েছে। প্রকৃত সর্দার তো তিনিই, যিনি ঈমানের সম্পদে ভরপুর ও আল্লাহভীতির ভাণ্ডারের অধিকারী। আমি আপনাকে একটি উত্তম বস্তুর আদেশ করছি এবং একটি খারাপ বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার নির্দেশ দিচ্ছি এবং শয়তানের ইবাদত করতে নিষেধ করছি। আপনি যদি তা গ্রহণ করেন, তবে আপনার সমস্ত আশা পূর্ণ হবে এবং আশংকামুক্ত থাকবেন। আর যদি অস্বীকার করেন, তাহলে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য আপনাদের ও আমাদের মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে দেবে।

হাওযা বললেন, আমাকে সুযোগ দিন, একটু ভেবে দেখি। এরপর তিনি পত্রের এ জবাব লিখালেন :

ما احسن ما تدعوا الیه واجمله والعرب تهاب مکانی فاجعل الی بعض الامر اتبعك ٠

---

১. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ৩৫৬।

"যে বিষয়ের প্রতি আপনি আহ্বান করছেন, তা কতই না সুন্দর ও উত্তম ! আরব আমার শান-শওকত ও মর্যাদাকে ভয় পায়। আপনি আমাকে কিছুটা সময় দিন, আমি আপনার অনুসরণ করব।"

ফেরার পথে তিনি হযরত সালীত (রা)-কে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেন এবং হিজরের তৈরি কিছু কাপড় দেন। মদীনায় ফিরে তিনি নবী (সা)-কে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। নবীজি পত্রটি পাঠ করে বললেন, আল্লাহর কসম, সে এক বিঘত জমি চাইলে তাও দেব না, সেও ধ্বংস হয়েছে, তার দেশও ধ্বংস হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা বিজয়শেষে ফিরে আসেন, তখন জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে হাওযার মৃত্যু সংবাদ দেন। তিনি সাহাবীদেরকে এ খবর শুনিয়ে বললেন, শীঘ্রই ইয়ামামায় এক মিথ্যাবাদী আত্মপ্রকাশ করবে যে নবূয়াতের দাবি করবে এবং আমার পরে সে নিহত হবে।[১]

৮. দামেশকের আমীর হারিস গাসসানীর নামে পত্র

بسم الله الرّحمن الرّحيم - من محمّد رسول الله الى الحارث بن ابى شمر ، سلام على من اتبع الهدى وامن بالله وصدق فانى ادعوك الى ان تؤمن بالله وحده لاشريك يبقى ملكك ·

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে হ্যারিস ইবন আবূ শামারের প্রতি। সালাম সত্যের অনুসারীদের প্রতি ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আল্লাহর আদেশসমূহের সত্যায়নকারীর প্রতি। আমি আপনাকে ঐ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিচ্ছি যাঁর কোন শরীক নেই। যদি আপনি ঈমান আনয়ন করেন, তা হলে আপনার বাদশাহী অব্যাহত থাকবে।"

হযরত শুজা' ইবন ওহাব আসাদী (রা) এ পত্র নিয়ে দামেশকে উপস্থিত হন। হারিস গাসসানী তখন রোম সম্রাটকে আপ্যায়নের যোগাড়-যন্ত্রে ব্যস্ত ছিলেন। রোম সম্রাট তখন পারস্য বিয়ের শোকরানা আদায়ের জন্য হিমস থেকে পদব্রজে বায়তুল মুকাদ্দাস এসেছিলেন। কয়েকদিন অপেক্ষায় কেটে গেল কিন্তু হারিসের সাথে সাক্ষাত হলো না। [হযরত শুজা (রা) বলেন,] আমি হারিসের প্রহরীকে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দূত, বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করতে চাই। প্রহরী বলল, বাদশাহ দু'-একদিনের মধ্যেই এসে পড়বেন, সে সময় দেখা হতে পারে। প্রহরীটি ছিল রোমের বাসিন্দা এবং তার নাম ছিল মুররী। সে আমার কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা শুরু করল। আমি তাঁর অবস্থা বর্ণনা করছিলাম আর সে কেঁদে চলছিল। অবস্থাদি শুনে সে বলল, আমি ইঞ্জিল পাঠ করেছি, সেখানে তাঁর নাম

১. যাতুল মা'আদ, ৩খ. পৃ. ৬৩।

ও গুণাবলীর বর্ণনা পেয়েছি। আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম এবং তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করলাম। আমার ভয় হয় যে, হারিস আমাকে হত্যা করবে। সে আমাকে খুবই শ্রদ্ধার সাথে খাতির যত্ন করল ও মেহমানদারী করল। একদিন হারিস এসে পড়লেন। তিনি মুকুট পরিধান করে বসলেন এবং আমাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। হযরত শুজা' ইবন ওহাব (রা) নবীজির পত্রটি তার সামনে পেশ করলেন। হারিস পত্রটি পাঠ করে রুষ্ট হলেন এবং তাঁর পত্রটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, কে এই ব্যক্তি যে আমার রাজত্ব আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় ? আমি নিজেই তার কাছে যাচ্ছি। এ বলে তিনি ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানোর হুকুম দিলেন এবং এ মর্মে এটি পত্র লিখিয়ে প্রথমে রোম সম্রাটের নিকট প্রেরণ করলেন। রোম সম্রাটের জবাব এলো, তোমার ইচ্ছা মুলতবী করো। রোম সম্রাটের জবাব আসার পর হারিস হযরত শুজা' (রা)-কে ডাকালেনএবং জিজ্ঞেস করলেন, কবে ফিরে যেতে ইচ্ছে কর? তিনি বললেন, আগামীকাল ইচ্ছে করছি। হারিস তাকে একশত মিসকাল স্বর্ণ উপঢৌকন দেয়ার আদেশ করলেন। এছাড়া ঐ প্রহরীও তাকে কিছু নজরানা দিল এবং বলল, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমার সালাম পৌঁছাবেন। আমি ফিরে এলাম এবং সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, ওর রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেল। এরপর আমি তাঁর খিদমতে মুররীর সালাম বললাম এবং সে যা কিছু বলেছিল, তাও বললাম। তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে।[১]

ফায়দাসমূহ

১. বিশ্বের শাসকদের নামে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করা এ বিষয়ের প্রকাশ্য প্রমাণ যে, নবী (সা)-এর নবূয়াত কেবল আরববাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না; বরং তাঁর রিসালাত ছিল আরব-আজম, জিন্ন-ইনসান, ইয়াহূদী-খ্রিস্টান, মুশরিক-অগ্নিপূজক সবার জন্য।

রোম সম্রাট, ধর্মের দিক থেকে যিনি খ্রিস্টান ছিলেন, তিনি তাঁর নবূয়াত ও রিসালাতকে সত্য বলে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেন নি। অনুরূপভাবে মিসরের আযীয অর্থাৎ মকূকাসও যিনি ধর্মের দিক থেকে খ্রিস্টান ছিলেন, মহানবী (সা)-এর নবূয়াত ও রিসালত সম্পর্কে অবগত থাকলেও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী, তিনিও খ্রিস্টান ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। খ্রিস্টান সপ্রদায়ের কোন কোন গোত্রের ধারণা ছিল, মহানবী (সা) তো নবী ও রাসূল ঠিকই ছিলেন, তবে তা কেবল আরবের জন্যই ছিলেন, ইয়াহূদী-নাসারাদের নবী হিসেবে তাঁকে প্রেরণ করা হয়নি। তাদের এ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

যদি নবী (সা)-এর নবূয়াত ও রিসালাত শুধু আরববাসীর জন্য নির্দিষ্ট হতো, তা হলে তিনি ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকদেরকে ইসলামের দাওয়াত কেন দিলেন

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৭; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৫৬।

এবং ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের উপর জিযিয়া কেন আরোপ করলেন? ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম নাজরানের খ্রিস্টানদের উপর জিযয়া ধার্য করেন। যখন তিনি হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন, তখন আদেশ দিলেন, ইয়েমেনে যে সব ইয়াহূদী বাস করে, তাদের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট থেকে বাৎসরিক এক দীনার হিসেবে জিযিয়া আদায় করবে।

২. এ পর্যন্ত অধিকাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহ আরববাসীদের সাথে সংঘটিত হচ্ছিল, এর পরে সপ্তম হিজরীতে তিনি খায়বরের ইয়াহূদীদের সাথে জিহাদ করেন এবং অষ্টম হিজরীতে মুতা নামক স্থানে খ্রিস্টানদের সাথে মুকাবিলার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, যাতে হযরত যায়দ, হযরত জাফর এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ করেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা শীঘ্রই আসবে। এরপর নবম হিজরীতে তিনি নিজেই রোম সম্রাটের মুকাবিলা করার জন্য তাবূক নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হন, এটি তাবূক যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধ ছিল সিরিয়ার খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে, ফলে জানা গেল যে, তাঁর নবূয়াত কেবল আরবের মুশরিকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, বরং ইয়াহূদী, খ্রিস্টান এবং সমগ্র বিশ্ব তাঁর দাওয়াত ও শরীয়াত বাস্তবায়নের ক্ষেত্র ছিল; অন্যথায় যা তাঁর শরীয়াতের ক্ষেত্র ছিল না, তাদের সাথে জিহাদ অর্থহীন প্রমাণিত হতো।

৩. অধিকন্তু পবিত্র কুরআন ও ধারাবাহিকতাসম্পন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁর সাধারণ ঘোষণা ছিল : يَاأَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (ওহে লোকসকল! আমি তোমাদের সবার জন্য প্রেরিত আল্লাহর রাসূল) এবং يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (ওহে কিতাবধারিগণ, এসো এমন স্বীকৃতবাক্যের প্রতি যা তোমাদের এবং আমাদের দৃষ্টিতে অভিন্ন) এভাবে তিনি আহলে কিতাবকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

কাজেই খ্রিস্টানদের ঐ সব গোত্রের দৃষ্টিতে যদি তিনি আরবের জন্যও নবীরূপে প্রেরিত হন, তবুও তিনি নবী তো ছিলেন। নবী কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্যও প্রেরিত হলেও জ্ঞান এবং প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী (আ)-গণ তাঁদের কথা ও কাজে অবশ্যই সত্যবাদী। এটা অসম্ভব যে, নবী হবেন অথচ কোন ব্যাপারে মিথ্যে বলবেন। কাজেই খ্রিস্টানদের ঐ দলের মতে তিনি আরবদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হলেও তিনি يَاأَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (ওহে লোকসকল, আমি তোমাদের সবার জন্য প্রেরিত আল্লাহর রাসূল) এ দাবিতে অবশ্যই সত্যবাদী হবেন। সুতরাং যেহেতু তাঁকে নবী মানাই হচ্ছে, তা হলে তাঁর সাধারণ আহ্বানের বিষয়েও তিনি সত্যবাদীই ছিলেন, এটা মানতে হবে।

খায়বরের যুদ্ধ (সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাস)

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ ۔

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন প্রচুর গনীমতের, যা তোমরা গ্রহণ করবে, এটা আমার নিয়ামত, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে শীঘ্রই দেবেন।" (সূরা ফাতহ : ২০)

হযরত (সা) যখন হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে সূরা ফাতহ নাযিল হয়, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমানের জন্য এবং বিশেষভাবে 'বায়'আতে রিদওয়ানে' অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের সাথে এ ওয়াদা করেন যে, তোমরা অনেক বিজয় অর্জন করবে এবং প্রচুর গনীমত লাভ করবে। আর কার্যত এ বায়'আতুর রিদওয়ানের পুরস্কার স্বরূপই খায়বর বিজয় দান করেন এবং মক্কা বিজয়, যা এখনো নাগালের বাইরে, মনে করো তাও তোমরা পেয়ে গিয়েছ। আর ভবিষ্যতে আরো বিজয় তোমাদের অর্জিত হবে, যা তোমাদের জানা আছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ বাক্যটি দ্বারা খায়বর বিজয়ই বুঝানো হয়েছে এবং অনুরূপভাবে পূর্বোক্ত আয়াত وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا দ্বারাও খায়বারই উদ্দেশ্য।

কাজেই তিনি হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হন এবং যিলহজ্জ ও মুহাররম মাসের প্রথমভাগ মদীনাতেই অবস্থান করেন। এর মধ্যে মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়, খায়বারের উপর চড়াও হতে, যেখানে বিশ্বাসঘাতক ইয়াহূদীদের আবাস ছিল। যারা চুক্তি ভঙ্গ করে আহযাব যুদ্ধে মক্কাস্থ কাফিরদেরকে মদীনায় আক্রমণ করতে এনেছিল। আর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-কে এ সংবাদ দেন যে, খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ পেয়ে মুনাফিকরাও আপনার নিকট দাবি করবে, আমরাও আপনার সাথে এ সফরে যাব। আর আল্লাহর আদেশ হলো, তারা যেন কোনমতেই আপনার সাথে সফরে না যেতে পারে। অতঃপর তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয় :

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۔

"তোমরা যখন গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও, ওরা আল্লাহর ওয়াদা পরিবর্তন করতে চায়। বল, তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন : ওরা অবশ্যই বলবে, তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। বস্তুত ওদের বোধশক্তি সামান্য।" (সূরা ফাতহ : ১৫)

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় কয়েকদিন অবস্থানের পর সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসের শেষদিকে চৌদ্দশত পদাতিক ও দুইশত অশ্বারোহী বাহিনীসহ খায়বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং পবিত্র সহধর্মিণীগণের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫২ ও যারকানী, ২খ. পৃ. ২১৭)।

সহীহ বুখারীতে হযরত সালমা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, [(তিনি বলেন) রাত্রিকালে যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, তখন প্রসিদ্ধ কবি আমের ইবন আকওয়া রাজায ছন্দের এ কবিতা পড়তে পড়তে আমাদের আগে আগে চলছিলেন :

اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

"আয় আল্লাহ্, আপনি যদি হিদায়াত দান না করতেন তা হলে আমরা কখনো হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না, এবং না আমরা সাদকা প্রদান করতাম আর না নামায আদায় করতাম।

فَاعْفُوْا فِدَاءَ لَكَ مَا اَلْقَيْنَا * وَاَلْقِيْنَ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

"আয় আল্লাহ, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বস্ত ও আত্মোৎসর্গকৃত, আমাদের দ্বারা অন্যায় যা কিছু হয়েছে, তা মাফ করে দিন এবং বিশেষ নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতা আমাদের প্রতি নাযিল করুন যাতে আত্মার স্বস্তি ও শান্তি অর্জিত হয় এবং সব ধরনের অশান্তি ও অস্থিরতা অন্তর থেকে দূর হয়ে যায়।

وَثَبِّتِ الْاَقْدَامِ اِنْ لاَقَيْنَا * وَبَالصَّيَاحِ عَوَلُوا علينا انَّا اذا صيح بِنَا اتَيْنَا

"আর শত্রুপক্ষের সাথে মুকাবিলার সময় আমাদেরকে অবিচল রাখুন; আমাদেরকে যখন জিহাদ ও লড়াইয়ের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আমরা দৌড়ে সেখানে উপস্থিত হই। আর আহ্বান করে আমাদের সাহায্য চাওয়া হয়।" (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫৭)।

'মুসনাদে আহমদে' ঐ রাজাযে এতে আরো কয়েক পংক্তি ছিল, তা এই :

اِذَا اَرَدُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا * اِنَّ الَّذِيْنَ قَدْ بَغُوْا عَلَيْنَا

"নিশ্চয়ই যে সমস্ত লোক আমাদের প্রতি যুলম-অত্যাচার করেছে, যখন তারা আমাদেরকে কুফর ও শিরকের কোন ফিতনায় জড়িয়ে ফেলার ইচ্ছে করে তখন তা আমরা গ্রহণ করি না।

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

"আয় পরোয়ারদিগার, আমরা আপনার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নিরাসক্ত ও অমুখাপেক্ষী নই।" (এ শেষোক্ত রাজাযটি মুসলিমেও বর্ণিত আছে)।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এ 'হুদি' পাঠকারী কে ? লোকেরা বললেন, আমের ইবন আকওয়া। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।' আর 'মুসনাদে আহমদে'র বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন।' আর রাসূল (সা) যখন খাসভাবে কারো জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতেন, তবে সেই ব্যক্তি অবশ্যই শহীদ হয়ে যেতেন। এ প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা) আরয করলেন, আয় আল্লাহর নবী, তার জন্য তো জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল! আহ, যদি আপনি আরো কিছুদিন আমরের বীরত্ব দ্বারা (ইসলামের উন্নয়নকল্পে) আমাদেরকে সম্পদশালী ও উপকৃত হতে দিতেন! (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫)।

অতঃপর যখন তারা পথে একটি উচ্চ স্থানে উপনীত হলেন, সাহাবিগণ তখন উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, নিজেদের প্রতি অনুগ্রহ কর, তোমরা কোন বধির বা অদৃশ্যকে ডাকছ না; তোমরা তো ঐ মহান সত্তাকে ডাকছ, যিনি শ্রোতা ও সন্নিকটবর্তী এবং সব সময় তোমাদের সাথেই আছেন। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, আমি তাঁর বাহনের কাছেই ছিলাম, তিনি আমাকে لاحول ولاقوة الا بالله পাঠ করতে শুনে আবদুল্লাহ ইবন কায়স,[২] বলে আহ্বান করলেন। আমি বললাম 'লাব্বইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' (ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি উপস্থিত)। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারের কথা বলব না? আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোন, কেন বলবেন না, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন : لاحول ولاقوة الا بالله [৩] অর্থাৎ এই কালেমা জান্নাতের ভাণ্ডার (বুখারী)।

---

১. আর এক রিওয়ায়াতে ما القينا এর পরিবর্তে مَا اَبْقَيْنَا শব্দ উল্লেখ আছে। অর্থাৎ যে সমস্ত গুনাহ আমাদের যিম্মায় অবশিষ্ট আছে, যা জন্য আমরা তাওবা করিনি, তা মাফ করে দিন। এ জন্যে যে, সত্যিকারের তাওবা করলে তো আমলনামা থেকে গুনাহ মুছে দেয়া হয়, তাওবার পর গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না; যেমন হাদীসসমূহে এসেছে। আর এক রিওয়ায়াতে ما لقينا শব্দ এসেছে, অর্থাৎ আয় আল্লাহ যে সমস্ত গুনাহ আমরা করেছি, তা মাফ করুন।

২. এটা ছিল তার নাম, আর আবূ মূসা আশআরী ছিল উপনাম।

৩. এর অর্থ এই যে, আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া বান্দা তার গুনাহ থেকে কখনই বাঁচতে পারে না এবং বান্দার কোন প্রকার আনুগত্য ও সৎকর্ম করার কোনই শক্তি নেই বরং আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্য ও শক্তিই তার শক্তি। আর প্রকাশ থাকে যে, নিজের সামর্থ্য ও শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আল্লাহর সামর্থ্য, তাঁর শক্তি, তাঁরই সাহায্য-সহযোগিতা, তাঁরই প্রদত্ত সামর্থ্য ও হিদায়াতের প্রতি দৃষ্টি রাখাই উচ্চ পর্যায়ের আত্ম সমর্পণ ও আনুগত্য, যা জান্নাতের ভাণ্ডার। আর যে বস্তু ভাণ্ডারে থাকে, তা লুক্কায়িত ও গোপন হয়ে থাকে। এ কারণে এর বিনিময় ও সওয়াব কোন হাদীসে উল্লেখ নেই। যেহেতু তা ভাণ্ডারের বস্তু ছিল, তাই لاحول ولاقوة الا بالله এর বিনিময়ও গোপন রাখা হয়েছে।

যেহেতু এটা জানা ছিল যে, গাতফান গোত্র খায়বারের ইয়াহূদীদের সাহায্যার্থে সেনা সমাবেশ করেছে, এ জন্যে তিনি মদীনা থেকে অগ্রসর হয়ে রাজী' নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন, যা ছিল খায়বার এবং গাতফানের মধ্যবর্তী এলাকায়। যাতে গাতফানের ইয়াহূদীরা ভীত হয়ে খায়বারের ইয়াহূদীদের সাহায্য পাঠাতে না পারে। সুতরাং গাতফানের ইয়াহূদীরা যখন বুঝতে পারল যে, তাদের নিজেদের জীবনই আশঙ্কার মধ্যে, তখন তারা ফিরে গেল। (ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৮৫)।

যখন খায়বারের নিকটে পৌঁছে গেলেন, তখন সাহাবাগণকে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন এবং এ দু'আ করলেন :

اللّهم رب السموت وما الظللن ورب لارضين وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما اذرين فانا نسألك خير هذه القرية وخير اهلها وخير ما فيها ونعوذبك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها اقدموا بسم اللّه ·

তাঁর পবিত্র অভ্যেস ছিল, যখন কোন জনপদে প্রবেশ করতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন। (ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৮৫)।

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা খায়বারে উপস্থিত হন। তাঁর পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি রাত্রিকালে কারো প্রতি আক্রমণ করতেন না, বরং প্রভাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। যেখানে ফজরের আযান শুনতে পেতেন, সেখানে আক্রমণ চালাতেন না; অন্যথায় আক্রমণ চালাতেন। প্রভাত হতেই ইয়াহূদীরা নিজেদের কোদাল ও অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম নিয়ে নিজেদের কাজে বেরিয়ে পড়ল। তাঁর সেনাবাহিনী দেখেই তারা তারা বলল, محمد والخميس অর্থাৎ 'মুহাম্মদ তাঁর সমস্ত সেনা-সামন্ত নিয়ে এসে পড়েছেন।'

সেনাবাহিনীকে খামীস এ জন্যে বলা হয় যে, এতে পাঁচটি অংশ থাকে مقدمه اميمنه ميسره قلب ساقه। তিনি ওদের দেখে দু'আ করার উদ্দেশ্যে উভয় হাত উঠালেন এবং বললেন : اللّه اكبر خرجت خيبر انا اذا انزلنا الساحة قوم فساء صباح المنذرين (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫৯)।[1]

খায়বারে ইয়াহূদীদের অনেকগুলো দূর্গ ছিল। ইয়াহূদীরা তাঁকে দেখামাত্র স্ত্রী-পরিজন নিয়ে দূর্গের নিরাপদ অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল। তিনি দূর্গসমূহের ওপর আক্রমণ চালিয়ে একের পর এক দখল করে নেন।[2]

---

১. সহীহ বুখারীর কিতাবুস সালাতে তিনবার আল্লাহু আকবর এবং তিনবার এ বাক্যাবলী পাঠ করার কথা উল্লেখ আছে। যারকানী, ২খ. পৃ. ২২৩।

২ ইবনহিশাম, ২খ. পৃ. ১৮৫; উয়ূনুল আসার, ২খ. পৃ. ১৩২; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫৮।

১. নাঈম দূর্গ

সর্ব প্রথম তিনি জয় করেন নাঈম দূর্গ। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) ঐ দূর্গের নিচে ছিলেন, ইয়াহূদীরা উপর থেকে তার উপর যাঁতার একটি চাক্কি ফেলে দেয়। এতে তিনি শহীদ হয়ে যান।

২. কামূস দূর্গ

নাঈমের পর কামূস দূর্গ দখল করা হয়। এ দূর্গটি খায়বারের অন্যান্য দূর্গ অপেক্ষা সুরক্ষিত ছিল। যখন এ দূর্গ ঘেরাও করা হল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা ব্যথার কারণে ময়দানে আসতে পারেননি। ফলে পতাকা দিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে প্রেরণ করেন। পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেও দূর্গটি দখল করা গেল না, কাজেই সবাই ফিরে এলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি হযরত ফারুকে আযম (রা)-কে পতাকা দিয়ে প্রেরণ করলেন। হযরত উমর (রা)-ও পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু জয়লাভ করা ছাড়াই ফিরে এলেন। [আহমদ,[১] নাসাঈ, ইবন হিব্বান ও হাকিমে হযরত বুরায়দা ইবন খুসায়ব (রা) সূত্রে বর্ণিত]।

এ দিন হযরত (সা) ইরশাদ করেন, আগামীকাল এমন ব্যক্তির হাতে পতাকা অর্পণ করব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং তাঁরাও তাকে ভালবাসেন। আর তার হাত দিয়েই আল্লাহ এ বিজয় অর্জন করাবেন।

প্রত্যেক ব্যক্তিই উৎসুক ছিলেন যে, দেখা যাক, এ সৌভাগ্য কার নসীবে জোটে। এ কল্পনা জল্পনায় সারা রাত কেটে গেল। প্রভাত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডাকালেন। হযরত আলীর চোখ সে সময় অসুখে আক্রান্ত ছিল। আলী (রা)-কে ডেকে হযরত (সা) তার চোখে মুখের থুথু লাগিয়ে দেন এবং তার জন্য দু'আ করেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ভাল হয়ে গেল। মনে হলো তার চোখে কোন সময় কোন অসুখ ছিল না। আর তার হাতে পতাকা দিয়ে এ উপদেশ দিলেন যে, যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে আর আল্লাহ্ তা'আলার হকসমূহের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করবে। আল্লাহর কসম, যদি এক ব্যক্তিকেও আল্লাহ তা'আলা তোমার মাধ্যমে হিদায়াত নসীব করেন, তা হলে তা তোমার জন্য লাল বর্ণের বহু সংখ্যক উট পাওয়া অপেক্ষাও উত্তম হবে। হযরত আলী (রা) পতাকা নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং তার হাতেই দূর্গের পতন ঘটে। (বুখারী)[২]

ইয়াহূদীদের প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বীর পাহলোয়ান মারহাব নিম্নোক্ত কবিতা আওড়াতে আওড়াতে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসে :

---

১. হায়সামী বলেন, হাদীসটি আহমদ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তার বর্ণনাকারিগণ বিশুদ্ধ বর্ণনাকারী; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ. ১৫০; এ ছাড়া হকিম তার ইকলীলে, আবূ নুয়াইম তার দালাইলে এবং ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৬৫-তে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৬৫।

قد علمت خيبر انى مرحب * شاك السلاح بطل مجرب

"খায়বরবাসীদের খুবই জানা যে, আমি মারহাব অস্ত্রবাজ বাহাদুর এবং এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।"

হযরত আমের ইবন আকওয়া (রা) তার মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে এ রওয়ায আবৃত্তি করতে করতে বেরিয়ে এলেন :

قد علمت خيبر انى عامر * شاكى السلاح بطل مغامر

আমের (রা) তার পায়ে তরবারির আঘাত করতে উদ্যত হলে তরবারি ফিরে এসে তারই কণ্ঠদেশে আঘাত হানে। ফলে তিনি ইনতিকাল করেন। হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, ফেরার পথে আমাকে চিন্তিত দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি আরয করলাম, মানুষের ধারণা আমের-এর সৎকর্ম বরবাদ হয়ে গেছে, কেননা সে আপন তরাবারির আঘাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বললেন, ওরা ভুল বলছে, সে বড় মুজাহিদ। এরপর রাসূল (সা) আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, তার জন্য দু'টি বিনিময় রয়েছে। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, সে তো শহীদ। এরপর তার জানাযা পড়ান।[১]

অতঃপর হযরত আলী (রা) এ বীরত্ব ব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তার মুকাবিলায় অগ্রসর হন :

انا الذى سمتنى امى حيدره * كليث غابات كرهيه المنظره

"আমি ঐ ব্যক্তি, যার মা তার নাম রেখেছে হায়দার (ব্যাঘ্র),[২] আর বাঘের মতই আমি ভীতিপ্রদ।"

এ বলে তিনি এত জোরে তরবারির আঘাত হানেন যে, মাহরাবের মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দূর্গ দখলে আসে। (মুসলিম, ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৬৭)।

অতঃপর মারহাবের ভাই ইয়াসির মুকাবিলায় আসে। এদিক থেকে হযরত যুবায়র (রা) বের হন এবং এক আঘাতেই ইয়াসিরের জীবনের সমাপ্তি ঘটান। (যাদুল মাআদ)।[৩]

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৮০।

২ বলা হয়ে থাকে যে, মারহাব ঐ রাতে স্বপ্নে দেখে, একটি বাঘ তাকে ফেড়ে ফেলছে। হযরত আলী (রা) কাশফ দ্বারা তা অবগত হন। কাজেই তার বর্ণিত انا الذى سمتنى امى حيدره দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে, ওহে মারহাব, যে বাঘকে তুমি স্বপ্নে দেখেছ, আমিই সেই বাঘ। কাজেই হযরত আলীর কবিতা শুনেই তার কম্পন শুরু হয় এবং বাহাদুরী কর্পূরের ন্যায় উড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন এবং তাঁর জানাই পরিপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত। যারকানী, ৩খ., পৃ. ২২৪।

৩. ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৮৭।

এ দূর্গ বিশদিন অবরোধ করে রাখার পর হযরত আলী (রা)-এর হাতে বিজয় অর্জিত হয়। গনীমতের মাল ছাড়া অনেক বন্দীও হস্তগত হয়। যাদের মধ্যে বনী নাযীরের সর্দার হুয়াই ইবন আখতাবের কন্যা এবং কিনানা ইবন রবী'-এর স্ত্রী সাফিয়া-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[১]

দ্রষ্টব্য : নবী করীম (সা) প্রতিদিন যখন কোন দূর্গ আক্রমণ করার ইচ্ছা করতেন, তখন মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কাউকে মনোনীত করে বলতেন, ইসলামের পতাকা তার হাতে দাও। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার হাতেই দূর্গ জয় করিয়ে দিতেন। সুতরাং কামূস দূর্গের জয়ের ব্যাপারে আল্লাহর লিখন ছিল হযরত আলী (রা)-এর হাতে। এ জন্যে রাসূল (সা) হযরত আলীকে ডেকে পাঠাান এবং তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করেন। নবী (সা)-এর এটা বলা যে, পতাকা এমন ব্যক্তির হাতে দেব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে মহব্বত রাখে, এটা তাকে মর্যাদা ও সম্মানদানের উদ্দেশ্যে ছিল। আল্লাহ্ মাফ করুন, এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি ছাড়া আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করেন না।

হযরত সাফিয়্যা (রা) এবং তার দু' চাচাত বোন এ কামূস দূর্গ থেকে বন্দী হন, যার বর্ণনা সামনে আসবে। আর হযরত সাফিয়ার স্বামীর নাম ছিল কিনানা ইবন রবী' যে এ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে।[২]

৩. সা'আব ইবন মা'আয দূর্গ

কামূস দূর্গের পতনের পর সা'আব ইবন মা'আয দূর্গ বিজিত হয়, যেখানে খাদ্যশস্য, চর্বি এবং পানাহারের অনেক দ্রব্য ছিল, এর সবই মুসলমানদের অধিকারে আসে।

এক বর্ণনায় আছে, যখন মুসলমানদের রসদে কমতি দেখা দিল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দু'আর আবেদন জানালেন। তিনি দু'আ করলেন। তার পরদিনই সাআব ইবন মাআয দূর্গ মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং পানাহারের মত অনেক দ্রব্য মুসলমানদের হস্তগত হয়, যা তাঁদের বিরাট সাহায্যে আসে।[৩]

ঐ দিন নবী (সা) চারদিকে আগুন জ্বলতে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি ? লোকেরা বলল, গোশত রান্না করা হচ্ছে। অতঃপর জানতে চাইলেন, কিসের গোশত ? বলল, গৃহপালিত গাধার গোশত। তিনি বললেন, এ তো অপবিত্র, এ সবই ফেলে দাও এবং পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেল। কেউ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি গোশত ফেলে দিয়ে পাত্রগুলো ধুয়ে ফেলি, এটা কেমন হয় ? তিনি বললেন, তাতেও চলবে, পাত্রগুলো ধুয়ে ফেল।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩২৬।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৬০।

৩. উয়ূনুল আসার, ২খ. পৃ. ১৩৪।

৪. হিসন দূর্গ

অতঃপর ইয়াহূদীরা হিসন দূর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এটিও একটি অত্যন্ত মযবূত দূর্গ ছিল। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত হওয়ায় একে হিসন দূর্গ বলা হতো। কিল্লা অর্থ পাহাড়ের চূড়া, পরে যা কিল্লায়ে যুবায়র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারণ, গনীমত বন্টনের পর এ দূর্গটি হযরত যুবায়রের ভাগে পড়ে।

তিনদিন পর্যন্ত মুসলমানরা দূর্গটি ঘিরে রাখেন। ঘটনাক্রমে এক ইয়াহূদী নবীজির খিদমতে হাযির হয়ে আরয করে, হে আবুল কাসিম, আপনি যদি মাসব্যাপীও এ দূর্গ অবরোধ করে রাখেন, তাতে তাদের কোন পরোয়া নেই। তাদের কাছে মাটির নিচে পানির নহর আছে। ওরা চুপে চুপে রাতে এসে পানি সংগ্রহ করে দূর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। আপনি ঐ পানির নহর বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে সফল হতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ওদের পানি বন্ধ করে দিলেন। বাধ্য হয়ে ওরা দূর্গের বাইরে এলো এবং তুমুল সংঘর্ষ হলো। দশজন ইয়াহূদী নিহত হলো, অপরদিকে এবং কয়েকজন মুসলমানও শহীদ হলেন। দূর্গ বিজিত হলো।

হাফিয ইবন কাসীর বলেন, এ দূর্গটিই ছিল সমতল অঞ্চলের সর্বশেষ দূর্গ। রাসূল (সা) এটি জয় করার পর উচ্চ এলাকার দূর্গগুলোর প্রতি অগ্রসর হন। এ অঞ্চলে সর্বপ্রথম জয় করেন উবাই দূর্গটি, যা কঠিন যুদ্ধের পর বিজিত হয়। মুসলমানগণ এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তারপর অন্যান্য দূর্গের প্রতি অগ্রসর হন।[১]

৫. অতীহ ও সালালিম দূর্গ

হিসন দূর্গের পতনের পর রাসূলুল্লাহ (সা) অপরাপর এলাকার দিকে অগ্রসর হন। অতঃপর যখন সকল দূর্গ মুসলমানদের অধিকারে আসে, তখন সবশেষে অতীহ ও সালালিম দূর্গের প্রতি অগ্রসর হন। কোন কোন রিওয়ায়াতে আল-কিতবাহরও উল্লেখ আছে। এর পেছনের সকল দূর্গ অধিকৃত হয়, মাত্র এ দু'টি দূর্গ বাকী ছিল। ইয়াহূদীদের পুরো সামরিক শক্তি এখানে নিয়োগ করা হয়েছিল। চারদিক থেকে গুটিয়ে এসে ইয়াহূদীরা এখানে নিরাপত্তা গ্রহণ করেছিল। চৌদ্দদিন অবরোধ করে রাখার পর অগত্যা তারা সন্ধির আবেদন করে। রাসূল (সা) ওদের আবেদন মঞ্জুর করেন। ইয়াহূদীরা ইবন আবুল হুকায়েককে সন্ধির ব্যাপারে কথাবার্তা বলার জন্য প্রেরণ করে। রাসূল (সা) এ শর্তে তাদের প্রাণভিক্ষা দেন যে, তারা খায়বরের ভূমি খালি করে দেবে, অর্থাৎ দেশ ত্যাগ করবে। আর স্বর্ণ-রৌপ্য ও যুদ্ধাস্ত্রসমূহ সবকিছু এখানে ছেড়ে যাবে। কোন কিছু লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এর বরখেলাফ করা হলে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এর যিম্মাদারী নেবেন না।[২]

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৯৮।

২ যাদুল মাআদ, ২খ. পৃ. ১৩৬।

কিন্তু ইয়াহূদীরা এ ওয়াদা এবং চুক্তি করা সত্ত্বেও দুষ্টবুদ্ধি থেকে নিবৃত্ত হয়নি এবং হুয়াই ইবন আখতাবের একটা থলে (যার মধ্যে সবার গহনা-গাঁটি নিরাপদে রাখা ছিল) সেটি গায়েব করে ফেলে। তিনি কিনানা ইবন রবী'কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, ঐ থলেটি কোথায় ? কিনানা বলল, যুদ্ধের সময় ব্যয় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সময় তো খুব বেশি অতিক্রান্ত হয়নি, আর সম্পদ অনেক বেশি ছিল। এটা ইবন সা'দের বর্ণনা। আর আবূ দাঊদের বর্ণনায় আছে, তিনি হযরত সাফিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। বায়হাকী[১] এবং ইবন সা'দের অপর বর্ণনায় আছে যে, কিনানা, তার ভাই ও অন্যান্য লোকজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। সবাই এ কথাই বলে যে, ব্যয় হয়ে গেছে। হযরত (সা) বললেন, যদি সে থলে পাওয়া যায়, তা হলে তোমাদের ভাল হবে না। এ কথা বলে তিনি এক আনসারীকে নির্দেশ দিলেন, অমুক স্থানে যাও এবং সেখানে একটি বৃক্ষের শেকড়ের মধ্যে থলেটি লুকানো আছে। সাহাবী সেখানে গেলেন এবং থলেটি নিয়ে এলেন যার মূল্য ছিল দশ হাজার দীনার। চুক্তিভঙ্গের এ অপরাধে ঐ লোকগুলোকে হত্যা করা হয়,[২] যাদের মধ্যে হযরত সাফিয়ার স্বামীও ছিল। তার নাম ছিল কিনানা ইবন রবী' ইবন আবুল হুকায়েক।[৩]

এছাড়াও কিনানার আর একটি অপরাধ ছিল, সে মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-এর ভাই মাহমূদ ইবন মাসলামা (রা)-কে এ যুদ্ধেই হত্যা করেছিল। এ জন্যে রাসূল (সা) কিনানাকে মুহাম্মদ ইবন মাসলামার হাতে তুলে দেন, যাতে তিনি আপন ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারেন। (সীরাতে ইবন হিশাম)।

সতর্ক বাণী : খায়বরের দূর্গসমূহ বিজয়ের যে ধারাবাহিক বর্ণনা অধম (লিখক) উল্লেখ করেছে, তাতে প্রথমে নাইম দূর্গ জয় হয়েছে, তারপর কামূস দূর্গ, অতঃপর সাআব দূর্গ, শেষে অতীহ ও সালালিম দূর্গ জয় হয়। এ ধারাবাহিকতা সীরাতে ইবন হিশাম এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৯২-১৯৪-এ উল্লেখ আছে। হাদীস এবং সীরাত গ্রন্থসমূহে এছাড়া আরো দূর্গের উল্লেখ আছে এবং জয়ের ধারাবাহিকতায়ও কিছুটা বিভিন্নতা রয়েছে। আল্লামা হালাবী তাঁর সীরাতে হালাবিয়ায় লিখেছেন, সমতল এলাকায় তিনটি দূর্গ ছিল, নাইম দূর্গ, কুল্লা দূর্গ , সমতল এলাকায় সর্বপ্রথম যে দূর্গটি জয় করেন, তা ছিল নাইম দূর্গ। যেসব ইয়াহূদী নাইম থেকে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তারা সমতল এলাকার অপর দূর্গ সাআব ইবন মাআয দূর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দুই দিন অবরোধ করে রাখার পর দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই এ দূর্গ বিজিত হয়।

---

১. হাফিয আসকালানী বায়হাকীর এ রিওয়ায়াত সম্পর্কে বলেন, 'হাদীসটি বায়াকী রিওয়ায়াত করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটিতে নির্ভরযোগ্য। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৬৭। ইত্যাদি।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ১২৯।

৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৯৯।

তারপর তিনি কুল্লা দূর্গ অবরোধ করেন। এ দূর্গকে এজন্যে কুল্লা বলা হতো যে, কুল্লা অর্থ পাহাড়ের চূড়া, আর এটি পাহাড় চূড়ায়ই অবস্থিত ছিল। যেহেতু পরবর্তীতে এটি হযরত যুবায়র (রা)-এর ভাগে পড়ে, তাই এটিকে পরে যুবায়রের কিল্লাও বলা হতো। এ তিনটি দূর্গ ছিল সমতল এলাকায়।

এরপর মুসলমানগণ উচ্চ এলাকার দূর্গগুলোর দিকে অগ্রসর হন। এ এলাকায় ছিল দু'টি দূর্গ, একটি উবাই দূর্গ এবং অপরটি বারী দূর্গ। প্রথমে উবাই এবং পরে বারী দূর্গ বিজিত হয়।

যখন এ এলাকাও মুসলমানদের দখলে এলো, তখন ইয়াহূদীরা কিতবার দূর্গসমূহে আশ্রয় নেয়। কিতবা এলাকায় তিনটি দূর্গ ছিল, কামূস, অতীহ এবং সালালিম। সবচে' বড় ছিল কামূস দূর্গ, যা হযরত আলী (রা)-এর হাতে বিজিত হয়। এ দূর্গটিও যখন দখলে এলো, তখন মুসলমানগণ অতীহ এবং সালালিম দূর্গ অবরোধ করেন। চৌদ্দদিন অবরুদ্ধ থাকার পর তারা নবীজির কাছে এ আবেদন জানায় যে, আমাদেরকে এবং আমাদের পরিবার-পরিজনকে ছেড়ে দেয়া হোক, আমরা খায়বর ছেড়ে চলে যাব। তিনি তা মঞ্জুর করেন।[১]

ফিদক বিজয়

ফিদকবাসিগণ যখন সংবাদ পেল যে, খায়বারের ইয়াহূদীগণ এই এই শর্তে সন্ধি করেছে, তখন তারাও রাসূল (সা)-এর নিকট প্রস্তাব পাঠাল যে, আমাদের প্রাণের নিরাপত্তা দেয়া হোক, আমরা আমাদের সমস্ত ধন-সম্পদ ত্যাগ করে এ স্থান ছেড়ে চলে যাব। তিনি এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন। মুহাইসা ইবন মাসউদের মাধ্যমে কথাবার্তা হয়। কোন আক্রমণ বা সেনা অভিযান ছাড়াই যেহেতু ফিদক অধিকারে আসে, সেখানে না অশ্বারোহী নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, না পদাতিক বাহিনী, এ জন্যে ফিদক নির্ভেজালভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবজা ও অধিকারে রাখা হয়। খায়বারের ন্যায় গনীমতের অধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হয়নি। (সীরাতে ইবন হিশাম)

ফায়দা : এ যুদ্ধে চৌদ্দ অথবা পনেরজন মুসলমান শহীদ হন এবং তিরানব্বইজন ইয়াহূদী নিহত হয়। বিজয়ের পর যখন গনীমতের মাল এবং বন্দীদের একত্র করা হয়, তাদের মধ্যে হুয়াই ইবন আখতাবের কন্যা ও কিনানা ইবন রবী'র স্ত্রী হযরত সাফিয়্যাও ছিলেন। যিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা ।

হুয়াই ইবন আখতাব হযরত হারুন (আ)-এর বংশধর ছিল। যুদ্ধের পর বন্দীদের একত্র করা হলে, হযরত দাহিয়া (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী যাকে খুশি, নিয়ে যাও। হযরত দাহিয়া হযরত হারুন (আ)-এর বংশধর হুয়াইর কন্যা ও কিনানার স্ত্রী সাফিয়্যাকে পসন্দ করেন। সাহাবিগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি তো ওদের সর্দারের

১. সীরাতে হালাবিয়া, ২খ. পৃ.১৬৪; আউনুল মাবূদ, ৩খ. পৃ. ১২০।

করুন, তিনি কেবল আপনারই উপযোগী। অতঃপর সাহাবীদের পরামর্শ অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাফিয়্যাকে হযরতের ভাগে এবং সাফিয়্যার চাচাত বোনকে দাহিয়্যার ভাগে প্রদান করা হয়। হযরত (সা) সাফিয়্যাকে মুক্তি দিয়ে নিজে বিবাহ করেন।[১]

হযরত সফিয়্যা (রা) সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ পবিত্র সহধর্মিণীগণের বর্ণনায় আসবে। যেভাবে বনী মুসতালিক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-এর সাথে তাঁর বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্য অনুযায়ী ব্যবহার করেছিলেন, অনুরূপভাবে এ স্থলে হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর সাথে তাঁর বংশ মর্যাদা এবং হযরত হারুন (আ)-এর বংশধর হওয়ার সম্মানকে বজায় রেখে মুক্তি দেন এবং যথার্থ মর্যাদায় নিজ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

বিষ প্রদানের ঘটনা

বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুদিন খায়বারেই অবস্থান করেন। এরই মধ্যে একদিন সালাম ইবন মিশকামের স্ত্রী যয়নাব বিনতে হারিস একটি ভুনা বকরি হাদিয়া স্বরূপ তাঁর খিদমতে পেশ করে, যাতে আগেই বিষ মিশিয়ে রাখা হয়। পসন্দনীয় অংশ থেকে এক টুকরা মুখে পুরে চিবানোমাত্র তিনি হাত গুটিয়ে নেন, বিশর ইবন বারা ইবন মা'রূর তাঁর সাথে খানায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনিও এ থেকে কিছুটা খেয়ে ফেলেছিলেন। তিনি (সা) বললেন, হাত গুটাও, এতে বিষ মেশানো আছে।

যয়নাবকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে সাক্ষ্য দিল যে, নিঃসন্দেহে এতে বিষ মেশানো হয়েছে। তা এ জন্যে যে, যদি আপনি সত্যিকারের নবী হন, তবে আল্লাহ আপনাকে অবহিত করবেন, আর যদি আপনি মিথ্যে নবী হন, তা হলে মানুষ আপনার থেকে পরিত্রাণ পাবে। যেহেতু মহানবী (সা) নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না, এ জন্যে তিনি এ কথার কোন প্রতিবাদ না করে চুপ থাকলেন (এরপর সে মুসলমান হয় কিনা, তা দেখাই নিরবতার কারণ হতে পারে)। কিন্তু পরে যখন বিশর ইবন বারা ইবন মা'রূর (রা) এ বিষক্রিয়ায় ইনতিকাল করেন, তখন যয়নাবকে বিশরের উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দেয়া হয় এবং তারা তাকে বিশরের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

বায়হাকীর এক রিওয়ায়াতে আছে, অপরাধ স্বীকার করার পর যয়নাব ইসলাম গ্রহণ করে বলে, আপনার সত্যবাদী হওয়ার বিষয়টি আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেছে। এক্ষণে আমি উপস্থিত জনতাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি আপনার দীন গ্রহণ করছি এবং শপথ করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। যুহরী এবং সুলায়মান প্রথমেই তাকে হত্যা না করার কারণ হিসেবে বলেছেন যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[২]

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৬০।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৮০।

সংবাদ

যখন খায়বার বিজয় হলো এবং ঐ ভূখণ্ডটি ইসলামের অনুসারীদের অধিকারে এলো, তখন হযরত (সা) ইচ্ছে করলেন, (চুক্তি অনুসারে) ইয়াহূদীরা দেশত্যাগ করুক। কিন্তু তারা এ বলে আবেদন করল যে, আমাদেরকে এখানে থাকতে দিন; আমরা কৃষিকাজ করব, তাতে যা উৎপাদিত হবে, তার অর্ধেক আপনার সরকারকে দেব। তিনি তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন ও সাথে সাথে এ কথাও স্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, نقركم على ذلك ماشئنا "যতদিন ইচ্ছে হয়, তোমাদেরকে বহাল রাখব।"

বুখারী, ১খ. পৃ. ৩১৫, কিতাবুল মুযারিয়াত, اذا قال بر الارض اقرك ما اقرك الله ... ... অধ্যায়; ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ১৬ এবং ২৩৯, কিতাবুশ শুরূত, اذا اشترط في المزارعة اذا شئت اخر جتك অধ্যায়; এ ধরনের লেনদেন সর্বপ্রথম খায়বারে শুরু হয়, ফলে এ লেনদেনের নাম 'মুখাবারা' হয়ে যায়।

যখন ফসল তোলার সময় আসত, উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ অনুমান করার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে প্রেরণ করতেন। (বাবুল খারাস, সুনানে আবূ দাঊদ)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) উৎপাদিত ফসলকে দু'ভাগ করে বলতেন, যে ভাগ ইচ্ছে হয়, গ্রহণ কর। ইয়াহূদীরা তার ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ দেখে বলত, এ ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের জন্যই আসমান ও যমীন স্থির আছে। এক রিওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) বলতেন :

يا معشر اليهود انتم ابغض الخلق الى قتلتم انبياء الله وكذبتم على الله وليس يحملنى بغضى اياكم ان احيف عليكم ·

"ওহে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তোমরাই আমার নিকট সবচে' বেশি ক্রোধের বস্তু, তোমরাই আল্লাহর পয়গাম্বরগণকে হত্যা করেছ, তোমরাই আল্লাহর প্রতি মিথ্যে আরোপ করেছ। কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার ক্রোধ কখনই আমাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না যে, আমি তোমাদের প্রতি যুলম করি।"[১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর উপস্থিতি

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং তার কতিপয় সঙ্গী খায়বার বিজয়ের পর নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি (সা) তাদের গনীমতের মালের কোন অংশ দেননি। (বুখারী, খায়বার যুদ্ধ)।

খায়বারের গনীমত বন্টন

খায়বারের গনীমতের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য ছিল না, গরু, বকরি, উট এবং কিছু

১. তাহাবীকৃত শারহে মাআনিউল আসার, ১খ. পৃ. ৩১৬।

মালপত্র ছিল। আর সবচে' বড় জিনিস ছিল খায়বারের কৃষিজমি ও বাগানসমূহ। জমি ছাড়া যে সব মাল ছিল, তা কুরআনের নির্দেশ অনুসারে বন্টন করে দেন, আর জমিগুলো কেবল হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বন্টন করেন।[১]

হুদায়বিয়ার উমরার সফরে যাত্রার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা) বেদুঈনদেরকেও তাঁর সহযাত্রী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আশঙ্কা ছিল যে, বদর, উহুদ ও আহযাব যুদ্ধে নিহতদের কারণে মক্কাবাসীর অন্তর ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ঈর্ষা ও শত্রুতায় নিমজ্জিত হয়ে আছে। মক্কায় প্রবেশকালে তাই যদি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় এবং মক্কাবাসী সরাসরি মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়, এ জন্যে চিন্তা ও জ্ঞানের বিচারে এটাই যুক্তিযুক্ত ছিল যে, তাঁর সঙ্গে বিরাট দল যাবে, যাতে কুরায়শদের দ্বারা ক্ষতির কোন আশঙ্কা না থাকে। কিন্তু অনেক বেদুঈদ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি, আর অনেকেই তুচ্ছ বাহানা ও জরুরী কাজের অজুহাত দেখায়। নিষ্ঠাবান মুসলমান, যাদের আপাদ মস্তক ঈমানী আনন্দে আপ্লুত ছিল, তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতাকে দুনিয়া ও আখিরাতের মহাসৌভাগ্য মনে করে তাঁর সঙ্গী হন। হুদায়বিয়ার নিকটে বাধা এলো এবং পরাজয়মূলক সন্ধির অবস্থা সামনে এলো, যাতে এ মহাত্মাগণ ধৈর্যধারণ করেন। এ সফরে যখন এঁদের নিষ্ঠা ও একনিষ্ঠতা সুপ্রমাণিত ও উপমাযোগ্য প্রমাণিত হলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবার থেকে তাদের অন্তরের পরাজিতভাব দূর করার উদ্দেশ্যে খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ নাযিল হয় যে, শীঘ্রই তোমরা খায়বার জয় করবে এবং এ আদেশ নাযিল করেন যে, খায়বারের গনীমত হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে, অপর কাউকে এতে শরীক করা হবে না।[২] বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রয়োজন হলে তাফসীরের কিতাবসমূহের সূরা আল-ফাতহ-এর তাফসীর দেখুন।

বাকী থাকলো যে, খায়বারের জমিগুলো তিনি কিভাবে বন্টন করেন। এর বিবরণ সুনানে আবূ দাঊদে বর্ণিত হয়েছে যে, এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের জমিগুলোকে ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন, যার মধ্যে আঠারটি অংশ পৃথক করে নেন অর্থাৎ মুসলমানদের প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্য নির্ধারণ করেন এবং মুজাহিদদের মধ্যে তা বন্টন করেন নি। আর অবশিষ্ট আঠার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে দেন এবং এর প্রতি অংশ একশত মুজাহিদের অংশ হিসেবে নির্ধারিত হয় যা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে কেবল হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেই বন্টন করা হয়। খায়বারের জমির ঐ অর্ধাংশ, যা তিনি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করেননি, তার মধ্যে নিচু, উঁচু, ঊষর ও মধ্যমমানের জমিও ছিল।

আর অর্ধাংশ তিনি হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করেন, তণ্ডধ্যে পার্বত্য এবং সমতল ভূমিও ছিল। এ রিওয়ায়াত সুনানে আবূ দাউদে সাহাবী হযরত

১. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ২৪৬।

২ শাহ ওয়ালীউল্লাহ প্রণীত ইযালাতুল খাফা, ১খ. পৃ. ৩৮।

সাহল ইবন আবূ হাসমা (রা) থেকে মাওসুল এবং তাবিঈ হযরত বাশীর ইবন ইয়াসার (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[১]

ইমাম তাহাবী বলেন, নবী করীম (সা) খায়বারের সমস্ত জমি বন্টন করেননি, কেবল পার্বত্য ও সমতল ভূমি আর পার্শ্বস্থিত জমিগুলো বন্টন করেন। অবশিষ্ট সমুদয় জমি মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণের জন্য সংরক্ষণ করেন।[২]

প্রশ্ন থাকলো, ঐ আঠার অংশ কিভাবে বন্টন করা হয়। এতে মতপার্থক্য আছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে যে, সাকুল্যে চৌদ্দশত মানুষ যার মধ্যে দু'শত ছিলেন অশ্বারোহী; চৌদ্দটি অংশ চৌদ্দশত মানুষকে দেয়া হয়, কেননা এককেটি অংশ একশত ভাগের ছিল। আর ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ এবং অপরাপর আলিমের নিকট প্রতি ঘোড়ার জন্য দু'টি অংশ পাওয়া যেত বিধায় দু'শত ঘোড়ার জন্য চারটি অংশ দেয়া হয়। এভাবে চৌদ্দ অংশের সাথে চার অংশ মিলে মোট আঠার অংশ হয়ে যায়।

আর সুনানু আবূ দাউদে হযরত মাজমা' ইবন জারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, খায়বারে যোদ্ধার সংখ্যা ছিল পনরশত, যার মধ্যে তিনশত ছিলেন অশ্বারোহী; সুতরাং তিনি প্রতি অশ্বারোহীকে দু'টি অংশ এবং প্রত্যেক পদাতিককে একটি অংশ দেন।[৩]

এ রিওয়ায়াত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতের সমার্থক। তার মতে আরোহী কেবল দু'টি অংশ পায়, একটি আরোহীর এবং একটি ঘোড়ার। যেমনটি হযরত আলী ও হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

কাজেই এ হিসেবে পনেরশতের মধ্যে তিনশত অশ্বারোহীর জন্য ছয়টি অংশ, আর প্রতিটি অংশ ছিল একশত ভাগের, আর বাদবাকী বারশত ব্যক্তির জন্য বারটি অংশ দেয়া হয় এবং বার ও ছয়ে মিলে আঠার পূর্ণ হয়।

প্রশিক্ষকদের জন্য ফায়েদা

ইবন মালিক এই রিওয়ায়াত (অর্থাৎ হযরত মাজমা ইবন জারিয়া-এর হাদীস) প্রসঙ্গে বলেন, সঠিক মত এটাই যে, প্রতি ঘোড়ার জন্য দু'টি অংশ, কেননা এ রিওয়ায়াত অনুযায়ী পদাতিকের সংখ্যা ছিল বারশত, তাদের জন্য বারটি অংশ, প্রতি অংশ একশত লোকের জন্য, আর ঘোড় সওয়ারদের প্রত্যেকের দু'টি অংশ হিসেবে ছয়টি অংশ, প্রতি অংশ একশত ভাগের; কাজেই সব মিলিয়ে আঠার অংশ হয়। আর যারা বলেন, প্রতি অশ্বারোহীর জন্য তিনটি ভাগ ছিল, এটা দুরূহ; কেননা এতে দাঁড়ায় ঘোড় সওয়ারদের জন্য নয়শত এবং বারশত পদাতিকের জন্য বারশত, মোট একুশ শত অংশ (বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত)।

---

১. আবূ দাউদ, ২খ. পৃ. ৪২৫; অধিকন্তু বাযলুল যুহূদ, ৪খ. পৃ. ১৪৫।

২ শারহে মাআনিউল আসার, ২খ. পৃ. ১৪৪।

৩. বাযলুল যুহূদ, ৪খ. পৃ. ১৪৬।

সারকথা : নবী (সা) খায়বারের অর্ধেক সম্পত্তি হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ-কারীদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং তাদের ছাড়া আর কাউকে এতে শরীক করেননি। হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, খায়বার বিজয়ের পর নৌ-আরোহী সাহাবিগণ অর্থাৎ হযরত জাফর, হযরত আবূ মূসা আশআরী এবং তাদের সঙ্গী (রা), যাদের সংখ্যা ছিল একশতেরও বেশি, তারা আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন, রাসূল (সা) তাদেরকেও কিছু অংশ দান করেছিলেন।

এটা জানা নেই যে, তাদেরকে তিনি আসল গনীমত থেকে অংশ দিয়ে ছিলেন নাকি গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে অথবা গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে সমষ্টি থেকে দান স্বরূপ কিছু দিয়েছিলেন। এটাও জানা নেই যে, এ অনুদান তিনি কি কেবল নিজ সিদ্ধান্তেই দিয়েছিলেন নাকি মুজাহিদীন ও গনীমত প্রাপকদের অনুমতিক্রমে দিয়েছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন। (শায়খুল ইসলাম দেহলবী কৃত ফাতহুল বারীর শরাহ থেকে)।[১]

খায়বার যুদ্ধে কিছু বালক এবং স্ত্রীলোকও মুজাহিদদের পরিচর্যা ও সাহায্যের জন্য অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার থেকে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্য থেকে অনুদান হিসেবে কিছু দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট জমি থেকে পুরুষদের মত তাদেরকে কোন অংশ দেননি। যেমনটি আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈর বর্ণনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে।[২]

মুহাজিরগণ কর্তৃক আনসারগণের ক্ষেত-খামার ফেরত দান

হিজরতের প্রথম ভাগে যখন মুহাজিরগণ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন মুহাজিরদের সাহায্য ও সহযোগিতায় আনসারগণ তাদেরকে কিছু জমি ও ক্ষেত-খামার দান করেন যাতে তা থেকে তারা নিজেরাও উপকৃত হন এবং আনসারগণকেও কিছু মুনাফা দিতে পারেন।

খায়বার বিজয়ের পর সম্মানিত মুহাজিরগণ সাহায্য সহায়তা লাভ করে যখন বিত্তবান হয়ে উঠেন, তখন মুহাজিরগণ আনসারদের জমি-যিরাত ও বৃক্ষাদি ফেরত দিয়ে দেন। হযরত আনাস (রা)-এর দাদী উম্মে সুলায়ম (রা)-ও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কয়েকটি গাছ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা) সেগুলো নিজ ধাত্রী উম্মে আয়মান অর্থাৎ হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা)-এর দাদীকে ফিরিয়ে দেন।

খায়বর বিজয়ের পর যখন মুহাজিরগণ সব আনসারের বৃক্ষাদি ফিরিয়ে দেন, তখন উম্মে সুলায়ম (রা)-ও রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে নিজের বৃক্ষগুলো দাবি করেন। এগুলো ছিল সেই বৃক্ষ যা তিনি উম্মে আয়মানকে দিয়ে দিয়েছিলেন। নবী (সা) উম্মে আয়মানকে বললেন, উম্মে সুলায়মের বৃক্ষগুলো ফিরিয়ে দাও। উম্মে আয়মান সেগুলো

১. উমদাতুল কারী, ৭খ. পৃ. ১৪৭; কাসতাল্লানী, ৫খ. পৃ. ২০০, ২০৯।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২০৪।

ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন এবং হযরত আনাসের গলায় কাপড় পেঁচিয়ে টানতে থাকেন ও বলতে থাকেন, আল্লাহর কসম, আমি এ বৃক্ষ কখনই ফিরিয়ে দেব না। যেহেতু উম্মে আয়মান নবী (সা)-এর ধাত্রীমাতা এবং তাঁর পিতার দাসী ছিলেন, এ জন্যে তিনি তাকে অসন্তুষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না। রাসূল (সা) বললেন, ওহে উম্মে আয়মান, তুমি এ বৃক্ষগুলো ফিরিয়ে দাও এবং এর পরিবর্তে অন্য বৃক্ষ নাও। তিনি এ কথা বলতেই থাকলেন এমনকি তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি থেকে একেকটি বৃক্ষের পরিবর্তে দশ দশটি বৃক্ষ মঞ্জুর করলেন, তখন উম্মে আয়মান রাযী হলেন। রাসূল (সা) তার সাথে এমন উত্তম ও সুন্দর ব্যবহারই করতেন।[১]

মাসআলা ও বিধানসমূহ

এ যুদ্ধে হালাল ও হারামের যে বিধানসমূহ নাযিল হয়েছে অথবা যে সব উদ্ভূত মাসআলা এ যুদ্ধের ঘটনা থেকে সম্মানিত ফকীহগণ নির্ধারণ করেছেন, তা সংক্ষেপে এরূপ :

১. নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ

পূর্বেই জানা গেছে যে, খায়বার যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাররম মাসে বের হয়েছিলেন, এতে জানা গেল যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ নয়। আর যে সমস্ত কুরআনের আয়াত এবং হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ বুঝা যায়, তা মানসূখ হয়েছে। বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ এবং সূরা তাওবার مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ এ আয়াতের তাফসীর পর্যালোচনা করুন।

২. ভূমি বন্টন

এটা পূর্বেই জানা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের সমুদয় ভূমি গনীমত প্রাপকদের মধ্যে বন্টন করেননি, বরং উচ্চ ভূমি, সমতল ভূমি এবং এর পার্শ্বস্থিত জমিগুলোই কেবল মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করেছিলেন এবং উচ্চ, নিচু, ঊষর এবং এর সংলগ্ন জমিগুলো মুসলমানদের সামগ্রিক সমস্যা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য সংরক্ষিত রাখেন। এতে জানা গেল যে, রাষ্ট্রের শাসক বিজিত ভূমির ব্যাপারে এ অধিকার রাখেন যে, তিনি যা ভাল মনে করবেন, তা করতে পারবেন। ইচ্ছে হলে তা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারেন, ইচ্ছে হলে স্থানীয় অধিবাসীদের বন্দোবস্ত দিয়ে দিতে পারেন এবং তাদের উপর কর নির্ধারণ করে দিতে পারেন। আর ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, সাহিবাইন (ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ) এবং সুফিয়ান সাওরীর মত এটাই।

ইমাম শাফিঈর মাযহাব এই যে, অস্থাবর সম্পত্তির মত জমিও মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করা জরুরী। খায়বারের ভূমি বন্টনের ব্যাপারে শাফিঈ মাযহাবের ব্যাখ্যা হল,

১. ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ১৮০; কাসতাল্লানী, ৪খ. পৃ. ৩৫৪।

এর অর্ধেক অংশ কঠোরতার (যুদ্ধের) মাধ্যমে জয় করা হয়েছে আর অর্ধেক অংশ সন্ধির মাধ্যমে। কাজেই যে অর্ধেক যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, তা রাসূল (সা) মুজাহিদ দের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন, আর যে অংশ সন্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, সে অংশ বন্টন করেননি। অথচ সমস্ত হাদীস এবং সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সমগ্র খায়বার এলাকাই কঠোর যুদ্ধ, কঠিন সংঘর্ষ ও শক্ত মুকাবিলার পর জয় করা সম্ভব হয়েছে। যখন ইয়াহূদীরা মুকাবিলা করতে অপারগ হয়ে পড়ে, কেবল তখনই দূর্গ থেকে নেমে আসে এবং সব ধরনের অধিকার ও কর্তৃত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয় এবং এ কথায় সম্মত হয় যে, জমি এবং বাগানে তাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা শ্রমিকের মত সেখানে কাজ করবে এবং মুসলমানগণ যখন চাইবেন, তাদেরকে ঐ জমি থেকে বের করে দিতে পারবেন। এর ছিল কেবল মজুর, কোন জমি কিংবা গৃহের মালিক ছিল না। আর রাসূলুল্লাহ (সা) লেনদেনের সময় তাদের সাথে প্রকাশ্যে এ শর্ত করেছিলেন যে, যখন ইচ্ছে, তোমাদের থেকে জমি ফেরত নেয়া হবে। সুতরাং এ শর্তের ভিত্তিতে হযরত ফারুকে আযম (রা) তাঁর খিলাফতকালে সমস্ত জমি তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন এবং তাদেরকে ঐ এলাকা থেকে বের করে দেন। এতে জানা গেল যে, সমস্ত খায়বারই যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে দখল হয়েছে। যে বুযর্গগণের যেমন ইমাম মালিক এবং অপরাপরের কথায় জানা যায় যে, খায়বারের অর্ধেক অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে বাকী অর্ধেক সন্ধির মাধ্যমে অধিকৃত হয়েছে, সেখানে সন্ধির প্রকৃত অর্থ হলো, ইয়াহূদীরা প্রথমে মুকাবিলা ও সংগ্রাম করে কিন্তু পরে যখন যুদ্ধে অক্ষম হয়ে পড়ল, তখন অস্ত্র সমর্পণ করে এবং যুদ্ধ সমাপ্তির আবেদন জানায়। তাদের যুদ্ধ ও মুকাবিলা না করাটাকেই কতিপয় আলিমের ব্যাখ্যায় সন্ধি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। অর্থাৎ অর্ধেক খায়বার যুদ্ধের মাধ্যমে এবং বাকি অর্ধেক বিনাযুদ্ধে বিজিত হয়েছে। এ মাসআলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন হলে শাহ ওয়ালীউল্লাহকৃত ইযালাতুল খাফা, আল্লামা জাসসাসকৃত আহকামুল কুরআন এবং ইমাম তাহাবীকৃত শারহে মাআনিউল আসার, الامام بالارض المفتوحته। অধ্যায় পর্যালোচনা করুন; অধিকন্তু তাইসীরুল কারী এবং শারহে শায়খুল ইসলামও দেখুন।[১]

৩. খায়বারে নিষেধকৃত বিষয়সমূহ

খায়বারে রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েকটি বিষয়ে নিষেধ করেন। ১. গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন; ২. গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে তা থেকে বিক্রি করতে নিষেধ করেন; ৩. (মসজিদে গমনকালে) (কাঁচা) রসুন খাওয়া থেকে নিষেধ করেন এবং ৪. ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দেন (যাতে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ আছে)। এতদসমুদয়ের বিস্তারিত বর্ণনা যারকানী, ২খ. পৃ. ২৩৩ থেকে ২৩৯-তে দেখুন।

১. তাইসীরুল কারী, ৩খ. পৃ. ১৫৮।

৪. মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়া

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারে মু'তআ থেকে নিষেধ করেছেন। অধিকন্তু কুরআনুল করীমের বিভিন্ন আয়াতে মুত'আর নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়।

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ الاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَانَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ۔[১]

অর্থাৎ কল্যাণ ও মঙ্গল ওতেই নিহিত যে, ঈমানদারগণ তাদের লজ্জাস্থান দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া পুরোপুরি হিফাযত করবে (ক্ষেত্র দু'টি হলো) নিজেদের স্ত্রী এবং শরীয়তসম্মত দাসী; এ দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া সহবাস বৈধ নয়। আর যে ব্যক্তি এ দু'টি পন্থা বৈ অপর কোন পন্থা বের করে, সে শরীয়াতের সীমা রক্ষাকারী নয়,। আর প্রকাশ থাকে যে, মুত'আ স্ত্রী শীআদের নিকটও স্ত্রী নয়, দাসীও নয়। কেননা মুত'আর জন্য না সাক্ষ্য আছে, না ঘোষণা; না ব্যয় আছে, না বাসস্থান, আর না আছে তাদের জন্য তালাক, না আছে লিআন ও যিহার; না আছে ইদ্দত, আর না আছে মীরাস।

২. অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَانْكِحُوْا مَاطَابَلَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

এতে বিবাহের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, চারের অধিক বিবাহের অনুমতি নেই। কিন্তু মুত'আতে না কোন সীমা নির্দিষ্ট করা আছে, আর না আছে কোন নির্ধারিত সংখ্যা।

৩. অধিকন্তু এ কুপ্রথা প্রচলিত থাকলে বিবাহের প্রয়োজন থাকে না। কেননা অধিকাংশ বিবাহকারী প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণার্থে বিবাহ করে থাকে। আর প্রবৃত্তির চাহিদা যদি মুত'আ দ্বারা পূরণই হয়ে যায়, তা হলে বিবাহের প্রয়োজন কোথায় থাকবে ?

মুত'আ হারাম হওয়া

ইসলামের প্রথমদিকে হালাল ও হারামের বিধান ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই মদ্যপান ও সুদ হারাম হওয়ার নির্দেশ নবূয়াত লাভের কমপক্ষে পনের-বিশ বছর পর নাযিল হয়েছে।

অনুরূপভাবে মুত'আর ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে জাহিলী যুগের অভ্যেস ও নিয়ম-নীতি অনুসারে মানুষ মুত'আ বিবাহ করত এবং ততদিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন প্রকাশ্য ও সরাসরি নির্দেশ নাযিল হয়নি। খায়বর যুদ্ধের

---

১. সূরা মু'মিনূন ঃ ৫-৬।

সময়, যা ছিল নবূয়াতের সপ্তম বর্ষে, প্রথমবারের মত রাসূলুল্লাহ (সা) মুত'আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম হওয়ার ঘোষণা দেন। যেমনটি হযরত আলী (রা) থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)।

অতঃপর অষ্টম হিজরীর শেষভাগে আওতাসের ঘটনা সংঘটিত হয়, এ সময় মাত্র তিনদিনের জন্য মুত'আর অনুমতি দেয়া হয়। আর অনুমতি এ জন্যে দেয়া হয় যে, যারা পূর্বের প্রথা অনুযায়ী মুত'আ করেছিল এবং খায়বারে মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে যাদের জানা ছিল না, আর এ না জানার কারণে যারা মুত'আ করে ফেলেছিল, তাদেরকে ধর্তব্যে আনা হয়নি। কিন্তু এরপরে যখন নবী (সা) উমরা করার উদ্দেশে মক্কা মুয়াযযমা আগমন করলেন, তখন কাবাঘরের উভয় চৌকাঠ হাতে ধরে বললেন, মুত'আ কিয়ামত পর্যন্ত সব সময়ের জন্য হারাম করা হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের পর যেহেতু হাজার হাজার লোক ইসলামে শামিল হলেন, যাদের (অনেকের) মুত'আ হারাম হওয়া সম্পর্কে জানা ছিল না, সেহেতু না জানার কারণে পূর্বকালীন অর্থাৎ জাহিলী যুগের প্রথা অনুসারে ঐ নও-মুসলিমদের কেউ কেউ অজ্ঞতার কারণে আওতাসে মুত'আ করে। মহানবী (সা) যখন তা জানতে পারেন, তখন কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে চিরকালের জন্য মুত'আ হারাম হওয়ার ঘোষণা দেন।[১]

আবার মহানবী (সা) তাবূক যুদ্ধের সময় কিছু স্ত্রীলোককে মুসলমানদের তাঁবুর কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, এ মহিলারা কারা ? বলা হল, এ স্ত্রীলোকদেরকে কেউ কেউ মুত'আ করেছে (ঐ সময়ে[২] করেছে নাকি পূর্বে, তা জানা যায়নি)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, ক্রোধে তাঁর পবিত্র চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং এর পর মুত'আ করা থেকে নিষেধ করলেন। সাহাবিগণ বলেন, এর পর আমরা আর কখনো মুত'আ করিনি এবং সকল সময়ের জন্য এ অঙ্গীকার করলাম যে, কখনো মুত'আ করব না। (যেমনটি ইমাম হাযিমীকৃত কিতাবুল ই'তিবার,[৩] পৃ. ১৭০-এ বর্ণিত হয়েছে)।

১. بيـن القوسيـن এ ইবারত ফাতহুল বারী থেকে নেয়া হয়েছে।

২. حرم الله المتعة الى يوم القيامة (বুখারী)।

৩. ইমাম হাযিমী হাদীসটি বর্ণনা করেন। তার সনদ ছিল :

عن جابر بن عبد الله الانصارى يقول خرجنا رسول ﷺ الى غزوة تبوك حتى اذا كنا عند العقبة مما بلى الشام حين نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يحلبن غى رحالنا او قال بطفن فى رحالنا فجاءنا رسول الله ﷺ فنظر اليهن فقامن هؤلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه وتغير لونه اشتد غضبه وقام فينا فحمد الله واثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتواو عنا يومئذ الرجال ولم نعد ولا نعودلها ابداه ٠

আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভীষণ অসন্তুষ্ট হওয়া, ক্রোধে চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, মুত'আর নিষিদ্ধ করা এবং এর বিরোধিতা তিনি প্রথম থেকেই করে আসছিলেন। বরং দু'বার এর হারাম হওয়া সম্পর্কে (মানুষকে) অবহিত করেছিলেন। প্রথমবার খায়বারে এবং দ্বিতীয়বার আওতাস যুদ্ধের সময়। আর দু' দফা নিষেধ করার পরও যখন এ ঘটনা প্রকাশ পেল (যদিও তা না জানা এবং অজ্ঞতার কারণে ছিল) মহানবী (সা)-এর নিকট তা খুবই অপসন্দনীয় হলো এবং এমনকি ক্রোধে তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। ফলে তৃতীয়বারের মত তিনি এটা হারাম ঘোষণা করে খুতবা দিলেন। আর তৃতীয়বার তা হারাম করে তাকিদ ঘোষণা করলেন। এর পর আবার বিদায় হজ্জে মুত'আ হারাম হওয়ার সাধারণ ঘোষণা দেন যাতে বিশেষ এবং সাধারণ সবাই এটা হারাম হওয়ার সংবাদ জেনে যায়।

কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা বার বার দেয়ার ফলে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, মুতআ দু' অথবা তিনবার হালাল করা হয় এবং দু' অথবা তিনবার হারাম করা হয়। অথচ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বার ঘোষণা কোন নতুনভাবে হারাম করা ছিল না, বরং তা পূর্বতন নিষেধই স্মরণ করানো ও তাকিদ দেয়ার জন্য ছিল। এরপর হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে অজ্ঞতার কারণে যাদের কাছে মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার সংবাদ পৌঁছেনি এবং ঐ কর্ম করে বসেছে, হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনিও খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং মিম্বরে উঠে খুতবা দিলেন ও মুত'আ হারাম হওয়ার ঘোষণা দিলেন, যাতে এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ বাকী না থাকে। আর বললেন, আমার এঘোষণার পর যদি কেউ মুত'আ করে, তবে তার প্রতি আমি ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করব। এর পর থেকে মুত'আ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, আর এর উপরই সমস্ত সাহাবী একমত হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ, যারা অজ্ঞতার কারণে মুত'আর প্রবক্তা ছিলেন, তাঁরা যখন মুত'আ হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অবহিত হলেন, তখন নিজ বক্তব্য থেকে ফিরে আসলেন। যেমনটি আবূ বকর জাসসাস তাঁর আহকামুল কুরআনে (২খ. পৃ. ১৪৭) অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করেছেন। সম্মানিত বিজ্ঞগণ, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ فَاتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً -এর তাফসীরে বিস্তারিত দেখে নিন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর জন্ম হয়েছে হিজরতের এক অথবা দু' বছর পূর্বে এবং আট অথবা নয় বছর বয়স পর্যন্ত পিতামাতার সাথে মক্কা মুয়াযযমায় অবস্থান করেন। মক্কা বিজয়ের পর অষ্টম হিজরীতে যখন হযরত আব্বাস (রা) সপরিবারে হিজরত করেন, তখন হযরত ইবন আব্বাস (রা)-ও তাঁর সম্মানিত পিতার সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হন। খায়বর যুদ্ধ (যাতে মুত'আ হারাম ঘোষিত হয়েছিল) সংঘটিত হয়েছিল হযরত ইবন আব্বাসের মদীনা আগমনের পূর্বে। আর এ সময়ের মধ্যে মুত'আর কোন ঘটনা সামনে আসেনি। এ জন্যে হযরত ইবন আব্বাস

(রা) স্বয়ং মুত'আ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। কেবল অপর এক সাহাবীর মুখে শোনেন এবং তারই ভিত্তিতে ফাতওয়া দেন যে, নিরুপায় অবস্থায় যেমন মৃত জন্তু এবং শূকর নামেমাত্র বৈধ (মুবাহ) হয়, অনুরূপভাবে নিরুপায় অবস্থায় মুত'আ-ও বৈধ। কিন্তু পরে যখন হযরত আলী (রা) এবং অপরাপর সাহাবীগণ কিয়ামত পর্যন্ত মুত'আর হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-কে অবহিত করেন, তখন ইবন আব্বাস (রা) নিজ ফাতওয়া থেকে ফিরে আসেন। হযরত আলী (রা) থেকে মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে. কিন্তু সম্মানিত শী'আগণ মুত'আর ব্যাপারে এতই আসক্ত যে, হযরত আলীর কথাও শোনেন না।

قال الامام ابو جعفر الطحاوى كل هؤلاء الذين رووا عن النبى ﷺ اطلافها اخبروا انها كانت فى سفرو ان النهى لحقها فى ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس احد منهم يخبر انها كانت فى حضور كذلك روى عن ابن مسعود رضى الله عنه ·

"ইমাম তাহাবী বলেন, যত লোকেই মুত'আর অনুমতি ও অবকাশের কথা বলেন, সবাই ঐকমত্যভাবে এ কথাই বলেছেন যে, এ সাময়িক অবকাশ কেবল সফর অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল, অতঃপর এ কথাও বলেছেন যে, সে সফরেই এ অবকাশকে অর্থাৎ স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে মুত'আ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। আর এমন একজন বর্ণনাকারীও নেই, যিনি বলেছেন মুত'আর ঘটনা গৃহে অবস্থানকালে সংঘটিত হয়েছে। এমনটিই হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।" (তাফসীরে কুরতুবী, ৫খ. পৃ. ১৩১)।

অনুরূপভাবে ইমাম হাযিমী (র) বলেন :

وانما كان ذلك فى اسفارهم ولم يبلغا ان النبى ﷺ اباحة لهم وهم فى بيوتهم ·

"মুত'আর অনুমতির যে ঘটনা ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে সফর অবস্থায় হয়েছে। আর আমাদের কাছে এমন কোন একজন বর্ণনাকারী থেকেও এ সংবাদ আসেনি যে, দেশে এবং গৃহে থাকা অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ (সা) কাউকে এ অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ এমনটি কখনই হয়নি যে, দেশে থেকে কেউ মুত'আ করেছেন।" (কিতাবুল ইতিবার, পৃ. ১৭৮)।

ইসলামের শুরুতে কি ধরনের মুত'আ অনুমোদিত ছিল

জানা দরকার যে, মুতআ শব্দের উৎপত্তি متاع থেকে, যার অর্থ সামান্য মুনাফা। যেমন আল্লাহর বাণী : انَّمَا هٰذه الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الاَّ مَتَاعٌ আর রূপক অর্থে, যে কাপড়কে জোড়া দেয়া হয়, তাকেও মাতা' এ জন্যে বলে যে, জোড়াবিহীন পূর্বাবস্থায় এর

কল্যাণকারিতা অল্পই থাকে; তা বৃদ্ধির জন্য জোড়া। যেমন আল্লাহ্ বলেন : فَمَتِّعُوْهُنَّ : আল্লাহ। বলেন : وَلِلْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ : এটাই মুত‘আর প্রকৃত অর্থ।

মুত‘আর প্রয়োগ দু' অর্থে হয়ে থাকে। একটি এই যে, মুত‘আ অর্থ খন্ডকালীন বিবাহ, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাক্ষীদের সামনে কোন মহিলার সাথে স্ত্রীত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে তালাক ছাড়াই পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়া। কিন্তু বিচ্ছেদের পর গর্ভাশয়ের পরিচ্ছন্নতার জন্য একাধারে একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা, যাতে তা অপর ব্যক্তির বীর্যের সাথে একীভূত হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকে। কেবল এ অবস্থাটি ইসলামের প্রথম যুগে বৈধ ছিল, পরবর্তীতে চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যায়। অর্থাৎ মুত‘আ অর্থ খন্ডকালীন বিবাহ যা বিভিন্ন কারণে ইসলামের প্রথম অবস্থায় বৈধ থাকলেও পরবর্তীতে তা চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যায়।

আর মুত‘আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বলল, আমি একদিনের জন্য তোমার থেকে লাভবান হব এবং এই একদিন কিংবা দুইদিনের বাসনা চরিতার্থের জন্য তোমাকে এ মূল্য দেব; তা হলে এটা সরাসরি ব্যভিচার বা ব্যভিচারের অনুরূপ। মুত‘আর এ ধরন কখনই ইসলামে জায়েয কিংবা বৈধ হয়নি যে, তা বাতিল করা হবে। বরং মুত‘আর এ ধরন কোন দিনই হালাল হয়নি; কেননা মুত‘আর এ ধরন সরাসরি যিনা বা ব্যভিচার আর ব্যভিচার কোনদিন কোন ধর্মেই বৈধ ছিল না।

অবশ্য মুত‘আর প্রথম ধরন অর্থাৎ খন্ডকালীন বিবাহ (অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অভিভাবকের অনুমতিক্রমে সম্পর্ক স্থির করা এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক ঋতুস্রাব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা), এটা একটা দোদুল্যমান বা মধ্যবর্তী অবস্থা অর্থাৎ এটা খন্ডকালীন বিবাহ, প্রকৃত বিবাহ ও ব্যভিচারের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা, যা কেবল ব্যভিচারও নয় আর প্রকৃত বিবাহও নয়, যাতে তালাক, ইদ্দত ও মীরাস থাকে। মুত‘আ বিবাহের এ ধরন প্রকৃত বিবাহ নয়, বরং প্রকৃত বিবাহের সাথে কেবল দৃশ্যত তুলনীয় যে, মুত‘আর এ ধরনে সাক্ষী এবং অভিভাবকের অনুমতিও প্রয়োজন হয় এবং এক পুরুষ থেকে পৃথক হওয়ার পর যদি অপর পুরুষের সাথে মুত‘আ করতে চায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত একবার ঋতুস্রাব না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপর পুরুষের সাথে মুত‘আ করতে পারবে না। এ জন্যে এ অবস্থাকে ব্যভিচারও বলা যায় না, এ খন্ডকালীন বিবাহে (প্রথমে যাতে সাক্ষী এবং অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যিক এবং শেষে গর্ভাশয় পরিচ্ছন্ন করার জন্য ঋতুস্রাব হওয়া প্রয়োজন) প্রকৃত বিবাহের সাথে কেবল সময় নির্ধারণ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হওয়ার পার্থক্য বিদ্যমান, অপরাপর শর্তাবলীতে উভয়টি একইরূপ।

روى الليث بن سعد عن بكير بن الاشجع عن عمار مولى الشريد قال سألت ابن عباس عن المتعة اسفاح هى ام نكاح قال لاسفاح ولانكاح قلت فما هى قال المتعة كما قال تعالى قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة قلت يتوارثان قال لا ·

"ইমাম লায়স ইবন সা'দ বুকায়র ইবনুল আশাজ্জ থেকে বর্ণনা করেন, শারীদের মুক্তদাস আম্মার বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে মুত'আ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, মুত'আ কি ব্যভিচার, নাকি বিবাহ ? তিনি বললেন, মুত'আ যিনাও নয় বিয়েও নয়। আমি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে এটা কি ? তিনি বললেন, এটা মুত'আ, যেমন আল্লাহ তা'আলা এতে মুত'আ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম মুত'আকারী স্ত্রীলোকের কি ইদ্দত আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, মুত'আর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার উপর এক ঋতুস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব। আমি প্রশ্ন করলাম, তারা কি একে অপরের উত্তরাধিকারী হবে ? তিনি বললেন, না।" এ বাক্যাবলী দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মুত'আ বিবাহ অর্থ খন্ডকালীন, যা এক ঝুলন্ত অবস্থা; অর্থাৎ প্রকৃত বিবাহ এবং ব্যভিচারের মধ্যবর্তী অবস্থা।

ইসলামের প্রথম যুগে কেবল এ ধরনের মুত'আ এমন নিরুপায় অবস্থায় জায়েয ছিল, যেমন নিরুপায় অবস্থায় মৃত জন্তু এবং শূকর হালাল হয়ে যায়। এরপর ইমাম কুরতুবী বলেন :

قال ابو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح الى اجل لا ميراث فيه والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق وقال ابن عطية وكانت المتعة ان يتزوج الرجل بشاهدين واذن الولى الى اجل مسمى وعلى الا ميراث بينهما ويعطيها ما الفقا عليه فاذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرى رحمها لا الولد لاحق فيه بملاشك فان لم تحمل حلت يغره فى كتاب المخاس فى هذا خطاء وان الولد لايلحق فى نكاح المتعة (قلت) هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فانه فقال انما المتعة يقول لها اتزوجك يوما او شبه ذلك على انه لا عدة عليك ولاميراث بيننا ولاطلاق ولاشاهد يشهد على ذلك وهدا هو الزنا بعينه ولم يبع قط فى الاسلام - ولذا قال عمر لا اوتى برجل تزوج متعة الا غيبة تحت الحجارة - (তাফসীরে কুরতুবী, ৫খ. পৃ. ১৩২)[১]

১. তাফসীরে কুরতুবী, ৫খ., পৃ. ১৩২।

সারকথা

এ হাদীসে নববীসমূহে যে মুত'আ বিবাহের অনুমতি দান ও পরে তা নিষিদ্ধ করার উল্লেখ আছে, তদ্বারা এ প্রতীকী মুত'আ কক্ষণো বুঝানো হয়নি সম্মানিত শী'আগণ যার প্রবক্তা, বরং এর দ্বারা ঐ খন্ডকালীন বুঝানো হয়েছে, যে বিবাহ্ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অভিভাবকের সম্মতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তালাক ছাড়াই বিচ্ছেদ ঘটে; অতঃপর ঐ স্ত্রীলোক এক ঋতুস্রাব না হওয়া পর্যন্ত অপর কোন পুরুষের সাথে মুত'আ করতে পারে না। কেবল এই ধরনটি ইসলামের প্রাথমিক কালে অর্থগতভাবে জায়েয এবং মুবাহ ছিল, যে শরীয়াতে ঐ পর্যন্ত এ বিশেষ ধরনটির নিষিদ্ধ বা হারাম হওয়ার কোন হুকুম অবতীর্ণ হয়নি। যেমন শারাব ও সুদ ইসলামের প্রথম যুগে মুবাহ্ ও হালাল হওয়ার অর্থ এই যে, ইসলামের প্রথম যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে শারাব ও সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি। আর যে সমস্ত লোক নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে শারাব পান করেছে অথবা সুদ গ্রহণ করেছে, শরীআতের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি আরোপ করা হয়নি আর তাদেরকে কোন শাস্তিও দেয়া হয়নি। এমনকি যে পর্যন্ত না শারাব ও সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হলো।

ইসলামের প্রথম যুগে শারাব ও সুদ হালাল হওয়ার এ অর্থ ছিল না যে, (আল্লাহ্ মাফ করুন) শরীয়াতের পক্ষ থেকে এ অনুমতি ছিল, যার ইচ্ছে হয়, শারাব পান করুক এবং যার ইচ্ছে হয়, সুদ গ্রহণ করুক। অনুরূপভাবে মুত'আ খন্ডকালীন বিবাহ্ অর্থে ইসলামের প্রথম যুগে মুবাহ ও বৈধ হওয়ার অর্থ এই যে, ইসলামের প্রথম যুগে খন্ডকালীন বিবাহ্ অর্থে মুত'আ বিবাহ্ নিষেধকৃত ছিল না; (আল্লাহ্ মাফ করুন) এ অর্থ ছিল না যে, মহানবী (সা) বাণী দ্বারা মুত'আ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার প্রথম ঘোষণা খায়বার যুদ্ধে প্রদান করা হয়, এর পর আওতাস যুদ্ধের সময়, অতঃপর তাবূক যুদ্ধের সময় আর এরও পর বিদায় হজ্জের সময়, যাতে করে সাধারণ ও বিশেষ সব ধরনের মানুষের এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান অর্জিত হয়। আর মহানবী (সা) কর্তৃক মুত'আ হারাম হওয়ার ব্যাপারে বার বার ঘোষণা ছিল গুরুত্ব দানের জন্য প্রথম ঘোষণার পুনরুক্তি, যা তিনি খায়বার যুদ্ধের সময় ঘোষণা দিয়েছিলেন; এটা কোন নতুন ঘোষণা ছিল না। শী'আদের অনুসৃত আরেকটি মুত'আ হলো, পুরুষ মহিলাকে একদিন বা দু'দিন, এক ঘন্টা বা দু'ঘন্টা সময়ের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে উপভোগ করে। এটা নির্ভেজাল যিনা এবং প্রকাশ্য অপকর্ম; এ ধরনের ব্যবস্থা কোন দিন ইসলামে জায়েয বা মুবাহ ছিলই না যে, পরবর্তীতে তা রহিত করা হয়েছে। যেমন ব্যভিচার না কখনো বৈধ ছিল, আর না তা রহিত করা হয়েছে।

বরং সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে এযাবতকাল পর্যন্ত কেবল শী'আ মাযহাব ছাড়া আর কোন ধর্ম বা মাযহাবেই মুত'আ জায়েয ছিল না, আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, শী'আ অনুসৃত মুত'আ যদি জায়েয হয় তবে বংশধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, সন্তানও ধ্বংস হবে, উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকারী বিবেচিত হবে না, আর এও বুঝা যাবে না যে, কে পুত্র আর কে ভাই। অধিকন্তু মীরাস, তালাক ও ইদ্দতের যে বিধান শরীয়াতে এসেছে, এর সবই বাতিল হয়ে যাবে। আর বিবাহের ক্ষেত্রে শরীয়াত যে চারজন স্ত্রীর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে তাও বাতিল হয়ে যাবে। এ জন্যে যে, মুত'আয় না চারের সীমা নির্ধারিত আছে, না আছে ইদ্দত, না আছে তালাক, আর না আছে উত্তরাধিকার। একমাত্র মুত'আর প্রবক্তা হওয়ার দরুন শরীয়াতের এ সমুদয় আদেশ একচোটেই বাতিল হয়ে যাবে। বরং বিবাহেরও প্রয়োজন থাকবে না। পুরুষ মুত'আর মাধ্যমে তার প্রয়োজন সেরে নেবে আর স্ত্রীলোক তার রুটি-রুযী এবং দুঃখ-ব্যথার স্বতন্ত্র একজন অভিভাবকের অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। আর চলাফেরায় সে অনিশ্চিত পথের পথিক হিসেবে দৃষ্টিগোচর হবে। অতঃপর যৌবন চলে যাওয়ার পর কে তার অভিভাবক ও যিম্মাদার হবে ? সম্মানিত শী'আগণ, চিন্তা করে দেখুন যে, এরচেয়ে বেশি কোন অপদস্থতা ও বিপদ দেখা যায় কি ? শী'আদের উচিত মনে-প্রাণে হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, যিনি নিজ খিলাফতকালে এহেন বেহায়াপনার নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছেন।

মুত'আ হারাম হওয়ার বিস্তারিত প্রমাণাদি এবং এর থেকে উদ্ভূত বিড়ম্বনা সম্পর্কে জানতে চাইলে সম্মানিত ইলম অনুসন্ধানীগণ আল্লামা আবূ বকর আল-জাসসাস প্রণীত আহকামুল কুরআন, ২খ. পৃ. ৪৬ থেকে ১১৫ এবং তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যা ও ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়া অধ্যয়ন করুন। মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ এবং তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ ও মননশীল।

মুত'আ হারাম হওয়ার একটি বিজ্ঞোচিত প্রমাণ

প্রতিটি সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিই নিজের, আপন কন্যা ও বোনের বিবাহের ঘোষণাকে গৌরবজনক মনে করেন এবং সর্বোচ্চ আনন্দ উল্লাসের সাথে বিবাহের ওলীমায় আপন নিকটজন ও বন্ধুদের দাওয়াত করে থাকেন। কিন্তু মুত'আ এর বিপরীত, একে বরং গোপন রাখার চেষ্টা করেন এবং আপন কন্যা, ভগ্নি ও মাতার প্রতি মুত'আর সপর্কে সম্পর্কিতকরণে লজ্জা অনুভব করেন। আজ পর্যন্ত কোন ন্যূনতম আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, বরং এমন কোন আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তির বেলায়ও এমনটি শোনা যায়নি যে, সে কোন মজলিসে গর্বভরে অথবা কথা প্রসঙ্গে বলেছে যে, আমার কন্যা অথবা ভগ্নি কিংবা মা এতটা মুত'আ করেছে। অধিকন্তু সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিই বিবাহে স্বামী ও স্ত্রীকে এবং তাদের পিতামাতাকে মুবারকবাদ দেন; কিন্তু মুত'আর ব্যাপারে কাউকে কখনো মুবারকবাদ দিতে শোনা যায়নি।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের প্রত্যাবর্তন

যে সমস্ত মুহাজির মক্কা থেকে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করে গিয়েছিলেন, যখন তারা জানতে পেলেন যে, মহানবী (সা) মক্কা মুয়াযযমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়েছেন, তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশ আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় চলে আসেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) ঐ সময় মদীনায় উপস্থিত হন যখন নবী (সা) বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন।[১]

হযরত জাফর (রা) এবং তার সাথে যে মুষ্টিমেয় মানুষ থেকে গিয়েছিলেন, তারা ঐ দিন পৌঁছেন যেদিন খায়বার বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল। মহানবী (সা) হযরত জাফরের সাথে আলিঙ্গন করেন এবং কপালে চুম্বন করেন। এর পর বলেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি না যে, খায়বার বিজয়ে আমি বেশি আনন্দিত হয়েছি নাকি জাফরের প্রত্যাবর্তনে। [বায়হাকী কর্তৃক হযরত জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত]

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা), (যিনি হযরত জাফরের সাথে এসেছিলেন) বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে ঐ সময় উপস্থিত হই যখন তিনি খায়বার জয় সম্পন্ন করেছিলেন। মালে গনীমত থেকে তিনি আমাদেরকেও অংশ দেন; আমরা ছাড়া খায়বার বিজয়ে অংশগ্রহণ করেনি এমন আর কাউকে তিনি অংশ দেননি।

এটা বুখারীর বর্ণনা, বায়হাকীর বর্ণনায় আছে যে, তিনি মুসলমানদেরকে বলে এদেরকে গনীমতের মালে শরীক করেন।[২]

ওয়াদিউল কুরা ও তায়মা বিজয়

খায়বার বিজয়ের পর তিনি ওয়াদিউল কুরার প্রতি মনোনিবেশ করেন। চারদিন অবরোধ করে রাখার পর জয় করে নেন। নবীজির দাস মিদআম উটের পিঠ থেকে তাঁর মালামাল নামাচ্ছিলেন, অদৃশ্য একটি তীর এসে তাকে বিদ্ধ করে এবং তিনি শহীদ হন। লোকে বলল, এর শাহাদত কল্যাণকর হোক। তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, যে চাদর সে গনীমতের মাল থেকে চুরি করেছে, তা আগুনে পরিণত হয়ে তাকে জ্বালাবে। জনৈক ব্যক্তি যখন তাঁকে এ কথা বলতে শুনল, তখন সে একটি জুতার ফিতা নিয়ে এলো। তিনি বললেন, জুতার একটি ফিতাও (যা আত্মসাৎ করা হয়েছে) জাহান্নামের অন্তর্ভুক্ত (বুখারী)।

তায়মাবাসী যখন ওয়াদিউল কুরা জয়ের খবর পেল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জিযয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করে নিল।[৩]

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৫।

২. যারকানী, ২খ. পৃ. ২৪৬।

৩. যারকানী, ২খ. পৃ. ২৪৭; ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ১৭।

প্রত্যাবর্তন ও তা'রীস রজনীর ঘটনা

ওয়াদিউল কুরা এবং তায়মা জয়ের পর তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনার সন্নিকটে পৌঁছে রাত্রির শেষভাগে এক উপত্যকায় বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি করেন। ঘটনাক্রমে কারো নিদ্রা ছোটেনি, এমনকি সূর্য উপরে উঠে গেছে। সর্বপ্রথম হযরত রাসূল (সা) জেগে উঠেন এবং তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন ও সাহাবিগণকে জাগিয়ে দেন। আর তিনি ঐ উপত্যকা পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন যে, এখানে শয়তান আছে। ঐ উপত্যকা পেরিয়ে তিনি অবতরণের আদেশ করেন এবং হযরত বিলাল (রা)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। উযূ করে ফজরের দু'রাকাত সুন্নত আদায় করেন। এর পর হযরত বিলাল ইকামত বলেন এবং জামাআতের সাথে ফজরের নামায কাযা আদায় করা হয়। [মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে]।

ফায়দাসমূহ

১. নামায এবং ইবাদতে হযরত নবী (আ)-গণের (তাঁদের প্রতি আল্লাহর সহস্র সহস্র শান্তি বর্ষিত হোক) আলস্যের কারণে কখনো ভুল হয় না; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করা হয় যাতে উম্মত ভুলের মাসআলা সম্পর্কে জানতে পারে। কাজেই যদি তাঁর থেকে এ ভুল ঘটে না যেত, তাহলে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা আদায় সম্পর্কে উম্মত কি করে জানতে পেত ? আবার যদি তিনি যোহর অথবা আসরের নামাযের দু' অথবা তিন রাকাআতে সালাম না ফিরাতেন (যুল-ইয়াদাইনের হাদীসে যেমনটি রয়েছে) তাহলে সাহু সিজদার মাসআলা উম্মত কি করে জানতে পেত ?

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কতই না কৌশল আর কতই না অনুগ্রহ, যে হযরতগণকে নবূয়াত ও রিসালাতের রাজ-মুকুট পরিয়ে আল্লাহর আদেশের ব্যাখ্যাকারের মসনদে আসীন করেছেন, তাঁদের ভুল-ভ্রান্তিকেও আহকামে শরীয়ার মাধ্যম বানিয়েছেন। হযরত আদম (আ)-এর যদি ভুল-ভ্রান্তি না হতো, তা হলে তাওবা ইসতিগফারের সুন্নত কোত্থেকে জানা যেত। رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ। (সূরা আ'রাফ : ২৩) বলে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ এবং ইবলীসের অপমান ও অপদস্থ করার পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে। সত্যিই এগুলো ব্যতিক্রমধর্মী ভুল-ভ্রান্তি, যদ্বারা সব সময়ের জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে।

সম্মানিত আরিফগণের বাক্যাবলীর মধ্যে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর এ উক্তিটি উদ্ধৃত করা যায় : يا ليتنى كنت سهو محمد ﷺ "আহা, আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভুলের কারণ হতাম!"

হযরত নবী (আ)-গণের ভুল-ভ্রান্তি কোন্ পর্যায়ের কল্যাণ ও বরকতময় এবং আল্লাহর দরবারে কোন্ স্তরে গ্রহণযোগ্য হয়, খুব সম্ভব তা বুঝেই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) এ কামনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা অধিক জ্ঞাত।

২. এ হাদীস থেকেই এ মাসআলা জানা গেল যে, যে স্থানে ইবাদতে ভ্রান্তি ও আলস্য এসে পড়ে, সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে পড়া মুস্তাহাব। দৃশ্যত এ স্থানান্তর বড় হিজরতের নমুনা হিসেবে অনুমিত হয়, কাজিই একে যদি ছোট হিজরত নামকরণ করা হয়, তবে সম্ভবত তা অন্যায় হবে না। যে স্থানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং যে স্থানের পাপের বাজার গরম হয়ে যায়, এরূপ স্থান ত্যাগ করে যেখানে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগী করা সহজ, এমন স্থানে গিয়ে বাস করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। আর একেই বড় হিজরত নামে নামকরণ করা হয়েছে।

আর যে স্থানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে আলস্য এসে পড়ে, এমন স্থান ত্যাগ করে নিকটবর্তী অপর কোন স্থানে গিয়ে ইবাদত করা মুস্তাহাব; একেই আমরা ছোট হিজরত নামে আখ্যায়িত করেছি।

'যখন তোমার কাছে কোন মনযিল অনুপযোগী হয়, তবে সেখান থেকে সরে পড়।' হিজরতের অবশিষ্ট হুকুম-আহকাম বিস্তারিতভাবে ফিকহের কিতাবসমূহ থেকে জানা যাবে।

হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-এর সাথে বাসর উদ্‌যাপন

এ বছরেই হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা) আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় আগমন করেন, যাকে নবী (সা) নাজ্জাশীর মাধ্যমে বিবাহ করেছিলেন। যাকে বিবাহ করার বিস্তারিত বর্ণনা ইনশা আল্লাহ পবিত্র সহধর্মিণিগণের বর্ণনায় আসবে।

উমরাতুল কাযা (সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাস)

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কুরায়শের সাথে এ চুক্তি হয়েছিল যে, এ বছর উমরা না করেই (মুসলমানগণ) প্রত্যাবর্তন করবেন এবং আগামী বছর উমরা করতে আসবেন এবং উমরা সমাপ্ত করে তিনদিনের মধ্যে ফিরে যাবেন। এর ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা) যিলকদ মাসের চাঁদ দেখে সাহাবীগণকে আদেশ দেন, পূর্ববর্তী বছরের উমরার কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে, যা থেকে মুশরিকগণ হুদায়বিয়াতে বাধা দিয়েছিল। আরো নির্দেশ দেন যে, যারা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের কেউ যেন থেকে না যায়। কাজেই তাদের মধ্যে কেবল যারা ইতোমধ্যে শাহাদতবরণ করেছিলেন কিংবা ইনতিকাল করেছিলেন তারা ছাড়া আর কেউই অংশগ্রহণ করা

থেকে বিরত থাকলেন না। (তাবাকাতে[১] ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৮৭; যারকানী, ২খ. পৃ. ২৫৪)।

এভাবে দু'হাজার মানুষের জামাআতের সাথে তিনি মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে ছিল কুরবানীর সত্তরটি উট। যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে তিনি এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) ইহরাম বাঁধলেন এবং লাব্বায়েক ধ্বনিসহ সামনে অগ্রসর হলেন। সতর্কতামূলকভাবে অস্ত্র সঙ্গে রেখেছিলেন। কিন্তু যেহেতু হুদায়বিয়ার সন্ধিতে এ শর্ত ছিল যে, অস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারবেন না, সেহেতু তারা মক্কা থেকে আট মাইলের দূরত্বে অবস্থিত বাতনে ইয়াহুজ নামক স্থানে অস্ত্রশস্ত্র খুলে রাখলেন এবং সেগুলোর হিফাযতের জন্য দু'শো লোকের একটি দল মোতায়েন রাখলেন। আর তিনি সাহাবিগণসহ তালবিয়া পাঠ করতে করতে হেরেমের দিকে অগ্রসর হলেন। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৮৭)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) নবীজির উট কাসওয়ার নাক-রশি ধরে এই রাজায পাঠ করতে করতে সবার সামনে চলছিলেন :

خلوا بنى الكفار عن سبيله * قد انزل الرحمن فى تنزيله
بان خير القتل فى سبيله * نحن قتلناكم على تاويله
كما قتلناكم على تنزيله

"ওহে কাফিরগণ, তাঁর পথ ছেড়ে দাও, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এ আদেশ অবতীর্ণ করেছেন যে, উত্তম যুদ্ধ তাই যা আল্লাহর পথে হয়, আমরা তোমাদের

---

১. قال ابن اسحاق خرج النبى ﷺ فى ذى القعدة شد الشهر الذى صدفيه المشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التى صده عنها - وقال الحاكم فى الاكليل تواترت الاخبار انه ﷺ هل ذو القعدة امر اصجابه ان يعتمروا اقضاء عمرتهم وان لايختلف احد منهم شهد الحديبية فخرجوا الا من استشهد وخرج معه اخرون معتمرين فكانت عدتهم الفين سوى النساء والصبيان قال وتسمى ايضا عمرة الصلح ۰

হাকীম তাঁর ইকলীলে বলেন, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যিলকদ মাসের চাঁদ দেখে ঐ উমরার কাযা আদায় করতে আদেশ করেন যা হুদায়বিয়ায় কুরায়শদের বাধার কারণে আদায় করতে পারেন নি। এবং তাগিদ দেন যে, যারা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে কেউ যেন থেকে না যায়। কাজেই যারা এ সময়ের মধ্যে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, তারা ছাড়া সবাই কাযা উমরা আদায়ের জন্য তাঁর সাথে রওয়ানা হন। এরা ছাড়া আরো কিছু লোক তাঁর সাথে উমরার নিয়্যতে রওয়ানা হন, শিশু এবং স্ত্রীলোক ছাড়া যাদের সমষ্টি ছিল দু'হাজার। এ উমরাকে 'উমরাতুস-সুলহ'-ও বলা হয়। অধিকন্তু এ রিওয়ায়াত দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হলো যে, কোন কারণে যদি উমরা ও হজ্জ করা সম্ভব না হয়, তবে পরবর্তী বছর এর কাযা আদায় করা ওয়াজিব। এটাই ইমাম আযম আবূ হানীফারও মত। বিস্তারিতের জন্য ফিকহের কিতাবসমূহ দেখা যেতে পারে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৮৩।

সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করেছি তাঁর আদেশ[১] না মানার কারণে, যেমন কুরআন পাক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এটা না মানার কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছি।" [হযরত আনাস (রা) সূত্রে আবদুর রাযযাক এটি বর্ণনা করেছেন]।

আর বায়হাকীর রিওয়ায়াতে এর পর অতিরিক্ত আছে :

اليوم نضربكم على تنزيله * ضربا يزيل الهام من مقيله

ويذهل الخليل عن خليله * يارب انى مؤمن بقيله

"আজ আল্লাহর নির্দেশে তোমাদেরকে এমন মার দেব যে, তোমাদের মাথা থেকে খুলি আলাদা হয়ে যাবে এবং বন্ধু তার বন্ধু সম্বন্ধে বেখবর হয়ে পড়বে। হে আল্লাহ, আমি এ বক্তব্যে বিশ্বাস রাখি।"

আর ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে :

يارب انى مؤمن بقيله * انى رأيت الحق فى قبوله

"আয় আল্লাহ, আমি এটি গ্রহণ করাকেই যথার্থ মনে করি।"

হযরত উমর (রা) বললেন, ওহে ইবন রাওয়াহা, তুমি আল্লাহর রাসূলের সামনে এবং আল্লাহর হেরেমে কবিতা পড়ছ ? রাসূল (সা) বললেন, হে উমর! বলতে দাও, এ কবিতা কাফিরদের জন্য তীরের আঘাত অপেক্ষা বেশি কঠিন। (ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-গরীব; এ সমুদয় বর্ণনা বিস্তারিতভাবে ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৮৩- উল্লেখিত আছে)।

ইবন সা'দের বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছিলেন, ওহে উমর! আমি শুনছি। আর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে আদেশ করলেন, ওহে ইবন রাওয়াহা, পড় :

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ نَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَّمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ

হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর সঙ্গে অপরাপর সাহাবিগণও এ বাক্যাবলী পাঠ করতে থাকলেন। এ মর্যাদার সাথে তারা মক্কায় প্রবেশ করলেন, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করে কুরবানীর পশু যবেহ করলেন ও হালাল হয়ে গেলেন (অর্থাৎ ইহরাম খুললেন)। এর পর তিনি কিছু লোককে বাতনে ইয়াজুজ চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন যাতে সেখানে অস্ত্রের পাহারায় ছেড়ে আসা লোকেরা এসে তাওয়াফ ও সাঈ করতে পারেন। এ কথা বলে তিনি কাবা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। যোহর পর্যন্ত ভেতরেই অবস্থান করলেন। তাঁর নির্দেশে হযরত বিলাল (রা) কাবাগৃহের ছাদে উঠে যোহরের আযান দিলেন।[২]

১. على تنزيله على تاويله এর এ অর্থ আল্লামা যারকানী বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ واكار تاويله على انكار تنزيله على আর সম্ভবত এর অর্থ এই হবে যে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ ও লড়াই তাঁর আদেশে করে থাকি।

২. তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৮৮।

কুরায়শগণ যদিও চুক্তি অনুসারে তাঁকে উমরা করার অনুমতি দিয়েছিল কিন্তু কঠিন হিংসা ও চরম ক্রোধের কারণে তাঁকে ও তাঁর সাহাবাগণকে সহ্য করতে পারছিল না। কাজেই কুরায়শের সর্দারও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ও খান্দানী ব্যক্তিবর্গ মক্কা মুকাররামা ছেড়ে পাহাড়ে চলে যায়।[১]

হযরত মায়মূনা (রা)-এর সাথে বিবাহ

উমরা আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তিনদিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন এবং হযরত মায়মূনা বিনতে হারিস (রা)-কে বিবাহ[২] করেন। তিন দিন অতিক্রান্ত হলে কুরায়শগণ কয়েক ব্যক্তি পাঠিয়ে তাঁকে জানায় যে, তিনদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি বললেন, যদি তোমরা অবকাশ দাও, তা হলে আমি মক্কায় মায়মূনা বিনতে হারিসের বিবাহের আনন্দ ও ওলীমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করি। তারা অত্যন্ত ত্রস্ততার সাথে জবাব দিল যে, আপনার ওলীমার দাওয়াতে আমাদের প্রয়োজন নেই, আপনি চলে যান।

তিনি তৎক্ষণাৎ সাহাবিগণকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন এবং নিজ দাস আবূ রাফে'কে হযরত মায়মূনার কাছে রেখে গেলেন। আবূ রাফে' তাকে সঙ্গে নিয়ে সারিফ নামক স্থানে তাঁর কাছে পৌঁছে দিলেন। এখানে তিনি বাসর যাপন করলেন এবং এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যিলহজ্জ মাসে মদীনায় পৌঁছলেন। আর তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لاَ تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ٠

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, নিরাপদে, তোমাদের কেউ মাথা মুন্ডন করবে আর কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ জানেন তোমরা যা জান না। এ ছাড়াও আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।" (সূরা ফাতহ : ২৭)

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ২৫৫।

২. সহীহ বুখারীর বিভিন্ন স্থানে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মায়মূনাকে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন। সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হালাল হওয়ার পর হযরত মায়মূনাকে বিবাহ করেন। তবে সহীহ বুখারীর রিওয়ায়াত সবচেয়ে বিশুদ্ধ। যেমন হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারীতে ব্যাখ্যা করেছেন। বিস্তারিতের জন্য হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করুন।

উমরাতুল কাযা সমাপ্ত করে যখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা মুকাররামা ছেড়ে আসছিলেন, তখন হযরত হামযা (রা)-এর কনিষ্ঠা কন্যা চাচা চাচা[১] বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর কাছে আসে। হযরত আলী (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাকে উঠিয়ে নেন। তখন হযরত আলী, হযরত জাফর এবং হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর মধ্যে মতভেদ শুরু হয়। সবাই চাচ্ছিলেন যে, সে আমার তত্ত্বাবধানে থাকুক। হযরত আলী (রা) বললেন, যে আমার চাচার মেয়ে এবং আমি তাকে উঠিয়ে নিয়েছি। হযরত জাফর (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। হযরত যায়দ (রা) বললেন, সে আমার ইসলামী ও দীনি ভাইয়ের মেয়ে।

মহানবী (সা) সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন মেয়েটি তার খালার কাছে থাকুক এবং আরো বললেন, খালা মায়ের বিকল্প। [হযরত বারা ইবন আযিব (রা) সূত্রে বুখারী কর্তৃক বর্ণিত]।

হযরত আখরাম ইবন আবুল আওজা (রা)-এর অভিযান (সপ্তম হিজরীর যিলহজ্জ মাস)

যিলহজ্জ মাসে নবী (সা) হযরত আখরাম (রা)-কে পঞ্চাশজন সঙ্গী সহ বনী সুলায়ম গোত্রে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। বনী সুলায়ম বলে, আমাদের ইসলামের প্রয়োজন নেই এবং তীর নিক্ষেপ করে মুসলমানদের এ ক্ষুদ্র বাহিনীকে শহীদ করে দেয়। কেবল হযরত আখরাম (রা)-কে মৃত ভেবে ছেড়ে যায়। তিনি আঘাতজনিত কারণে অর্ধমৃত প্রায় হয়ে পড়েছিলেন। এর পর সুস্থ হয়ে পয়লা সফর মদীনায় ফিরে আসেন।[২]

হযরত গালিব ইবন আবদুল্লাহ লাইসী (রা)-এর অভিযান

অষ্টম হিজরীর সফর মাসে মহানবী (সা) হযরত গালিস ইবন আবদুল্লাহ লাইসী (রা)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী বনী মালূহকে আক্রমণ করার জন্য কাদীদ অভিমুখে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে পৌঁছে নৈশ অভিযান চালান এবং কিছু উট ধরে নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। বরী মালূহ-এর একটি দল প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দ্রুত ধাবিত হয়। তৎক্ষণাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে এত জোরে বৃষ্টি হয় যে, মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে যে উপত্যকাটি অন্তরায় ছিল, তা পানিতে ভরে যায় এবং তারা মুসলমানদের কাছে পৌঁছতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এভাবে মুসলমানগণ নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন।

কতিপয় অভিযান

খায়বার এবং মুতা যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) আরো ছোট ছোট অনেক অভিযান প্রেরণ করেন, আল্লাহর অনুগ্রহে এর সবগুলো সফল হয়ে ফিরে আসে।

১. হযরত হামযা ছিলেন তাঁর দুধভাই, এ সম্বন্ধে তিনি চাচা হন।

২ ইবন সা'দ কৃত আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৮৯।

হযরত খালিদ ইবন ওলীদ, হযরত উসমান ইবন তালহা এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

এ সময়ের মধ্যেই ইসলামের প্রসিদ্ধ সিপাহ্ সালার হযরত খালিদ ইবন ওলীদ এবং আরবের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তি হযরত আমর ইবনুল আস ইসলাম গ্রহন করেন। তাদের ইবলাম গ্রহনের সময় নিয়ে মতভেদ আছে, কেউ বলেছেন অষ্টম হিজরীর সফর মাসে আবার কেউ বলেছেন সপ্তম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধের পর তারা মুসলমান হয়েছেন।

এ বিষয়টি বিশুদ্ধ ও প্রকাশ্য যে, হযরত খালিদ ইবন ওলীদ হুদায়বিয়ার যুদ্ধে কাফির বাহিনীতে ছিলেন এবং পরবর্তীতে মুতার যুদ্ধের বর্ণনায় বুখারীর রিওয়ায়াতে জানা যাবে যে, খালিদ ইবন ওলীদ মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং পরিশেষে সেনাপতি হন ও তারই হাতে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং মুতা যুদ্ধের মধবর্তী সময়ে ইসরাম গ্রহণ করেন।

হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) বলেন, মহামহিম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যখন আমার মঙ্গল করার ইচ্ছা করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার মনে ইসলামের প্রতি ভালবাসা ঢেলে দিলেন। পর্যায়ক্রমে আমার অন্তরে এ ধারণার সৃষ্টি হলো যে, যে যুদ্ধেই আমি কুরায়শের পক্ষে মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে যেতাম এবং (যুদ্ধ শেষে) ফিরে আসতাম, আসার সময় আমার অন্তরের অবস্থা এই হতো যে, অন্তর যেন আমাকে বলত, তোমার এ সমুদয় প্রচেষ্টা ও সকল কলাকৌশল ফলাফলশূন্য এবং নিরর্থক। অবশ্য অবশ্যই মুহাম্মদ (সা)-ই জয়ী হবেন। সুতরাং হুদায়বিয়ার সময় আমি মক্কার মুশরিকদের অশ্বারোহী সেনাদলের একজন ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি নবী (সা)-কে উসফান নামক স্থানে দেখলাম যে, তিনি সাহাবিগণকে সালাতুল খাওফ পড়াচ্ছেন। আমি ইচ্ছা করলাম, নামায আদায়কালে তাঁর উপর আক্রমণ চালাব। কিন্তু তিনি আমার ইচ্ছা সম্পর্কে জেনে ফেললেন এবং আমি আক্রমণ করতে সক্ষম হলাম না। ঐ সময় আমি বুঝে ফেললাম যে, এ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত, অদৃশ্য থেকে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি বিফল হয়ে ফিরে এলাম।

আর হযরত (সা) যখন কুরায়শদের সাথে সন্ধি করে ফিরে গেলেন, তখন আমার অন্তরে এ ধারণা হলো যে, কুরায়শদের শক্তি ও শৌর্য শেষ হয়েছে এবং আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ অর্থাৎ নাজ্জাশী তাঁর অনুগত হয়েছেন। আর তাঁর সাহাবিগণ আবিসিনিয়ায় শান্তি ও নিরাপদে রয়েছে। এখন এছাড়া আর কি উপায় আছে যে, আমি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে চলে যাই, সেখানে গিয়ে ইয়াহূদী কিংবা খ্রিস্টান হই এবং আজম (অনারব)-এর অনুগত ও অধীন থেকে নিন্দনীয় জীবন যাপন করি। আর কিছুদিন নিজ দেশে থেকে দেখি পর্দার অন্তরাল থেকে কি প্রকাশ পায়, এমন চিন্তাই করছিলাম। পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে যখন মক্কা মুয়াযযমায় এলেন, তখন ঐ সময় আমি মক্কা থেকে বের হয়ে গেলাম এবং আত্মগোপণ করলাম।

মহানবী (সা) যখন উমরা সমাপন করলেন, তখন আমার ভাই ওলীদ ইবন ওলীদ, যে নবী (সা)-এর সহযাত্রী ছিল, সে আমাকে খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু পেল না। এর পর আমার ভাই নিম্নোক্ত ভাষায় আমাকে একটি পত্র লিখল :

بسم الله الرحمن الرحيم - اما بعد فانى لم ارا عجب من ذهاب رابك عن الاسلام وعقلك عقلك ومثل الاسلام جهله احد وقد سألنى رسول الله ﷺ عنك وقال اين خالد فقلت ياتى الله به فقال مثله جهل الاسلام ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيرا له ولقد مناه على غيره فاستدرك يا اخى ماقد فاتك من مواطن صالحة ·

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। অতঃপর আমি এর থেকে আশ্চর্যজনক কোন বস্তু দেখিনি যে, তোমার বিবেক ইসলামের মত একটি পবিত্র দীন কবূল করার বিরোধী। অথচ তোমার জ্ঞান তো সে তোমারই জ্ঞান (যা পরিচিত ও প্রসিদ্ধ)। আর ইসলামের মত একটি পবিত্র ধর্ম থেকে অজ্ঞ থাকা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। মহানবী (সা) তোমার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন এবং বলেছেন যে, খালিদ কোথায়? আমি আরয করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাকে নিয়ে আসবেন। তিনি বলেন, আশ্চর্য, তার মত বিজ্ঞ ব্যক্তি কি ইসলামের মত পবিত্র ধর্ম থেকে অজ্ঞ ও বেখবর থাকতে পারে? আর বললেন, খালিদ যদি মুসলমানদের সাথে একত্র হয়ে সত্য দীনের সাহায্য করত এবং বাতিলের অনুসারীদের মুকাবিলা করত, তবে তার জন্য ভাল হতো। আর আমরা তাকে অপরের চেয়ে অগ্রগামী রাখতাম। কাজেই ওহে ভাই, তোমার থেকে যে উত্তম অবস্থান বিনষ্ট হয়েছে, তা তুমি প্রতিরোধ কর, এখনো সময় আছে।"

گیا وقت پهر هاته اتانهين * سداؤ در دوران وكهاتانهين

হযরত খালিদ ইবন ওলীদ বলেন, আমার ভাইয়ের এ পত্র যখন আমার কাছে পৌঁছল, তখন এ পত্র আমার ইসলামের প্রতি অনুরাগ আরো বাড়িয়ে দিল এবং অন্তরে হিজরতের সফরের এক বিশেষ আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। আর মহানবী (সা) আমার ব্যাপারে যা কিছু বলেছেন, তা আমাকে আনন্দিত করল। এ সময়েই আমি একটি স্বপ্নও দেখলাম যে, আমি একটি সংকীর্ণ শহরে আছি, যেখানে দুর্ভিক্ষ চলছে। আমি সেই সংকীর্ণ ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত শহর ছেড়ে একটি প্রশস্ত ও সবুজ-শ্যামল শহরে চলে গিয়েছি। আমি মনে মনে বললাম, এ এক বিশেষ স্বপ্ন, যা আমাকে সতর্ক করার জন্য দেখানো হয়েছে। আমি মক্কা মুকাররামায় উপস্থিত হলাম এবং সফরের মাল-সামান সংগ্রহ করে মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। আমি চাচ্ছিলাম যে, আরো কেউ আমার সঙ্গী হোক। আমি সাফওয়ান ইবন উমায়্যার সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, তুমি কি দেখছ না যে, মুহাম্মদ (সা) আরব ও আজমে বিজয় লাভ করেছেন?

আমরা যদি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাই এবং তাঁর অনুসরণ করি, তা হলে এটা আমাদের জন্য উত্তম হবে; মুহাম্মদ (সা)-এর মর্যাদা আমাদেরও মর্যাদায় পরিণত হবে। সাফওয়ান অত্যন্ত কঠোরভাবে অস্বীকার করল এবং বলল, এ যমীনে যদি আমি ছাড়া আর একটি লোকও মুহাম্মদের অনুসরণ করা থেকে বাকী না থাকে, তবুও আমি তার অনুসরণ করব না। আমি মনে মনে বললাম, এ ব্যক্তির পিতা ও ভাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে, কাজেই একে কোন দোষ দেয়া যায় না। এরপর আমি ইকরামা ইবন আবূ জাহলের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং সাফওয়ানকে যা বলেছি, তাকেও তা বললাম। তখন ইকরামাও আমাকে ঐ জবাব দিল যা সাফওয়ান দিয়েছিল। হযরত খালিদ বলেন, আমি আমার গৃহে ফিরে গেলাম এবং উটনী প্রস্তুত করলাম এবং মনে করলাম যে, উসমান ইবন তালহার সাথে সাক্ষাত করে দেখি, সে তো আমার সত্যিকারের বন্ধু। কিন্তু তার পিতা ও পিতামহের নিহত হওয়ার কথা আমার স্মরণ হলো, ফলে আমি ইতস্তত করতে লাগলাম যে, উসমানকে বলব কি বলব না। আবার মনে হলো যে, বলায় আমার ক্ষতিটা কোথায় ? আমি তো চলেই যাচ্ছি। সুতরাং আমি উসমান ইবন তালহাকে তাই বললাম, যা সাফওয়ানকে বলেছিলাম। উসমান ইবন তালহা আমার পরামর্শ গ্রহণ করল এবং বলল, আমিও মদীনা যাচ্ছি, ইয়াহুজ নামক স্থানে তোমার সাথে মিলিত হব। তুমি যদি আগে পৌঁছে যাও, তবে আমার জন্য অপেক্ষা করবে; আর আমি আগে পৌঁছলেও তোমার অপেক্ষা করব।

খালিদ ইবন ওলীদ বলেন, আমিও রওয়ানা হলাম এবং ওয়াদামাফিক ইয়াহুজে গিয়ে উসমান ইবন তালহার সঙ্গে মিলিত হলাম। প্রত্যুষে আমরা উভয়ে সেখান থেকে যাত্রা করলাম। আমরা যখন হাদ্দা নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমর ইবনুল আস-এর সাথে সাক্ষাত হল, তিনিও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাচ্ছিলেন। আমর ইবনুল আস আমাদেরকে দেখে মারহাবা বললেন, আমরাও মারহাবা বললাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন ? বললেন, ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হতে এবং মুহাম্মদ (সা)-এর আনুগত্য করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমরা বললাম, আমরাও ঐ উদ্দেশ্যেই বের হয়েছি।

খালিদ ইবন ওলীদ বলেন, এভাবে আমরা তিনজন একই সাথে মদীনায় প্রবেশ করলাম এবং হাররা নামক স্থানে আমাদের বাহন উটগুলোকে বসালাম। কোন ব্যক্তি মহানবী (সা)-কে আমাদের সংবাদ দিয়েছিল, তিনি আমাদের আগমনের সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলেন, মক্কা তার কলিজার টুকরাকে নিক্ষেপ করেছে। খালিদ বলেন, আমি উত্তম পোশাক পরিধান করলাম এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চললাম। পথিমধ্যে আমার ভাই ওলীদ এসে মিলিত হল এবং বলল, তাড়াতাড়ি চল, তোমার আগমন বার্তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছে গেছে, নবী (সা) তোমাদের আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এবং তোমাদের অপেক্ষায় আছেন। আমরা দ্রুত চললাম এবং নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। মহানবী

(সা) আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বিনম্রভাবে আমার সালামের জবাব দিলেন। আমি আরয করলাম, اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله তিনি বললেন, নিকটে এসো এবং বললেন :

الحمد لله الذى هداك قد كنت ارى لك عقلا رجوت ان لايسلمك الا الى خير -

"প্রশংসা সেই পবিত্র সত্তার, যিনি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন। আমি দেখছিলাম যে, তোমার জ্ঞান আছে আর আশা করছিলাম যে, ঐ জ্ঞান কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে তোমাকে পথ প্রদর্শন করবে।"

খালিদ বলেন, আমি আরয করলাম, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, যুদ্ধের ময়দানসমূহে আমি আপনার এবং সত্যের মুকাবিলায় উপস্থিত থাকতাম (যে জন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত)। এ জন্যে আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, যাতে আল্লাহ তা'আলা আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি বললেন : الاسلام يجب ما كان قبله। "ইসলাম এর পূর্বে কৃত সব কিছু মিটিয়ে দেয়।"

আমি পুনরায় একই আবেদন জানালে তিনি আমার জন্য এ দু'আ করেন :

اللهم اغفر لخالد بن الوليد ما اوضع فيه من صد عن سبيل الله -

"আয় আল্লাহ্, তুমি খালিদের ঐ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও যা খালিদ আল্লাহ তা'আলার পথে বাধাদানের জন্য করেছিল।"

খালিদ বলেন, আমার পরে উসমান ইবন তালহা এবং আমর ইবনুল আস অগ্রসর হলেন এবং মহানবী (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত হন। এতদ সমুদয়ের বিস্তারিত বিবরণ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় এবং এভাবেই আল্লামা সুয়ূতীকৃত খাসাইসুল কুবরায় বর্ণিত হয়েছে।[১]

আমর ইবনুল আস বলেন, মহানবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার পর প্রথমে খালিদ ইবন ওলীদ বায়য়াত হন; এরপর উসমান ইবন তালহা বায়য়াত হন। এর পর আমি বায়য়াত হওয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হই; কিন্তু আমার অবস্থা তখন ছিল এরূপ :

فوالله ماهو الا ان جلست بين يديه فما استطعت ان ارفع طرفى حياء منه قال فبايعته على ان يغفرلى ما تقدم من ذنبى ولم يحضرنى ما تأخر فقال ان الاسلام يجب ما كان قبله والهجرة تجب ما كان قبلها .

"আল্লাহর কসম, আমি নবীজির সামনে বসে তো পড়েছিলাম, কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। আমর বলেন, অবশেষে আমি

১. ৪খ, পৃ, ২৩৮-২৪০; খাসাইস, ১খ. পৃ. ২৪৮।

তাঁর হাতে বায়য়াত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম এ শর্তে যে, আমার পূর্ববর্তী ভুল-ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আমর বলেন, সে সময় আমার এ খেয়াল হলো না যে, আমার পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হোক। তিনি ইরশাদ করলেন, ইসলাম ঐ সমুদয় গুনাহ লুপ্ত দেয় যা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাফির অবস্থায় করা হয়েছিল। আর একইভাবে হিজরতও পূর্ববর্তী গুনাহ বিলুপ্ত করে দেয়।"

হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, সেই অবিনশ্বর প্রভুর শপথ, যেদিন থেকে আমরা মুসলমান হলাম, সেদিন থেকে যত সমস্যাই এসেছে, মহানবী (সা) আমাদের মত আর কাউকেই বলেন নি। আমর ইবনুর আস (রা) বলেন, আমি, খালিদ এবং উসমান অষ্টম হিজরীর সফর মাসের শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ.২৩৮)।

মুতার যুদ্ধ (অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাস)

মুতা একটি স্থানের নাম যা সিরিয়ার বালকা এলাকায় অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বিভিন্ন বাদশাহ এবং আমীরদের নামে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন, তখন শারজীল ইবন আমর গাসসানীর নামেও একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। শারজীল ছিল রোম সম্রাট কায়সারের পক্ষে সিরিয়ার আমীর। হযরত হারিস ইবন উমায়র (রা) যখন নবীজির পত্র নিয়ে মুতা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন শারজীল তাকে হত্যা করে। এজন্যে হযরত (সা) তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে মুতার দিকে প্রেরণ করেন।[১]

হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে সেনানায়ক নিযুক্ত করেন এবং বলেন, যদি যায়দ শহীদ হয়ে যায়, তবে জাফর ইবন আবূ তালিব সেনানায়ক হবে; যদি জাফরও শহীদ হয়ে যায়, তবে আবদুল্লাহ ইবন আবূ রাওয়াহা সেনাধ্যক্ষ হবে। আর যদি আবদুল্লাহও শহীদ হয়ে যায়, তা হলে মুসলমানগণ যাকে ইচ্ছা, অধিনায়ক মনোনীত করবে। (বুকারী, আহমদ ও নাসাঈ বিশুদ্ধ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

এ জন্যে এ যুদ্ধকে 'গাযওয়াতু জায়শুল উমারা' বলা হয়। যেমনটি মুসনাদে আহমদ ও নাসাঈতে সহীহ সনদে হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জায়শুল উমারা প্রেরণ করলেন... হাদীসের শেষ পর্যন্ত।[২]

আর একটি সাদা পতাকা হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর হাতে দিলেন এবং বললেন, প্রথমে ঐ স্থানে যাবে, যেখানে হারিস ইবন উমায়র শহীদ হয়েছেন। আর ঐ লোকদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা সে দাওয়াত কবূল করে, তবে তা যথেষ্ট নিয়ামত; অন্যথায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সাহায্য ও সহায়তার আবেদন করে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং সানিয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত তিনি নিজেই পদব্রজে মুজাহিদেরকে সঙ্গ দিলেন। সানিয়াতুল ওয়াদায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এ

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৯২; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৯২।

২. যারকানী, ২খ. পৃ. ২৬৮।

উপদেশ দিলেন যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ-ভীতি ও পরহেযগারী বজায় রাখবে, আপন সাথীদের কল্যাণ কামনা করবে, আল্লাহর পথে আল্লাহর নামে আল্লাহকে অস্বীকার কারীদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদ করবে, প্রতারণা ও অপব্যবহার করবে না, কোন শিশু, স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধকে হত্যা করবে না। মানুষ যখন সেনাপ্রধানকে বিদায় জানাচ্ছিল, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) কেঁদে ফেলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ওহে ইবন রাওয়াহা, কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে ? তখন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) জবাব দিলেন :

اما والله ما بى حب الدنيا ولاصبابة بكم والكنى سمعت رسول الله ﷺ يقرأ اية من كتاب الله عز وجل وَاِنَّ مِنْكُمْ الاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلىٰ رَبِّكَ حَتمًا مَّقْضِيًّا – فَلَسْتَ ادرى كيف لى بالصدر بعد الورود –

"জেনে রাখ, আল্লাহর কসম, আমার না দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা আছে আর না তোমাদের সাথে সখ্যতা, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহর কিতাবের এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছি যে, 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই উহা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।' আর আমি জানি না যে, জাহান্নাম অতিক্রমের পর ফিরব কিভাবে। এ জন্যে আমি কাঁদছি।"

সেনাদল যাত্রা শুরু করলে মসলমানগণ উচ্চকণ্ঠে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্বিঘ্নে নিরাপদে ও সাফল্যের সাথে ফিরিয়ে আনুন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) এ কবিতা পাঠ করেন :

لكننى اسأل الرحمن مغفرة * وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا
او طعنة بيدى حران مجهزة * بحربة تنفذ الاحشاء الكبدا
حتى يقال اذا مروا على جدثى * يا ارشد الله من غاز وقد رشدا

"আমি প্রত্যাবর্তন চাই না, বরং আমি আল্লাহর ক্ষমার সাথে সাথে তাঁর রাস্তায় এমন আঘাত কামনা করি যা থেকে বুদবুদ উথলে ওঠে; এমন কঠিন আঘাত যা তীক্ষ্ণ বর্শা দ্বারা করা হয়, যা আমার পাকস্থলি ও কলিজা ভেদ করে; এমনকি মানুষ যখন আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন এ কথা বলবে যে, বাহ্ ইনি কেমন চমৎকার গাযী ছিলেন আর কেমন সাফল্য লাভ করেছেন।"

সেনাদল যখন যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) নবী (সা)-এর নিকটে এলেন এবং এ কবিতা বললেন :

انت الرسول فمن يحرم نوافله * والوجه منه فقد ازرى به القدر
فثبت الله ما اتاك من حسن * تثبيت موسى ونصرا كالذى نصروا
انى تفرست فيك الخير نافله * فراسة خالفت فيك الذى نظروا

"আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল, আর যে ব্যক্তি আপনার ফয়েয ও বরকত, আপনার নূরান্বিত চেহারা দর্শন থেকে বঞ্চিত রইল, তাহলে বুঝে নিন, তার ভাগ্য তাকে নিকৃষ্ট বানালো যে, এ মহাসম্পদ থেকে সে বঞ্চিত থেকে গেল। কাজেই আল্লাহ্ তা'আলা যেন মূসা (আ)-এর মত আপনার সৌন্দর্য স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণের মত আপনাকে সাহায্য করেন। আমি তাঁর মধ্যকার কল্যাণ ও মঙ্গলকে বেশি থেকে বেশি অনুভব করেছি, আর আমার অনুভব মুশরিকদের দৃষ্টি ও অনুভূতির বিরোধী।"

রাসূল (সা) বললেন : وانت فثبتك الله يا ابن رواحه "আর তোমাকেও ওহে ইবন রাওয়াহা, আল্লাহ্ তা'আলা যেন অবিচল রাখেন।"

শারজীল যখন এ সেনা অভিযানের খবর পেলো, তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক লক্ষেরও অধিক সৈন্য একত্র করল। আর হিরাক্লিয়াস স্বয়ং আর এক লক্ষ সৈন্যসহ শারজীলের সাহায্যার্থে বালকায় এসে উপস্থিত হলো। মা'আন পৌঁছে মুসলমানগণ অবগত হলেন যে, দু'লক্ষের অধিক যুদ্ধবাজ সৈন্য মাত্র আমাদের তিন হাজার মুসলিম সেনার মুকাবিলার জন্য বালকায় একত্র হয়েছে। মুসলিম বাহিনী দু'রাত মা'আনে অবস্থান করলেন আর পরামর্শ চলতে থাকল যে, কি করা যায়। সিদ্ধান্ত হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সংবাদ দেয়া হোক এবং সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা হোক। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা (রা) বললেন :

يا قوم والله ان التى تكرهون للتى خرجتم اياها تطلبون الشهاده وما تقاتل الناس بعدد ولاقوة ولا كثرة ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذى اكرمنا الله به فالطلقوا فانما هى احد الحسينين اما ظهرو واما شهادة -

"ওহে সম্প্রদায়, যে বিষয়টি তোমরা অপসন্দ করছ, তাই শাহাদত, যার সন্ধানে তোমরা বেরিয়েছ। আমরা কাফিরদের সাথে শক্তি ও আধিক্যের কারণে লড়াই করি না, আমাদের লড়াই তো কেবল এ দীন ইসলামের জন্য, যদ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মর্যাদা দান করেন। কাজেই উঠো এবং অগ্রসর হও, দু'টি কল্যাণের একটি তো অবশ্যই অর্জিত হবে, হয় কাফিরদের উপর বিজয় অর্জিত হবে, না হয় শাহাদতের নিয়ামত অদৃষ্টে জুটবে।"

লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম, ইবন রাওয়াহা সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলেছেন। আর আল্লাহর উপাসক ও জানবায এ তিন হাজারের দল আল্লাহর দুশমনের দু'লাখ যুদ্ধবাজ সৈন্যের মুকাবিলা করার জন্য মুতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মুতায় উভয় দল লড়াই করার উদ্দেশ্যে মুখোমুখি হলো। এদিকে হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) ইসলামের পতাকা নিয়ে অগ্রসর হন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। তাঁর পর হযরত জাফর (রা) ইসলামী ঝান্ডা হাতে নিয়ে অগ্রসর হন। যখন দুশমন তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং তার ঘোড়া যখম হয়ে যায়, তখন তিনি ঘোড়া থেকে

নেমে পড়েন এবং ঘোড়ার জিন কেটে বুক টান করে আল্লাহর দুশমনদের সাথে লড়াই শুরু করেন।

ঘোড়ার জিন এ জন্যে কাটেন যাতে আল্লাহর দুশমনরা এর থেকেও কোন ফায়দা হাসিল করতে না পারে। আর আল-বিদায়ার বর্ণনানুযায়ী তিনি লড়াই করছিলেন এবং পাঠ করছিলেন :

يا حبذ الجنة واقترابها * طيبة وباردا شرابها

والروم روم قد دنا عذابها * كافرة بعيده انسابها

على اذ لاقيتها ضرابها

"জান্নাত এবং তার নিকটস্থ এলাকা কতই না পবিত্র ও পসন্দনীয়, আর এর পানি অত্যন্ত ঠাণ্ডা; আর আযাব রোমবাসীর নিকটবর্তী হয়েছে, ওরা কাফির এবং ওদের বংশ মর্যাদা আমাদের মর্যাদা থেকে অনেক দূরে, অর্থাৎ আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন নৈকট্য নেই, মুকাবিলার সময় ওদের হত্যা করা আমার জন্য ফরয ও আবশ্যিক।"

লড়াই করতে করতে যখন তার ডান হাত কেটে গেল, তখন বাঁ হাতে ইসলামের পতাকা নিলেন। যখন বাঁ হাতও কেটে গেল, তখন তিনি পতাকা কোলে নিলেন এবং এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দু'টি পাখা দান করেন যার মাধ্যমে তিনি জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে উড্ডয়ন করেন।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত জাফরের লাশ সন্ধান করা হলো, তখন তাতে নব্বইয়েরও বেশি সংখ্যক তীর ও তরবারির আঘাত ছিল, আর এর সবগুলোই ছিল সামনের দিকে, পিছন দিকে কোন আঘাত ছিল না।

হযরত জাফরের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) পতাকা উঠিয়ে নেন এবং সামনে অগ্রসর হন। তিনি ছিলেন ঘোড়ায় আসীন, কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে ইতস্ততভাব দেখা দিলে তিনি নিজ প্রবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

اقسمت يا نفس لتنزلته * كارهة او لتطاوعنه

ان اجلب الناس وشدوا الرنه * مالى اراك تكرهين الجنة

قد طالما قد كنت مطمئنه * هل انت الا نطفة فى شنه

"ওহে নফস, তোর দোহাই লাগে, তুই ঘোড়া থেকে নেমে আল্লাহর দুশমনদের সাথে লড়াই কর, অনিচ্ছায় নাম, অথবা আনন্দ ও আগ্রহের সাথে; (যেমনটি রয়েছে ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৯৩-তে)। যদিও লোকে চিৎকার করে ডাকছে, তো এর কি কারণ, তোকে দেখছি তুই জান্নাতকে অপসন্দ করছিস, অর্থাৎ দ্রুত কদম ফেলছিস না, অগ্রসর হতে অলসতা করে যেন জান্নাতকে অপসন্দ করছিস। এ ছিল কেবল নফসকে ভর্ৎসনা ও অভিযুক্ত করা; তুই তো প্রায়ই প্রশান্তচিত্ত ও স্থির থাকিস, এখন তোর কি হলো, তোর প্রকৃতি কি, তুই তো মাতৃগর্ভে একফোঁটা বীর্যই ছিলি; এ অন্তঃসারশূন্য বীর্য হয়ে আল্লাহর রাস্তায় নিজকে সোপর্দ করতে ইতস্তত করছিস?"

আরো বললেন :

يا نفس الا تقتلي تموتي * هذا حمام الموت قد صليت
وما تمنيت فقد اعطيت * ان تفعلي فعلهما هديت

"ওহে নফস, যদি তুই নিহত না হোস তবে মরবি তো অবশ্যই, এটাই হচ্ছে মৃত্যুর ভাগ্য, যাতে তোর জড়িত হওয়া জরুরী; যে বস্তুর তুই আকাঙ্ক্ষা করছিলি, তা তো তোর মিলে গেছে, অর্থাৎ আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার সুযোগ, যদি তুই যায়দ এবং জাফরের মত কাজ করিস, তা হলে সুপথ পাবি।"

এ কথা বলে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তার চাচাত ভাই এগিয়ে এসে তাকে গোশতের একটি হাড় দিলেন যে, চুষে নাও, যাতে এর শক্তিতে কিছুটা লড়তে পারো। কয়েকদিন যাবত তো তুমি অভুক্তই কাটাচ্ছ। ইবন রাওয়াহা হাড়টি নিলেন এবং একবারমাত্র চুষলেন, এরপর দ্রুত ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, ওহে নফস, মানুষ জিহাদ করছে, আর তুই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত। আর তরবারি নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং এমনকি শহীদ হয়ে গেলেন ও ইসলামের ঝান্ডা হাত থেকে পড়ে গেল। হযরত সাবিত ইবন আখরাম (রা) দ্রুত ইসলামী ঝান্ডা হাতে নিলেন এবং মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ওহে মুসলমানের দল, নিজেদের মধ্যে একজনকে নেতা মনোনীত করতে একমত হয়ে যাও। সবাই বলল, আপনিই আমাদের আমীর, আমরা আপনার আমীর হওয়াতে সম্মত আছি। সাবিত (রা) বললেন, আমি এ কাজে সক্ষম নই। আর এ কথা বলেই তিনি হযরত খালিদ ইবন ওলীদের হাতে ঝান্ডা ধরিয়ে দিলেন এবং বললেন আপনিই যুদ্ধের ব্যাপারে বেশি অভিজ্ঞ। খালিদ ইবন ওলীদ (রা) নেতৃত্ব গ্রহণে কিছুটা ইতস্তত করছিলেন কিন্তু সমস্ত মুসলমান তার আমীর হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) ইসলামী ঝান্ডা নিয়ে অগ্রসর হন এবং অত্যন্ত বীরত্ব ও পৌরুষোচিতভাবে আল্লাহর দুশমনদের মুকাবিলা করেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মুতার যুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে আমার হাদে নয়টি তরবারি ভেঙে যায়, কেবল একটি ইয়েমেনী তরবারি আমার হাতে অবশিষ্ট থাকে।

দ্বিতীয় দিন হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করেন এবং অগ্রবর্তী বাহিনীকে পার্শ্ববতী, দক্ষিণ বাহু ও বাম বাহুতে বিভক্ত করে দেন। শত্রু বাহিনী এ পুনর্বিন্যস্তকরণ দেখে ভীত হয়ে পড়ে এবং ভাবে, নতুন কোন সাহায্য এসে পৌঁছেছে।

ইবন সা'দ আবূ আমের থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত খালিদ যখন রোমান সেনাদলের উপর আক্রমণ করেন, তখন এমনভাবে পরাজিত করেন যে, এমন পরাজয় আমি কখনো দেখিনি। মুসলমান যেদিকে ইচ্ছা, কেবল নিজের তরবারি রাখতেন।

ইমাম যুহরী, উরউয়া ইবন যুবায়র, মূসা ইবন উকবা, আত্তাফ ইবন খালিদ এবং ইবন আয়িয থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর সহীহ বুখারীতে রয়েছে, حتى فتح الله عليهم। এমনকি আল্লাহ্ শেষ পর্যন্ত মুসলমানদর বিজয় দান করেন।

হাকিম বর্ণনা করেন, সামান্য পরিমাণ গনীমত পাওয়া গিয়েছিল। রোমক বাহিনীর পশ্চাদপসরণের পর হযরাত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না এবং নিজ ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ যুদ্ধে বারজন মুসলমান শহীদ হন, যাদের নাম নিম্নে দেয়া হলো :

১. হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)
২. হযরত জাফর ইবন আবূ তালিব (রা)
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)
৪. হযরত মাসঊদ ইবন আওস (রা)
৫. হযরত ওহাব ইবন সা'দ (রা)
৬. হযরত আব্বাদ ইবন কায়স (রা)
৭. হযরত হারিস ইবন নুমান (রা)
৮. হযরত সুরাকা ইবন উমর (রা)
৯. হযরত আবূ কুলায়ব (রা)
১০. হযরত জাবির (রা) (আমর ইবন যায়দের দু'পুত্র)।
১১. হযরত আমর (রা)
১২. হযরত আমের (রা) (সা'দ ইবন হারিসের দু'পুত্র)।

এ সমুদয় বিশদ বর্ণনা যারকানী এবং ফাতহুল বারী, মুতা যুদ্ধ অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে।

যে দিন ও যে সময়ে মুতা প্রান্তরে ইসলামী গাযীদের শাহাদতের ঘটনা ঘটছিল, আল্লাহ তা'আলা[১] সমস্ত সিরিয়ার প্রান্তর আপন পূর্ণ কুদরতে রাসূলের সামনে এনে

১. كما اخرج الواقدى عن شيوخه قالوا رفعت الارض رسول الله ﷺ حتى نظر الى معركة القوم وقال ابن كثير قال الواقدى حدثنى عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن ابى بكر بن عمرو بن حزم قال لما التقى الناس بمؤتته جلس رسول الله ﷺ على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام فهو ينظر الى معتركهم فقال خذ الراية ازيد الحديث

যেমনটি ওয়াকিদী তার শায়খগণ থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে যমীনকে উঠিয়ে দেয়া হয়, এমনকি তিনি (মুসলিম ও রোমক) কওমের যুদ্ধ দেখতে পান। অনুরূপ বর্ণনা আল্লামা সুয়ূতী কৃত খাসাইসে (১খ. পৃ. ২৬০) রয়েছে। এবং ইবন কাসীর বলেন, ওয়াকিদী বলেছেন, আমাকে আবদুল জব্বার ইবন আম্মারা আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর ইবন হাযম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যখন মানুষ মুতায় যুদ্ধে লিপ্ত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরে আসীণ হলেন এবং তাঁর ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী সব কিছু উণ্মুক্ত করে দেয়া হলো, ফলে তিনি তাদের যুদ্ধ দেখছিলেন। অতঃপর বললেন, ইসলামী পতাকা যায়দ গ্রহণ করেছে... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪খ. পৃ. ২৪৬) এবং অনুরূপ খাসাইসে (১খ. পৃ. ২৬০)। আর বায়হাকী এবং আবূ নুয়াইমে মূসা ইবন উকবা থেকে বর্ণিত হয়েছে, [রাসূলুল্লাহ (সা)] বলেছেন, ان الله رفع لى الارض حتى رائيت معتركهم নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার সামনে যমীনকে উঠিয়ে দেন এমনকি আমি তাদের যুদ্ধ দেখতে পাই। অনুরূপ খাসাইসে (১খ. পৃ. ১৫৯)।

দেন, ফলে ময়দানের সমস্ত বিষয় তাঁর চোখের সামনে ছিল। তাঁর এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী সমস্ত অন্তরায় উঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে একত্র করার জন্য 'আস-সালাতু জামিআ' ঘোষণা করান। সাহাবীগণ একত্র হলে তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন। ময়দানের অবস্থা তাঁর চোখের সামনে ছিল। তিনি বললেন, যায়দ ইসলামী পতাকা হাতে নিল এবং কাফিরদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ করল। এমনকি সে শহীদ হয়ে গেল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল। যায়দের পর জাফর ইসলামী পতাকা নেয় এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ করে। এমনকি সে শহীদ হয়ে যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। আর ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতে দুটি পাখা নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

তার পর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ইসলামী পতাকা ধারণ করে। মহানবী (সা) এ কথা বলে চুপ হয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত নীরবতায় ছেয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে আনসারগণ ঘাবড়ে গেলেন এবং তাদের চেহারায় পেরেশানীর ছাপ দেখা যাচ্ছিল। তাদের ধারণা হলো যে, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কর্তৃক কোন অপসন্দনীয় কর্ম প্রকাশ পেয়েছে, যার ফলে তিনি চুপ করে আছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও কাফিরদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ করেছে, এমনকি সে শহীদ হয়ে গেছে। এরা তিনজনই এখন জান্নাতে, তাদেরকে জান্নাতে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং স্বর্ণ নির্মিত সিংহাসনে তারা হেলান দিয়ে আছে। কিন্তু আমি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সিংহাসন কিছুটা দুলতে[১] দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি যে আমি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সিংহাসন দুলতে দেখছি? তখন আমাকে বলা হলো যে, মুকাবিলার সময় আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সামান্য সময় কিছুটা ইতস্তত করছিল এবং সামান্য দোদুল্যমান থাকার পর সামনে অগ্রসর হয়। আর যায়দ এবং জাফর কোন সংশয় ও ইতস্তত না করেই অগ্রসর হয়।

অপর এক বর্ণনায় আছে :

ثم اخذ الرأية عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخل الجنة معترضا فشق ذلك على الانصار فقيل يا رسول الله ما اعترض قال لما اصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فتجع فاستشهد فدخل الجنة فسرى عن قومه -

তিনি বলেন, "এর পর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা পতাকা গ্রহণ করল এবং শহীদ হয়ে গেল। অতঃপর সে জান্নাতে থামতে থামতে ঢুকে পড়ল। এ কথা শুনে আনসারদের

---

১. قال ابن اسحاق وحدثنى محمد بن جعفر عن عن عروة قال ثم اخذ الرائيته عبد الله بن رواحة فالتقوى بها بعض الاا ء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى (যেমনটি আছে ফাতহুল বারীতে, ৭খ. পৃ. ৩৯৩); عن سريرى صاحبيه فقلت عم هذا فقيل لى مضيا وتردد عبد الله بعض تردد ثم مضى (সীরাতে ইবন হিশাম)।

দুঃখ হলো। কেউ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এর কারণ কি ? তিনি বললেন, যখন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত হয়, মানবীয় স্বভাবের কারণে কিছুটা অলস হয়ে পড়ে এবং অগ্রসর হতে কিছুটা ইতস্তত করতে থাকে। অতঃপর সে তার নফসকে অভিসম্পাত ও তিরস্কার করে এবং সাহস ও বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করে ও যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। এ কথা শুনে আনসারগণের পেরেশানী দূর হয়ে যায়।" (বায়হাকী বর্ণিত, অনুরূপ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৪৭; খাসাইসুল কুবরা, পৃ. ২৬০)।

নবী (সা) এসব বলছিলেন এবং তাঁর চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হচ্ছিল। অতঃপর বললেন, তারপর আল্লাহর তরবারিসমূহের একটি তরবারি, অর্থাৎ খালিদ ইবন ওলীদ ইসলামের পতাকা ধারণ করে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে বিজয় দান করেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন :

اللّٰهم انه سيف من سيوفك فانت تنصره فمن يومئذ سمى سيف اللّٰه –

"আয় আল্লাহ্, খালিদ তোমার তরবারিসমূহের একটি তরবারি, কাজেই তুমি তাকে সাহায্য কর। ব্যাস, ঐদিন থেকেই হযরত খালিদ (রা) সাইফুল্লাহ্ উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।"

প্রকৃত ঘটনা তো সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে, অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ ইবন ইসহাক ও বায়হাকীর বর্ণনা থেকে নেয়া হয়েছে।[১]

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) যখন হযরত খালিদকে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেন এবং তার হাতে নেতৃত্বের পতাকা তুলে দেন, তখন বলেন :

انى سمعت رسول اللّٰه ﷺ يقول نعم عبد اللّٰه واخو العشيرة خالد ابن الوليد سيف من سيوف اللّٰه سلم اللّٰه على الكفار –

"নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, কতই না উত্তম ব্যক্তি, আল্লাহর বান্দা এবং গোত্রের ভ্রাতা খালিদ ইবন ওলীদ,আল্লাহর তরবারিসমূহের মধ্যে একটি তরবারি, যা আল্লাহ্ কাফিরদের উপর চালানোর জন্য কোষমুক্ত করেছেন।" (ইসাবা, হযরত খালিদ ইবন ওলীদের জীবন চরিত)।

দ্রষ্টব্য : অর্থ এই যে, হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) আল্লাহর তরবারি, আর এ তরবারি চালনাকারী এবং কাফিরদের উপর এর ব্যবহারকারী আল্লাহ্ তা'আলা। আর প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা চালনা করেন, এমন তরবারি থেকে কে বেঁচে পলায়ন করতে পারে ?

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২৪৫; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৯৩; খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২৬০।

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম প্রধান মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব নানতুবী বলতেন যে, খালিদ ইবন ওলীদ সারা জীবন শাহদত লাভের বাসনা নিয়ে জিহাদ ও লড়াই চালিয়ে যান, কিন্তু তার এ আশা পূর্ণ হয়নি, শাহাদত তার নসীবে জোটেনি। মাওলানা ইয়াকূব সাহেবের মধ্যে কিছুটা জযবার বৈশিষ্ট্য ছিল, সেই জযবার অবস্থায় বলেন, খালিদ ইবন ওলীদ অহেতুক শাহাদত লাভের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন, তার এ আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া ছিল ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অসাধ্য। যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহর তরবারি বানিয়েছেন, তাকে কেউই ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম নয়, অকেজো করতেও অক্ষম; কেননা আল্লাহর তরবারি ভেঙ্গে ফেলা অসম্ভব ও দুঃসাধ্য।

অপর দ্রষ্টব্য : হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ কথা বলা যে, আমি তার সিংহাসন দুলতে দেখেছি, এটা প্রকৃতপক্ষে ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার দোদুল্যমানতার উদাহরণ। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার শাহাদতের কিছু পূর্বে এ দৃশ্যমান জগতে যে ইতস্ততা জন্মায়, অদৃশ্য জগতে তা দোলায়মান সিংহাসনের অবয়বে দেখানো হয়েছে। এখানে যে বস্তু গোপন, সে বস্তুই অদৃশ্য জগতে যে কোন আকার আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়।

কাহিনী

সুলতান মাহমূদ গযনবী যখন হিন্দুস্থান জয় করেন এবং সোমনাথ মন্দিরের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন, তখন এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে মূর্তিটি ছিল, সেটি যখন ভাঙ্গতে ইচ্ছা করলেন, তখন সোমনাথের পূজারীরা অনুনয়-বিনয়ের সাথে আরয করল, এ মূর্তিটি ওজন করে আমাদের নিকট থেকে সে পরিমাণ স্বর্ণ নেয়া হোক, কিন্তু এ মূর্তিটি ভাঙ্গা না হোক। সুলতান মাহমূদ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করলেন। সবাই বলল, জয় তো হয়েছেই, এখন একটামাত্র মূর্তি যদি ছেড়ে দেয়া হয়, তাতে বিশেষ কোন ক্ষতি নেই। আর এর পরিবর্তে যে সম্পদ পাওয়া যাবে, তা ইসলামী সেনাদলের প্রয়োজন মেটাবে। ঐ মজলিসে প্রধান সেনাপতি মাসঊদ গাযীও ছিলেন। তিনি বললেন, এটা তো মূর্তি বিক্রি, এ যাবত বাদশাহ মূর্তি ধ্বংসকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এখন তাকে মূর্তি বিক্রেতা বলা হবে। এ কথা মাহমূদ গযনবীর অন্তর স্পর্শ করল; কিন্তু কিছুটা ইতস্তত ভাব অবশিষ্ট ছিল। দ্বিপ্রহরে নিদ্রা গেলে তিনি স্বপ্নে দেখেন, হাশরের ময়দান বিদ্যমান, আর সেখানে এক ফেরেশতা তাকে এ বলে দোযখের দিকে টেনে নিচ্ছেন যে, এ ব্যক্তি মূর্তি বিক্রেতা। দ্বিতীয় ফেরেশতা বলছেন, না, ইনি তো মূর্তি ধ্বংসকারী, একে জান্নাতে নিয়ে যাও। ইতোমধ্যে নিদ্রা ভেঙ্গে গেল এবং তিনি আদেশ করলেন, দ্রুত মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলা হোক। যখন মূর্তিটি ভাঙ্গা হলো, তখন এর পেট মণি-মানিক্য ভর্তি পাওয়া গেল। তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন যে, তিনি তাকে মূর্তি বিক্রি থেকে রক্ষা করলেন এবং যে সম্পদের আশায় তিনি মূর্তি বিক্রি করতে চাচ্ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ তাকে দান করলেন।

ফেরেশতা কর্তৃক দোযখ ও বেহেশতের দিকে টানাটানি করা ছিল তার মনের ইতস্তত ভাবের চিত্র, যা মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারে মাহমূদ গযনীর মনে উদয় হয়েছিল। জাগ্রত অবস্থায় যা ছিল অন্তরের সংশয়, তা স্বপ্নে এরূপে দেখানো হলো যে, এক ফেরেশতা দোযখের দিকে টানছেন আর অপরজন বেহেশতের দিকে; কখনো চিন্তা মূর্তি ভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল আর কখনো মূর্তি ছেড়ে দেয়ার দিকে যাচ্ছিল। প্রকৃত অবস্থা হলো, মূর্তি না ভাঙ্গা বাস্তবে মূর্তি বিক্রি ছিল না, কিন্তু মূর্তি বিক্রেতার সাথে তুলনীয় ছিল। এ জন্যে আল্লাহ তাআলা তাকে তা এ অবস্থায় দেখিয়েছেন।

অনুরূপভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর দোদুল্যমানতা দুলতে থাকা সিংহাসনের অবস্থায় দেখানো হয়েছে। কোন ইবাদতকে সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই বাস্তবায়ন করা, এটা নফসে মুতমাইন্নাহর বৈশিষ্ট্য। আর ইতস্তত ভাব এলে নফসকে তিরস্কার করা (যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা করেছেন), এটা নফসে লাওয়ামাহর বৈশিষ্ট্য, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সূরা কিয়ামাহর প্রথমে কসম করেছেন : لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّمَةِ "আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।" হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) যুদ্ধকালে যে কবিতা পাঠ করেন, তার উদ্দেশ্য ছিল আপন নফসকে তিরস্কার করা, তিরস্কার সূচক দু'একটি কবিতা পাঠেই নফস স্থির হয়ে যায় এবং তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে আল্লাহর রাহে শহীদ হয়ে যান এবং আপন সঙ্গীদের সাথে জান্নাতে মিলিত হন।

يٰاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى اِلٰى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ٠

"হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদেরঅন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"

এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করার পর নবী (সা) হযরত জাফর (রা)-এর গৃহে গমন করেন। তার সন্তানদের ডাকেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। চোখে তখন অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। হযরত জাফর (রা)-এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা) ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, আপনি কেন কাঁদছেন, জাফর এবং তার সঙ্গীদের ব্যাপারে আপনি কি কোন সংবাদ পেয়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আজ সে শহীদ হয়েছে। আসমা বিনতে উমায়েস (রা) বলেন, শোনামাত্র আমার মুখ দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে গেল এবং মহিলারা আমার পাশে জমা হয়ে গেল। আর নবী (সা) আপন গৃহে চলে গেলেন ও বললেন, জাফরের পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে পাঠাও, আজ তারা তাদের দুখে কাতর হয়ে পড়েছে। আর এ ব্যথার বিরাট প্রভাব

স্বয়ং নবী (সা)-এর ওপরও ছিল। এ ব্যথায় তিনি তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে যেতে থাকেন। (যারকানী)।

হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) ইসলামী বাহিনী নিয়ে মুতা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনার সন্নিকটে পৌঁছলে মহানবী (সা) ও মুসলমানগণ মদীনার বাইরে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

যাতুস সালাসিলে হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর অভিযান

অষ্টম হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে রাসূল (সা) সংবাদ পান যে, বনী কাযাআ গোত্রের একটি দল মদীনা মুনাওয়ারা আক্রমণের ইচ্ছা করছে। এ জন্যে তাদের সমুচিত জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-কে যাতুস সালাসিলের দিকে প্রেরণ করেন। স্থানটি ছিল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দশ মনযিল দূরে অবস্থিত। তার সাথে তিনশত পদাতিক এবং ত্রিশজন ঘোড় সওয়ার সহগামী হলেন। যখন ঐ স্থানের নিকটে পৌঁছলেন, তখন জানতে পেলেন যে, কাফিরের দল অনেক ভারী। সুতরাং তারা সেখানেই অবস্থান নিলেন এবং অতিরিক্ত লোক প্রেরণের জন্য হযরত রাফে' ইবন মাকীস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে প্রেরণ করলেন। নবী (সা) হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর নেতৃত্বে দু'শো লোক প্রেরণ করলেন, যার মধ্যে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-ও ছিলেন। আর এতাকিদ দিলেন যে, আমর ইবনুল আসের সাথে গিয়ে মিলিত হও। আর পরস্পরে একমত থাকবে, কখনই মতপার্থক্য করবে না। হযরত আবূ উবায়দা (রা) যখন সেখানে পৌঁছলেন এবং নামাযের সময় হলো, তখন হযরত আবূ উবায়দা (রা) ইমামতি করতে চাইলেন। আমর ইবনুল আস বললেন, সেনাধ্যক্ষ তো আমি, তুমি তো আমাকে সাহায্য করতে এসেছ। আবূ উবায়দা বললেন, তোমার দলের আমীর তুমি আর আমার দলের আমীর আমি। এর পর হযরত আবূ উবায়দা (রা) বললেন, যাত্রা করাকালীন সময়ে নবী করীম (সা) আমাকে শেষ নির্দেশ এটাই দিয়েছেন যে, একে অপরের আনুগত্য করবে এবং মতপার্থক্য করবে না। সুতরাং আমি তোমার আনুগত্য করব যদিও তুমি আমার বিরোধিতা কর। এভাবে হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর নেতৃত্ব ও ইমামতকে গ্রহণ করে নিলেন। কাজেই আমর ইবনুল আস ইমামতি করতেন এবং আবূ উবায়দা তার ইকতিদা করতেন। অবশেষে সবাই মিলে বনী কাযাআ গোত্রে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে আক্রমণ করলেন। কাফিরেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করল এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সাহাবিগণ আউফ ইবন মালিক আশজাঈকে সংবাদসহ মদীনায় প্রেরণ করলেন। বিজয় লাভের পর হযরত আমর ইবনুল আস (রা) কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন দিকে অশ্বারোহীদেরকে প্রেরণ করতে থাকেন। জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত মালিকানাধীন গনীমতের উট ও বকরি মুসলমানগণ রান্না করে খেতে থাকেন।

এ সফরেই এ ঘটনা ঘটে যায় যে, হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর স্বপ্নদোষ হয়ে গেল। ঠাণ্ডার প্রকোপ খুব বেশি ছিল, এ জন্যে আমর ইবনুল আস গোসল করলেন না এবং তায়াম্মুম করে ফজরের নামায পড়ান। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে যখন এ ঘটনার উল্লেখ করা হলো, তখন তিনি বললেন, ওহে আমর, তুমি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের নামায পড়িয়েছ ! আমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার প্রাণের ভয় ছিল; আর আল্লাহ তা'আলার বাণী হলো : وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا শুনে নবী (সা) মৃদু হাসলেন কিন্তু কিছু বললেন না।[১]

ফায়েদা : হযরত খালিদ ইবন ওলীদ এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা) উভয়ে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ দু'জনের ইসলাম গ্রহণের পর মুতার যুদ্ধ সামনে আসে, যাতে হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) সেনাধ্যক্ষ হয়ে যান । আর মুতা যুদ্ধের পর আসে যাতুস সালাসিল অভিযান। এর নেতা হন হযরত আমর ইবনুল আস (রা)।

সাইফুল বাহারে হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর অভিযান

এর পর অষ্টম হিজরীর রজব মাসে রাসূল (সা) হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে তিনশত মুজাহিদের একটি বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে সাইফুল বাহার (সমুদ্রোপকূল) অভিমুখে জুহায়না গোত্র আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এ বাহিনীতে হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) এবং হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-ও ছিলেন। চলার পথে রসদ হিসেবে নবী (সা) তাদেরকে এক থলি খেজুর দেন। যখন খেজুর শেষ হয়ে গেল, তখন খেজুরের বিচি চুষে চুষে এবং পানি পান করে করে তারা জিহাদ চালাতে থাকলেন। যখন তাও আর থাকল না, তখন গাছের পাতা ছিঁড়ে পানিতে ভিজিয়ে খেতে থাকলেন। এ কারণে এ অভিযানকে 'সারিয়াতুল খাবাত'-ও বলা হয়। কেননা 'খাবাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো গাছের পাতা ছেঁড়া। গাছের পাতা খাওয়ার ফলে মুজাহিদদের ঠোঁট ও মুখ যখম হয়ে যায়।

অবশেষে তারা একদিন সমুদ্রের কিনারে উপস্থিত হলেন। ক্ষুধার জ্বালায় তখন সবাই তখন অস্থির ও ব্যাকুল। হঠাৎ করে অদৃশ্য সাহায্যের নিদর্শন প্রকাশ পেল, সমুদ্র তার অভ্যন্তর থেকে একটি বিশাল আকৃতির মাছ ছুঁড়ে দিল। যা সব মুজাহিদ মিলে আঠার দিন পর্যন্ত খেয়েছেন। সাহাবী বলেন, এ মাছ খেয়ে আমাদের শরীর সুস্থ ও সবল হলো। মাছটির নাম ছিল আম্বর। এর পর হযরত আবূ উবায়দা (রা) মাছটির পাঁজরের একটি হাড় নিয়ে দাঁড় করান এবং বাহিনীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ লোকটিকে বাছাই করে সবচে' বড় উটটির পিঠে বসিয়ে আদেশ দেন ঐ হাড়টির নিচ দিয়ে যেতে। তখন সে কোন চেষ্টা ছাড়াই অবলীলায় হাড়টির নিচ দিয়ে চলে গেল। অথচ আরোহীর মাথাও হাড়ের সাথে লাগল না।

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২৭৩; যারকানী, ২খ. পৃ. ২৭৭।

আমরা যখন মদীনায় ফিরে এলাম, তখন রাসূল (সা) সমীপে এ ঘটনার উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযক, যা তিনি তোমাদের জন্য প্রেরণ করেছিলেন, যদি এর থেকে কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তো আনো। সুতরাং তা থেকে কিছু পরিমাণ তাঁর সামনে পেশ করা হলে তিনি তা থেকে কিছুটা খেলেন। এ অভিযানে কোন সংঘর্ষ হয়নি, ইসলামী বাহিনী বিনাযুদ্ধে মদীনায় ফিরে আসে।[১]

দ্রষ্টব্য : যে রিযক আল্লাহর তরফ থেকে সরাসরি আসে, যাতে বান্দার কোন কাজ বা চেষ্টা-পরিশ্রম না থাকে, তবে ঐ রিযক অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও পবিত্র হয়ে থাকে। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বরকত ও পবিত্রতার অংশ লাভের জন্য চেয়ে নেন এবং কিছুটা খেয়ে নেন। رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

ফায়েদা : কতিপয় আলিম এমন বলেন যে, এ অভিযান হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে প্রেরণ করা হয়েছিল; কেননা রাসূল (সা) হুদায়বিয়ার সন্ধির পর কুরায়শের উপর আক্রমণ করার জন্য কোন অভিযান প্রেরণ করেননি। আর প্রসিদ্ধ বক্তব্য এটাই যে, এ অভিযান কুরায়শদের চুক্তি ভঙ্গের পর এবং মক্কা বিজয়ের সামান্য কিছু দিন পূর্বে প্রেরণ করেছিলেন। এ জন্যে যে, নবী (সা) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে পবিত্র রমযান মাসে রওয়ানা হয়েছিলেন আর এ অভিযান প্রেরণ করেছিলেন রজব মাসে। মাঝে শুধু শাবান মাসই থাকে। আশ্চর্যের কিছু নয় যে, কুরায়শদের চুক্তি ভঙ্গের দরুন রজব মাস থেকেই মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন; আর এ অভিযান ছিল তারই সূচনা।

মাসয়ালা : নিষিদ্ধ রজব মাসে অভিযান প্রেরণ এ বিষয়ের প্রমাণ যে, পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নিষিদ্ধ মাসে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ জায়েয।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/১৪২(উ)—৩২৫০

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২৭৬।